শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

দ্বিতীয় সম্ভার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সপ্তম মুদ্রণ

মুদ্রক : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র



১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সমাবর্তন উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডি-লিট্ ব সাহিত্যাচার্য উপাধিতে ভূষিত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রের বামদিক হইতে দণ্ডায়মান : স্যার যদুনাথ সরকার, সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চ্যান্সেলার, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভাইস্-চ্যান্সেলার মিঃ রহিম।

শ্রীকান্ত

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

শ্রীকান্ত

চতুর্থ পর্ব্ব

১

এতকাল জীবনটা কাটিল উপগ্রহের মত। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরি, না পাইলাম তাহার কাছে আসিবার অধিকার, না পাইলাম দূরে যাইবার অনুমতি। অধীন নই, নিজেকে স্বাধীন বলারও জোর নাই। কাশীর ফেরত-ট্রেনের মধ্যে বসিয়া বার বার করিয়া এই কথাই ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, আমার ভাগ্যেই বা পুনঃপুনঃ এমন ঘটে কেন? আমরণ নিজের বলিয়া কি কোনদিন কিছুই পাইব না? এমন করিয়া কি চিরজীবন কাটিবে? ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল। পরের ইচ্ছায় পরের ঘরে বছরের পর বছর জমিয়া এই দেহটাকেই দিল শুধু কৈশোর হইতে যৌবনে আগাইয়া, কিন্তু মনটাকে দিয়াছে কোন্ রসাতলের পানে খেদাইয়া। আজ অনেক ডাকাডাকিতেও সেই বিদায় দেওয়া মনের সাড়া মিলে না, যদিবা কোন ক্ষীণ কণ্ঠের অনুরণন কদাচিৎ কানে আসিয়া লাগে, আপন বলিয়া নিঃসংশয়ে চিনিতে পারি না—বিশ্বাস করিতে ভয় পাই।

এটা বুঝিয়া আসিয়াছি রাজলক্ষ্মী আমার জীবনে আজ মৃত, বিসর্জ্জিত প্রতিমার শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নদীতীরে দাঁড়াইয়া স্বচক্ষে দেখিয়া ফিরিয়াছি—আশা করিবার, কল্পনা করিবার, আপনাকে ঠকাইবার কোথাও কোন সূত্র আর অবশিষ্ট রাখিয়া আসি নাই। ওদিকটা নিঃশেষ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। কিন্তু এই শেষ যে কতখানি শেষ, তাহা বলিবই বা কাহাকে, আর বলিবই বা কেন?

কিন্তু এই ত সেদিন। কুমারসাহেবের সঙ্গে শিকারে যাওয়া—দৈবাৎ পিয়ারীর গান শুনিতে বসিয়া এমন কিছু একটা ভাগ্যে মিলিল যাহা যেমন আকস্মিক তেমনি অপরিসীম। নিজের গুণে পাই নাই, নিজের দোষেও হারাই নাই, তথাপি হারানোটাকে আজ স্বীকার করিতে হইল, ক্ষতিটাই আমার বিশ্ব জুড়িয়া রহিল। চলিয়াছি কলিকাতায়, বাসনা একদিন আবার বর্ম্মায় পৌঁছিব। কিন্তু এ যেন সর্ব্বস্ব

খোয়াইয়া জুয়াড়ীর ঘরে ফেরা। ঘরের ছবি অস্পষ্ট, অপ্রকৃত—শুধু পথটাই সত্য। মনে হয়, এই পথের চলাটা যেন আর না ফুরায়।

* * * *

অ্যাঁ। একি শ্রীকান্ত যে?

এ-যে একটা স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে সে খেয়ালও করি নাই। দেখি, আমার দেশের ঠাকুর্দ্দা ও রাঙাদিদি ও একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে ঘাড়ে মাথায় ও কাঁধে একরাশ মোটঘাট লইয়া প্ল্যাটফর্মে ছুটাছুটি করিয়া অকস্মাৎ আমার জানালার সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছেন।

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, উঃ কি ভিড়! একটা ছুঁচ গলাবার জায়গা নেই, এই ত তিন-তিনটে মানুষ। তোমার গাড়িটি ত দিব্যি খালি—উঠবো?

উঠুন বলিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। তাঁহারা তিন-তিনটে মানুষ হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়া যাবতীয় বস্তু নামাইয়া রাখিলেন। ঠাকুর্দ্দা কহিলেন, এ বুঝি বেশী ভাড়ার গাড়ি, আবার দণ্ড লাগবে না ত?

বলিলাম, না, আমি গার্ডসাহেবকে বলে দিয়ে আসছি।

গার্ডকে বলিয়া যথাকর্ত্তব্য সমাপন করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন তাঁহারা আরামে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছেন। গাড়ি ছাড়িলে রাঙাদিদি আমার দিকে নজর দিলেন, চমকাইয়া বলিলেন, তোর এ কি ছিরি হয়েছে শ্রীকান্ত! এ যে মুখ শুকিয়ে একেবারে দড়ি হয়ে গেছে! কোথায় ছিলি এতদিন? ভ্যালা ছেলে যা হোক! সেই যে গেলি একটা চিঠিও কি দিতে নেই? বাড়িসুদ্ধ সবাই ভেবে মরি।

এ সকল প্রশ্নের কেহ জবাব প্রত্যাশা করে না, না পাইলেও অপরাধ গ্রহণ করে না।

ঠাকুর্দ্দা জানাইলেন, তিনি সস্ত্রীক গয়াধামে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন এবং এই মেয়েটি তাঁর বড় শ্যালিকার নাতনী—বাপ হাজার টাকা গুনে দিতে চায়, তবু এত দিনে মনোমত একটি পাত্র জুটলো না; ছাড়লে না, তাই সঙ্গে করে আনতে হ'লো। পুঁটু, প্যাঁড়ার হাঁড়িটা খোল ত। গিন্নী, বলি দইয়ের কড়াটা ফেলে আসা হয়নি ত? দাও, শালপাতায় করে গুছিয়ে দাও দিকি—গোটা-দুই প্যাঁড়া এক থাবা দই—এমন দই কখনো মুখে দাওনি ভায়া, তা দিব্যি করে বলতে পারি। না-না-না—ঘটির জলে হাতটা আগে ধুয়ে ফেল পুঁটু—যাকে তাকে ত নয়—এসব মানুষকে কি করে দিতে-থুতে হয় শেখো।

পুঁটু যথা আদেশ সযত্নে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিল। অতএব, অসময়ে ট্রেনের মধ্যে অযাচিত প্যাঁড়া আর দধি জুটিল। খাইতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম আমার ভাগ্যে যত অঘটন ঘটে। এইবার পুঁটুর জন্য হাজার টাকা দামের পাত্র না মনোনীত হইয়া

উঠি। বর্মায় ভালো চাকরি করি এ খবরটা তাঁহারা আগের বারেই পাইয়াছিলেন।

রাঙাদিদি অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং আত্মীয়-জ্ঞানে পুঁটু ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কারণ, আমি ত আর পর নই!

বেশ মেয়েটি। সাধারণ ভদ্রগৃহস্থ ঘরের, ফর্সা না হোক, দেখিতে ভালোই। ঠাকুর্দ্দা তাহার গুণের বিবরণ দিয়া শেষ করিতে পারেন না এমনি অবস্থা ঘটিল। লেখাপড়ার কথায় রাঙাদিদি বলিলেন, ও এমনি গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারে যে, তোদের আজকালকার নাটক-নভেল হার মানে। ও-বাড়ির নন্দরাণীকে এমনি একখানি চিঠি লিখে দিয়েছিল সে, সাতদিনের দিন জামাই পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে এসে পড়ল।

রাজলক্ষ্মীর উল্লেখ কেহ ইঙ্গিতেও করিলেন না। সেরূপ ব্যাপার যে একটা ঘটিয়াছিল তাহা কাহারও মনেই নাই।

পরদিন দেশের স্টেশনে গাড়ি থামিলে আমাকে নামিতেই হইল। তখন বেলা বোধ করি দশটার কাছাকাছি। সময়ে স্নানাহার না করিলে পিত্ত পড়িবার আশঙ্কায় দু'জনেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

বাড়িতে আনিয়া আদর-যত্নের আর অবধি রহিল না। পুঁটুর বর যে আমিই পাঁচ-সাতদিনে এ সম্বন্ধে গ্রামের মধ্যে আর কাহারো সন্দেহ রহিল না! এমন কি পুঁটুরও না।

ঠাকুর্দ্দার ইচ্ছা আগামী বৈশাখেই শুভকর্ম্ম সমাধা হইয়া যায়। পুঁটুর যে যেখানে আছে আনিয়া ফেলিবার কথা উঠিল। রাঙাদিদি পুলকিত চিত্তে কহিলেন, মজা দেখেচ, কে যে কার হাঁড়িতে চাল দিয়ে রেখেচে আগে থাকতে কারও বলবার জো নাই।

আমি প্রথমটা উদাসীন, পরে চিন্তিত, তারপর ভীত হইয়া উঠিলাম। সায় দিয়াছি কি দিই নাই -ক্রমশঃ নিজেরই সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। ব্যাপার এমনি দাঁড়াইল যে, না বলিতে সাহস হয় না, পাছে বিশ্রী কিছু একটা ঘটে। পুঁটুর মা এখানেই ছিলেন, একটা রবিবারে হঠাৎ বাপও দেখা দিয়ে গেলেন। আমাকে কেহ যাইতেও দেয় না, আমোদ-আহ্লাদ ঠাট্টা-তামাসাও চলে—পুঁটু যে ঘাড়ে চাপিবেই, শুধু দিন-ক্ষণের অপেক্ষা—উত্তরোত্তর এমনি লক্ষণই চারিদিক দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। জালে জড়াইতেছি—মনে শান্তিও পাই না—জাল কাটিয়া বাহির হইতেও পারি না। এমনি সময়ে হঠাৎ একটা সুযোগ ঘটিল। ঠাকুর্দ্দা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কোন কোষ্ঠী আছে কিনা। সেটা ত দরকার?

জোর করিয়া সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিয়া ফেলিলাম, আপনারা কি পুঁটুর সঙ্গে আমার বিবাহ দেওয়া সত্যিই স্থির করেচেন?

ঠাকুর্দ্দা কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, সত্যিই? শোন কথা একবার!

কিন্তু আমি তো এখনো স্থির করিনি?

করোনি? তা হলে করো। মেয়ের বয়স বারো-তেরোই বলি, আর যাই করি, আসলে ওর বয়স হ'লো সতেরো-আঠারো। এর পরে ও মেয়ের বিয়ে দেবো আমরা কেমন করে?

কিন্তু সে দোষ ত আমার নয়।

দোষ তবে কার? আমার বোধ হয়?

ইহার পরে মেয়ের মা ও রাঙাদিদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশী মেয়েরা পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িল। কান্নাকাটি, অনুযোগ অভিযোগের আর অন্ত রহিল না। পাড়ার পুরুষেরা কহিল, এত বড় শয়তান আর দেখা যায় না, উহার রীতিমত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

কিন্তু শিক্ষা দেওয়া এক কথা, মেয়ের বিবাহ দেওয়া আর এক কথা। সুতরাং ঠাকুর্দ্দা চাপিয়া গেলেন। তারপরে শুরু হইল অনুনয়-বিনয়ের পালা। পুঁটুকে আর দেখি না, সে বেচারা লজ্জায় বোধ করি কোথাও মুখ লুকাইয়া আছে। ক্লেশ-বোধ হইতে লাগিল। কি দুর্ভাগ্য লইয়াই উহারা আমাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করে! শুনিতে পাইলাম ঠিক এই কথাই উহার মা বলিতেছে,—ও হতভাগী আমাদের সবাইকে খেয়ে তবে যাবে। ওর এমনি কপাল যে, ও চাইলে সমুদ্দুর পর্য্যন্ত শুকিয়ে যায় —পোড়া শোল মাছ জলে পালায়। এমন ওর হবে না ত হবে কার?

কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্বে ঠাকুরর্দ্দাকে ডাকিয়া বাসার ঠিকানা দিলাম, বলিলাম, আমার একজনের মত নেওয়া দরকার, তিনি বললেই আমি সম্মত হবো।

ঠাকুর্দ্দা গদগদকণ্ঠে আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, দেখো ভাই, মেয়েটাকে মেরো না। তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলো যেন অমত না করেন।

বলিলাম, আমার বিশ্বাস তিনি অমত করবেন না, বরঞ্চ খুশী হয়েই সম্মতি দেবেন।

ঠাকুর্দ্দা আশীর্ব্বাদ করিলেন—কবে তোমার বাসায় যাব দাদা?

পাঁচ-ছ'দিন পরেই যাবেন।

পুঁটুর মা, রাঙাদিদি রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া চোখের জলের সঙ্গে আমাকে বিদায় দিলেন।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্ট! কিন্তু এ ভালোই হইল যে, একপ্রকার কথা দিয়া আসিলাম। রাজলক্ষ্মী এ বিবাহে যে লেশমাত্র আপত্তি করিবে না এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছিলাম।

২

স্টেশনে পদার্পণ মাত্র ট্রেন ছাড়িয়া গেল; পরেরটা আসিতে ঘণ্টা-দুই দেরি—সময় কাটাইবার পন্থা খুঁজিতেছি—বন্ধু জুটিয়া গেল। একটি মুসলমান যুবক আমার প্রতি মুহূর্ত্ত-কয়েক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শ্রীকান্ত না?

হাঁ।

আমায় চিনতে পারলে না? আমি গহর। এই বলিয়া সে সবেগে আমার হাত মলিয়া দিল, সশব্দে পিঠে চাপড় মারিল এবং সজোরে গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, চল্, আমাদের বাড়ি। কোথা যাওয়া হচ্ছিল, কলকাতায়? আর যেতে হবে না - চল্।

সে আমার পাঠশালার বন্ধু। বয়সে বছর-চারেকের বড়, চিরকাল আধপাগলা গোছের ছেলে—মনে হইল বয়েসের সঙ্গে সেটা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তাহার জবরদস্তি পূর্ব্বেও এড়াইবার জো ছিল না, সুতরাং আজ রাত্রের মত সে যে আমাকে কিছুতেই ছাড়িবে না, এই কথা মনে করিয়া আমার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। বলা বাহুল্য, তাহার উল্লাস ও আত্মীয়তার সহিত পাল্লা দিয়া চলিবার মত শক্তি আজ আমার নাই। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। আমার ব্যাগটা সে নিজেই তুলিয়া লইল, কুলি ডাকিয়া বিছানাটা তাহার মাথায় চাপাইয়া দিল, জোর করিয়া বাহিরে টানিয়া আনিয়া গাড়ি ভাড়া করিয়া আমাকে কহিল, ওঠ্।

পরিত্রাণ নাই—তর্ক করা বিফল।

বলিয়াছি গহর আমার পাঠশালার বন্ধু। আমাদের গ্রাম হইতে তাহাদের বাড়ি এক ক্রোশ দূরে, একই নদীর তীরে। বাল্যকালে তাহারই কাছে বন্দুক ছুঁড়িতে শিখি। তাহার বাবার একটা সেকেলে গাদাবন্দুক ছিল, সেই লইয়া নদীর ধারে, আমবাগানে, ঝোপঝাড়ে দু'জনে পাখী মারিয়া বেড়াইতাম, ছেলেবেলা কতদিন তাহাদের বাড়িতে রাত কাটাইয়াছি—তাহার মা মুড়ি গুড় দুধ কলা দিয়া আমার কলায়ের যোগাড় করিয়া দিত। তাহাদের জমিজমা চাষ-আবাদ অনেক ছিল।

গাড়িতে বসিয়া গহর প্রশ্ন করিল, এতদিন কোথায় ছিলি শ্রীকান্ত?

যেখানে যেখানে ছিলাম একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এখন কি করো গহর?

কিছুই না।

তোমার মা ভালো আছেন?

মা বাবা দু'জনেই মারা গেছেন—বাড়িতে আমি একলা আছি।

বিয়ে করোনি?

সেও মারা গেছে।

মনে মনে অনুমান করিলাম এইজন্যই যাহাকে হোক ধরিয়া লইয়া যাইতে তাহার এত আগ্রহ। কথা খুঁজিয়া না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের সেই গাদাবন্দুকটা আছে?

গহর হাসিয়া কহিল, তোর মনে আছে দেখছি। সেটা আছে, আর একটা ভালো বন্দুক কিনেছিলাম, তুই শিকারে যেতে চাস্ ত সঙ্গে যাবো, কিন্তু আমি আর পাখী মারিনে—বড় দুঃখ লাগে।

সে কি গহর, তখন যে এই নিয়ে দিনরাত থাকতে?

তা সত্যি, কিন্তু এখন অনেকদিন ছেড়ে দিয়েচি।

গহরের আর একটা পরিচয় আছে—সে কবি। তখনকার দিনে সে মুখে মুখে অনর্গল ছড়া কাটিতে পারিত, যে কোন সময়ে, যে কোন বিষয়ে অনেকটা পাঁচালীর ধরণে। ছন্দ, মাত্রা, ধ্বনি ইত্যাদি কাব্য-শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিত কিনা সে জ্ঞান আমার তখনও ছিল না, এখনও নাই, কিন্তু মণিপুরের যুদ্ধ, টিকেন্দ্রজিতের বীরত্বের কাহিনী তাহার মুখে ছড়ায় শুনিয়া আমরা সেকালে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিতাম। এ আমার মনে আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, গহর, তোমার যে একদিন কৃত্তিবাসের চেয়ে ভালো রামায়ণ রচনার শখ ছিল, সে সঙ্কল্প আছে, না গেছে?

গেছে! গহর মুহূর্তে গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, সে কি যাবার রে! ঐ নিয়েই ত বেঁচে আছি। যতদিন জীবন থাকবে, ততদিন ঐ নিয়েই থাকব। কত লিখেচি, চল্ না আজ তোকে সমস্ত রাত্রি শোনাব, তবু ফুরোবে না।

বল কি গহর?

নয়ত কি তোরে মিথ্যে বলচি?

প্রদীপ্ত কবি-প্রতিভায় তাহার চোখমুখ ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল। সন্দেহ করি নাই, শুধু বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলাম মাত্র। তথাপি, পাছে কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হয়, আমাকে ধরিয়া বসাইয়া সে সারা রাত্রি ব্যাপিয়া কাব্যচর্চ্চা করে, এই ভয়ে শঙ্কার সীমা রহিল না। প্রসন্ন করিতে বলিলাম, না গহর, তা বলিনি, তোমার অদ্ভুত শক্তি আমরা সবাই স্বীকার করি, তবে ছেলেবেলার কথা মনে আছে

কিনা—তাই শুধু বলছিলাম। তা বেশ বেশ—এ একটা বাংলাদেশের কীর্তি হয়ে থাকবে।

কীর্তি? নিজের মুখে কি আর বলব ভাই, আগে শোন, তারপরে হবে কথা।

কোনদিক দিয়াই নিস্তার নাই। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কতকটা যেন নিজের মনেই বাললাম, সকাল থেকেই শরীরটা এমন বিশ্রী ঠেকচে যে মনে হচ্ছে ঘুমোতে পেলে—

গহর কানও দিল না, বলিল, পুষ্পক-রথে সীতা যেখানে কাঁদতে কাঁদতে গয়না ফেলে দিচ্ছেন সে জায়গাটা যারা শুনেচে চোখের জল রাখতে পারেনি, শ্রীকান্ত!

চোখের জল যে আমিই রাখিতে পারিব সে সম্ভাবনা কম; বলিলাম, কিন্তু—

গহর কহিল, আমাদের সেই বুড়ো নয়নচাঁদ চক্রবর্তীকে তোর মনে আছে ত, তার জ্বালায় আমি আর পারিনে। যখন-তখন এসে বলবে, গহর, সেইখানটা একবার পড় দেখি, শুনি। বলে, বাবা, তুই কখনো মোছলমানের ছেলে নোস্—তোর গায়ে আসল ব্রহ্মরক্ত স্বচক্ষে দেখতে পাচ্চি।

নয়নচাঁদ নামটা খুব সচরাচর মেলে না, তাই মনে পড়িল। বাড়ি গহরদের গ্রামেই। জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই চক্কোত্তি বুড়ো ত? যার সঙ্গে তোমার বাবার লাঠালাঠি মামলা-মোকদ্দমা চলছিল?

গহর বলিল, হাঁ, কিন্তু বাবার সঙ্গে পারবে কেন—তার জমি, বাগান, পুকুর, মায় বাস্তুসমেত বাবা দেনার দায়ে নিলেম করে নিয়েছিল; আমি কিন্তু তার পুকুর আর ভিটেটা ফিরিয়ে দিয়েচি। ভারী গরীব—দিনরাত চোখের জল ফেলত, সে কি আর ভাল শ্রীকান্ত।

ভাল ত নয়ই। চক্রবর্ত্তীর কাব্য-প্রীতিতে এমনি কিছু একটা আন্দাজ করিতেছিলাম, বলিলাম, এখন চোখের জল ফেলা থেমেচে ত?

গহর কহিল, লোকটি কিন্তু সত্যিই ভালোমানুষ। দেনার জ্বালায় একসময়ে যা করেছিল অমন অনেকেই করে। ওর বাড়ির পাশেই বিঘে-দেড়েকের একটা আমবাগান আছে, তার প্রত্যেক গাছটাই চক্কোত্তির নিজের হাতে পোঁতা। নাতি-নাতনী অনেকগুলি, কিনে খাবার পয়সা নেই—তা ছাড়া আমার কেই-বা আছে, কেই-বা খাবে।

সে ঠিক। ওটাও ফিরিয়ে দাও গে।

দেওয়াই উচিত শ্রীকান্ত। চোখের সামনে আম পাকে, ছেলেপুলেগুলোর নিশ্বাস পড়ে—আমার ভারী দুঃখ হয় ভাই। আমের সময় আমার বাগানগুলো ত সব ব্যাপারীদের জমা করেই দিই—ও বাগানটা আর বিক্রী করিনে, বলি, চক্কোত্তিমশাই, তোমার নাতিরা যেন পেড়ে খায়। কি বলিস্ রে, ভালো নয়?

নিশ্চয়ই ভালো। মনে মনে বলিলাম, বৈকুণ্ঠের খাতার জয় হোক, তাহার কল্যাণে গরীব নয়নচাঁদ যদি যৎকিঞ্চিৎ গুছাইয়া লইতে পারে হানি কি? তাছাড়া গহর কবি। কবি-মানুষের অত বিষয়-সম্পত্তি কিসের জন্য, যদি রসগ্রাহী রসিক সুজনদের ভোগেই না লাগে?

চৈত্রের প্রায় মাঝামাঝি। গাড়ির কপাটটা গহর অকস্মাৎ শেষ পর্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া বাহিরে মাথা বাড়াইয়া বলিল, দক্ষিণে বাতাসটা টের পাচ্ছিস শ্রীকান্ত?

পাচ্ছি।

গহর কহিল, বসন্তকে ডাক দিয়ে কবি বলেচেন, "আজ দখিন দুয়ার খোলা—"

কাঁচা মেঠো রাস্তা, এক ঝাপ্‌টা মলয়ানিল রাস্তার শুকনো ধূলা আর রাস্তায় রাখিল না, সমস্ত মাথায় মুখে মাখাইয়া দিয়া গেল। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, কবি বসন্তকে ডাকেননি, তিনি বলেচেন এ সময়ে যমের দক্ষিণ-দোর খোলা—সুতরাং গাড়ির দরজা বন্ধ না করলে হয়ত সে-ই এসে হাজির হবে।

গহর হাসিয়া কহিল, গিয়ে একবার দেখবি চল্‌। দুটো বাতাবি-লেবুর গাছে ফুল ফুটেচে, আধক্রোশ থেকে গন্ধ পাওয়া যায়। সুমুখের জামগাছটা মাধবী ফুলে ভরে গেছে, তার একটা ডালে মালতীর লতা, ফুল এখনো ফোটেনি, কিন্তু থোপা থোপা কুঁড়ি। আমাদের চারিদিকেই ত আমের বাগান, এবার মৌলে মৌলে গাছ ছেয়ে গেছে, কাল সকালে দেখিস্‌ মৌমাছির মেলা। কত দোয়েল, কত বুলবুলি, আর কত কোকিলের গান। এখন জ্যোৎস্না রাত কিনা, তাই রাত্রিতেও কোকিলদের ডাকাডাকি থামে না। বাইরের ঘরের দক্ষিণের জানালাটা যদি খুলে রাখিস্‌ তোর দু'চোখে আর পলক পড়বে না। এবার কিন্তু সহজে ছেড়ে দিচ্চিনে ভাই, তা আগে থেকে বলে রাখচি। তা ছাড়া খাবার ভাবনাও নেই, চক্কোত্তিমশাই একবার খবর পেলে হয়, তোরে গুরুর আদর করবে।

তাহার আমন্ত্রণের অকপট আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইলাম। কতকাল পরে দেখা কিন্তু ঠিক সেদিনের সে গহর—এতটুকু বদলায় নাই—তেমনি ছেলেমানুষ তেমনি বন্ধু-সম্মিলনে তাহার অকৃত্রিম উল্লাসের ঘটা।

গহররা মুসলমান ফকির-সম্প্রদায়ের লোক। শুনিয়াছি তাহার পিতামহ বাউল, রামপ্রসাদী ও অন্যান্য গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। তাহার একটা পোষা শালিক পাখীর অলৌকিক সঙ্গিত-পারদর্শিতার কাহিনী তখনকার দিনে এদিকে প্রসিদ্ধ ছিল। গহরের পিতা কিন্তু পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া তেজারতি ও পাটের ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ছেলের জন্য সম্পত্তি খরিদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, অথচ ছেলে

পাইল না বাপের বিষয়-বুদ্ধি, পাইয়াছে ঠাকুর্দ্দার কাব্য ও সঙ্গীতের অনুরাগ। সুতরাং, পিতার বহুশ্রমার্জ্জিত জমিজমা চাষ-আবাদের শেষ পরিণাম যে কি দাঁড়াইবে তাহা শঙ্কা ও সন্দেহের বিষয়।

সে যাই হোক, বাড়িটা তাহাদের দেখিয়াছিলাম ছেলেবেলায়। ভালো মনে নাই। এখন হয়ত রূপান্তরিত হইয়াছে কবির বাণী-সাধনার তপোবনে। আর একবার চোখে দেখিবার আগ্রহ জন্মিল।

তাহাদের গ্রামের পথ আমাদের পরিচিত, তাহার দুর্গমতার চেহারাও মনে পড়ে, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণেই জানা গেল শৈশবের সেই মনে পড়ার সঙ্গে আজকের চোখে দেখার একেবারে কোন তুলনাই হয় না। বাদশাহী আমলের রাজবর্ত্ম—অতিশয় সনাতন। ইট-পাথরের পরিকল্পনা এদিকের জন্য নয়, সে দুরাশা কেহ করে না, কিন্তু সংস্কারের সম্ভাবনাও লোকের মন হইতে বহুকাল পূর্ব্বে মুছিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকে জানে অনুযোগ-অভিযোগ বিফল—তাহাদের জন্য কোনদিনই রাজকোষে অর্থ নাই—তাহারা জানে পুরুষানুক্রমে পথের জন্য শুধু 'পথকর' যোগাইতে হয়, কিন্তু সে পথ যে কোথায় এবং কাহার জন্য এ সকল চিন্তা করাও তাহাদের কাছে বাহুল্য।

সেই পথের বহুকাল বঞ্চিত স্তূপীকৃত ধূলাবালির বাধা ঠেলিয়া গাড়ি আমাদের কেবলমাত্র চাবুকের জোরেই অগ্রসর হইতেছিল, এমনি সময়ে গহর অকস্মাৎ উচ্চ কোলাহলে ডাক দিয়া উঠিল, গাড়োয়ান, আর না, আর না—থামো, থামো—একদম রোকো।

সে এমন করিয়া উঠিল, যেন এ পাঞ্জাব-মেলের ব্যাপার। সমস্ত ভ্যাকুয়াম-ব্রেক চক্ষের নিমিষে কসিতে না পারিলে সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা।

গাড়ি থামিল। বাঁ-হাতি পথটা তাহাদের গ্রামে ঢুকিবার। নামিয়া পড়িয়া গহর কহিল, নেমে আয় শ্রীকান্ত। আমি ব্যাগটা নিচ্চি, তুই নে বিছানাটা—চল।

গাড়ি বুঝি আর যাবে না?

না! দেখচিস্‌নে পথ নেই!

তা বটে। দক্ষিণে ও বামে শিয়াকুল ও বেতসকুঞ্জের ঘন-সম্মিলিত শাখা-প্রশাখায় পল্লী-বীথিকা অতিশয় সঙ্কীর্ণ। গাড়ি ঢোকার প্রশ্নই অবৈধ, মানুষেও একটু সাবধানে কাত হইয়া না ঢুকিলে কাঁটায় জামা-কাপড়ের অপঘাত অনিবার্য্য। অতএব কবির মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনবদ্য। সে ব্যাগটা কাঁধে করিল, আমি বিছানাটা বগলে চাপিয়া গোধূলিবেলায় গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম।

কবিগৃহে আসিয়া যখন পৌঁছান গেল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অনুমান করিলাম আকাশে বসন্ত-রাত্রির চাঁদও উঠিয়াছে। তিথিটা ছিল বোধ করি পূর্ণিমার কাছাকাছি, অতএব আশা করিয়া রহিলাম গভীর নিশীথে চন্দ্রদেব মাথার উপরে আসিলে এ সম্বন্ধে নিসংশয় হওয়া যাইবে। গৃহের চারিদিকেই নিবিড় বেণুবন, খুব সম্ভব তাহার কোকিল, দোয়েল ও বুলবুলির দল এর মধ্যেই থাকে এবং অহর্নিশ শিস দিয়া, গান গাহিয়া কবিকে ব্যাকুল করিয়া দেয়। পরিপক্ব অসংখ্য বেণুপত্ররাশি ঝরিয়া ঝরিয়া উঠান আঙ্গিনা পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, দৃষ্টি তাই ঝরাপাতার গান গাহিবার প্রেরণায় সমস্ত মন মুহূর্ত্তে গর্জ্জন করিয়া উঠে। চাকর আসিয়া বাহিরের ঘর খুলিয়া আলো জ্বালিয়া দিল, গহর তক্তপোশটা দেখাইয়া কহিল, তুই এই ঘরেই থাকবি। দেখিস্ কি রকম হাওয়া।

অসম্ভব নয়। দেখিলাম, দখিনা-বায়ে রাজ্যের শুকনা লতাপাতা গবাক্ষপথে ভিতরে ঢুকিয়া ঘর ভরিয়াছে, তক্তপোশ ভরিয়াছে, মেঝেতে পা ফেলিতে গা ছমছম করে। খাটের পায়ার কাছে ইঁদুরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া একরাশি মাটি তুলিয়াছে, দেখাইয়া বলিলাম, গহর, এ ঘরে কি তোমরা ঢোকো না?

গহর বলিল, না, দরকারই হয় না। আমি ভেতরই থাকি। কাল সব পরিষ্কার করিয়ে দেব।

তা যেন দিলে, কিন্তু গর্ত্তটায় সাপ থাকতে পারে ত?

চাকরটা বলিল, দুটো ছিল, আর নেই। এমন দিনে তারা থাকে না, হাওয়া খেতে বার হয়ে যায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করে জানলে মিঞা?

গহর হাসিয়া কহিল, ও মিঞা নয়, আমাদের নবীন। বাবার আমলের লোক। গরুবাছুর, চাষবাস দেখে, বাড়ি আগলায়। আমাদের কোথায় কি আছে না আছে সব জানে।

নবীন হিন্দু, বাঙালীও বটে, পৈতৃক কালের লোকও বটে। এই পরিবারের গরুবাছুর চাষবাস হইতে বাড়িঘর দোরের অনেক কিছু জানাও তাহার অসম্ভব নয়, তথাপি সাপের সম্বন্ধে ইহার মুখের কথায় নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। ইহাদের বাড়িসুদ্ধ সকলকে দক্ষিণা হাওয়ায় পাইয়া বসিয়াছে। ভাবিলাম হাওয়ার লোভে সর্পযুগলের বহির্গমন আশ্চর্য্য নয় মানি, প্রত্যাগমন করিতেই বা কতক্ষণ?

গহর বুঝিল, আমি বিশেষ ভরসা পাই নাই, কহিল, তুই ত থাকবি খাটে, তোর ভয়টা কিসের। তা ছাড়া ওঁরা থাকেন না আর কোথায়? কপালে লেখা থাকলে রাজা পরীক্ষিৎও নিস্তার পান না—আমরা ত তুচ্ছ। নবীন, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে খালের মুখে একটা ইঁট চাপা দিয়ে দিস্। তুলিস্নে। কি খাবি বল্ ত শ্রীকান্ত?

বলিলাম, যা জোটে।

নবীন কহিল, দুধ মুড়ি আর ভালো আখের গুড় আছে। আজকের মত যোগাড়—

বলিলাম, খুব খুব, এ বাড়িতে ও জিনিসের আমার অভ্যাস আছে। আর কিছু যোগাড়ের দরকার নেই বাবা, তুমি বরঞ্চ আস্তো দেখে একখানা ইঁট যোগাড় করে আনো। গর্ত্তটা একটু মজবুত করে চাপা দাও—দখিনে বাতাসে ভরপুর হয়ে ওঁরা যখন ঘরে ফিরবেন তখন হঠাৎ না ঢুকে পড়তে পারেন।

নবীন আলো দিয়া চৌকির তলায় কিছুক্ষণ উঁকিঝুঁকি মারিয়া বলিল, নাঃ—হবে না।

কি হবে না হে?

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, হবে না। খালের মুখ কি একটা বাবু? এক পাঁজা ইঁট চাই যে। ইঁদুরে মেঝেটা একেবারে ঝাঁঝরা করে রেখেচে।

গহর বিশেষ বিচলিত হইল না, শুধু লোক লাগাইয়া কাল নিশ্চয় ঠিক করিয়া ফেলিতে হুকুম করিয়া দিল।

নবীন হাত-পা ধুইবার জল দিয়া ফলারের আয়োজন ভিতরে চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি খাবে গহর?

আমি? আমার এক বুড়ো মাসী আছেন তিনিই রান্না করেন। সে যাক, খাওয়া-দাওয়া চুকলে লেখাগুলো তোরে পড়ে শোনাব। সে আপন কাব্যের অনুধ্যানেই মগ্ন ছিল, অতিথির সুখ-সুবিধার কথা হয়ত চিন্তাও করে নাই; কহিল, বিছানাটা পেতে ফেলি, কি বল? রাত্তিরে দু'জনে একসঙ্গেই থাকব কেমন?

এ আর এক বিপদ। বলিলাম, না ভাই গহর, তুমি তোমার ঘরে শোও গে, আজ আমি বড় ক্লান্ত, বই তোমার কাল সকালে শুনব।

কাল সকালে? তখন কি সময় হবে?

নিশ্চয় হবে।

গহর চুপ করিয়া একটুখানি চিন্তা করিয়া বলিল, কিংবা একটা কাজ করলে হয় না শ্রীকান্ত? আমি পড়ে যাই, তুমি শুয়ে শুয়ে শোনো। ঘুমিয়ে পড়লেই আমি উঠে যাবো, কি বলো? এই বেশ মতলব,—না?

আমি মিনতি করিয়া বলিলাম—না ভাই গহর, তাতে তোমার বইয়ের মর্য্যাদা নষ্ট হবে। কাল আমি সমস্ত মন দিয়ে শুনব।

গহর ক্ষুব্ধমুখে বিদায় লইল। কিন্তু বিদায় করিয়া নিজের মনটাও প্রসন্ন হইল না।

এই এক পাগল! ইতিপূর্ব্বে ইশারায় ইঙ্গিতে বুঝিয়াছিলাম তাহার কাব্যগ্রন্থ সে ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে চায়। মনে আশা, সংসারে একটা নূতন সাড়া পড়িবে। সে লেখাপড়া বেশী করে নাই, পাঠশালায় ও স্কুলে সামান্য একটু বাঙলা ও ইংরাজী শিখিয়াছিল মাত্র। মনও ছিল না, বোধ হয় সময়ও পায় নাই। কবে কোন্ শৈশবে সে কবিতা ভালোবাসিয়াছে; হয়ত এ মুগ্ধতা তাহার শিরার রক্তে প্রবহমান, তারপর জগতের বাকী সবকিছুই তাহার চক্ষে অর্থহীন হইয়া গিয়াছে। নিজের অনেক রচনাই তাহার মুখস্থ, গাড়িতে বসিয়া গুন গুন করিয়া মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেও ছিল, শুনিয়া তখন মনে করিতে পারি নাই বাগ্দেবী তাঁহার স্বর্ণপদ্মের একটি পাপড়ি খসাইয়াও এই অক্ষম ভক্তটিকে কোনদিন পুরস্কার দিবেন। কিন্তু অক্লান্ত আরাধনার একাগ্র আত্মনিবেদন এ বেচারার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, বারো বৎসর পরে এই দেখা। এই দ্বাদশ-বর্ষ ব্যাপিয়া এ পার্থিব সকল স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া কথার পরে কথা গাঁথিয়া শ্লোকের পাহাড় জমা করিয়াছে, কিন্তু এসব কোন্ কাজে লাগিবে? কাজেও লাগে নাই জানি। গহর আজ আর নাই। তাহার দুশ্চর তপস্যার অকৃতার্থতা স্মরণ করিয়া মনে আজও দুঃখ পাই। ভাবি, লোকচক্ষুর অন্তরালে শোভাহীন গন্ধহীন কত ফুল ফুটিয়া আপনি শুকায়। বিশ্ববিধানে কোন সার্থকতা যদি তাহার থাকে, গহরের সাধনাও হয়ত ব্যর্থ হয় নাই।

অতি প্রত্যুষেই ডাকাডাকি করিয়া গহর আমার ঘুম ভাঙাইয়া দিল, তখন হয়ত সবে সাতটা বাজিয়াছে, কিংবা বাজেও নাই। তাহার ইচ্ছা বসন্তদিনের বঙ্গের নিভৃত পল্লীর অপরূপ শোভা-সৌন্দর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়া ধন্য হই। তাহার ভাবটা এমনি, যেন আমি বিলাত হইতে আসিয়াছি। তাহার আগ্রহ ক্ষ্যাপার মত, অনুরোধ এড়াইবার জো নাই, অতএব হাত-মুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইতে হইল। প্রাচীরের গায়ে আধমরা জামগাছের অর্দ্ধেকটায় মাধবী ও অর্দ্ধেকটায় মালতী লতা—কবির নিজস্ব পরিকল্পনা। অত্যন্ত নির্জ্জীব চেহারা—তথাপি একটায় গোটা-কয়েক ফুল ফুটিয়াছে, অপরটায় সবে কুঁড়ি ধরিয়াছে। তাহার ইচ্ছা গোটাকয়েক ফুল আমাকে উপহার দেয়, কিন্তু গাছে এত কাটুপিঁপড়া যে ছোঁবার জো নাই। সে এই বলিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিল যে, আর একটু বেলা হইলে আঁকশি দিয়া অনায়াসে পাড়াইয়া দিতে পারিবে। আচ্ছা, চলো।

নবীন প্রাতঃক্রিয়ার স্বচ্ছন্দ সুনির্ব্বাহের উদ্যোগপর্ব্বে দম ভরিয়া তামাক টানিয়া প্রবলবেগে কাশিতেছিল, থুথু ফেলিয়া ঢোক গিলিয়া অনেকটা সামলাইয়া লইয়া

হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল। বলিল, বনে-বাদাড়ে মেলাই যাবেন না বলে দিচ্ছি।

গহর বিরক্ত হইয়া উঠিল – কেন রে ?

নবীন জবাব দিল, গোটা দুত্তিন শেয়াল ক্ষেপেচে—গরু-মনিষ্যি একসাই কামড়ে বেড়াচ্চে।

আমি সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইলাম। কোথায় হে নবীন ?

কোথায় সে কি দেখে রেখেচি ? আছেই কোন্ ঠাঁই ঝোপেঝাড়ে। যান ত একটু চোখ রেখে চলবেন।

তা হলে কাজ নেই ভাই গহর।

বাঃ রে ! এই সময়টায় শিয়াল-কুকুর একটু ক্ষ্যাপেই, তা বলে লোকজন রাস্তায় চলবে না নাকি ? বেশ ত !

এও দখিনা হাওয়ার ব্যাপার। অতএব, প্রকৃতির শোভা দেখিতে সঙ্গে যাইতেই হইল, পথের দু'ধারে আমবাগান। কাছে আসিতেই অগণিত ছোট ছোট পোকা চড়চড় পটপট শব্দে আম্রমুকুল ছাড়িয়া চোখে নাকে মুখে জামার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল, শুকনা পাতায় আমের মধু ঝরিয়া চটচটে আঠার মত হইয়াছে, সেগুলা জুতার তলায় জড়াইয়া ধরে, অপ্রশস্ত পথের অধিকাংশ বেদখল করিয়া বিরাজিত ঘেঁটুগাছের কুঞ্জ, মুকুলিত বিকশিত পুষ্পসম্ভারে একান্ত নিবিড়—মনে পড়িয়া গেল নবীনের সতর্কবাণী। গহরের মতে কালটা ক্ষেপিবার উপযোগী। সুতরাং ঘেঁটুফুলের শোভা সময়মত আর একদিন না হয় উপভোগ করা যাইবে, আজ গহর ও আমি, অর্থাৎ নবীনের গরু-মনিষ্যি দ্রুতপদেই স্থানত্যাগ করিলাম।

বলিয়াছি আমাদেরই গ্রামের নদী ইহাদেরও গ্রামপ্রান্তে প্রবাহিত। বর্ষায় পরিস্ফীত জলধারা বসন্ত সমাগমে একান্ত শীর্ণ, সেদিনের স্রোতশ্চালিত অপরিমেয়পানা ও শৈবাল আজ শুষ্ক তটভূমিতে পড়িয়া শিশির ও রৌদ্রে পচিয়া সমস্ত স্থানটাকে দুর্গন্ধে নরককুণ্ড করিয়া তুলিয়াছে। পরপারে দূরে কয়েকটা শিমুলগাছে অজস্র রাঙা ফুল ফুটিয়া আছে চোখে পড়িল, কিন্তু তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা কবির কাছেও এখন যেন বাড়াবাড়ি বলিয়া ঠেকিল। বলিল, চল্, ঘরে ফিরি।

তাই চলো।

আমি ভেবেছিলাম তোর এসব ভালো লাগবে।

বলিলাম, লাগবে ভাই লাগবে। ভাল ভাল কথা দিয়ে এসব তুমি কবিতায় লিখো, পড়ে আমি খুশীই হবো।

তাই বোধ হয় গাঁয়ের লোক ফিরেও চায় না।

না। দেখে দেখে তাদের অরুচি ধরে গেছে। চোখের রুচি আর কানের রুচি এক নয় ভাই। যারা মনে করে কবির বর্ণনা চোখে দেখতে পেলে লোকে মোহিত হয়ে যায়, তারা জানে না। দুনিয়ার সকল ব্যাপারই তাই। চোখে যা সাধারণ ঘটনা, হয়ত-বা সামান্য সাধারণ বস্তু, কবির ভাষায় তাই হয়ে যায় নতুন স্বষ্টি। তুমি দেখতে পাও সেও সত্যি, আমি যে দেখতে পেলাম না সেও সত্যি! এর জন্য তুমি দুঃখ ক'রো না গহর।

তবুও ফিরিবার পথে সে কত কি যে আমাকে দেখাইবার চেষ্টা করিল তাহার সংখ্যা নাই! পথের প্রত্যেকটি গাছ, প্রত্যেকটি লতাগুল্ম পর্য্যন্ত যেন তাহার চেনা। কি একটা গাছের অনেকখানি ছাল কেহ বোধ হয় ঔষধের প্রয়োজনে চাঁচিয়া লইয়া গিয়াছে, তখনও আঠা ঝরিতেছে, গহর হঠাৎ দেখিতে পাইয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল—অন্তরে সে যে কি বেদনাই বোধ করিল তাহার মুখ দেখিয়া আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। চক্রবর্ত্তী যে তাহার সমুদয় হারানো বিষয় ফিরিয়া পাইতেছিল, সে কেবল কৌশল বিস্তার করিয়া নয়—তাহার হেতু ছিল গহরের নিজেরই স্বভাবের মধ্যে। ব্রাহ্মণের প্রতি অনেকখানি ক্রোধ আমার আপনিই পড়িয়া গেল। চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল না, কারণ শোনা গেল, তাঁহারগৃহে গুটি-দুই নাতির 'মায়ের অনুগ্রহ' দেখা গিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ওলাবিবি এখনো দেখা দেন নাই—পচা পুকুরের জল আর একটু শুকাইবার অপেক্ষায় আছেন।

সে যাই হোক, বাড়িতে ফিরিয়া গহর তাহার পুঁথি আনিয়া হাজির করিল, তাহার পরিমাণ দেখিয়া ভয় পায় না সংসারে এমন কেহ যদি থাকেও তাহা অত্যন্ত বিরল। বলিল, না পড়া হলে কিন্তু ছাড়া পাবে না শ্রীকান্ত। সত্যি করে তোমাকে মত দিতে হবে।

এ আশঙ্কা ছিলই। স্পষ্ট করিয়া রাজী হইতে পারি এ সাহস ছিল না, তথাপি দিনের পর দিন করিয়া কবির বাটীতে কাব্য-আলোচনায় এ যাত্রায় আমার সাতদিন কাটিল। কাব্যের কথা থাক্ কিন্তু নিবিড় সাহচর্য্যে মানুষটির যে পরিচয় পাইলাম তাহা যেমন সুন্দর, তেমনি বিস্ময়কর।

একদিন গহর বলিল, তোর কাজ কি শ্রীকান্ত বর্ম্মায় গিয়ে। আমাদের দু'জনেরই আপনার বলতে কেউ নেই, আয় না দু'ভায়ে এখানেই একসঙ্গে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

হাসিয়া বলিলাম, আমি তোমার মত কবি নই ভাই, গাছপালার ভাষাই বুঝিনে, তাদের সঙ্গে কথা কইতে পারিনে, পারব কেন এই বনের মধ্যে বাস করতে? দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠবো যে!

গহর গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, আমি কিন্তু সত্যিই ওদের ভাষা বুঝি, ওরা সত্যিই কথা কয়—তোরা পারিস্‌নে বিশ্বাস করতে?

বলিলাম, বিশ্বাস করা যে শক্ত এটা তুমিও ত বোঝো ?

গহর সহজেই স্বীকার করিয়া লইল ; কহিল, হাঁ, তাও বুঝি।

একদিন সকালে তাহার রামায়ণের অশোকবনের অধ্যায়টা কিছুক্ষণ পড়ার পরে সে হঠাৎ বই মুড়িয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা শ্রীকান্ত, তুই কাউকে ভালোবেসেছিলি ?

কাল অনেক রাত্রি জাগিয়া রাজলক্ষ্মীকে হয়ত আমার এই শেষ চিঠিই লিখিয়াছিলাম। ঠাকুর্দার কথা, পুঁটুর কথা, তাহার দুর্ভাগ্যের বিবরণ সমস্তই তাহাতে ছিল। তাঁহাদিগকে কথা দিয়াছিলাম একজনের অনুমতি চাহিয়া লইব—সে ভিক্ষাও তাহাতে ছিল। পাঠান হয় নাই, চিঠিটা তখনও আমার পকেটে পড়িয়া। গহরের প্রশ্নের উত্তরে হাসিয়া বলিলাম, না।

গহর কহিল, যদি কখনো ভালোবাসিস্, যদি কখনো সেদিন আসে, আমাকে জানাস্ শ্রীকান্ত।

জেনে তোমার কি হবে ?

কিছুই না। তখন শুধু তোদের মধ্যে গিয়ে দিনকতক কাটিয়ে আসব।

আচ্ছা।

আর যদি তখন টাকার দরকার হয় আমাকে খবর দিস্। বাবা অনেক টাকা রেখে গেছে, সে আমার কাজে লাগল না—কিন্তু তোদের হয়ত কাজে লেগে যাবে।

তাহার বলার ধরণটা এমনি যে, শুনিলেও চোখে জল আসিয়া পড়িতে চায়। বলিলাম, আচ্ছা, তাও জানাব। কিন্তু আশীর্বাদ করো সে প্রয়োজন যেন না হয়।

আমার যাবার দিনে গহর পুনরায় আমার ব্যাগ ঘাড়ে করিয়া প্রস্তুত হইল। প্রয়োজন ছিল না, নবীন ত লজ্জায় প্রায় আধমরা হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কানও দিল না। ট্রেনে তুলিয়া দিয়া সে মেয়েমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, আমার মাথার দিব্যি রইল শ্রীকান্ত, চলে যাবার আগে আবার একদিন এসো, যেন আর একবার দেখা হয়।

আবেদন উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, কথা দিলাম দেখা করিতে আবার আসিব।

কলকাতায় পৌঁছে কুশল সংবাদ দেবে বলো ?

এ প্রতিশ্রুতিও দিলাম। যেন কত দূরেই না চলিয়াছি।

কলিকাতার বাসায় গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। চৌকাঠে পা দিয়াই যাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল সে আর কেহ নহে, স্বয়ং রতন।

এ কি রে, তুই যে ?

হ্যাঁ, আমিই। কাল থেকে বসে আছি—একখানা চিঠি আছে।

বুঝিলাম সেই প্রার্থনার উত্তর। কহিলাম, চিঠি ডাকে দিলেও ত আসত ?

রতন বলিল, সে ব্যবস্থা চাষাভূষো মুটেমজুর গেরস্ত লোকদের জন্য। মার চিঠি একটা লোক না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে পাঁচশো মাইল ছুটে হাতে করে না আনলে কোথা যায়। জানেন ত সব, কেন মিছে জিজ্ঞাসা করেছেন।

পরে শুনিয়াছিলাম রতনের এ অভিযোগ মিথ্যা। কারণ সে নিজেই উদ্যোগী হইয়া এ চিঠি হাতে করিয়া আনিয়াছে। এখন মনে হইল গাড়ির ভিড়ে ও আহারাদির অব্যবস্থায় তাহার মেজাজ বিগড়াইয়াছে। হাসিয়া কহিলাম, উপরে আয়। চিঠি পরে হবে, চল্ তোর খাবার যোগাড়টা আগে করে দিই গে।

রতন পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, চলুন।

৩

সশব্দ উদ্গারে চমকিত করিয়া রতন দেখা দিল।

কি রতন, পেট ভরলো ?

আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু আপনি যাই বলুন বাবু, আমাদের কলকাতায় বাঙালী বামুন-ঠাকুর ছাড়া রান্নার কেউ কিছু জানে না। ওদের ঐসব মেড়ুয়া মহারাজগুলোকে ত জানোয়ার বললেই হয়।

উভয় প্রদেশের রান্নার ভালোমন্দ, অথবা পাচকের শিল্প-নৈপুণ্য লইয়া রতনের সঙ্গে কখনো তর্ক করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না। কিন্তু রতনকে যতদূর জানি তাহাতে বুঝিলাম সুপ্রচুর ভোজনে সে পরিতুষ্ট হইয়াছে। না হইলে পশ্চিমা পাচকদের সম্বন্ধে এমন নিরপেক্ষ সুবিচার করিতে পারিত না। কহিল, গাড়ির ধকলটা ত সামান্য নয়, একটু আড়মোড়া ভেঙে গড়িয়ে না নিলে—

বেশ ত রতন, ঘরে হোক, বারান্দায় হোক, একটা বিছানা পেতে শুয়ে পড়ো গে। কাল সব কথা হবে।

কি জানি কেন, চিঠির জন্য উৎকণ্ঠা ছিল না। মনে হইতেছিল, সে যাহা লিখিয়াছে তাহা ত জানিই।

রতন ফতুয়ার পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া হাতে দিল। আগাগোড়া গালা দিয়া শিলমোহর করা। বলিল, বারান্দার ঐ দক্ষিণের জানালার ধারে বিছানাটা পেতে ফেলি, মশারি খাটাবার হাঙ্গামা নেই—কলকাতা ছাড়া এমন সুখ কি আর কোথাও আছে! যাই—

কিন্তু খবর সব ভাল ত রতন ?

রতন মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, তাই ত দেখায়। গুরুদেবের কৃপায় বাড়ির বাইরেটা গুলজার, ভেতরে দাসদাসী, বঙ্কুবাবু, নতুন বৌমা এসে ঘর-দোর আলো করেছেন, আর সবার ওপরে স্বয়ং মা আছেন যে বাড়ির গিন্নী—এমন সংসারকে নিন্দে করবে কে? আমি কিন্তু অনেক কালের চাকর, জাতে নাপ্‌তে—রত্নাকে অত সহজে ভোলানো যায় না বাবু। তাই ত সেদিন ইস্টীশনে চোখের জল সামলাতে পারিনি, প্রার্থনা জানিয়েছিলাম বিদেশে চাকরের অভাব হলে রতনকে একটা খবর পাঠাবেন। জানি, আপনার সেবা করলেও সেই মায়ের সেবাই করা হবে। ধর্মে পতিত হবো না।

কিছুই বুঝিলাম না, শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলাম।

সে বলিতে লাগিল, বঙ্কুবাবুর বয়সও হ'লো, যা হোক একটু বিদ্যেসিদ্যে শিখে মানুষও হয়েছেন। ভাবছেন বোধহয় কিসের জন্য আর পরবশে থাকা ? দানপত্রের জোরে মেরে ত সব নিয়েছেন। মোটামুটি যে বেশ কিছু মেরেছেন তা মানি, কিন্তু সে কতক্ষণ বাবু ?

স্পষ্ট এখনও হইল না, কিন্তু একটা আবছায়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল।

সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, স্বচক্ষেই ত দেখেচেন মাসে অন্তত দু'বার করে আমার চাকরি যায়। অবস্থা মন্দ নয়, রাগ করে চলে গেলেও পারি, কিন্তু যাইনে কেন ? পারিনে। এটুকু জানি, যাঁর দয়ায় হয়েচে তাঁর একটা নিশ্বাসেই আশ্বিনের মেঘের মত সমস্ত উবে যাবে, চোখের পাতা ফেলবার সময় দেবে না। ও তো মায়ের রাগ নয়, ও আমার দেবতার আশীর্ব্বাদ।

এখানে পাঠককে একটু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, রতন ছেলেবেলায় কিছুকাল প্রাইমারী স্কুলে বিদ্যালাভ করিয়াছিল।

একটু থামিয়া কহিল, মায়ের বারণ তাই কথনো বলিনে। ঘরে যা-কিছু ছিল খুড়োরা ঠকিয়ে নিলে, একঘর যজমান পর্য্যন্ত দিলে না। ছোট দুটি ছেলেমেয়ে আর তাদের মাকে ফেলে পেটের দায়ে একদিন গাঁ ছেড়ে বার হলাম, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের তপিস্যে ছিল, আমার এই মায়ের ঘরেই চাকরি জুটে গেল। সমস্ত দুঃখই শুনলেন, কিন্তু কিছুই তিনি বললেন না। বছরখানেক পরে একদিন নিবেদন জানালাম, মা, ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখতে একবার সাধ হয়, যদি দিন-কয়েকের ছুটি দেন। হেসে বললেন, আবার আসবি ত ? যাবার দিনে হাতে একটা পুঁটুলি গুঁজে দিয়ে বললেন, রতন, খুড়োদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করিস্‌নে বাবা, যা তোর গেছে এই দিয়ে ফিরিয়ে নি গে যা। খুলে দেখি পাঁচশো টাকা। প্রথমে নিজের চোখ দুটোকেই বিশ্বাস হ'লো না, ভয় হ'লো বুঝি-বা জেগে জেগেই স্বপন দেখচি। আমার সেই মাকেই

বঙ্কুবাবু এখন ব্যাঁকা-ট্যারা কথা কয়, আড়ালে দাঁড়িয়ে গজগজ করে। ভাবি, এর আর বেশী দিন নয়, মা লক্ষ্মী টললেন বলে।

আমি এ আশঙ্কা করি নাই, নিরুত্তরে শুনিতে লাগিলাম।

মনে হইল রতন কিছুদিন হইতেই ক্রোধে ও ক্ষোভে ফুলিতেছে। কহিল, মা যখন দেন দু'হাতে দেন। বঙ্কুকেও দিয়েচেন। তাই ও ভেবেচে নেঙড়ানো মৌচাকের আর দাম কি, বড় জোর এখন জ্বালানোই চলে। তাই ওর এত অগ্রাহ্য। মুখ্যু জানে না যে, আজও মায়ের একখানা গয়না বিক্রী করলে অমন পাঁচখানা বাড়ি তৈরী হয়।

আমিও জানিতাম না। হাসিয়া বলিলাম, তাই নাকি? কিন্তু সে-সব আছে কোথায়?

রতন হাসিয়া কহিল, আছে তাঁরই কাছে। মা অত বোকা নন। এক আপনার পায়েই সমস্ত উজোড় করে দিয়ে তিনি ভিখিরী হতে পারেন, কিন্তু আর কারও জন্যে নয়। বঙ্কু জানে না যে, আপনি বেঁচে থাকতে মায়ের আশ্রয়ের অভাব নেই, আর রতন বেঁচে থাকতে তাঁর চাকরের ভাবনা ভাবতে হবে না। সেদিন কাশী থেকে আপনার অমনি করে চলে আসা যে মা'র বুকে কি শেল বিঁধেচে, বঙ্কুবাবু তার কি খবর রাখে? গুরুঠাকুরই বা তার সন্ধান পাবে কোথায়?

কিন্তু আমাকে যে তিনি নিজেই বিদায় করেচেন, এ খবর ত তুমি জান রতন?

রতন জিভ কাটিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। এতটা বিনয় কখনো তাহার পূর্ব্বে দেখি নাই। বলিল, আমরা চাকরবাকর বাবু, এসব কথা আমাদের কানেও শুনতে নাই। ও মিথ্যে।

রতন আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া একটু গড়াইয়া লইতে প্রস্থান করিল। বোধ করি কাল আটটার পূর্ব্বে আর তার দেহটা 'ধাতে' আসিবে না।

দুটো বড় খবর পাওয়া গেল। একটা এই যে, বঙ্কু বড় হইয়াছে। পাটনায় যখন তাহাকে প্রথম দেখি তখন বয়স তাহার ষোল-সতেরো। এখন একুশ বৎসরের যুবক। উপরন্তু এই পাঁচ-ছয় বৎসরের ব্যবধানে সে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং শৈশবের এই সকৃতজ্ঞ স্নেহ যদি আজ যৌবনের আত্মসম্মানবোধে সামঞ্জস্য রাখিতে না পারে, বিস্ময়ের কি আছে?

দ্বিতীয় সংবাদ—না বঙ্কু, না গুরুদেব, রাজলক্ষ্মীর গভীরতম বেদনার কোনও সন্ধান আজও তাঁহাদের জানা নাই।

মনের মধ্যে এই কথা দুটাই বহুক্ষণ ধরিয়া নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

সযত্ন-অঙ্কিত শিলমোহরের গালার ছাপগুলো দেখিয়া লইয়া চিঠি খুলিলাম।

তাহার হাতের লেখা বেশী দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু স্মরণ হইল হস্তাক্ষর দুষ্পাঠ্য না হইলেও ভালো নয়। কিন্তু এই পত্রখানি সে অত্যন্ত সাবধানে লিখিয়াছে, বোধ হয় তাহার ভয়, বিরক্ত হইয়া আমি না ফেলিয়া রাখি। যেন আগাগোড়া সবটুকুই সহজে পড়িতে পারি।

আচার-আচরণে রাজলক্ষ্মী সে-যুগের মানুষ। প্রণয়-নিবেদন আতিশয্য ত দূরের কথা, 'ভালবাসি' এমন কথাও কখনো স্বমুখে উচ্চারণ করিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। সে লিখিয়াছে চিঠি—আমার প্রার্থনার অনুকূলে অনুমতি দিয়া। তবু কি জানি কি আছে পড়িতে কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল। তাহার বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। সেদিন তাহার পড়াশুনা সাঙ্গ হইয়াছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়। পরবর্ত্তীকালে ঘরে বসিয়া হয়ত সামান্য কিছু বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া থাকিবে। অতএব, ভাষার ইন্দ্রজাল, শব্দের ঝঙ্কার, পদবিন্যাসের মাধুরী তাহার পত্রের মধ্যে আশা করা অন্যায়। সর্ব্বদা প্রচলিত সামান্য গোটা-কয়েক কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করা ছাড়া আর সে কি করিবে? একটা অনুমতি দিয়া মামুলি শুভ-কামনা করিয়া দু'ছত্র লেখা—এই ত? কিন্তু খাম খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বাহিরের কিছুই আর মনে রহিল না। পত্র দীর্ঘ নয়, কিন্তু ভাষা ও ভঙ্গি যত সহজ ও সরল ভাবিয়াছিলাম তাহাও নয়। আমার আবেদনের উত্তর সে এইরূপ দিয়াছে—

৺কাশীধাম

প্রণামস্তে সেবিকার নিবেদন—

তোমার চিঠিখানি এইবার নিয়ে একশোবার পড়লুম। তবু ভেবে পেলুম না তুমি ক্ষেপেচ না আমি ক্ষেপেচি। ভেবেচো বুঝি হঠাৎ তোমাকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম? কুড়িয়ে তোমাকে পাইনি, পেয়েছিলুম অনেক তপস্যায়, অনেক আরাধনায়। তাই, বিদায় দেবার কর্ত্তা তুমি নও, আমাকে ত্যাগ করার মালিকানা স্বত্বাধিকার তোমার হাতে নেই।

ফুলের বদলে বন থেকে তুলে বঁইচির মালা গেঁথে কোন্ শৈশবে তোমাকেঁ বরণ করেছিলুম সে তোমার মনে নেই। কাঁটায় হাত বয়ে রক্ত ঝরে পড়তো, রাঙামালার সে রাঙা-রং তুমি চিনতে পারোনি, বালিকার পূজার অর্ঘ্য সেদিন তোমার গলায়, তোমার বুকের 'পরে রক্তরেখায় যে লেখা এঁকে দিত সে তোমার চোখে পড়েনি, কিন্তু যাঁর সংসারের কিছুই বাদ পড়ে না আমার সে-নিবেদন তাঁর পাদপদ্মে গিয়ে পৌঁচেছিল।

তারপরে এলো দুর্য্যোগের রাত, কালো মেঘে দিলে আমার আকাশের জ্যোৎস্না ঢেকে। কিন্তু সে সত্যিই আমি না আর কেউ, এ জীবনে যথার্থই ওসব ঘটেছিল,

না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখচি, ভাবতে গিয়ে অনেক সময় ভয় হয় বুঝি-বা আমি পাগল হয়ে যাব। তখন সমস্ত ভুলে যাঁকে ধ্যান করতে বসি তাঁর নাম বলা চলে না। কাউকে বলতেও নেই। তাঁর ক্ষমাই আমার জগদীশ্বরের ক্ষমা। এতে ভুল নেই, সন্দেহ নেই, এখানে আমি নির্ভয়।

হাঁ, বলছিলুম, তারপরে, এলো আমার দুর্দ্দিনের রাত্রি, কলঙ্ক দিলে দু'চোখের সকল আলো নিবিয়ে। কিন্তু সেই কি মানুষের সমস্ত পরিচয়? সেই অখণ্ড গ্লানির নিরবকাশ আবরণের বাইরে তার কি আর কিছুই বাকী নেই?

আছে। অব্যাহত অপরাধের মাঝে মাঝে তাকে আমি বার বার দেখতে পেয়েচি। তাই যদি না হ'তো, বিগত দিনের রাক্ষসটা যদি আমার অনাগতের সমস্ত মঙ্গলকে নিঃশেষে গিলে খেতো, তবে তোমাকে ফিরে পেতুম কি করে? আমার হাতে এনে আবার তোমাকে দিয়ে যেতো কে?

আমার চেয়ে তুমি চার-পাঁচ বছরের বড়, তবু তোমাকে যা মানায় আমাকে তা সাজে না। বাঙালী-ঘরের মেয়ে আমি, জীবনের সাতাশটা বছর পার করে দিয়ে আজ যৌবনের দাবী আর করিনে। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না—যত অধমই হই, ওকথা যদি ঘুণাক্ষরেও তোমার মনে আসে তার বাড়া লজ্জা আমার নেই। বঙ্কু বেঁচে থাক্, সে বড় হয়েছে, তার বৌ এসেচে—তোমার বিয়ের পরে তাদের সুমুখে বার হবো আমি কোন্ মুখে? এ অসম্মান সইব কি করে?

যদি কখনো অসুখে পড়ো দেখবে কে—পুঁটু? আর আমি ফিরে আসব তোমার বাড়ির বাইরে থেকে চাকরের মুখে খবর নিয়ে? তারপরেও বেঁচে থাকতে বলো নাকি?

হয়ত প্রশ্ন করবে, তবে কি এমনি নিঃসঙ্গ জীবনই চিরদিন কাটাব? কিন্তু প্রশ্ন যাই হোক, এর জবাব দেবার দায় আমার নয়, তোমার। তবে নিতান্তই যদি ভেবে না পাও, বুদ্ধি এতই ক্ষয়ে গিয়ে থাকে, আমি ধার দিতে পারি, শোধ দিতে হবে না,—কিন্তু ঋণটা অস্বীকার ক'রো না যেন।

তুমি ভাবো গুরুদেব দিয়েচেন আমাকে মুক্তির মন্ত্র, শাস্ত্র দিয়েচে পথের সন্ধান, সুনন্দা দিয়েচে ধর্ম্মের প্রবৃত্তি, আর তুমি দিয়েচ শুধু ভার বোঝা। এমনই অন্ধ তোমরা।

জিজ্ঞেস করি, তোমাকে ত ফিরে পেয়েছিলুম আমার তেইশ বছর বয়সে, কিন্তু তার আগে এঁরা সব ছিলেন কোথায়? তুমি এত ভাবতে পার, আর এটা ভাবতে পারো না?

আশা ছিল একদিন আমার পাপ ক্ষয় হবে, আমি নিষ্পাপ হবো। এ লোভ কেন জানো? স্বর্গের জন্যে নয়, সে আমি চাইনে। আমার কামনা, মরণের পরে যেন আবার এসে জন্মাতে পারি। বুঝতে পারো তার মানে কি?

ভেবেছিলুম জলের ধারা গেছে কাদায় ঘুলিয়ে,—তাকে নির্ম্মল আমাকে করতেই হবে। কিন্তু আজ তার উৎসই যদি যায় শুকিয়ে ত থাকলো আমার জপতপ পূজা-অর্চ্চনা, থাকলো সুনন্দা, থাকলো আমার গুরুদেব।

স্বেচ্ছায় মরণ আমি চাইনে। কিন্তু আমাকে অপমান করার ফন্দি যদি করে থাকো, সে বুদ্ধি ত্যাগ করো। তুমি দিলে বিষ আমি নেবো, কিন্তু ও নিতে পারবো না। আমাকে জানো বলেই জানিয়ে দিলুম যে-সূর্য্য অস্ত যাবে তার পুনরুদয়ের অপেক্ষায় বসে থাকার আমার আর সময় হবে না। ইতি—

রাজলক্ষ্মী

বাঁচা গেল। সুনিশ্চিত কঠোর অনুশাসনের চরম-লিপি পাঠাইয়া একটা দিকে আমাকে সে একেবারে নিশ্চিন্ত করিয়া দিল। এ জীবনে ও-ব্যাপার লইয়া ভাবিবার আর কিছু রহিল না। কিন্তু কি করিতে পারিব না তাহাই নিঃসংশয়ে জানিলাম, কিন্তু অতঃপর কি আমাকে করিতে হইবে এ সম্বন্ধে রাজলক্ষ্মী একেবারে নির্ব্বাক। হয়ত উপদেশ দিয়া আর একদিন চিঠি লিখিবে, কিংবা আমাকেই সশরীরে তলব করিয়া পাঠাইবে, কিন্তু আপাততঃ ব্যবস্থা যাহা হইল তাহা অত্যন্ত চমৎকার. এদিকে ঠাকুর্দ্দা মহাশয় সম্ভবতঃ কাল সকালেই আসিয়া উপস্থিত হইবেন; ভরসা দিয়া আসিয়াছি চিন্তার হেতু নাই, অনুমতি পাওয়ায় বিঘ্ন ঘটিবে না। কিন্তু আসিয়া যাহা পৌঁছিল তাহা নির্ব্বিঘ্ন অনুমতিই বটে! রতন নাপিতের হাতে সে যে চেলি এবং টোপর পাঠায় নাই এই ঢের।

ও-পক্ষে দেশের বাটীতে বিবাহের আয়োজন নিশ্চয়ই অগ্রসর হইতেছে। পুঁটুর আত্মীয়-স্বজনও কেহ কেহ হয়ত আসিয়া হাজির হইতেছে এবং প্রাপ্তবয়স্কা অপরাধী মেয়েটা হয়ত এতদিনে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার পরিবর্ত্তে একটুখানি সমাদরের মুখ দেখিতে পাইয়াছে। ঠাকুর্দ্দাকে কি বলিব জানি, কিন্তু কেমন করিয়া সেই কথাটা বলিব ইহাই ভাবিয়া পাইলাম না। তাঁহার নির্ম্মম তাগাদা ও লজ্জাহীন যুক্তি ও ওকালতি মনে মনে আলোচনা করিয়া অন্তরটা একদিকে যেমন তিক্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার ব্যর্থ প্রত্যাবর্ত্তনে নিরাশায় ক্ষিপ্ত পরিজনগণের ঐ দুর্ভাগা মেয়েটাকে অধিকতর উৎপীড়নের কথা মনে করিয়াও হৃদয় তেমনি ব্যথিত হইয়া আসিল। কিন্তু উপায় কি? বিছানায় শুইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিলাম। পুঁটুর কথা ভুলিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু নিরন্তর মনে পড়িতে লাগিল গঙ্গামাটির কথা। জনবিরল সেই ক্ষুদ্র পল্লীস্মৃতি কোনদিন মুছিবার নয়। এ জীবনের গঙ্গা-যমুনাধারা একদিন এইখানে আসিয়া মিলিয়াছে এবং স্বল্পকাল পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়া আবার

একদিন এইখানেই বিযুক্ত হইয়াছে। একত্রবাসের সেই ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি শ্রদ্ধায় গভীর, স্নেহে মধুর, আনন্দে উজ্জ্বল, আবার তাদের মতই নিঃশব্দ বেদনায় নিরতিশয় স্তব্ধ। বিচ্ছেদের দিনেও আমরা প্রবঞ্চনার পরিবর্তে কেহ কাহাকেও কলঙ্কলিপ্ত করি নাই, লাভ-ক্ষতির নিষ্ফল বাদপ্রতিবাদে গঙ্গামাটির শান্ত গৃহখানিকে আমরা ধূমাচ্ছন্ন করিয়া আসি নাই। সেখানের সবাই জানে আবার একদিন আমরা ফিরিয়া আসিব, আবার শুরু হইবে আমোদ-আহ্লাদ, শুরু হইবে ভূস্বামিনীর দীনদরিদ্রের সেবা ও সৎকার। কিন্তু সে সম্ভাবনা যে শেষ হইয়াছে, প্রভাতের বিকশিত মল্লিকা দিনান্তের শাসন মানিয়া লইয়া নীরব হইয়াছে, এ কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না।

চোখে ঘুম নাই, বিনিদ্র রজনী ভোরের দিকে যতই গড়াইয়া আসিতে লাগিল ততই মনে হইতে লাগিল, এ রাত্রি যেন না পোহায়। এই একটিমাত্র চিন্তাই এমনি করিয়া যেন আমাকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

বিগত কাহিনী ঘুরিয়া ঘুরিয়া মনে পড়ে, বীরভূম জেলার সেই তুচ্ছ কুটীরখানি মনের উপর ভূতের মত চাপিয়া বসে, অনুক্ষণ গৃহকর্মে নিযুক্তা রাজলক্ষ্মীর স্নিগ্ধ হাত দুটি চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাই, এ জীবনে পরিতৃপ্তির আস্বাদন এমন করিয়া কখনো করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

এতকাল ধরাই পড়িয়াছি, ধরিতে পারি নাই। কিন্তু আজ ধরা পড়িল রাজলক্ষ্মীর সবচেয়ে বড় দুর্ব্বলতা কোথায়। সে জানে আমি সুস্থ নই, যে কোন দিন অসুখে পড়িতে পারি, তখন কোথাকার কে এক পুঁটু আমাকে ঘিরিয়া শয্যা জুড়িয়া বসিয়াছে, রাজলক্ষ্মীর কোনো কর্ত্তৃত্বই নাই, এত বড় দুর্ঘটনা মনের মধ্যে সে ঠাঁই দিতে পারে না। সংসারের সবকিছু হইতেই নিজেকে সে বঞ্চিত করিতে পারে, কিন্তু এ বস্তু অসম্ভব,—এ তাহার অসাধ্য। মরণ তুচ্ছ, এর কাছে রহিল তাহার গুরুদেব, রহিল তাহার জপতপ-ব্রত-উপবাস। সে মিথ্যা ভয় আমাকে চিঠির মধ্যে দেখায় নাই।

ভোরের সময় বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, রতনের ডাকে যখন জাগিয়া উঠিলাম তখন বেলা হইয়াছে। সে কহিল, কে একটি বুড়ো ভদ্রলোক ঘোড়ার গাড়ি করে এইমাত্র এলেন।

এ ঠাকুর্দ্দা। কিন্তু গাড়ি ভাড়া করিয়া? সন্দেহ জন্মিল।

রতন কহিল, সঙ্গে একটি সতেরো-আটারো বছরের মেয়ে আছে।

এ পুঁটু। এই নির্লজ্জ মানুষটা তাহাকে কলিকাতার বাসায় পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। সকালের আলো তিক্ততায় ম্লান হইয়া উঠিল। বলিলাম, তাঁদের এই

ঘরে এনে বসাও রতন, আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসছি, এই বলিয়া নীচে স্নানের ঘরে চলিয়া গেলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিতে ঠাকুর্দ্দাই আমাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, যেন আমিই অতিথি, এসো দাদা, এসো। শরীরটা বেশ ভালো ত?

আমি প্রণাম করিলাম। ঠাকুর্দ্দা হাঁকিলেন, পুঁটু গেলি কোথায়?

পুঁটু জানালায় দাঁড়াইয়া রাস্তা দেখিতেছিল, কাছে আসিয়া আমাকে নমস্কার করিল।

ঠাকুর্দ্দা কহিলেন, ওর পিসীমা বিয়ের আগে ওকে একবার দেখতে চায়। পিসেমশাই হাকিম—পাঁচশো টাকা মাইনে। ডায়মণ্ডহারবারে বদলি হয়ে এসেচে—ঘর-সংসার ফেলে পিসীর বার হবার জো নেই, তাই সঙ্গে নিয়ে এলুম, বললুম, পরের হাতে তুলে দেবার আগে ওকে একবার দেখিয়ে আনি গে। ওর দিদিমা আশীর্ব্বাদ করে বললে, পুঁটি, এমনি অদৃষ্ট যেন তোরও হয়।

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বে নিজেই বলিলেন, আমি কিন্তু সহজে ছাড়চিনে ভায়া। হাকিমই হোন, আর যেই হোন, আত্মীয় ত—দাঁড়িয়ে থেকে কাজটি সমাধা করে দিতে হবে—তবে তাঁর ছুটি। জানোই তো দাদা, শুভকর্ম্মে বহু বিঘ্ন—শাস্ত্রে কি বলে—শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি, অমন একটা লোক দাঁড়িয়ে থাকলে কারুর টুঁ শব্দ করবার ভরসা হবে না। আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোককে ত বিশ্বাস নেই—ওরা সব পারে। কিন্তু হাকিম কিনা, ওদের রাশই আলাদা।

পুঁটুর পিসেমশাই হাকিম। খবরটা অবান্তর নয়—তাৎপর্য্য আছে।

নতুন হুঁকা কিনিয়া আনিয়া রতন সযত্নে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল, ঠাকুর্দ্দা ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া বলিলেন, লোকটিকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্চে না?

রতন তৎক্ষণাৎ কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখেচেন বইকি। দেশের বাড়িতে বাবুর অসুখের সময়।

ওঃ—তাই ত বলি। চেনা মুখ।

আজ্ঞে হাঁ। বলিয়া রতন চলিয়া গেল।

ঠাকুর্দ্দার মুখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত ধূর্ত্ত লোক, বোধ হয় সমস্ত কথাই তাঁহার স্মরণ হইল। নীরবে তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, বেরুবার সময়ে দিনটা দেখিয়ে এসেছিলাম, বেশ ভালো দিন, আমার ইচ্ছে আশীর্ব্বাদের কাজটা অমনি সেরে যাই। নতুনবাজারে সমস্ত কিনতে পাওয়া যায়,

চাকরটাকে একবার পাঠিয়ে দিলে হয় না? কি বলো?

কিছুতেই কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কোনমতে শুধু বলিয়া ফেলিলাম, না।

না? না কেন? বেলা বারোটা পর্য্যন্ত দিনটা তো বেশ ভালো। পাঁজি আছে?

বলিলাম, পাঁজির দরকার নেই। বিবাহ করতে পারবো না।

ঠাকুর্দ্দা হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। মুখ দেখিয়া বুঝিলাম যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছেন। গলাটা বেশ শান্ত ও গম্ভীর করিয়া কহিলেন, উদ্যোগ-আয়োজন এক রকম সম্পূর্ণ বললেই হয়। মেয়ের বিয়ে বলে কথা, ঠাট্টা-তামাসার ব্যাপার ত নয় —কথা দিয়ে এসে এখন না বললে চলবে কেন?

পুঁটু পিছন ফিরিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া আছে এবং দ্বারের আড়ালে রতন কান পাতিয়া রাখিয়াছে বেশ জানি।

বলিলাম, কথা দিয়ে যে আসিনি তা আমিও জানি, আপনিও জানেন। বলেছিলাম একজনের অনুমতি পেলে রাজী হতে পারি।

অনুমতি পাওনি?

না।

ঠাকুর্দ্দা একমুহূর্ত্ত থামিয়া বলিলেন, পুঁটির বাপ বলে, সর্ব্ব রকমে সে হাজার টাকা দেবে। ধরাধরি করলে আর দু'-একশ উঠতে পারে। কি বলো হে?

রতন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তামাকটা আর একবার পালটে দেব কি?

দাও। তোমার নামটি কি বাপু?

রতন।

রতন? বেশ নামটি—থাকো কোথায়?

কাশীতে।

কাশী? ঠাকুরুণটি বুঝি আজকাল কাশীতেই থাকেন? কি করেচেন সেখানে?

রতন মুখ তুলিয়া বলিল, সে খবরে আপনার দরকার?

ঠাকুর্দ্দা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, রাগ করো কেন বাপু, রাগের ত কিছু নেই। গাঁয়ের মেয়ে কিনা, তাই খবরটা জানতে ইচ্ছে করে। হয়ত তাঁর কাছে গিয়ে পড়তেই বা হয়। তা ভালো আছে ত?

রতন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল এবং মিনিট-দুই পরেই কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ফিরিয়া আসিয়া হুঁকাটা তাঁহার হাতে দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ঠাকুর্দ্দা সবলে কয়েকটা টান দিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন—দাঁড়াও ত বাপু, পায়খানাটা একবার দেখিয়ে দেবে। ভোরেই বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল কিনা। বলিতে বলিতে তিনি রতনের আগেই ব্যস্ত-ত্রস্তপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

পুঁটু মুখ ফিরিয়া চাহিল, কহিল, দাদামশায়ের কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। বাবা হাজার টাকা কোথায় পাবেন যে দেবেন? অমনি করে পরের গয়না চেয়ে দিদির বিয়ে,—এখন তারা দিদিকে আর নেয় না। তারা বলে, ছেলের আবার বিয়ে দেবে।

এই মেয়েটি এত কথা আমার সঙ্গে পূর্ব্বে কহে নাই; কিছু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা সত্যিই কি হাজার টাকা দিতে পারেন না?

পুঁটু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কখ্খনো না। বাবা রেলে চল্লিশ টাকা মোটে মাইনে পান, আমার ছোট ভাইয়ের ইস্কুলের মাইনের জন্য আর পড়াই হ'লো না। সে কত কাঁদে। বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুটি ছলছল করিয়া আসিল।

প্রশ্ন করিলাম, তোমার শুধু টাকার জন্য বিয়ে হচ্ছে না?

পুঁটু কহিল, হাঁ, তাই ত। আমাদের গাঁয়ের অমূল্যবাবুর সঙ্গে বাবা সম্বন্ধ করেছিলেন। তার মেয়েরাই আমার চেয়ে অনেক বড়। মা জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলেন বলেই ত সে বিয়ে বন্ধ হ'লো। এবারে বাবা বোধ হয় আর কারু কথা শুনবেন না, সেইখানেই আমার বিয়ে দেবেন।

বলিলাম, পুঁটু, আমাকে তোমার পছন্দ হয়?

পুঁটু সলজ্জে মাথা নীচু করিয়া একটুখানি মাথা নাড়িল।

কিন্তু আমি ত তোমার চেয়ে চোদ্দ-পনের বছরের বড়?

পুঁটু এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কি আর কোথাও কখনো সম্বন্ধ হয়নি?

পুঁটু মুখ তুলিয়া খুশী হইয়া বলিল, হয়েছিল ত। আপনাদের গ্রামের কালিদাস বাবুকে জানেন? তাঁর ছোট ছেলে। বি. এ. পাস করেচে, বয়সে আমার চেয়ে কেবল একটুখানি বড়ো। তার নাম শশধর।

তোমার তাকে পছন্দ হয়?

পুঁটু ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বলিলাম, কিন্তু শশধর তোমাকে যদি পছন্দ না করে?

পুঁটু বলিল, তাই বৈকি! আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে কেবল আনাগোনা করত। রাঙাদিদিমা ঠাট্টা করে বলতেন, সে শুধু আমার জন্যই।

কিন্তু এ বিয়ে হ'লো না কেন!

পুঁটুর মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, কহিল, তার বাবা হাজার টাকার গয়না আর হাজার টাকা নগদ চাইলে। আর কোন্ না পাঁচশ' টাকা খরচ হবে বলুন? এ তো জমিদারদের ঘরের মেয়ের জন্যই হয়। সত্যি নয়? ওরা বড়লোক, অনেক টাকা ওদের, আমার মা তাদের বাড়ি গিয়ে কত হাতে-পায়ে ধরলে, কিন্তু কিছুতে শুনলে না।

শশধর কিছু বললে না?

না, কিছু না। কিন্তু সেও তো বেশী বড় নয়—তার বাপ-মা বেঁচে আছে কিনা।

তা বটে, শশধরের বিয়ে হয়ে গেছে?

পুঁটু ব্যগ্র হইয়া কহিল, না এখনো হয়নি। শুনচি নাকি শীগ্‌গির হবে।

আচ্ছা, সেখানে তোমার বিয়ে হলে তারা যদি তোমাকে ভালো না বাসে?

আমাকে? কেন ভালবাসবে না? আমি যে রাঁধাবাড়া, সেলাই করা, সংসারের সব কাজ জানি। আমি একলাই তাদের সব কাজ করে দেবো।

এর বেশী বাঙালী-ঘরের মেয়ে কি-ই বা জানে! কায়িক পরিশ্রম দিয়াই সে সমস্ত অভাব পূরণ করিতে চায়। জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁদের সব কাজ নিশ্চয় করবে ত?

হাঁ, নিশ্চয় করব।

তা হলে তোমার মাকে গিয়ে ব'লো, শ্রীকান্তদাদা আড়াই হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবে।

আপনি দেবেন? তা হলে বিয়ের দিনে যাবেন বলুন?

হাঁ, তাও যাবো!

দ্বারপ্রান্তে ঠাকুর্দ্দার সাড়া পাওয়া গেল। কোঁচায় মুখ মুছিতে মুছিতে তিনি প্রবেশ করিলেন—তোফা পায়খানাটি ভায়া! শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। রতন গেল কোথায়, এক কলকে তামাক দিক না।

৪

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় সত্য এই যে, মানুষকে সদুপদেশ দিয়া কখনো ফললাভ হয় না। সৎ পরামর্শ কিছুতেই কেহ শুনে না। কিন্তু সত্য বলিয়াই দৈবাৎ ইহার ব্যতিক্রমও আছে। সেই ঘটনাটা বলিব।

ঠাকুর্দ্দা দাঁত বাহির করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া অতি হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন, পুঁটু বিস্তর পায়ের ধূলা গ্রহণ করিয়া আদেশ পালন করিল, কিন্তু তাহারা চলিয়া গেলে আমার পরিতাপের অবধি রহিল না। সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া কেবলি তিরস্কার করিতে লাগিল যে, কে ইহারা যে বিদেশে চাকরি করিয়া বহু দুঃখে যাহা-কিছু সঞ্চয় করিয়াছি তাহাই দিয়া দিব? ঝোঁকের মাথায় একটা কথা বলিয়াছি বলিয়াই দাতাকর্ণগিরি করিতেই হইবে, তাহার অর্থ কি? কোথাকার কে এই মেয়েটা

গাড়িতে অযাচিত প্যাঁড়া এবং দই খাওয়াইয়া আমাকে ত আচ্ছা ফাঁদে ফেলিয়াছে! একটা ফাঁস কাটিতে আর একটা ফাঁসে জড়াইয়া পড়িলাম। পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে মাথা গরম হইয়া উঠিল এবং এই নিরীহ মেয়েটার প্রতি ক্রোধ ও বিরক্তির সীমা রহিল না। আর ঐ শয়তান ঠাকুর্দ্দা। ইচ্ছা করিতে লাগিল লোকটা যেন না আর বাড়ি পৌঁছায়, রাস্তাতেই সর্দিগর্ম্মি হইয়া মারা যায়। কিন্তু সে আশা ভিত্তিহীন, নিশ্চয় জানি, লোকটা কিছুতেই মরিবে না এবং একবার যখন আমার বাসার ঠিকানা জানিয়াছে, তখন আবার আসিবে এবং যেমন করিয়া পারে টাকা আদায় করিবে। হয়ত এবার সেই হাকিম পিসেমশায়কে সঙ্গে করিয়া আনিবে। এক উপায়—যঃ পলায়তি। টিকিট কিনিতে গেলাম, কিন্তু জাহাজে স্থানাভাব—সমস্ত টিকিট পূর্ব্বাহ্ণেই বিক্রী হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পরের মেলের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। সে ছয়-সাত দিনের ব্যাপার।

আর-এক পন্থা বাসা বদল করা। ঠাকুর্দ্দা না খুঁজিয়া পায়। কিন্তু এমন একটি ভালো জায়গা এত শীঘ্র পাওয়াই বা যায় কোথায়? কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, ভালোমন্দর প্রশ্নই অবান্তর—যথারণ্যং তথা গৃহম্—শিকারীর হাত হইতে প্রাণ বাঁচানোর দায়।

ভয় ছিল আমার গোপন উদ্বেগটা পাছে রতনের চোখে পড়ে। কিন্তু বিপদ হইয়াছে তাহার নড়িবার গা নাই, কাশীর চেয়ে কলিকাতা তাহার বেশী মনে ধরিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, চিঠির জবাব নিয়ে কি তুমি কালই যেতে চাইচ রতন।

রতন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, আজ্ঞে না। আজ দুপুরে মাকে একখানা পোস্টকার্ড লিখে দিলাম, আমার দু'-পাঁচদিন দেরি হবে। মরা সোসাইটি, জ্যান্ত সোসাইটি না দেখে আর ফিরচিনে। আবার কবে কোন্‌কালে আসা হবে তার কোন ঠিক নেই।

বলিলাম, কিন্তু তিনি ত উদ্বিগ্ন হতে পারেন—

আজ্ঞে, না। গাড়ির ধকলটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। সে কথা লিখে দিয়েচি।

কিন্তু চিঠির জবাবটা—

আজ্ঞে, দিন না। কালই রেজেস্ট্রী করে পাঠিয়ে দেবোখন। সে-বাড়িতে মার চিঠি যমে খুলতেও সাহস করবে না।

চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। নাপিত ব্যাটার কাছে কোন ফন্দিই খাটিল না। সব প্রস্তাবই নাকচ করিয়া দিল।

যাবার সময় ঠাকুর্দ্দা টাকার কথাটা প্রচার করিয়াই গিয়াছেন। তাহা চিত্তের

ঔদার্য্য অথবা সারল্যের প্রাচুর্য্য এ ভ্রম যেন কেহ না করেন! তিনি সাক্ষী রাখিয়া গিয়াছেন।

রতন ঠিক সেই কথাই পাড়িল, বলিল, যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা বলি বাবু।

কি কথা রতন?

রতন একটু দ্বিধা করিয়া বলিল, আড়াই হাজার টাকা ত নিতান্ত তুচ্ছ নয় বাবু—ওরা কে যে ওদের মেয়ের বিয়েতে এতটা টাকা আপনি খামোকা দান করবেন বললেন! তা ছাড়া, ঠাকুর্দ্দাই হোক, আর যাই হোক, বুড়োটা লোক ভাল নয়। ওকে বলাটা ভাল হয়নি বাবু।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া যেমন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলাম, মনের মধ্যে তেমনি জোর পাইলাম—ইহাই চাহিতেছিলাম।

তথাপি কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ সন্দেহের আভাস দিয়া কহিলাম, বলাটা ভাল হয়নি, না রতন?

রতন বলিল, নিশ্চয় ভালো হয়নি বাবু। টাকাটা ত কম নয়। তা ছাড়া, কিসের জন্য বলুন ত?

ঠিক ত! কহিলাম, তাহলে না দিলেই হবে।

রতন সবিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, সে ছাড়বে কেন?

কহিলাম, না ছেড়ে করবে কি? লেখাপড়া করে ত দিইনি। আর, তখন আমি এখানে থাকব কি বর্ম্মায় চলে যাবো, তাই বা কে জানে!

রতন একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া একটু হাসিল, বলিল, বুড়োকে আপনি চিনতে পারেননি বাবু, ওদের লজ্জা-সরম মান-অপমান নেই। কেঁদে-কেটে ভিক্ষে করেই হোক, আর ভয় দেখিয়ে জুলুম করেই হোক, টাকা ও নেবেই। আপনার দেখা না পেলে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে ও কাশী গিয়ে মার কাছ থেকে আদায় করে ছাড়বে। মা বড় লজ্জা পাবেন বাবু, ও মতলবে কাজ নেই।

শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। রতন আমার চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান। অর্থহীন আকস্মিক করুণার হঠকারিতার জরিমানা আমাকে দিতেই হইবে। নিস্তার নাই।

রতন পাঁড়াগাঁয়ের ঠাকুর্দ্দাকে যে চিনতে ভুল করে নাই, বুঝা গেল যখন চতুর্থ দিবসে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কেবল আশা করিয়াছিলাম এবার নিশ্চয় হাকিম পিসেমশাই সঙ্গে আসিবেন—কিন্তু একাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, দশখানা গ্রামের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে দাদা, সবাই বলচে, কলিকালে এমন কখনো শোনা যায় না। গরীব ব্রাহ্মণের কন্যাদায় এভাবে উদ্ধার করে দিতে কেউ

কখনো চোখে দেখেনি। আশীর্ব্বাদ করি চিরজীবী হও।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বিয়ে কবে?

এই মাসের পঁচিশে স্থির হয়েচে, মধ্যে কেবল দশটা দিন বাকী। কাল পাকা-দেখা; আশীর্ব্বাদ—বেলা তিনটের পরে বারবেলা, এর ভেতরেই শুভকর্ম্ম সমাধা করে নিতে হবে। কিন্তু তুমি না গেলে বরঞ্চ সব বন্ধ থাকবে, তবু কিছুই হতে পারবে না। এই নাও তোমার পুঁটুর চিঠি—সে নিজের হাতে লিখে পাঠিয়েচে। কিন্তু তাও বলি দাদা, যে রত্ন তুমি স্বেচ্ছায় হারালে তার জোড়া কথনো পাবে না। এই বলিয়া তিনি ভাঁজ-করা একখণ্ড হলদে রঙের কাগজ আমার হাতে দিলেন।

কৌতূহলবশতঃ চিঠিখানা পড়িবার চেষ্টা করিলাম, ঠাকুর্দ্দা হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, কালিদাসের পয়সা থাকলে হবে কি, একেবারে ছোটলোক—চামার। চোখের চামড়া বলে তার কোন বালাই নেই। কালই টাকাকড়ি সব নগদ চুকিয়ে দিতে হবে, গহনাপত্র নিজের স্যাকরা দিয়ে গড়িয়ে নেবে। ওর কাউকে বিশ্বাস নেই—এমন কি, আমাকে পর্য্যন্ত না।

লোকটার মস্ত দোষ। ঠাকুর্দ্দাকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে না—আশ্চর্য্য!

পুঁটু স্বহস্তে পত্র লিখিয়াছে। একপাতা দুপাতা নয়, চার-পাতা-জোড়া ঠাস্-বুনানি। চারপাতাই সকাতর মিনতি। ট্রেনে রাঙাদিদি বলিয়াছিলেন, আজ-কালকার নাটক-নভেল হার মানে। কেবল আজকালকার নয়, সর্ব্বকালের নাটক নভেল হার মানে তাহা অস্বীকার করিব না। এই লেখার জোরে নন্দরাণীর স্বামী চৌদ্দ দিনের ছুটি লইয়া সাতদিনের দিন আসিয়া হাজির হইয়াছিল কথাটা বিশ্বাস হইল।

অতএব, আমিও পরদিন সকালেই যাত্রা করিলাম। টাকাটা সত্যই সঙ্গে লইয়াছি এবং ভাওচুর করিয়া প্রতারণা করিতেছি না—ঠাকুর্দ্দা নিজের চক্ষে তাহা যাচাই করিয়া লইলেন, বলিলেন, পথ চলবে জেনে, টাকা নেবে গুনে। আমরা দেবতা নই তো রে ভাই, মানুষ—ভুল হতে কতক্ষণ।

সত্যই ত! রতন কাল রাত্রেই কাশী রওনা হইয়া গিয়াছে। তাহার হাতে চিঠির জবাব দিয়াছি, লিখিয়া দিয়াছি—তথাস্তু। ঠিকানা দিতে পারি নাই ঠিক নাই বলিয়া। এ ত্রুটি যেন সে নিজগুণে ক্ষমা করে, এ প্রার্থনাও জানাইয়াছি।

যথাসময়ে গ্রামে পৌঁছিলাম, বাড়িশুদ্ধ লোকের দুশ্চিন্তা ঘুচিল। যত্ন ও সমাদর যাহা পাইলাম তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা অভিধানে নাই।

পাকা-দেখা ও আশীর্ব্বাদ করার উপলক্ষে কালিদাসবাবুর সহিত পরিচয় হইল। লোকটা যেমন রুক্ষ মেজাজের, তেমনি দাম্ভিক। তাঁহার অনেক টাকা এই কথাটা সকলকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করানো ছাড়া জগতে তাঁহার যে আর কোন কর্তব্য আছে মনে হয় না। সমস্ত স্বোপার্জ্জিত। সদম্ভে বলিলেন, মশাই, বরাত আমি মানিনে, যা করব তা নিজের বাহুবলে। দেব-দেবতায় অনুগ্রহ আমি ভিক্ষে করিনে। আমি বলি দৈবের দোহাই দেয় কাপুরুষে।

বড়লোক বলিয়া এবং ছোটখাটো তালুকদার বলিয়া গ্রামের প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং অধিকাংশেরই বোধ করি তিনি মহাজন—এবং দুর্দ্দান্ত মহাজন—অতএব সকলেই একবাক্যে তাঁহার কথাগুলো স্বীকার করিয়া লইলেন। তর্করত্ন মহাশয় কি একটা সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন এবং আশেপাশে হইতে তাঁহার সম্বন্ধে দুই-একটা পুরাতন কাহিনীরও সূত্রপাত হইল।

অপরিচিত ও সামান্য ব্যক্তি অনুমানে তিনি অবহেলাভরে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। টাকার শোকে আমার অন্তরটা তখন পুড়িতেছিল, দৃষ্টিটা সহ্য হইল না, হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, বাহুবল আপনার কি পরিমাণ আছে জানিনে, কিন্তু টাকা উপায়ের ব্যাপারে দৈব এবং বরাতের জোর যে যথেষ্ট প্রবল তা আমিও স্বীকার করি।

তার মানে?

বলিলাম, মানে আমি নিজেই। বরকেও চিনিনে, কনেকেও না, অথচ টাকা যাচ্চে আমার এবং সে ঢুকচে গিয়ে আপনার সিন্দুকে। একে বরাত বলে না ত বলে কাকে? এই বললেন, আপনি দেব-দেবতারও অনুগ্রহ নেন না, কিন্তু আপনার ছেলের হাতের আঙটি থেকে বৌয়ের গলার হার পর্য্যন্ত তৈরী হবে যে আমারই অনুগ্রহের দানে। হয়ত-বা বৌভাতের খাওয়ানোটা পর্য্যন্ত আমাকেই যোগাতে হবে।

ঘরের মধ্যে বজ্রাঘাত হইলেও বোধ করি সকলে এত বিচলিত ব্যাকুল হইয়া উঠিত না। ঠাকুর্দ্দা কি-সব বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই সুস্পষ্ট বা সুব্যক্ত হইয়া উঠিল না। কালিদাসবাবু ক্রোধে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, আপনি টাকা দিচ্চেন তা আমি জানব কি করে? এবং দিচ্চেনই বা কেন?

বলিলাম কেন দিচ্চি সে আপনি বুঝবেন না, আপনাকে বোঝাতেও চাইনে। কিন্তু দেশসুদ্ধ সকলে শুনেচে, আমি টাকা দিচ্চি, কেবল আপনিই শোনেননি? মেয়ের মা আপনাদের বাড়িসুদ্ধ সকলের হাতে-পায়ে ধরেচে, কিন্তু আপনি বি. এ. পাস-করা ছেলের দাম আড়াই হাজারের এক পয়সা কম করতে রাজী হননি। মেয়ের বাপ চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি করে, তার চল্লিশটা পয়সা দেবার শক্তি নেই—এটা ভেবে দেখেননি আপনার ছেলে কেনবার অত টাকা হঠাৎ তারা পায় কোথায়? যাই

হোক, ছেলে-বেচা টাকা অনেকেই নেয়, আপনি নিলেও দোষ নেই, কিন্তু এর পরে গাঁয়ের লোককে বাড়িতে ডেকে টাকার অহঙ্কার আর করবেন না এবং একজন বাইরের লোকের ভিক্ষের দানে ছেলের বিয়ে দিয়েচেন এ কথাটাও মনে রাখবেন।

উদ্বেগ ও ভয়ে সকলের মুখ কালিবর্ণ হইয়া উঠিল। বোধ হয় সবাই ভাবিলেন, এবার ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটিবে এবং ফটক বন্ধ করিয়া সকলকে লাঠিপেটা না করিয়া কালিদাসবাবু আর কাহাকেও ঘরে ফিরিতে দিবেন না।

কিন্তু তিনি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, টাকা আমি নেব না।

বলিলাম, তার মানে ছেলের বিয়ে আপনি এখানে দেবেন না?

কালিদাসবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না, তা নয়, আমি কথা দিয়েচি বিবাহ দেবো—তার নড়চড় হবে না। কালিদাস মুখুয্যে কথার খেলাপ করে না। আপনার নামটি কি?

ঠাকুর্দ্দা ব্যগ্রকণ্ঠে আমার পরিচয় দিলেন।

কালিদাসবাবু চিনিতে পারিয়া কহিলেন, ওঃ—তাই বটে। এর বাপের সঙ্গেই না একবার আমার ভয়ানক ফৌজদারী মামলা বাধে?

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ—কিছুই আপনি বিস্মৃত হন না। এ তারই ছেলে বটে, সম্পর্কে আমারও নাতি হয়।

কালিদাসবাবু প্রসন্নকণ্ঠে বলিলেন, তা হোক। আমার বড় ছেলে বেঁচে থাকলে এমনি বয়সই হ'তো। শশধরের বিয়েতে এসো বাবা। আমার পক্ষ থেকে সেদিন তোমার নিমন্ত্রণ রইল।

শশধর উপস্থিত ছিল, সে শুধু সকৃতজ্ঞ চক্ষে আমার প্রতি একটিবারমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই পুনরায় মুখখানি আনত করিল।

আমি উঠিয়া আসিয়া প্রণাম করিলাম, বলিলাম, যেখানেই থাকি অন্ততঃ বৌভাতের দিন এসে নব-বধূর হাতে অন্ন খেয়ে যাবো। কিন্তু অনেক রূঢ় কথা বলেচি, আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

কালিদাসবাবু বলিলেন, রূঢ় কথা যে বলেচ তা সত্যি, কিন্তু আমি ক্ষমাও করেচি। কিন্তু উঠলে চলবে না শ্রীকান্ত, শুভকর্ম্ম উপলক্ষে সামান্য কিছু খাবার আয়োজন করে রেখেচি, তোমাকে খেয়ে যেতে হবে।

যে আজ্ঞে, তাই হবে, বলিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িলাম।

সেদিন পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করা হইতে আরম্ভ করিয়া সভাস্থ অভ্যাগতগণের খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে সদুপদেশ সম্বন্ধে যে নিয়মের উল্লেখ করিয়াছিলাম, পুঁটুর বিবাহটা তাহারই একটা

ব্যতিক্রমের উদাহরণ। জগতে এই একটিমাত্রই নিজের চোখে দেখিয়াছি। কারণ নিঃসম্পর্কীয় অপরিচিত হতভাগ্য মেয়ের বাপের কান মলিলেই যেখানে টাকা আদায় হয় সেখানে বৈষ্ণব সাজিয়া হাতজোড় করিয়া বাঘের গ্রাস হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। নিষ্ঠুর নির্দ্দয় বলিয়া গালিগালাজ করিয়া সমাজ ও অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ক্ষোভ কিঞ্চিৎ মিটিতে পারে, কিন্তু প্রতিকার মিলে না। কারণ, প্রতিকার বরের বাপের হাতে নাই, সে আছে মেয়ের বাপেরই নিজের হাতে।

৫

গহরের খোঁজে আসিয়া নবীনের সাক্ষাৎ মিলিল। সে আমাকে দেখিয়া খুশী হইল, কিন্তু মেজাজটা ভারী রুক্ষ; বলিল, দেখুন গে ঐ বোষ্টমী বেটীদের আড্ডায়। কাল থেকে ত ঘরে আসাই হয়নি।

সে কি কথা নবীন! বোষ্টমী এলো আবার কোথা থেকে?

একটা? একপাল এসে জুটেচে।

কোথা থাকে তারা?

ঐ ত মুরারিপুরের আখড়ায়। এই বলিয়া নবীন হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, হায় বাবু, আর সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। বুড়ো মথুরোদাস বাবাজী ম'লো, তার জায়গায় এসে জুটল এক ছোকরা বৈরাগী, তার গণ্ডা-কয়েক সেবাদাসী। দ্বারিকদাস বৈরাগীর সঙ্গে আমাদের বাবুর খুব ভাব, সেখানেই ত প্রায় থাকেন।

আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তোমার বাবু ত মুসলমান, বৈষ্ণব-বৈরাগীরা তাদের আখড়ায় ওকে থাকতে দেবে কেন?

নবীন রাগ করিয়া কহিল, ঐসব আউলে-বাউলেগুলোর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে নাকি? ওরা জাত-জন্ম কিছুই মানে না, যে কেউ ওদের সঙ্গে মিশলেই ওরা দলে টেনে নেয়, বাচ-বিচার করে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সেবার যখন তোমাদের এখানে ছ'-সাতদিন ছিলাম তখন ত গহর ওদের কথা কিছুই বলেনি?

নবীন বলল, বললে যে কমলিলতার গুণাগুণ প্রকাশ হয়ে পড়ত। সে-কয়দিন বাবু আখড়ার কাছেও যায়নি। আর যেই আপনি চলে গেলেন, বাবুও অমনি খাতা-কাগজ-কলম নিয়ে আখড়ায় গিয়ে ঢুকলেন।

প্রশ্ন করিয়া করিয়া জানিলাম দ্বারিক বাউল গান বাঁধিতে, ছড়া রচনা করিতে

সিদ্ধহস্ত। গহর এই প্রলোভনে মজিয়াছে। তাহাকে কবিতা শুনায়, তাহাকে দিয়া ভুল সংশোধন করিয়া লয়। আর কমললতা একজন যুবতী বৈষ্ণবী—এই আখড়াতেই বাস করে। সে দেখিতে ভালো, গান গাহে ভালো, তাহার কথা শুনিলে লোকে মুগ্ধ হইয়া যায়! বৈষ্ণব-সেবায় গহর মাঝে মাঝে টাকাকড়ি দেয়, আখড়ার সাবেক প্রাচীর জীর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গিয়াছিল, গহর নিজ ব্যয়ে তাহা মেরামত করিয়া দিয়াছে। কাজটা তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকের অগোচরে সে গোপনে করিয়াছে।

ছেলেবেলায় এই আখড়ার কথা শুনিয়াছিলাম আমার মনে পড়িল। পুরাকালে মহাপ্রভুর কোন্ এক ভক্ত শিষ্য এই আখড়ার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদবধি শিষ্য-পরম্পরায় বৈষ্ণবেরা ইহাতে বাস করিয়া আসিতেছে।

অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, বলিলাম, নবীন, আখড়াটা আমাকে একবার দেখিয়ে দিতে পারবে?

নবীন ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল, বলিল, আমার অনেক কাজ আর আপনিও ত এই দেশের মানুষ, চিনে যেতে পারবেন না? আধ কোশের বেশি নয়, ঐ সুমুখের রাস্তা দিয়ে সিধে উত্তরমুখো চলে গেলে আপনি দেখতে পাবেন, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না। সামনের দীঘির পাড়ে বকুলতলায় বৃন্দাবনলীলা চলছে, দূর থেকেই আওয়াজ কানে যাবে—ভাবতে হবে না।

আমার যাওয়ার প্রস্তাবটা নবীন গোড়াতেই পছন্দ করে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয় সেখানে—কীর্ত্তন?

নবীন বলিল, হাঁ, দিনরাত। খুঞ্জনি-কর্ত্তালের কামাই নেই।

হাসিয়া বলিলাম, সে ভালোই নবীন। যাই, গহরকে ধরে আনিগে।

এবার নবীন হাসিল, বলিল, হাঁ যান; কিন্তু দেখবেন কমলিলতার কেত্তন শুনে নিজেই যেন আটকে যাবেন না।

দেখি, কি হয়। এই বলিয়া হাসিয়া কমললতা বৈষ্ণবীর আখড়ার উদ্দেশ্যে অপরাহ্ণবেলায় যাত্রা করিলাম।

আখড়ার ঠিকানা যখন মিলিল তখন সন্ধ্যা বোধকরি উত্তীর্ণ হইয়াছে, দূর হইতে কীর্ত্তন বা খোল-করতালের শব্দমাত্র পাই নাই, সুপ্রাচীন বকুল বৃক্ষটা সহজেই চোখে পড়িল, নীচে ভাঙাচোরা বেদী একটা আছে, কিন্তু লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। একটা ক্ষীণ পথের রেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রাচীরের ধার ঘেঁষিয়া নদীর দিকে গিয়াছে, অনুমান করিলাম হয়ত ওদিকে কাহারও সন্ধান মিলিতে পারে, অতএব সেদিকেই পা বাড়াইলাম। ভুল করি নাই, শীর্ণ সঙ্কীর্ণ শৈবালাচ্ছন্ন

নদীর তীরে একখণ্ড পরিষ্কৃত গোময়লিপ্ত ঈষদুচ্চ ভূমির উপরে বসিয়া গহর এবং আর এক ব্যক্তি—আন্দাজ করিলাম, ইনিই বৈরাগী দ্বারিকাদাস—আখড়ার বর্তমান অধিকারী। নদীর তীর বলিয়া তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয় নাই, বাবাজীকে বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম। লোকটিকে ভদ্র ও উচ্চ জাতির বলিয়াই মনে হইল। বর্ণ শ্যাম, রোগা বলিয়া কিছু দীর্ঘকায় বলিয়া চোখে ঠেকে; মাথার চুল চূড়ার মত করিয়া সুমুখে বাঁধা, দাড়ি-গোঁফ প্রচুর নয়—সামান্যই. চোখে-মুখে একটা স্বাভাবিক হাসির ভাব আছে, বয়সটা ঠিক আন্দাজ করিতে পারিলাম না, তবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশী হইবে বলিয়া বোধ করিলাম না। আমার আগমন বা উপস্থিতি উভয়ের কেহই লক্ষ্য করিল না, দু'জনেই নদীর পরপারে পশ্চিম-দিগন্তে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে। সেখানে নানা রঙ ও নানা আকারের টুকরো মেঘের মাঝে ক্ষীণ পাণ্ডুর তৃতীয়ার চাঁদ এবং ঠিক যেন তাহারই কপালের মাঝখানে ফুটিয়া আছে অত্যুজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা। বহু নিম্নে দেখা যায় দূর গ্রামান্তের নীল বৃক্ষরাজি—তাহার যেন কোথাও আর শেষ নাই, সীমা নাই। কালো, সাদা, পাঁশুটে নানা বর্ণের ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘের গায়ে তখনও অস্তগত সূর্য্যের শেষ দীপ্তি খেলিয়া বেড়াইতেছে—ঠিক যেন দুষ্ট ছেলের হাতে রঙের তুলি পড়িয়া ছবির আদ্যশ্রাদ্ধ চলিতেছে। তাহার ক্ষণ-কালের আনন্দ –চিত্রকর আসিয়া কান মলিয়া হাতের তুলি কাড়িয়া লইল বলিয়া।

স্বল্পতোয়া নদীর কতকটা অংশ বোধ করি গ্রামবাসীরা পরিষ্কৃত করিয়াছে, সম্মুখের সেই স্বচ্ছ কালো অল্পপরিসর জলটুকুর উপরে ছোট ছোট রেখায় চাঁদের ও সন্ধ্যাতারার আলো পাশাপাশি পড়িয়া ঝিকিমিকি করিতেছে—যেন কষ্টিপাথরে ঘষিয়া স্যাকরা সোনার দাম যাচাই করিতেছে। কাছে কোথাও বনের মধ্যে বোধ করি অজস্র কাঠমল্লিকা ফুটিয়াছে, তাহারই গন্ধে সমস্ত বাতাসটা ভারী হইয়া উঠিয়াছে এবং নিকটে কোন গাছে অসংখ্য বকের বাসা হইতে শাবকগণের একটানা ঝুমঝুম শব্দ বিচিত্র মাধুর্য্যে অবিরাম কানে আসিয়া পশিতেছে। এসবই ভালো এবং যে দুটা লোক তদ্গত-চিত্তে জড়ভরতের মত বসিয়া আছে তাহারাও কবি সন্দেহ নাই। কিন্তু এ দেখিতে এই জঙ্গলে সন্ধ্যাকালে আসি নাই। নবীন বলিয়াছিল একপাল বোষ্টমী আছে. এবং সকলের সেরা বোষ্টমী কমললতা আছে। তাহারা কোথায়?

ডাকিলাম, গহর!

গহর ধ্যান ভাঙিয়া হতবুদ্ধির মত আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, গোঁসাই, তোমার শ্রীকান্ত না?

গহর দ্রুতবেগে উঠিয়া আমাকে সজোরে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। তাহার আবেগ থামিতে চাহে না এমনি ব্যাপার ঘটিল। কোনমতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বসিয়া পড়িলাম, বলিলাম, বাবাজী আমাকে চিনলেন কি করে?

বাবাজী হাত নাড়িলেন—ও চলবে না গোঁসাই, ক্রিয়াপদে শেষের ঐ সম্ভ্রমের দন্ত্য 'ন'টি বাদ দিতে হবে। তবে ত রস জমবে।

বলিলাম, তা যেন দিলাম, কিন্তু হঠাৎ আমাকে চিনলে কি করে?

বাবাজী কহিলেন, হঠাৎ চিনব কেন! তুমি যে আমাদের বৃন্দাবনের চেনা মানুষ গোঁসাই, তোমার চোখ যে রসের সমুদ্দুর—ও যে দেখলেই চোখে পড়ে। যেদিন কমললতা এলো—তারও এমনি দুটি চোখ—তারে দেখেই চিনলাম—কমললতা, কমললতা এতদিন ছিলে কোথা? কমল এসে সেই যে আপনার হ'লো তার আর আদি-অন্ত বিরহ-বিচ্ছেদ রইল না। এই ত সাধনা গোঁসাই, একেই ত বলি রসের দীক্ষা।

বলিলাম, কমললতা দেখব বলেই ত এসেচি গোঁসাই, কই সে?

বাবাজী ভারী খুশী হইলেন, কহিলেন, দেখবে তাকে? কিন্তু সে তোমার অচেনা নয় গোঁসাই, বৃন্দাবনে তাকে অনেকবার দেখেচ। হয়ত ভুলে গেছ, কিন্তু দেখলেই চিনবে, সেই কমললতা। গোঁসাই, ডাকো না একবার তারে। এই বলিয়া বাবাজী গহরকে ডাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইঁহার কাছে সবাই গোঁসাই, বলিলেন, বলো গে শ্রীকান্ত এসেচে তোমাকে দেখতে।

গহর চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম, গোঁসাই, আমার কথা বুঝি তোমাকে গহর সমস্ত বলেচে?

বাবাজী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হাঁ সমস্ত বলেচে। তারে জিজ্ঞাসা করলাম, গোঁসাই, ছ'সাতদিন আসনি কেন? সে বললে, শ্রীকান্ত এসেছিল। তুমি যে শীঘ্রই আবার আসবে তাও বলেচে। তুমি বর্মাদেশে যাবে তাও জানি।

শুনিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলাম, রক্ষা হোক, ভয় হইয়াছিল সত্যই বা ইনি কোন্ অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে আমাকে দেখিবামাত্রই চিনিয়াছেন। যাই হোক, এক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধে তাঁহার আন্দাজটা যে বেঠিক হয় নাই তাহা মানিতেই হইবে।

বাবাজীকে ভাল বলিয়াই ঠেকিল, অন্ততঃ অসাধু-প্রকৃতির বলিয়া মনে হইল না। বেশ সরল। কি জানি, কেন ইহাদের কাছে গহর আমার সকল কথাই বলিয়াছে—অর্থাৎ যতটুকু সে জানে। বাবাজী সহজেই তাহা স্বীকার করিলেন, একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের—হয়ত কবিতা ও বৈষ্ণবী-রসচর্চ্চায় কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত।

অনতিকাল পরেই গহর গোঁসাইয়ের সঙ্গে কমললতা আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স ত্রিশের বেশী নয়, শ্যামবর্ণ, আঁটসাট ছিপছিপে গড়ন, হাতে কয়েকগাছি চুড়ি—

হয়ত পিতলের, সোনার হইতেও পারে, চুল ছোট নয়, গেরো দেওয়া পিঠের উপর ঝুলিতেছে, গলায় তুলসীর মালা, হাতে থলির মধ্যেও তুলসীর জপমালা। ছাপ-ছোপের খুব বেশী আড়ম্বর নাই, কিংবা সকালের দিকে ছিল, এ বেলায় কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে। ইহার মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। সবিস্ময়ে মনে হইল এই চোখ-মুখের ভাবটা যেন পরিচিত এবং চলার ধরণটাও যেন পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি।

বৈষ্ণবী কথা কহিল। সে যে নীচের স্তরের লোক নয় তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম। সে কিছুমাত্র ভূমিকা করিল না, সোজা আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, কি গোঁসাই, চিনতে পার?

বলিলাম, না, কিন্তু কোথায় যেন দেখেচি মনে হচ্চে।

বৈষ্ণবী কহিল, দেখেচ বৃন্দাবনে। বড়গোঁসাইজীর কাছে খবরটা শোননি এখনো?

বলিলাম, তা শুনেচি। কিন্তু বৃন্দাবনে আমি ত কখন জন্মেও যাইনি!

বৈষ্ণবী কহিল, গ্যাছো বইকি। অনেককালের কথা হঠাৎ স্মরণ হচ্ছে না। সেখানে গরু চরাতে, ফল পেড়ে আনতে, বনফুলের মালা গেঁথে আমাদের গলায় পরাতে—সব ভুলে গেলে? এই বলিয়া ঠোঁট চাপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বুঝিলাম তামাশা করিতেছে, কিন্তু আমাকে, না বড়গোঁসাইজীকে, ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। কহিল, রাত হয়ে আসচে, আর জঙ্গলে বসে কেন? ভেতরে চলো।

বলিলাম, জঙ্গলের পথে আমাদেরও অনেকটা যেতে হবে। বরঞ্চ কাল আবার আসব।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, এখানের সন্ধান দিলে কে? নবীন?

হাঁ, সেই।

কমললতার খবর বলেনি?

হাঁ, তাও বলচে।

বোষ্টমীর জাল ছিঁড়ে হটাৎ বার হওয়া যায় না, তোমাকে সাবধান করে দেয়নি?

সহাস্যে কহিলাম, হাঁ, তাও দিয়েচে।

বৈষ্ণবী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, নবীন হুঁসিয়ার মাঝি। তার কথা না শুনে ভাল করোনি।

কেন বল ত?

বৈষ্ণবী ইহার জবাব দিল না, গহরকে দেখাইয়া কহিল, গোঁসাই বলে, তুমি বিদেশে যাচ্চ চাকরি করতে। তোমার ত কেউ নেই, চাকরি করবে কেন?

তবে কি করব ?

আমরা যা করি। গোবিন্দজীর প্রসাদ কেউ আর কেড়ে নিতে পারবে না।

তা জানি। কিন্তু বৈরাগীগিরি আমার নতুন নয়।

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, তা বুঝেচি, ধাতে সয় না বুঝি ?

না, বেশীদিন সয় না।

বৈষ্ণবী মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, তোমার কমই ভাল। ভেতরে এসো, ওদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিই। এখানে কমলের বন আছে।

তা শুনেচি। কিন্তু অন্ধকারে ফিরব কি করে ?

বৈষ্ণবী পুনশ্চ হাসিল, কহিল, অন্ধকারে ফিরতেই বা আমরা দেব কেন ? অন্ধকার কাটবে গো কাটবে। তখন যেয়ো। এসো।

চলো।

বৈষ্ণবী কহিল, গৌর ! গৌর !

গৌর গৌর, বলিয়া আমিও অনুসরণ করিলাম।

৬

যদিচ ধর্ম্মাচরণে নিজের মতিগতি নাই, কিন্তু যাহাদের আছে তাহাদের বিঘ্ন ঘটাই না। মনের মধ্যে নিঃসংশয়ে জানি, গুরুতর বিষয়ের কোন অন্ধিসন্ধি আমি কোন কালে খুঁজিয়া পাইব না। তথাপি ধার্ম্মিকদের আমি ভক্তি করি। বিখ্যাত স্বামীজী ও স্বখ্যাত সাধুজী—কাহাকেও ছোট-বড় করি না, উভয়ের বাণীই আমার কর্ণে সমান মধু বর্ষণ করে।

বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি, বাঙলাদেশের আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ় রহস্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েই সুগুপ্ত আছে এবং সেইটাই নাকি বাঙলার নিজস্ব খাঁটি জিনিস। ইতিপূর্ব্বে সন্ন্যাসী-সাধুসঙ্গ কিছু কিছু করিয়াছি—ফললাভের বিবরণ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু এবার যদি দৈবাৎ খাঁটি বস্তু কপালে জুটিয়া থাকে ত এ সুযোগ ব্যয় হইতে দিব না। সঙ্কল্প করিলাম। পুঁটুর বৌভাতের নিমন্ত্রণ আমাকে রাখিতে হইবে, অন্ততঃ সে-কয়টাদিন কলিকাতার নিঃসঙ্গ মেসের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবী-আখড়াই আশেপাশে কোথাও কাটাইতে পারিলে আর যাই হোক জীবনের সঞ্চয়ে বিশেষ লোকসান ঘটিবে না।

ভিতরে আসিয়া দেখিলাম কমললতার কথা মিথ্যা নয়, সেথায় কমলের বনই বটে, কিন্তু দলিত-বিদলিত। মত্ত-হস্তিকুলের সাক্ষাৎ মিলিল না, কিন্তু বহু পদচিহ্ন

বিদ্যমান। বৈষ্ণবীরা নানা বয়সের ও নানা চেহারার এবং নানা কাজে ব্যাপৃত। কেহ দুধ জ্বাল দিতেছে, কেহ ক্ষীর তৈরী করিতেছে, কেহ নাড়ু পাকাইতেছে, কেহ ময়দা মাখিতেছে, কেহ ফলমূল বানাইতেছে—এসকল ঠাকুরের রাত্রের ভোগের ব্যাপার। একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী বৈষ্ণবী একমনে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে এবং তাহারই কাছে বসিয়া আর একজন নানা রঙের ছাপানো ছোট ছোট বস্ত্রখণ্ড সযত্নে কুঞ্চিত করিয়া গুছাইয়া তুলিতেছে, সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ কাল স্নানান্তে পরিধান করিবেন। কেহই বসিয়া নাই, তাহাদের কাজের আগ্রহ ও একাগ্রতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সকলেই আমার প্রতি চাহিয়া দেখিল, কিন্তু নিমেষমাত্র। কৌতূহলের অবসর নাই, ওষ্ঠাধর সকলেরই নড়িতেছে, বোধ হয় মনে মনে নাম-জপ চলিতেছে। এদিকে বেলা শেষ হইয়া দুই-একটা করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে শুরু করিয়াছে; কমললতা কহিল, চলো ঠাকুর নমস্কার করে আসবে। কিন্তু আচ্ছা—তোমাকে কি বলে ডাকব বল ত? নতুনগোঁসাই বলে ডাকলে হয় না?

বলিলাম, কেন হবে না? তোমাদের এখানে গহর পর্য্যন্ত যখন গহরগোঁসাই হয়েচে তখন আমি ত অন্ততঃ বামুনের ছেলে। কিন্তু আমার নিজের নামটা কি দোষ করলে। তার সঙ্গেই একটা গোঁসাই জুড়ে দাও না?

কমললতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সে হয় না ঠাকুর, হয় না। ও নামট আমার ধরতে নেই—অপরাধ হয়, এসো।

তা যাচ্ছি, কিন্তু অপরাধটা কিসের?

কিসের তা তোমার শুনে কি হবে? আচ্ছা মানুষ ত!

যে বৈষ্ণবীটি মালা গাঁথিতেছিল সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই মুখ নীচু করিল।

ঠাকুরঘরে কালোপাথর ও পিতলের রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি। একটি নয়, অনেকগুলি। এখানেও জন পাঁচ-ছয় বৈষ্ণবী কাজে নিযুক্ত। আরতির সময় হইয়া আসিতেছে, নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই।

ভক্তিভরে যথারীতি প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। ঠাকুরঘরটি ছাড়া অন্য সব ঘরগুলিই মাটির, কিন্তু সযত্ন-পরিচ্ছন্নতার সীমা নাই। বিনা আসনে কোথাও বসিতেই সঙ্কোচ হয় না, তথাপি কমললতা পূবের বারান্দার একধারে আসন পাতিয়া দিল, কহিল, বসো, তোমার থাকবার ঘরটা একটু গুছিয়ে দিয়ে আসি।

আমাকে এখানেই আজ থাকতে হবে নাকি?

কেন, ভয় কি? আমি থাকতে তোমার কষ্ট হবে না।

বলিলাম, কষ্টের জন্য নয়, কিন্তু গহর রাগ করবে যে।

বৈষ্ণবী কহিল, সে ভার আমার। আমি ধরে রাখলে তোমার বন্ধু একটুও রাগ

করবে না, এই বলিয়া সে হাসিয়া চলিয়া গেল।

একাকী বসিয়া অন্যান্য বৈষ্ণবীদের কাজ দেখিতে লাগিলাম। বাস্তবিকই তাহাদের সময় নষ্ট করিবার সময় নাই, আমার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। মিনিট-দশেক পরে কমললতা যখন ফিরিয়া আসিল তখন কাজ শেষ করিয়া সকলে উঠিয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি মঠের কর্ত্রী নাকি?

কমললতা জিভ কাটিয়া কহিল, আমরা সবাই গোবিন্দজীর দাসী—কেউ ছোট বড় নেই। এক-একজনের এক-একটা ভার, আমার ওপর প্রভু এই ভার দিয়েচেন। এই বলিয়া সে মন্দিরের উদ্দেশে হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল। বলিল, এমন কথা আর কখনো মুখে এনো না।

বলিলাম, তাই হবে। আচ্ছা, বড়গোঁসাই, গহরগোঁসাই এঁদের দেখচিনে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, তাঁরা এলেন বলে, নদীতে স্নান করতে গেছেন।

এই রাত্রে? আর ঐ নদীতে?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ।

গহরও?

হাঁ, গহরগোঁসাইও।

কিন্তু আমাকেই স্নান করালে না কেন?

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, আমরা কাউকে স্নান করাইনে, তারা আপনি করে। ঠাকুরের দয়া হলে তুমিও একদিন করবে, সেদিন মানা করলেও শুনবে না।

বলিলাম, গহর ভাগ্যবান, কিন্তু আমার ত টাকা নেই, আমি গরীব লোক—আমার প্রতি হয়ত ঠাকুরের দয়া হবে না।

বৈষ্ণবী ইঙ্গিতটা বোধ হয় বুঝিল এবং রাগ করিয়া কি যেন একটা বলিতে গেল, কিন্তু বলিল না। তারপরে কহিল গহরগোঁসাই যাই হোন কিন্তু তুমিও গরীব নয়। অনেক টাকা দিয়ে যে পরের কন্যাদায় উদ্ধার করে ঠাকুর তাকে গরীব ভাবে না। তোমার ওপরেও দয়া হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

বলিলাম, তা হলে সেটা ভয়ের কথা। তবু, কপালে যা লেখা আছে ঘটবে, আটকান যাবে না—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কন্যাদায় উদ্ধারের খবর তুমি পেলে কোথায়?

বৈষ্ণবী কহিল, আমাদের পাঁচ বাড়িতে ভিক্ষে করতে হয়, আমরা সব খবর শুনতে পাই।

কিন্তু এ খবর বোধ হয় এখনো পাওনি যে, টাকা দিয়ে দায় উদ্ধার করতে আমার হয়নি?

বৈষ্ণবী কিছু বিস্মিত হইল, কহিল, না, এ খবর পাইনি। কিন্তু হ'লো কি, বিয়ে ভেঙে গেল?

হাসিয়া কহিলাম, বিয়ে ভাঙেনি, কিন্তু ভেঙেচেন কালিদাসবাবু—বরের বাপ নিজে। পরের ভিক্ষের দানে ছেলে-বেচা-পণের কড়ি হাত পেতে নিতে তিনি লজ্জা পেলেন। আমিও বেঁচে গেলাম। এই বলিয়া ব্যাপারটা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

বৈষ্ণবী সবিস্ময়ে কহিল, বল কি গো, এ যে অঘটন ঘটল!

বলিলাম, ঠাকুরের দয়া। শুধু কি গহরগোঁসাইজীই অন্ধকারে পচা নদীর জলে ডুব মারবে, আর সংসারের কোথাও কোন অঘটন ঘটবে না? তাঁর লীলাই বা প্রকাশ পাবে কি করে বল ত? বলিয়াই কিন্তু বৈষ্ণবীর মুখ দেখিয়া বুঝিলাম কথাটা আমার ভালো হয় নাই—মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণবী কিন্তু প্রতিবাদ করিল না, শুধু হাত তুলিয়া মন্দিরের উদ্দেশে নিঃশব্দে নমস্কার করিল, যেন অপরাধের মার্জ্জনা করিল।

সম্মুখ দিয়া একজন বৈষ্ণবী মস্ত একথালা লুচি লইয়া ঠাকুরঘরের দিকে গেল। দেখিয়া কহিলাম, আজ তোমাদের সমারোহ ব্যাপার। বোধ হয় বিশেষ কোন পর্ব্বদিন—না?

বৈষ্ণবী কহিল, না, আজ কোন পর্ব্বদিন নয়। এ আমাদের প্রতিদিনের ব্যাপার, ঠাকুরের দয়ায় অভাব কখনো ঘটে না।

কহিলাম, আনন্দের কথা। কিন্তু আয়োজনটা বোধ করি রাত্রেই বেশী করে করতে হয়?

বৈষ্ণবী কহিল, তাও না। সেবার সকাল-সন্ধ্যা নেই, দয়া করে যদি দুদিন থাকো নিজেই সব দেখতে পাবে। দাসীর দাসী আমরা, ওঁর সেবা করা ছাড়া সংসারে আর ত আমাদের কোন কাজ নেই। এই বলিয়া মন্দিরের দিকে হাত-জোড় করিয়া আর একবার নমস্কার করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সারাদিন কি তোমাদের করতে হয়?

বৈষ্ণবী কহিল, এসে যা দেখলে, তাই।

কহিলাম, এসে দেখলাম বাটনা-বাটা, কুটনো-কোটা, দুধ জ্বাল-দেওয়া, মালা-গাঁথা, কাপড় রঙ করা—এমনি অনেক কিছু। তোমরা সারাদিন কি শুধু এই করো?

বৈষ্ণবী কহিল, সারাদিন শুধু এই করি।

কিন্তু এসব ত কেবল ঘর-গৃহস্থালীর কাজ, সব মেয়েরাই করে। তোমরা ভজন-সাধন কর কখন?

বৈষ্ণবী কহিল, এই আমাদের ভজন-সাধন।

এই রাঁধা-বাড়া, জল-তোলা, কুটনো-বাটনা, মালা-গাঁথা, কাপড়-ছোপান—একেই বলে সাধনা?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ, একেই বলি সাধনা। দাসদাসীর এর চেয়ে বড় সাধনা আমরা পাব কোথায় গোঁসাই? বলিতে বলিতে তাহার সজল চোখ দুটি যেন অনির্বচনীয় মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আমার হঠাৎ মনে হইল, এই অপরিচিত বৈষ্ণবীর মুখের মত সুন্দর মুখ আমি সংসারে কখনো দেখি নাই। বলিলাম, কমললতা, তোমার বাড়ি কোথায়?

বৈষ্ণবী আঁচলে চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিল, গাছতলায়।

কিন্তু গাছতলা ত আর চিরকাল ছিল না?

বৈষ্ণবী কহিল, তখন ছিল ইট-কাঠের তৈরী কোন একটা বাড়ির ছোট্ট একটি ঘর। কিন্তু সে গল্প করার ত এখন সময় নেই গোঁসাই। এস ত আমার সঙ্গে, তোমার নতুন ঘরটা দেখিয়ে দিই।

চমৎকার ঘরখানি। বাঁশের আলনায় একটি পরিষ্কার তসরের কাপড় দেখাইয়া দিয়া কহিল, ঐটি পরে ঠাকুরঘরে এস। দেরি ক'রো না যেন। এই বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল।

একধারে ছোট একটি তক্তপোশে পাতা বিছানা। নিকটেই জলচৌকির উপরে রাখা কয়েকখানি গ্রন্থ ও একথালা বকুলফুল; এইমাত্র প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ বোধ হয় ধূপধুনা দিয়া গিয়াছে, তাহার গন্ধ ও ধোঁয়ায় ঘরটি তখনও পূর্ণ হইয়া আছে—ভারী ভাল লাগিল। সারাদিনের ক্লান্তি ত ছিলই, ঠাকুর-দেবতাকেও চিরদিন পাশ কাটাইয়া চলি, সুতরাং ওদিকের আকর্ষণ ছিল না,—কাপড় ছাড়িয়া ঝুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কি জানি এ কাহার ঘর, কাহার শয্যা, অজ্ঞাত বৈষ্ণবী একটা রাত্রির জন্য আমাকে ধার দিয়া গেল—কিংবা হয়ত, এ তাহার নিজেরই—কিন্তু এসকল চিন্তায় মন আমার স্বভাবতঃই ভারী সঙ্কোচ বোধ করে, অথচ আজ কিছু মনেই হইল না, যেন কতকালের পরিচিত আপনার জনের কাছে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছি। বোধ হয় একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম, কে যেন দ্বারের বাহিরে ডাক দিল, নতুনগোঁসাই, মন্দিরে যাবে না? ওঁরা তোমাকে ডাকচেন যে।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। মন্দিরা-সহযোগে কীর্ত্তন-গান কানে গেল, বহুলোকের সমবেত কোলাহল নয়, গানের কথাগুলি যেমন মধুর তেমনি সুস্পষ্ট। বামাকণ্ঠ, রমণীকে চোখে না দেখিয়াও নিঃসন্দেহে অনুমান করিলাম এ কমললতা। নবীনের বিশ্বাস এই মিষ্ট স্বরই তাহার প্রভুকে মজাইয়াছে। মনে হইল—অসম্ভব নয় এবং অত্যন্ত অসঙ্গতও নয়।

মন্দিরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে একধারে গিয়া বসিলাম, কেহ চাহিয়া দেখিল না। সকলের দৃষ্টিই রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির প্রতি নিবদ্ধ। মাঝখানে দাঁড়াইয়া কমললতা কীর্ত্তন করিতেছে—মদন-গোপাল, জয়-জয় যশোদা-দুলাল কি, যশোদা-দুলাল জয় জয় নন্দদুলাল কি, নন্দদুলাল জয় জয় গিরিধারী-লাল কি, গিরিধারী-লাল জয় জয় গোবিন্দ-গোপাল কি।

এই সহজ ও সাধারণ গুটি কয়েক কথার আলোড়নে ভক্তের গভীর বক্ষঃস্থল মথিত করিয়া কি সুধা তরঙ্গিত হইয়া উঠে তাহা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন; কিন্তু দেখিতে পাইলাম উপস্থিত কাহারও চক্ষুই শুষ্ক নয়। গায়িকার দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে এবং ভাবের গুরুভাবে তাহার কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে যেন ভাঙিয়া পড়িল বলিয়া। এইসকল রসের রসিক আমি নই, কিন্তু আমারও মনের ভিতরটা হঠাৎ যেন কেমনধারা করিয়া উঠিল। বাবাজী দ্বারিকাদাস মুদ্রিত-নেত্রে একটা দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি সচেতন কি অচেতন বুঝা গেল না এবং শুধু কেবল ক্ষণকাল পূর্ব্বেই স্নিগ্ধ-হাস্যপরিহাস-চঞ্চল কমললতাই নয়, সাধারণ গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা যেসকল বৈষ্ণবীদের এইমাত্র সামান্য তুচ্ছ-কুরূপা মনে হইয়াছিল, তাহারাও যেন এই ধূপ ও ধূনায় ধূমাচ্ছন্ন গৃহের অনুজ্জ্বল দীপালোকে আমার চক্ষে মুহূর্ত্তকালের জন্য অপরূপ হইয়া উঠিল। আমারও যেন মনে হইতে লাগিল, অদূরবর্ত্তী ঐ পাথরের মূর্ত্তি সত্যই চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে এবং কান পাতিয়া কীর্ত্তনের সমস্ত মাধুর্য্য উপভোগ করিতেছে।

ভাবের এই বিহ্বল মুগ্ধতাকে আমি অত্যন্ত ভয় করি, ব্যস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম—কেহ লক্ষ্যও করিল না। দেখি প্রাঙ্গণের একধারে বসিয়া গহর। কোথাকার একটা আলোর রেখা আসিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে। আমার পদশব্দে তাহার ধ্যান ভাঙিল না, কিন্তু সেই একান্ত সমাহিত মুখের প্রতি চাহিয়া আমিও নড়িতে পারিলাম না, সেইখানে স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। মনে হইতে লাগিল, শুধু আমাকেই একাকী ফেলিয়া রাখিয়া এ বাড়ির সকলেই যেন আর এক দেশে চলিয়া গিয়াছে—সেখানের পথ আমি চিনি না! ঘরে আসিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম। নিশ্চয় জানি, জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে আমি ইহাদের সকলের বড়, তথাপি কিসের ব্যথায় জানি না, মনের ভিতরটা কাঁদিতে লাগিল এবং তেমনি অজানা কারণে চোখের কোণ বাহিয়া বড় বড় ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, কানে গেল, ওগো নতুনগোঁসাই!

জাগিয়া উঠিয়া বলিলাম, কে?

আমি গো—তোমার সন্ধ্যেবেলার বন্ধু। এত ঘুমোতেও পার!

অন্ধকার ঘরে চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া কমললতা বৈষ্ণবী? বলিলাম, জেগে থেকে লাভ হ'তো কি? তবু সময়টার একটু সদ্ব্যবহার হ'লো।

তা জানি। কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ পাবে না?

পাব।

তবে ঘুমোচ্ছ যে বড়?

জানি বিঘ্ন ঘটবে না, প্রসাদ পাবই। আমার সন্ধ্যাবেলাকার বন্ধু রাত্রেও পরিত্যাগ করবে না।

বৈষ্ণবী সহাস্যে কহিল, সে দাসী বৈষ্ণবের, তোমাদের নয়।

বলিলাম, আশা পেলে বোষ্টম হতে কতক্ষণ। তুমি গহরকে পর্য্যন্ত গোঁসাই বানিয়েচ, আর আমিই কি এত অবহেলার? হুকুম করলে বোষ্টমের দাসানুদাস হতেও রাজী।

কমললতার কণ্ঠস্বর একটুখানি গম্ভীর হইল, বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে তামাশা করতে নেই গোঁসাই, অপরাধ হয়। গহরগোঁসাইজীকেও তুমি ভুল বুঝেচ। তার আপন লোকেরাও তাকে কাফের বলে, কিন্তু তারা জানে না সে খাঁটি মুসলমান, বাপ-পিতামহর ধর্ম্মবিশ্বাস সে ত্যাগ করেনি।

কিন্তু তার ভাব দেখে ত তা মনে হয় না।

বৈষ্ণবী কহিল, সেইটেই আশ্চর্য্য। কিন্তু আর দেরি ক'রো না, এসো। একটু ভাবিয়া কহিল, কিংবা প্রসাদ না হয় তোমাকে এখানেই দিয়ে যাই—কি বল?

বলিলাম, আপত্তি নেই। কিন্তু গহর কোথায়? সে থাকে ত দু'জনকে একত্রেই দাও না।

তার সঙ্গে বসে খাবে?

বলিলাম, চিরকালই ত খাই। ছেলেবেলায় ওর মা আমাকে অনেক কলার মেখে দিয়েচে, তোমাদের প্রসাদের চেয়ে সে ত কম মিষ্টি হ'তো না। তা ছাড়া গহর ভক্ত, গহর কবি—কবির জাতের খোঁজ করতে নেই।

অন্ধকারেও মনে হইল বৈষ্ণবী একটা নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিল, তারপরে কহিল, গহরগোঁসাইজী নেই, কখন চলে গেছে আমরা জানতে পারিনি।

কহিলাম, গহরকে দেখলাম সে উঠানে বসে। তাকে কি তোমরা ভেতরে যেতে দাও না।

বৈষ্ণবী কহিল, না।

বলিলাম, গহরকে আজ আমি দেখেচি। কমললতা, আমার তামাশাতে তুমি রাগ করলে, কিন্তু তোমাদের ঠাকুরের সঙ্গে তোমরাও বড় কম তামাশা করচ না।

অপরাধ শুধু একটা দিকেই হয় তা নয়।

বৈষ্ণবী এ অনুযোগের আর জবাব দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল। অল্প একটুখানি পরেই সে অন্য একটি বৈষ্ণবীর হাতে আলো ও আসন এবং নিজে প্রসাদের পাত্র লইয়া প্রবেশ করিল, কহিল, অতিথিসেবার ত্রুটি হবে নতুনগোঁসাই, কিন্তু এখানকার সমস্তই ঠাকুরের প্রসাদ।

হাসিয়া বলিলাম, ভয় নেই গো সন্ধ্যার বন্ধু, বোষ্টম না হয়েও তোমার নতুন-গোঁসাইজীর রসবোধ আছে, আতিথ্যের ত্রুটি নিয়ে সে রসভঙ্গ করে না। রাখো কি আছে—ফিরে এসে দেখবে প্রসাদের কণিকাটুকুও অবশিষ্ট নেই।

ঠাকুরের প্রসাদ অমনি করেই ত খেতে হয়। এই বলিয়া কমললতা নীচে ঠাঁই করিয়া সমুদয় খাদ্যসামগ্রী একে একে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিল।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই ঘুম ভাঙিয়া গেল কাঁসর-ঘণ্টার বিকট শব্দে। সুবিপুল বাদ্যভাণ্ড-সহযোগে মঙ্গল আরতি শুরু হইয়াছে। কানে গেল ভোরের সুরে কীর্ত্তনের পদ—কানু-গলে বনমালা বিরাজে, রাই-গলে মোতি সাজে। অরুণিত চরণে মঞ্জীর রঞ্জিত খঞ্জন গঞ্জন লাজে। তারপরে সারাদিন ধরিয়া চলিল ঠাকুরসেবা। পূজা, পাঠ, কীর্ত্তন, নাওয়ানো-খাওয়ানো, গা-মোছানো, চন্দন-মাখানো, মালা-পরানো—ইহার আর বিরাম-বিচ্ছেদ নাই। সবাই ব্যস্ত, সবাই নিযুক্ত। মনে হইল পাথরের দেবতারই এই অষ্টপ্রহরব্যাপী অফুরন্ত সেবা সহে, আর কিছু হইলে এত বড় ধকলে কবে ক্ষইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইত।

কাল বৈষ্ণবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমরা সাধন-ভজন কর কখন? সে উত্তরে বলিয়াছিল—এই ত সাধন-ভজন। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এই রাঁধা-বাড়া, ফুল-তোলা, মালা-গাঁথা, দুধ জ্বাল-দেওয়া, একেই বলো সাধনা? সে মাথা নাড়িয়া তখনি জবাব দিয়া বলিয়াছিল, হাঁ, আমরা একেই বলি সাধনা—আমাদের আর কোন সাধন-ভজন নেই।

আজ সমস্তদিনের কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলাম কথাগুলো তাহার বর্ণে বর্ণে সত্য। অতিরঞ্জন অত্যুক্তি কোথাও নাই। দুপুরবেলা কোন এক ফাঁকে বলিলাম, কমললতা, আমি জানি তুমি অন্য সকলের মত নও। সত্যি বল ত ভগবানের প্রতীক এই যে পাথরের মূর্ত্তি—

বৈষ্ণবী হাত তুলিয়া আমাকে থামাইয়া দিল, কহিল, প্রতীক কি গো—উনিই যে সাক্ষাৎ ভগবান! এমন কথা আর কখনো মুখেও এনো না নতুনগোঁসাই—

আমার কথায় সেই যেন লজ্জা পাইল বেশী। আমিও কেমন একপ্রকার

অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, তবুও আস্তে আস্তে বলিলাম, আমি ত জানিনে, তাই জিজ্ঞাসা করচি, তোমরা কি সত্যই ভাবো ঐ পাথরের মূর্ত্তির মধ্যেই ভগবানের শক্তি এবং চৈতন্য, তাঁর—

আমার এ কথাটাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, সে বলিয়া উঠিল, ভাবতে যাবো কিসের জন্য গো, এ যে আমাদের প্রত্যক্ষ। সংস্কারের মোহ তোমরা কাটাতে পারো না বলেই ভাবো রক্ত-মাংসের দেহ ছাড়া চৈতন্যের আর কোনও থাকবার জো নেই। কিন্তু তা কেন? আর এও বলি, শক্তি আর চৈতন্যের হদিস কি তোমরাই সবখানি পেয়ে বসে আছ যে, বলবে পাথরের মধ্যে তার জায়গা হবে না? হয় গো হয়, ভগবানেরও কোথাও থাকতেই বাধা পড়ে না, নইলে তাঁকে ভগবান বলতে যাবো কেন বলো ত?

যুক্তি-হিসাবে কথাগুলো স্পষ্টও নয়, পূর্ণও নয়, কিন্তু এ ত তা নয়, এ তাহার জীবন্ত বিশ্বাস। তাহার সেই জোর ও অকপট উক্তির কাছে হঠাৎ কেমনধারা থতমত খাইয়া গেলাম, তর্ক করিতে, প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না, ইচ্ছাও করিল না। বরঞ্চ ভাবিলাম, সত্যিই ত, পাথরই হোক আর যাই হোক, এমন পরিপূর্ণ বিশ্বাসে আপনাকে একান্ত সমর্পণ না করিতে পারিলে বৎসরের পর বৎসর দিনান্তব্যাপী এই অবিচ্ছিন্ন সেবার জোর পাইত ইহারা কি করিয়া? এমন সোজা হইয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে দাঁড়াইবার অবলম্বন মিলিত কোথায়? ইহারা শিশু ত নয়, ছেলেখেলার এই মিথ্যা অভিনয়ে দ্বিধাগ্রস্ত মন যে শ্রান্তির অবসাদে দু'দিনেই এলাইয়া পড়িত। কিন্তু সে ত হয় নাই, বরঞ্চ ভক্তি ও প্রীতির অখণ্ড একাগ্রতায় আত্মনিবেদনের আনন্দোৎসব ইহাদের বাড়িয়াই চলিয়াছে। এ জীবনে পাওয়ার দিক দিয়া সে কি তবে সবই ভুয়া, সবই ভুল, সবই আপনাকে ঠকান।

বৈষ্ণবী কহিল, কি গোঁসাই, কথা কও না যে?

বলিলাম, ভাবচি?

কাকে ভাবচ।

ভাবচি তোমাকেই।

ইস্! বড় সৌভাগ্য যে আমার! একটু পরে কহিল, তবুও থাকতে চাও না, কোথায় কোন্ বর্ম্মাদের দেশে চাকরি করতে যেতে চাও। চাকরি করবে কেন?

বলিলাম, আমার ত মঠের জমিজমাও নেই, মুগ্ধ ভক্তের দলও নেই—খাবো কি?

ঠাকুর দেবেন।

কহিলাম অত্যন্ত দুরাশা। কিন্তু তোমাদেরও যে ঠাকুরের ওপর খুব ভরসা তাও ত মনে হয় না। নইলে ভিক্ষে করতে যাবে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, যাই তিনি দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দোরে দোরে দাঁড়িয়ে থাকেন

বলে। নইলে নিজেদের গরজ নেই, থাকলে যেতুম না, না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও না।

কমললতা, তোমার দেশ কোথায়?

কালকেই ত বলেচি গোঁসাই, ঘর আমার গাছতলায়, দেশ আমার পথে-পথে।

তা হলে গাছতলায় আর পথে-পথে না থেকে মঠে থাকো কিসের জন্য?

অনেকদিন পথে-পথেই ছিলুম গোঁসাই, সঙ্গী পাই ত আবার একবার পথই সম্বল করি।

বলিলাম, তোমার সঙ্গীর অভাব এ-কথা ত বিশ্বাস হয় না, কমললতা। যাকে ডাকবে সেই যে রাজী হবে।

বৈষ্ণবী হাসিমুখে কহিল, তোমাকে ডাকচি নতুনগোঁসাই- রাজী হবে?

আমিও হাসিলাম, বলিলাম, হাঁ রাজী। নাবালক অবস্থায় যে-লোক যাত্রার দলকে ভয় করেনি, সাবালক অবস্থায় তার বোষ্টমীকে ভয় কি!

যাত্রার দলেও ছিলে নাকি?

হাঁ।

তা হলে ত গান গাইতেও পারো।

না, অধিকারী অতটা দূর এগোতে দেয়নি, তার আগেই জবাব দিয়েছিল। তুমি অধিকারী হলে কি হ'তো বলা যায় না।

বৈষ্ণবী হাসিতে লাগিল, বলিল, আমিও জবাব দিতুম। সে যাক, এখন আমাদের একজন জানলেই কাজ চলে যাবে! এদেশে যেমন-তেমন করেও ঠাকুরের নাম নিতে পারলে ভিক্ষার অভাব হয় না। চলো না গোঁসাই, বেরিয়ে পড়া যাক। বলেছিলে শ্রীবৃন্দাবনধাম কখনো দেখোনি, চলো তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। অনেকদিন ঘরে বসে কাটল, পথের নেশা আবার যেন টানতে চায়। সত্যি, যাবে নতুনগোঁসাই?

হঠাৎ তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভারি বিস্ময় জন্মিল; কহিলাম, পরিচয় ত এখনো আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়নি, আমাকে এতটা বিশ্বাস হ'লো কি করে?

বৈষ্ণবী কহিল, চব্বিশ ঘণ্টা ত কেবল একপক্ষেই নয় গোঁসাই, ওটা দু'পক্ষেই। আমার বিশ্বাস, পথে-প্রবাসে আমাকেও তোমার অবিশ্বাস হবে না. কাল পঞ্চমী, বেরিয়ে পড়বার ভারি শুভদিন—চলো। আর পথের ধারে রেলের পথ ত রইলই—ভাল না লাগে ফিরে এসো, আমি বারণ করব না।

একজন বৈষ্ণবী আসিয়া খবর দিল—ঠাকুরের প্রসাদ ঘরে দিয়ে আসা হয়েচে।

কমললতা বলিল, চলো, তোমার ঘরে গিয়ে বসি গে।

আমার ঘর? তাই ভাল।

আর একবার তাহার মুখেরপানে চাহিয়া দেখিলাম। এবার আর সন্দেহের লেশমাত্র রহিল না যে, সে পরিহাস করিতেছে না। আমি যে মাত্র উপলক্ষ তাহাও নিশ্চিত, কিন্তু যে কারণেই হোক এখানের বাঁধন ছিঁড়িয়া এই মানুষটি পলাইতে পারিলেই যেন বাঁচে—তাহার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব সহিতেছে না।

ঘরে আসিয়া খাইতে বসিলাম। অতি পারিপাটি প্রসাদ। পলায়নের ষড়যন্ত্রটা জমিত ভালো, কিন্তু কে একজন অত্যন্ত জরুরী কাজে কমললতাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। সুতরাং একাকী মুখ বুজিয়াই সেবা সমাপ্ত করিতে হইল। বাহিরে আসিয়া কাহাকেও বড় দেখিতে পাই না, বাবাজী দ্বারিকাদাসই বা গেলেন কোথায়? দুই-চারিজন প্রাচীন বৈষ্ণবী ঘোরাঘুরি করিতেছে—কাল সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে ধোঁয়ার ঘোরে ইহাদেরই বোধ হয় অপ্সরা মনে হইয়াছিল, কিন্তু আজ দিনের বেলায় কড়া আলোতে কল্যকার সেই অধ্যাত্ম-সৌন্দর্য্যবোধটা তেমন অটুট রহিল না, গা-টা কেমনতর করিয়া উঠিল, সোজা আশ্রমের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সেই শৈবালাচ্ছন্ন শীর্ণকায়া মন্দস্রোতা সুপরিচিত স্রোতস্বতী এবং সেই লতাগুল্ম কণ্টকাকীর্ণ তটভূমি এবং সেই সর্পসঙ্কুল সুদৃঢ় বেতসকুঞ্জ ও সুবিস্তৃত বেণুবন। দীর্ঘকালের অনভ্যাসবশতঃ গা ছমছম করিতে লাগিল। অন্যত্র যাইবার উপক্রম করিতেছি, কোথাও একটি লোক আড়ালে বসিয়াছিল, উঠিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা আশ্চর্য্য হইলাম এ জায়গাতেও মানুষ থাকে। লোকটির বয়স হয়ত আমাদের মত—আবার বছর দশেকের বেশী হওয়া বিচিত্র নয়। খর্ব্বাকৃতি রোগা গড়ন, গায়ের রঙটা খুব কালো নয় বটে, কিন্তু মুখের নীচের দিকটা যেমন অস্বাভাবিক রকমের ছোট, চোখের ভ্রূ দুটাও তেমনি অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘে-প্রস্থে বিস্তীর্ণ, বস্তুতঃ এত বড় ঘন মোটা ভুরু যে মানুষের হয় ইতিপূর্ব্বে এ জ্ঞান আমার ছিল না, দূর হইতে সন্দেহ হইয়াছিল, হয়ত প্রকৃতির কোন হাস্যকর খেয়ালে একজোড়া মোটা গোঁফ ঠোঁটের বদলে লোকটার কপালে গজাইয়াছে। গলাজোড়া মোটা তুলসীর মালা, পোষাক-পরিচ্ছদও অনেকটা বৈষ্ণবদের মত, কিন্তু যেমন ময়লা তেমনি জীর্ণ।

মশাই!

থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, আজ্ঞা করুন।

আপনি এখানে কবে এসেচেন শুনতে পারি কি?

পারেন। এসেচি কাল বৈকালে।

রাত্রিতে আখড়াতে ছিলেন বুঝি?

হাঁ, ছিলাম।

ওঃ!

মিনিটখানেক নীরবে কাটিল। পা বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লোকটা বলিল, আপনি ত বোষ্টম নয়, ভদ্রলোক—আখড়ার মধ্যে আপনাকে থাকতে দিলে যে?

বলিলাম, সে খবর তাঁরাই জানেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করবেন।

ওঃ! কমলিলতা থাকতে বললে বুঝি?

হাঁ।

ওঃ! জানেন ওর আসল নাম কি? ঊষাঙ্গিনী। বাড়ি সিলেটে, কিন্তু দেখায় যেন ও কলকাতার মেয়েমানুষ। আমার বাড়িও সিলেটে। গাঁয়ের নাম মামুদপুর। শুনবেন ওর স্বভাব-চরিত্র?

বলিলাম, না। কিন্তু লোকটার ভাবগতিক দেখিয়া এবার সত্যই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। প্রশ্ন করিলাম, কমললতার সঙ্গে আপনার কি কোন সম্বন্ধ আছে?

আছে না?

কি সেটা?

লোকটা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া হঠাৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কেন, মিথ্যে নাকি? ও আমার পরিবার হয়। ওর বাপ নিজে থেকে আমাদের কণ্ঠীবদল করিয়েছিল। তার সাক্ষী আছে।

কেন জানি না আমার বিশ্বাস হইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কি জাত?

আমরা দ্বাদশ-তিলি।

আর কমললতা?

প্রত্যুত্তরে লোকটা তাহার সেই মোটা ভ্রূ-জোড়া ঘৃণায় কুঞ্চিত করিয়া বলিল, ওরা শুঁড়ী, ওদের জলে আমরা পা ধুইনে। একবার ডেকে দিতে পারেন?

না। আখড়ায় সবাই যেতে পারে, ইচ্ছে হলে আপনিও পারেন।

লোকটা রাগ করিয়া বলিল, যাব মশাই যাব। দারোগাকে দু'পয়সা খাইয়ে রেখেচি, পেয়াদা সঙ্গে করে একেবারে ঝুঁটি ধরে টেনে বার করে আনব। বাবাজীর বাবাও রাখতে পারবে না। শালা রাস্কেল কোথাকার!

আর বাক্যব্যয় না করিয়া চলিতে লাগিলাম। লোকটা পিছন হইতে কর্কশকণ্ঠে কহিল, তাতে আপনার কি হ'লো? গিয়ে একবার ডেকে দিলে কি শরীর ক্ষয়ে যেত নাকি? ওঃ—ভদ্দরলোক!

আর ফিরিয়া চাহিতে ভরসা হইল না। পাছে রাগ সামলাইতে না পারি এবং এই অতি দুর্ব্বল লোকটার গায়ে হাত দিয়া ফেলি এই ভয়ে একটু দ্রুতপদেই প্রস্থান করিলাম। মনে হইতে লাগিল বৈষ্ণবীর পলাইবার হেতুটা বোধ হয় এইখানেই কোথায় জড়িত।

মনটা বিগড়াইয়াছিল, ঠাকুরঘরে নিজেও গেলাম না, কেহ ডাকিতেও আসিল না। ঘরের মধ্যে একখানি জলচৌকির উপরে গুটিকয়েক বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী সযত্নে সাজান ছিল, তাহারি একখানা হাতে করিয়া প্রদীপটা শিয়রের কাছে আনিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। বৈষ্ণব-ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নয়, শুধু সময় কাটাইবার জন্য! ক্ষোভের সহিত একটা কথা বারবার মনে হইতেছিল, কমললতা সেই যে গিয়াছে আর আসে নাই। ঠাকুরের সন্ধ্যারতি যথারীতি আরম্ভ হইল, তাহার মধুর কণ্ঠ বার বার কানে আসিতে লাগিল এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেই কথাটাই মনে হইতে লাগিল, কমললতা সেই অবধি কোন তত্ত্বই আমার লয় নাই। আর সেই ভ্রূ-ওয়ালা লোকটা! কোন সত্যই কি তাহার অভিযোগের মধ্যে নাই?

আরও একটি কথা। গহর কৈ? সেও ত আজ আমার খোঁজ লইল না! ভাবিয়াছিলাম দিনকয়েক এখানেই কাটাইব, পুঁটুর বিবাহের দিনটি পর্য্যন্ত—সে আর হয় না। হয়ত কালই কলিকাতায় রওনা হইয়া পড়িব।

ক্রমশঃ আরতি ও কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। কল্যকার সেই বৈষ্ণবী আসিয়া আজও বহু যত্নে প্রসাদ রাখিয়া গেল, কিন্তু যেজন্য পথ চাহিয়াছিলাম তাহার দেখা মিলিল না। বাহিরে লোকজনের কথাবার্ত্তা আনাগোনার পায়ের শব্দ ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিল, তাহার আসিবার কোন সম্ভাবনা আর নাই জানিয়া আহার করিয়া হাতমুখ ধুইয়া দীপ নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

বোধ করি তখন অনেক রাত্রি, কানে গেল, নতুনগোঁসাই?

জাগিয়া উঠিয়া বসিলাম। অন্ধকারে ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া কমললতা; আস্তে আস্তে বলিল; আসিনি বলে মনে বোধ হয় অনেক দুঃখ করেচ—না গোঁসাই?

বলিলাম, হাঁ, করেচি।

বৈষ্ণবী মুহূর্ত্তকাল নীরব হইয়া রহিল, তারপরে বলিল, বনের মধ্যে ও-লোকটা তোমাকে কি বলছিল?

তুমি দেখেছিলে নাকি?

হাঁ।

বলছিল সে তোমার স্বামী —অর্থাৎ তোমাদের সামাজিক আচারমতে তুমি তার কণ্ঠিবদল-করা পরিবার।

তুমি বিশ্বাস করেচ?

না, করিনি।

বৈষ্ণবী আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, সে আমার স্বভাব-চরিত্রের ইঙ্গিত করেনি?

করেচে।

আমার জাত ?

হাঁ, তাও।

বৈষ্ণবী একটুখানি থামিয়া বলিল, শুনবে আমার ছেলেবেলার ইতিহাস ? কিন্তু হয়ত তোমার ঘৃণা হবে।

বলিলাম, তবে থাক, ও আমি শুনতে চাইনে।

কেন ?

বলিলাম, তাতে লাভ কি কমললতা ? তোমাকে আমার ভারী ভালো লেগেছে। কিন্তু কাল চলে যাবো, হয়ত আর কখনো আমাদের দেখা হবে না। নিরর্থক আমার সেই ভালো লাগাটুকু নষ্ট করে ফেলে ফল কি হবে বল ত ?

বৈষ্ণবী এবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া সে কি করিতেছে ভাবিয়া পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ভাবচ ?

ভাবচি, কাল তোমায় যেতে দেব না।

তবে, কবে যেতে দেবে ?

যেতে কোনদিনই দেব না। কিন্তু অনেক রাত হ'লো ঘুমোও। মশারিটা ভাল করে গোঁজা আছে ত ?

কি জানি, আছে বোধ হয়।

বৈষ্ণবী হাসিয়া কহিল, আছে বোধ হয়! বাঃ—বেশ ত! এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া অন্ধকারেই হাত বাড়াইয়া বিছানার সকল দিক পরীক্ষা করিয়া বলিল, ঘুমোও গোঁসাই—আমি চললুম। এই বলিয়া সে পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেল এবং বাহির হইতে অত্যন্ত সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

৭

আজ আমাকে বৈষ্ণবী বার বার করিয়া শপথ করাইয়া লইল তাহার পূর্ব্ব-বিবরণ শুনিয়া আমি ঘৃণা করিব কি না ?

বলিলাম, শুনতে আমি চাইনে, কিন্তু শুনলেও ঘৃণা করব না।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, কিন্তু করবে না কেন ? সে শুনলে মেয়েপুরুষে সবাই ত ঘৃণা করে।

বলিলাম, তুমি কি বলবে আমি জানিনে, কিন্তু তবুও আন্দাজ করতে পারি। সে শুনলে মেয়েরাই যে মেয়েদের সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে সে জানি এবং তার কারণও জানি, কিন্তু তোমাকে বলতে আমি চাইনে। পুরুষেরাও করে, কিন্তু অনেক

সময়ে সে ছলনা, অনেক সময়ে আত্মবঞ্চনা। তুমি যা বলবে তার চেয়েও অনেক কুশ্রী কথা আমি তোমাদের নিজের মুখেও শুনেচি, চোখেও দেখেচি। কিন্তু তবুও ঘৃণা হয় না।

কেন হয় না?

বোধ হয় আমার স্বভাব। কিন্তু কালই ত বলেচি তোমাকে, তার দরকার নাই। শুনতে আমি একটুও উৎসুক নই। তা ছাড়া, কোথাকার কে—সেসব কাহিনী নাই বা আমাকে বললে।

বৈষ্ণবী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা গোঁসাই, তুমি পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম এসব বিশ্বাস কর?

না।

না কেন? একি সত্যিই নেই তুমি ভাবো?

আমার ভাবনার জন্য অন্য জিনিস আছে, এসব ভাববার বোধ হয় সময় পেয়ে উঠিনে।

বৈষ্ণবী আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, একটা ঘটনা তোমাকে বলব, বিশ্বাস করবে? ঠাকুরের দিকে মুখ করে বলচি, তোমাকে মিথ্যে বলব না।

হাসিয়া কহিলাম, করব গো কমললতা, করব। ঠাকুরের দিব্যি না করে বললেও তোমাকে বিশ্বাস করব।

বৈষ্ণবী কহিল, তবে বলি। একদিন গহরগোঁসাইয়ের মুখে শুনলাম হঠাৎ তাঁর পাঠশালার বন্ধু এসেছিলেন বাড়িতে; ভাবলুম, যে লোক একটাদিন আমাদের এখানে না এসে পারে না সে রইল কোন ছেলেবেলার বন্ধুকে নিয়ে মেতে ছ'-সাত দিন। আবার ভাবলুম, এ কেমনধারা বামুন বন্ধু যে অনায়াসে পড়ে রইল মুসলমানের ঘরে, কারও ভয় করলে না। তার কি কোথাও কেউ নেই নাকি? জিজ্ঞাসা করতে গহরগোঁসাইও ঠিক এই কথাই বললে। বললে, সংসারে তার আপনার কেউ নেই বলে তার ভয়ও নেই, ভাবনাও নেই।

মনে মনে ভাবলুম, তাই হবে। জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার বন্ধুর নাম কি গোঁসাই? নাম শুনে যেন চমকে গেলুম। জানো ত গোঁসাই, ও নামটা আমার করতে নেই?

হাসিয়া বলিলাম, জানি। তোমার মুখেই শুনেচি।

বৈষ্ণবী কহিল, জিজ্ঞাসা করলুম, বন্ধু দেখতে কেমন? বয়স কত? গোঁসাই কত কি যে বলে গেল তার কতক বা আমার কানে গেল, কতক বা গেল না, কিন্তু বুকের ভিতরটায় টিপটিপ করতে লাগল। তুমি ভাববে এমন মানুষ ত দেখিনি

—এরা নাম শুনেই যে পাগল হয়! কিন্তু শুধু নাম শুনেই মেয়েমানুষ পাগল হয় গোঁসাই—এ সত্যি?

বললাম, তারপর?

বৈষ্ণবী বলিল, তারপরে নিজেও হাসতে লাগলুম, কিন্তু ভুলতে আর পারলুম না। সব কাজকর্মেই কেবল একটা কথা মনে হয় তুমি আবার কবে আসবে। তোমাকে নিজের চোখে দেখতে পাব কবে।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু তাহার মুখের পানে চাহিয়া আর হাসিতে পারিলাম না।

বৈষ্ণবী বলিল, সবে কাল সন্ধ্যায় ত তুমি এসেচ, কিন্তু আজ আমার চেয়ে বেশী এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালবাসে না। পূর্ব্বজন্ম সত্যি না হলে এমন অসম্ভব কাণ্ড কি কখন একটা দিনের মধ্যে ঘটতে পারে!

একটু থামিয়া আবার সে বলিল, আমি জানি তুমি থাকতেও আসোনি, থাকবেও না। যত প্রার্থনাই জানাইনে কেন, দু-একদিন পরেই চলে যাবে। কিন্তু আমি যে কতদিনে এই ব্যথা সামলাব তাই ভাবি। এই বলিয়া সে সহসা অঞ্চলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

চুপ করিয়া রহিলাম। এত অল্পকালে এমন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় রমণীর প্রণয়-নিবেদনের কাহিনী ইহার পূর্ব্বে কখনও পুস্তকেও পড়ি নাই, লোকের মুখেও শুনি নাই। এবং ইহা অভিনয় যে নয় তাহা নিজের চোখেই দেখিতেছি। কমললতা দেখিতে ভালো, অক্ষর-পরিচয়হীন মূর্খও নয়, তাহার কথায়-বার্ত্তায়, তাহার গানে, তাহার যত্ন ও অতিথিসেবার আন্তরিকতায় তাহাকে আমার ভালো লাগিয়াছে এবং সেই ভালো লাগাটা প্রশস্তি ও রসিকতার অত্যুক্তিতে ফলাও করিয়া তুলিতে নিজেও কৃপণতা করি নাই, কিন্তু দেখিতে দেখিতে পরিণতি যে এমন ঘোরালো হইয়া উঠিবে, বৈষ্ণবীর আবেদনে, অশ্রুমোচনে ও মাধুর্য্যের অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশে সমস্ত মন যে এমন তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, ক্ষণকাল পূর্ব্বেও তাহার কি জানিতাম। যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কেবল লজ্জাতেই যে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল তাই নয়, কি-একপ্রকার অজানা বিপদের আশঙ্কায় অন্তরের কোথাও আর শান্তি-স্বস্তি রহিল না। জানি না, কোন্ অশুভ-লগ্নে কাশী হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, এ যে এক পুঁটুর জাল কাটিয়া আর এক পুঁটুর ফাঁদে গিয়া ঘাড়মোড় গুঁজিয়া পড়িলাম। এদিকে বয়স তো যৌবনের সীমানা ডিঙাইতেছে, এই সময়ে অযাচিত নারীপ্রেমের বন্যা নামিল নাকি; কোথায় পলাইয়া যে আত্মরক্ষা করিব ভাবিয়া পাইলাম না। যুবতী রমণীর প্রণয়ভিক্ষাও যে পুরুষের কাছে এত অরুচিকর হইতে পারে তাহা ধারণাও ছিল না। ভাবিলাম, অকস্মাৎ মূল্য আমার এত বাড়িল কি করিয়া? আজ রাজলক্ষ্মীর প্রয়োজনও আমাতে শেষ

হইতে চাহে না—বজ্রমুষ্টি এতটুকু শিথিল করিয়াও আমাকে সে নিষ্কৃতি দিবে না, এ মীমাংসা চুকিয়াছে। কিন্তু এখানে আর না। সাধুসঙ্গ মাথায় থাক, স্থির করিলাম কালই এস্থান ত্যাগ করিব।

বৈষ্ণবী হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিল—এই যাঃ! তোমার জন্যে যে চা আনিয়েচি গোঁসাই।

বলো কি? পেলে কোথায়?

সহরে লোক পাঠিয়েছিলুম। যাই, তৈরী করে আনি গে। কোথাও পালিয়ো না যেন।

না। কিন্তু তৈরী করতে জানো ত?

বৈষ্ণবী জবাব দিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে সেইদিকে চাহিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা বাজিল। চা-পান আশ্রমের ব্যবস্থা নয়, হয়ত নিষেধই আছে, তবু ও-জিনিসটা যে আমি ভালবাসি এ খবর সে জানিয়াছে এবং সহরে লোক পাঠাইয়া সংগ্রহ করিয়াছে। তাহার বিগত জীবনের ইতিহাস জানি না, বর্ত্তমানেরও না, কেবল আভাসে এইটুকু শুনিয়াছি তাহা ভাল নয়, তাহা নিন্দার্হ, শুনিলে লোকের ঘৃণা জন্মে। তথাপি আমার কাছে সে-কাহিনী সে লুকাইতে চাহে নাই, বলিবার জন্যই বার বার পীড়াপীড়ি করিয়াছে, শুধু আমিই শুনিতে রাজী হই নাই। আমার কৌতূহল নাই—কারণ প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন তাহার। একলা বসিয়া সেই প্রয়োজনের কথাটা ভাবিতে গিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, আমাকে না বলিয়া তাহার অন্তরের গ্লানি ঘুচিতেছে না—মনের মধ্যে সে কিছুতেই জোর পাইতেছে না।

শুনিয়াছি আমার শ্রীকান্ত নামটা কমললতার উচ্চারণ করিতে নাই। জানি না কে তাহার এই পরমপূজ্য গুরুজন এবং কবে সে ইহলোক হইতে বিদায় হইয়াছে। দৈবাৎ আমাদের নামের মিলটাই বোধ করি এই বিপত্তির সৃষ্টি করিয়াছে এবং তখন হইতে কল্পনায় সে গত-জনমের স্বপ্নসাগরে ডুব মারিয়া সংসারের সকল বাস্তবতায় জলাঞ্জলি দিয়াছে।

তবু মনে হয় বিস্ময়ের কিছু নাই। রসের আরাধনায় আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়াও তাহার একান্ত নারী-প্রকৃতি আজও হয়ত রসের তত্ত্ব পায় নাই, সেই অসহায় অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তি এই নিরবচ্ছিন্ন ভাব-বিলাসের উপকরণ-সংগ্রহে হয়ত আজ ক্লান্ত—দ্বিধায় পীড়িত। সেই তাহার পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত মন আপন অজ্ঞাতসারে কোথায় যে অবলম্বন খুঁজিয়া মরিতেছে, বৈষ্ণবী তাহার ঠিকানা জানে না—আজ তাই সে চমকাইয়া বারে বারে

তাহার বিগত-জনমের রুদ্ধদ্বারে হাত পাতিয়া অপরাধের সান্ত্বনা মাগিতেছে। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারি আমার 'শ্রীকান্ত' নামটাকেই পাথেয় করিয়া আজ সে খেয়া ভাসাইতে চায়!

বৈষ্ণবী চা আনিয়া দিল; সবই নূতন ব্যবস্থা, পান করিয়া গভীর আনন্দ লাভ করিলাম। মানুষের মন কত সহজেই না পরিবর্ত্তিত হয়—আর যেন তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশ নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতা, তোমরা কি শুঁড়ি?

কমললতা হাসিয়া বলিল, না, সোনার বেনে। কিন্তু তোমাদের কাছে ত প্রভেদ নেই, ও দুই-ই এক।

কহিলাম, অন্ততঃ আমার কাছে তাই বটে। দুই-ই এক কেন, সবাই এক হলেও ক্ষতি ছিল না।

বৈষ্ণবী বলিল, তাই ত মনে হয়। তুমি গহরের মায়ের হাতেও খেয়েচ।

বলিলাম, তাঁকে তুমি জানো না। গহর বাপের মত হয়নি, তার মায়ের স্বভাব পেয়েছে—এমন শান্ত, আত্মভোলা মিষ্টি মানুষ আর কখনও দেখেচ? ওর মা ছিলেন তেমনি। একবার ছেলেবেলায় গহরের বাপের সঙ্গে তাঁর ঝগড়ার কথা আমার মনে আছে। কাকে নাকি লুকিয়ে অনেকগুলো টাকা দেওয়া নিয়ে ঝগড়া বাধল। গহরের বাপ ছিল বদরাগী লোক, আমরা ত ভয়ে গেলাম পালিয়ে। ঘণ্টাকয়েক পরে চুপি চুপি ফিরে এসে দেখি গহরের মা চুপ করে বসে। গহরের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করতে প্রথমটা তিনি কথা কইলেন না, কিন্তু আমাদের মুখের পানে চেয়ে থেকে হঠাৎ একেবারে হেসে লুটিয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে ফোঁটাকতক জল গড়িয়ে পড়ল। এ অভ্যাস তাঁর ছিল।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, এতে হাসির কি হ'লো?

বলিলাম, আমরাও ত তাই ভাবলাম। কিন্তু হাসি থামলে কাপড়ে চোখ মুছে ফেলে বললেন, আমি কি বোকা মেয়ে বাপু! ও দিব্যি নেয়ে-খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে, আর আমি না খেয়ে উপুস করে রেগে জ্বলে-পুড়ে মরচি। কি দরকার বল ত! আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রাগ অভিমান ধুয়ে-মুছে নির্ম্মল হয়ে গেল। মেয়েদের এ যে কতবড় গুণ তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানে না।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, তুমি কি ভুক্তভোগী নাকি গোঁসাই?

একটু বিব্রত হইলাম। প্রশ্নটা তাহাকে ছাড়িয়া যে আমার ঘাড়ে পড়িবে তাহা ভাবি নাই। বলিলাম, সবই কি নিজে ভুগতে হয় কমললতা, পরের দেখেও শেখা

যায়। ভুরু-ওয়ালা লোকটার কাছে তুমি কি কিছু শেখোনি?

বৈষ্ণবী বলিল, কিন্তু ও ত আমার পর নয়।

আর কোন প্রশ্ন আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না—একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী নিজেও কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তার পরে হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমাকে মিনতি করি গোঁসাই, আমার গোড়ার কথাটা একবার শোন—

বেশ, বল।

কিন্তু বলিতে গিয়া দেখিল বলা সহজ নয়। আমারি মত নতমুখে তাহাকেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিতে হইল। কিন্তু সে হার মানিল না, অন্তর্বিগ্রহে জয়ী হইয়া একসময়ে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন আমারও মনে হইল তাহার স্বভাবতঃ সুশ্রী মুখের 'পরে যেন বিশেষ একটি দীপ্তি পড়িয়াছে। বলিল, অহঙ্কার যে মরেও মরে না গোঁসাই। আমাদের বড়গোঁসাই বলে, ও যেন তুষের আগুন, নিবেও নেবে না। ছাই সরালেই চোখে পড়ে ধিকিধিকি জ্বলচে। কিন্তু তাই বলে ফুঁ দিয়েও ত বাড়াতে পারব না। আমার এ-পথে আসাই যে তা হলে মিথ্যে হয়ে যাবে। শোন। কিন্তু মেয়েমানুষ ত—হয়ত সব কথা খুলে বলতেও পারব না।

আমার কুণ্ঠার অবধি রহিল না। শেষবারের মত মিনতি করিয়া বলিলাম, মেয়েদের পদস্খলনের বিবরণে আমার আগ্রহ নেই, ঔৎসুক্য নেই, ও শুনতে আমার কোনদিন ভালো লাগে না কমললতা। তোমাদের বৈষ্ণব-সাধনায় অহংকার বিনাশের কোন্ পন্থা মহাজনেরা নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন আমি জানিনে, কিন্তু নিজের গোপন পাপ অনাবৃত করার স্পর্দ্ধিত বিনয়ই যদি তোমাদের প্রায়শ্চিত্তের বিধান হয়, এসব কাহিনী যাদের কাছে অত্যন্ত রুচিকর এমন বহুলোকের সাক্ষাৎ তুমি পাবে কমললতা, আমাকে ক্ষমা কর। এছাড়া বোধ হয় কালই আমি চলে যাবো—জীবনে হয়ত আর কখনো আমাদের দেখাও হবে না।

বৈষ্ণবী কহিল, তোমাকে ত আগেই বলেচি গোঁসাই, প্রয়োজন তোমার নয়, আমার। কিন্তু কালকের পর আর আমাদের দেখা হবে না, এই কি তুমি সত্যিই বলতে চাও? না কখনো তা নয়, আমার মন বলে, আবার দেখা হবে—আমি সেই আশা নিয়েই থাকব। কিন্তু যথার্থই কি আমার সম্বন্ধে তোমার কোন কথাই জানতে ইচ্ছা করে না? চিরকাল শুধু একটা সন্দেহ আর অনুমান নিয়েই থাকবে?

প্রশ্ন করিলাম, আজ বনের মধ্যে যে লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, যাকে তুমি আশ্রমে ঢুকতে দাও না, যার দৌরাত্ম্যে তুমি পালাতে চাচ্চো, সে কি তোমার সত্যিই কেউ নয়? নিছক পর?

কিসের ভয়ে পালাচ্চি তুমি বুঝেচ গোঁসাই?

হাঁ, এই ত মনে হয়। কিন্তু কে ও?

কে ও! ও আমার ইহ-পরকালের নরক-যন্ত্রণা। তাই ত অহরহ ঠাকুরকে কেঁদে বলি, প্রভু, আমি তোমার দাসী—মানুষের উপর থেকে এত বড় ঘৃণা আমার মন থেকে মুছে দাও—আমি আবার সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

তাহার চোখের দৃষ্টিতে যেন আত্মগ্লানি ফুটিয়া উঠিল, আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী কহিল, অথচ ওর চেয়ে আপন একদিন আমার কেউ ছিল না—জগতে অত ভালো বোধ করি কেউ কাউকে বাসেনি।

তাহার কথা শুনিয়া বিস্ময়ের সীমা রহিল না এবং এই সুরূপা রমণীর তুলনায় সেই ভালবাসার পাত্রটির কুৎসিত কদাকার মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া মনও ভারী ছোট হইয়া গেল।

বুদ্ধিমতী বৈষ্ণবী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া তাহা বুঝিল, কহিল, গোঁসাই, এ ত শুধু ওর বাইরেটা—ওর ভিতরের পরিচয়টা শোন।

বলো।

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল, আমার আরও দুটি ছোট ভাই আছে, কিন্তু বাপ-মায়ের আমিই একমাত্র মেয়ে। বাড়ি আমাদের শ্রীহট্টে, কিন্তু বাবা কারবারী লোক, তাঁর ব্যবসা কলকাতায় ব'লে ছেলেবেলা থেকে আমি কলকাতায় মানুষ—মা সংসার নিয়ে দেশের বাড়িতেই থাকেন, আমি পূজোর সময় যদি কখনো দেশে যেতুম মাস-খানেকের বেশী থাকতে পারতুম না। আমার ভালোও লাগত না। কলকাতাতেই আমার বিয়ে হয়, সতেরো বছর বয়সে কলকাতাতেই আমি তাঁকে হারাই, তার নামের জন্যেই গোঁসাই, তোমার নামটা গহরগোঁসাইয়ের মুখে শুনে আমি চমকে উঠি। এইজন্যেই নতুনগোঁসাই বলে ডাকি, ও নামটা তোমার মুখে আনতে পারিনে।

বলিলাম, সে আমি বুঝেচি, তারপর?

বৈষ্ণবী কহিল, যার সঙ্গে তোমার আজ দেখা তার নাম মন্মথ, ও ছিল আমাদের সরকার। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, আমার বয়স যখন একুশ বছর তখন আমার সন্তানসম্ভাবনা হ'লো—

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল, মন্মথর একটি পিতৃহীন ভাইপো আমাদের বাসায় থাকত, বাবা তাকে কলেজে পড়াতেন। বয়সে আমার চেয়ে সামান্য ছোট ছিল, আমাকে সে যে কত ভালবাসত তার সীমা ছিল না। তাকে ডেকে বললুম, যতীন, কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি ভাই, আমার এ বিপদে শেষবারের মত আমাকে একটু সাহায্য করো, আমাকে একটাকার বিষ কিনে এনে দাও।

কথাটা সে প্রথমে বুঝতে পারেনি, কিন্তু যখন বুঝলে মুখখানা তার মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললুম, দেরি করলে হবে না ভাই, তোমাকে এখুনি কিনে এনে দিতে হবে। এছাড়া আমার আর অন্য পথ নেই।

শুনে যতীনের সে কি কান্না! সে ভাবত আমাকে দেবতা, ডাকত আমাকে দিদি বলে। কি আঘাত, কি ব্যথাই সে যে পেলে, তার চোখের জল আর শেষ হতেই চায় না। বললে, উষাদিদি, আত্মহত্যার মত মহাপাপ আর নেই। একটা অন্যায়ের কাঁধে আর একটা তার বড়ো অন্যায় চাপিয়ে দিয়ে তুমি পথ খুঁজে পেতে চাও? কিন্তু লজ্জা থেকে বাঁচবার এই উপায় যদি তুমি স্থির করে থাকো দিদি, আমি কখনো সাহায্য করব না। এছাড়া তুমি আর যা আদেশ করবে আমি স্বচ্ছন্দে পালন করব।

তার জন্যেই আমার মরা হ'লো না!

ক্রমশঃ কথাটা বাবার কানে গেল। তিনি যেমন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, তেমনি শান্ত নিরীহ-প্রকৃতির মানুষ। আমাকে কিছুই বললেন না, কিন্তু দুঃখে, লজ্জায় দু-তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না! তারপর গুরুদেবের পরামর্শে আমাকে নিয়ে নবদ্বীপে এলেন। কথা হ'লো মন্মথ এবং আমি দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হবো, তখন ফুলের মালা আর তুলসীর মালাবদল করে নতুন আচারে হবে আমাদের বিয়ে। তাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিনা জানিনে, কিন্তু যে শিশু গর্ভে এসেচে মা হয়ে তাকে যে হত্যা করতে হবে না সেই ভরসাতেই যেন অর্দ্ধেক বেদনা মুছে গেল। উদ্যোগ আয়োজন চলল, দীক্ষাই বলো আর ভেখই বলো, তাও আমাদের সাঙ্গ হ'লো, আমার নতুন নামকরণ হ'লো কমললতা। কিন্তু তখনো জানিনে যে বাবা দশ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তবে মন্মথকে রাজী করিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কি কারণে জানিনে বিয়ের দিনটা দিনকয়েক পেছিয়ে গেল। বোধ হয় সপ্তাহখানেক হবে। মন্মথকে বড় একটা দেখিনে, নবদ্বীপের বাসায় আমি একলাই থাকি। এমনই ক'দিন যায়, তারপরে শুভদিন আবার এসে উপস্থিত হ'লো। স্নান করে, শুচি হয়ে শান্তমনে ঠাকুরের প্রসাদী মালা হাতে প্রতীক্ষা করে রইলুম।

বাবা বিষণ্ণমুখে একবার ঘুরে গেলেন, কিন্তু নবীন বৈষ্ণবের বেশে মন্মথর যখন দেখা মিলল, হঠাৎ সমস্ত মনের ভেতরটা যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল। সে আনন্দের কি ব্যথার ঠিক জানিনে, হয়ত দুই-ই ছিল, কিন্তু ইচ্ছে হলো উঠে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আসি, কিন্তু লজ্জায় সে আর হয়ে উঠল না।

আমাদের কলকাতার পুরানো দাসী কিসব জিনিসপত্র নিয়ে এলো—সে আমাকে মানুষ করেছিল, তার কাছেই দিন পিছোবার কারণ শুনতে পেলুম।

কতকালের কথা, তবু গলা ভারী হইয়া তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল: বৈষ্ণবী মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কারণটা কি বললে সে?

বৈষ্ণবী কহিল, বললে, মন্মথ হঠাৎ দশ হাজারের বদলে বিশ হাজার টাকা দাবী

করে বসল। আমি কিছুই জানতুম না, চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম, মন্মথ কি টাকার বদলে রাজী হয়েচে নাকি? আর বাবাও বিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েচেন? দাসী বললে, উপায় কি দিদিমণি? ব্যাপারটা সহজ নয়, প্রকাশ হয়ে পড়লে যে সমাজ-জাত-কুল-মান সব যাবে।

মন্মথ আসল কথাটা শেষকালে প্রকাশ করে দিলে, বললে, দায়ী ত সে নয়, দায়ী তার ভাইপো যতীন। সুতরাং বিনা দোষে যদি তাকে জাত দিতেই হয় ত বিশ হাজারের কমে পারবে না। তা ছাড়া, পরের ছেলের পিতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া—এ কি কম কঠিন!

যতীন তার ঘরে বসে পড়ছিল, তাকে ডেকে এনে কথাটা শোনানো হ'লো। শুনে প্রথমটা সে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বললে, মিছে কথা।

পিতৃব্য মন্মথ গর্জ্জন করে উঠল—পাজি নচ্ছার নেমকহারাম। যে লোক তোকে ভাতকাপড় দিয়ে কলেজে পড়িয়ে মানুষ করচে তুই তারই করলি সর্ব্বনাশ! কি কাল-সাপকেই না আমি মনিবের ঘরে ডেকে এনেছিলাম! ভেবেছিলাম বাপ-মা-মরা ছেলে মানুষ হবে। ছি ছি! এই না বলে সে বুকে কপালে পটাপট করাঘাত করতে লাগল, বললে, এ-কথা উষা নিজের মুখে ব্যক্ত করেচে, আর তুই বলিস না!

যতীন চমকে উঠে বললে, উষাদিদি নিজে বলেচেন আমার নামে? কিন্তু তিনি ত কখ্খনো মিথ্যে বলেন না—এত বড় মিথ্যে অপবাদ তাঁর মুখ থেকে ত কিছুতেই বার হতে পারে না!

মন্মথ আর একবার গর্জ্জন করে উঠল—ফের্! তবু অস্বীকার করবি পাজী হতভাগা শয়তান! জিজ্ঞেসা কর তবে মনিবকে। তিনি কি বলেন শোন্!

কর্ত্তা সায় দিয়ে বললেন, হাঁ।

যতীন বললে, দিদি নিজে করেচেন আমার নাম?

কর্ত্তা আবার ঘাড় নেড়ে বললেন, হাঁ।

বাবাকে সে দেবতা বলে জানত, এর পরে আর প্রতিবাদ করলে না, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল। কি ভাবলে সেই জানে।

রাত্রে কেউ তার খোঁজ করলে না। সকালে কে এসে তার খবর দিলে, সবাই ছুটে গিয়ে দেখলে আমাদের ভাঙা আস্তাবলের এককোণে যতীন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলচে।

বৈষ্ণবী কহিল, শাস্ত্রে ভাইপোর আত্মহত্যায় খুড়োর অশৌচ বিধি আছে কি না জানিনে গোঁসাই, হয়ত নেই, হয়ত ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়—সে যাই হোক, শুভদিন দিনকয়েক মাত্র পেছিয়ে গেল—তারপরে গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ-শুচি হয়ে মন্মথগোঁসাই মালা-তিলক ধারণ করে অধিনীর পাপ-বিমোচনের শুভ-সঙ্কল্প নিয়ে নবদ্বীপে এসে অবতীর্ণ হলেন।

একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বৈষ্ণবী পুনরায় কহিল, সেদিন ঠাকুরের প্রসাদী মালা ঠাকুরের পাদপদ্মে ফিরিয়ে দিয়ে এলুম। মন্মথর অশৌচ গেল কিন্তু পাপিষ্ঠা উষার অশৌচ ইহজীবনে আর ঘুচল না নতুনগোঁসাই।

কহিলাম, তারপরে?

বৈষ্ণবী মুখ ফিরাইয়াছিল, জবাব দিল না। বুঝিলাম, এবার তাহার সামলাইতে সময় লাগিবে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নীরবে বসিয়া রহিলাম।

ইহার শেষ অংশটুকু শুনিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রশ্ন করা উচিত কিনা ভাবিতেছিলাম, বৈষ্ণবী আর্দ্র মৃদুকণ্ঠে নিজেই বলিল, ছাখো গোঁসাই, পাপ জিনিসটা সংসারে এমন ভয়ঙ্কর কেন জানো?

বলিলাম, নিজের বিশ্বাসমত জানি একরকম, কিন্তু তোমার ধারণার সঙ্গে সে হয়ত না মিলতে পারে।

সে প্রত্যুত্তরে কহিল, জানিনে তোমার বিশ্বাস কি, কিন্তু সেদিন থেকে আমি একে আমার মত করে বুঝে রেখেচি গোঁসাই। স্পর্দ্ধাভরে তুমি কত লোককে বলতে শুনবে, কিছুই হয় না। তারা কত লোকের নজির দিয়ে তাদের কথা প্রমাণ করতে চাইবে। কিন্তু তার ত কোন দরকার নেই। তার প্রমাণ মন্মথ, প্রমাণ আমি নিজে। আজও কিছু আমাদের হয়নি। হলে একে এত ভয়ঙ্কর আমি বলতুম না। কিন্তু তা ত নয়, এর দণ্ড ভোগ করে নিরপরাধ নির্দ্দোষী লোকেরা। যতীনের বড় ভয় ছিল আত্মহত্যায়, কিন্তু সে তাই দিয়ে তার দিদির অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল। বল ত গোঁসাই, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সংসারে আর কি আছে? কিন্তু এমনই হয়, এমনি করেই ঠাকুর বোধ হয় তাঁর সৃষ্টি রক্ষা করেন।

এ লইয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই। তাহার যুক্তি এবং ভাষা কোনটাই প্রাঞ্জল নয়, তথাপি ইহাই মনে করিলাম তাহার দুষ্কৃতির শোকাচ্ছন্ন স্মৃতি হয়ত এই পথেই আপন পাপ-পুণ্যের উপলব্ধি অর্জ্জন করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতা, এর পরে কি হ'লো?

শুনিয়া সহসা সে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, সত্যি বল গোঁসাই, এর পরেও আমার কথা তোমার শুনতে ইচ্ছে করে?

সত্যি বলচি করে।

বৈষ্ণবী বলিল, আমার ভাগ্য যে এজন্মে আবার তোমার দেখা পেলুম। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, দিনচারেক পরে একটা মরা ছেলে ভূমিষ্ঠ হ'লো, তাকে গঙ্গার তীরে বিসর্জ্জন দিয়ে গঙ্গায় স্নান করে বাসায় ফিরে এলুম। বাবা কেঁদে বললেন, আমি ত আর থাকতে পারিনে মা। বললুম, না বাবা, তুমি আর থেকো না, তুমি বাড়ি যাও। অনেক দুঃখ দিলুম, আর

তুমি আমার জন্যে ভেবো না।

বাবা বললেন, মাঝে মাঝে খবর দিবি ত মা।

বললুম, না বাবা, আমার খবর নেবার আর তুমি চেষ্টা ক'রো না।

কিন্তু তোমার মা যে এখনো বেঁচে রয়েচে উষা?

বললুম, আমি মরব না বাবা, কিন্তু আমার সতীলক্ষ্মী মা, তাঁকে ব'লো উষা মরেচে। মা দুঃখ পাবেন, কিন্তু মেয়ে তাঁর বেঁচে আছে শুনলে তার চেয়েও বেশী দুঃখ পাবেন।

চোখের জল মুছে বাবা কলকাতায় চলে গেলেন।

আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কমললতা বলিতে লাগিল, হাতে টাকা ছিল, বাড়িভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গী জুটে গেলে—তারা যাচ্ছিল শ্রীবৃন্দাবনধামে—আমিও সঙ্গ নিলুম।

বৈষ্ণবী একটু থামিয়া বলিল, তারপরে কত তীর্থে, কত পথে, কত গাছতলায় কতদিন কেটে গেল।

বলিলাম, তা জানি, কিন্তু কত শত বাবাজীর কত শতসহস্র চোখের দৃষ্টির বিবরণ ত বললে না কমললতা?

বৈষ্ণবী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, বাবাজীদের দৃষ্টি অতিশয় নির্ম্মল, তাঁদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার কথা বলতে নেই গোঁসাই।

বলিলাম, না না, অশ্রদ্ধা নয়, অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাঁদের কাহিনী শুনতে চাইচি কমললতা।

এবার সে হাসিল না বটে, কিন্তু চাপা হাসি গোপন করিতেও পারিল না, কহিল, যে বাবাজী ভালোবাসে তাকে সব কথা খুলে বলতে নেই, আমাদের বোষ্টমের শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

বলিলাম, তবে থাক। সব কথায় কাজ নেই, কিন্তু একটা বল, গোঁসাইজী দ্বারিকাদাসকে জোগাড় করলে কোথায়?

কমললতা সঙ্কোচে জিভ কাটিয়া কপালে হাত ঠেকাইল, বলিল, ঠাট্টা করতে নেই, উনি যে আমার গুরুদেব গোঁসাই।

গুরুদেব! তুমি ওঁর কাছেই দীক্ষা নিয়েচ?

না, দীক্ষা নিইনি বটে, কিন্তু উনি তাঁর মতই পূজনীয়।

কিন্তু এই যে এতগুলি বৈষ্ণবী—সেবাদাসী না কি যে বলো—

কমললতা পুনশ্চ জিভ কাটিয়া বলিল ওরা আমার মতই ওঁর শিষ্যা। ওদেরও তিনি উদ্ধার করেচেন।

কহিলাম, নিশ্চয়ই করেচেন, কিন্তু পরকীয়া সাধনা, না কি এমনি একটা সাধন-

পদ্ধতি তোমাদের আছে—তাতে ত দোষ নেই—

বৈষ্ণবী আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, তোমরা দূর থেকে আমাদের কেবল ঠাট্টা তামাসাই করলে, কাছে এসে কখনো ত কিছু দেখলে না, তাই সহজেই বিদ্রূপ করতে পার। আমাদের বড়গোঁসাইজী সন্ন্যাসী, ওঁকে উপহাস করলে অপরাধ হয় নতুনগোঁসাই, অমন কথা আর কখনো মুখে এনো না।

তাহার কথা ও গাম্ভীর্য্যে একটু অপ্রতিভ হইলাম। বৈষ্ণবী তাহা লক্ষ্য করিয়া স্মিতমুখে বলিল, দু'দিন থাকো না গোঁসাই আমাদের কাছে? কেবল বড়গোঁসাইজীর জন্যেই বলচিনে, আমাকে ত তুমি ভালোবাসো, আর কখনো যদি দেখা না-ও হয়, তবুও দেখে যাবে কমললতা সত্যিই কি নিয়ে সংসারে থাকে। যতীনকে আমি আজো ভুলিনি—দু'দিন থাকো—আমি বলচি তোমাকে, তুমি যথার্থই খুশী হবে।

চুপ করিয়া রহিলাম। ইহাদের সম্বন্ধে একেবারেই যে কিছু জানি না তাহা নয়, জাত-বোষ্টমের মেয়ে টগরের কথাটাও মনে পড়িল, কিন্তু রহস্য করিতে আর প্রবৃত্তি হইল না। যতীনের প্রায়শ্চিত্তের ঘটনা সকল আলোচনার মাঝখানে রহিয়া রহিয়া আমাকেও যেন উন্মনা করিয়া দিতেছিল।

বৈষ্ণবী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, হাঁ গোঁসাই, এ বয়সে সত্যিই কাউকে কখনো কি ভালোবাসোনি?

তোমার কি মনে হয় কমললতা?

আমার মনে হয়—না। তোমার মনটা হ'ল আসল বৈরাগীর মন, উদাসীনের মন—প্রজাপতির মন। বাঁধন তুমি কখনো কোন কালে নেবে না।

হাসিয়া বলিলাম, প্রজাপতির উপমা ত ভাল হ'ল না কমললতা, ওটা যে অনেকটা গালাগালির মত শুনতে। আমার ভালোবাসার মানুষ কোথাও যদি সত্যই কেউ থাকে, তার কানে গেলে যে অনর্থ বাধবে।

বৈষ্ণবীও হাসিল, কহিল, ভয় নেই গোঁসাই, সত্যিই যদি কেউ থাকে আমার কথায় সে বিশ্বাসও করবে না, তোমার মধুমাখানো ফাঁকিও সে সারাজীবনে ধরতে পারবে না।

বলিলাম, তবে তার দুঃখ কিসের? হোক না ফাঁকি, কিন্তু তার কাছে ত সেই সত্যি হয়ে রইল।

বৈষ্ণবী মাথা নাড়িয়া কহিল, সে হয় না গোঁসাই, মিথ্যে কখনো সত্যির জায়গা নিয়ে থাকতে পারে না। তারা বুঝতে না পারুক, কারণটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট না হোক, তবু অন্তরটা তাদের নিরন্তর অশ্রুমুখী হয়েই থাকে। মিথ্যের কাণ্ড দেখেছি ত। এমনি করে এ পথে কত লোকই এলো, এ পথ যাদের সত্যি নয়, জলের ধারাপথে শুকনো বালির মত সমস্ত সাধনাই তাদের চিরদিন আলগা হয়ে রইল, কখনো জমাট

বাঁধতে পারলে না।

একটু থামিয়া সে যেন হঠাৎ নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, তারা রসের খবর ত পায় না, তাই প্রাণহীন নির্জ্জীব পুতুলের নিরর্থক সেবায় প্রাণ তাদের দু'দিনে হাঁপিয়ে ওঠে, ভাবে এ কোন মোহের ঘোরে নিজেকে দিনরাত ঠকিয়ে মরি! এদের দেখেই আমাদের তোমরা উপহাস করতে শেখো—কিন্তু এ কি আমি বাজে বকে মরচি গোঁসাই, এসব অসংলগ্ন প্রলাপের তুমি ত একটা কথাও বুঝবে না। কিন্তু এমন যদি কেউ তোমার থাকে, তুমি তাকে ভুলবে, কিন্তু সে তোমাকে না পারবে ভুলতে, না শুকোবে কখনো তার চোখের জলের ধারা।

স্বীকার করিলাম যে, তাহার বক্তব্যের প্রথম অংশটা বুঝি নাই, কিন্তু শেষের দিকটার প্রতিবাদে কহিলাম, তুমি কি আমাকে এই কথাই বলতে চাও কমললতা যে, আমাকে ভালোবাসার নামই হ'লো দুঃখ পাওয়া?

দুঃখ ত বলিনি গোঁসাই, বলচি চোখের জলের কথা।

কিন্তু ও দুই-ই এক কমললতা, শুধু কথার ঘোরফের।

বৈষ্ণবী কহিল, না গোঁসাই, ও দুটো এক নয়। না কথার ঘোরফের, না ভাবের। মেয়েরা ওর এটাও ভয় করে না, ওটাও এড়াতে চায় না। কিন্তু তুমি বুঝবে কি করে?

কিছুই যদি না বুঝি আমাকে বলাই বা কেন?

না বলেও যে থাকতে পারিনে গো। প্রেমের বাস্তবতা নিয়ে তোমরা পুরুষের দল যখন বড়াই করতে থাকো তখন ভাবি আমাদের জাত যে আলাদা! তোমাদের ও আমাদের ভালোবাসার প্রকৃতিই যে বিভিন্ন। তোমরা চাও বিস্তার, আমরা চাই গভীরতা, তোমারা চাও উল্লাস, আমরা চাই শান্তি। জানো গোঁসাই, ভালোবাসার নেশাকে আমরা অন্তরে ভয় করি, ওর মত্ততায় আমাদের বুকের কাঁপন থামে না।

কি-একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু সে গ্রাহ্যই করিল না, ভাবের আবেগে বলিতে লাগিল, ও আমাদের সত্যিও নয়, আমাদের আপনও নয়। ওর ছুটোছুটির চঞ্চলতা যেদিন থামে সেইদিনেই কেবল আমরা নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। ওগো নতুনগোঁসাই, নির্ভর হতে পারার চেয়ে ভালোবাসার বড় পাওয়া মেয়েদের আর নেই, কিন্তু ঐ জিনিসটাই যে তোমার কাছে কেউ কখনো পাবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, পাবে না নিশ্চয় জানো?

বৈষ্ণবী বলিল, নিশ্চয় জানি। তাই তোমার বড়াই আমার সয় না।

আশ্চর্য্য হইলাম। বলিলাম, বড়াই ত তোমার কাছে কখনো করিনি কমললতা?

সে কহিল, জেনে করোনি, কিন্তু তোমার ঐ উদাসীন বৈরাগী মন—ওর চেয়ে বড় অহঙ্কারী জগতে আর কিছু আছে নাকি!

কিন্তু এই দুটো দিনের মধ্যে আমাকে এত তুমি জানলে কি করে ?

জানলুম তোমাকে ভালবেসেচি বলে।

শুনিয়া মনে মনে বলিলাম, তোমার দুঃখ আর চোখের জলের প্রভেদটা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি কমললতা। অবিশ্রাম ভাবের পূজো আর রসের আরাধনার বোধ করি এমনি পরিণামই ঘটে।

প্রশ্ন করিলাম, ভালোবেসেচ একি সত্যি কমললতা ?

হাঁ সত্যি।

কিন্তু তোমার জপ-তপ, তোমার কীর্ত্তন, তোমার রাত্রিদিনের ঠাকুরসেবা এসবের কি হবে বল ত ?

বৈষ্ণবী কহিল, এরা আমার আরও সত্যি, আরও সার্থক হবে উঠবে ? চল না গোঁসাই, সব ফেলে দু'জনে পথে বেরিয়ে পড়ি ?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, সে হয় না কমললতা, কাল আমি চলে যাচ্চি। কিন্তু যাবার আগে গহরের কথাটা একটু জেনে যেতে ইচ্ছে করে।

বৈষ্ণবী নিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিল, গহরের কথা ? না, সে শুনে তোমার কাজ নেই। কিন্তু সত্যই কি কাল যাবে ?

হাঁ, সত্যিই কাল যাব।

বৈষ্ণবী মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, কিন্তু এ আশ্রমে আবার তুমি আসবে, তখন কিন্তু কমললতাকে খুঁজে পাবে না গোঁসাই।

৮

এখানে আর একদণ্ড থাকা উচিত নয় এবিষয়ে সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তখনি কে যেন আড়ালে দাঁড়াইয়া চোখ টিপিয়া ইশারায় নিষেধ করে, বলে, যাবে কেন ? ছ'-সাতদিন থাকবে বলেই ত এসেছিলে—থাক না। কষ্ট ত কিছুই নেই।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছিলাম, কে ইহারা একই দেহের মধ্যে বাস করিয়া একই সময়ে ঠিক উল্টা মতলব দেয় ? কাহার কথা বেশী সত্য ? কে বেশী আপনার ? বিবেক, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি—এমন কত নাম, কত দার্শনিক ব্যাখ্যাই না ইহার আছে, কিন্তু নিঃসংশয় সত্যকে আজও কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল ? যাহাকে ভাল বলিয়া মনে করি, ইচ্ছা আসিয়া সেখানে পা বাড়াইতে বাধা দেয় কেন ? নিজের মধ্যে এই বিরোধ, এই দ্বন্দ্বের শেষ হয় না কেন ? মন বলিতেছে আমার চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ, চলিয়া যাওয়াই কল্যাণের, তবে পরক্ষণে সেই মনের দু'চোখ ভরিয়া

জল দেখা দেয় কিসের জন্য? বুদ্ধি, বিবেক, প্রবৃত্তি, মন—এইসব কথার সৃষ্টি করিয়া কোথায় সত্যকার সান্ত্বনা?

তথাপি যাইতেই হইবে, পিছাইলে চলিবে না। এবং কালই। এই যাওয়াটা যে কি করিয়া সম্পন্ন করিব তাহাই ভাবিতেছিলাম। ছেলেবেলার একটা পথ জানি, সে অন্তর্হিত হওয়া। বিদায়বাণী নয়, ফিরিয়া আসিবার স্তোকবাক্য নয়, কারণ প্রদর্শন নয়, প্রয়োজনের, কর্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ নয়—শুধু আমি যে ছিলাম এবং আমি যে নাই, এই সত্য ঘটনাটা আবিষ্কারের ভার যাহাদের রহিল তাহাদের 'পরে নিঃশব্দে অর্পণ করা।

স্থির করিলাম, ঘুমানো হইবে না ঠাকুরের মঙ্গল আরতি শুরু হইবার পূর্বেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া প্রস্থান করিব। একটা মুস্কিল, পুঁটুর পণের টাকাটা ছোট ব্যাগসমেত কমললতার কাছে আছে. কিন্তু সে থাক। হয় কলিকাতা, নয় বর্মা হইতে চিঠি লিখিব, তাহাতে আরও একটা কাজ এই হইবে যে, আমাকে প্রত্যার্পণ না করা পর্য্যন্ত কমললতাকে বাধ্য হইয়া এখানেই থাকিতে হইবে, পথে-বিপথে বাহির হইবার সুযোগ পাইবে না। এদিকে যে কয়টা টাকা আমার জামার পকেটে পড়িয়া আছে কলিকাতায় পৌঁছিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এমনি করিয়াই কাটিল এবং ঘুমাইব না বলিয়া বার বার সঙ্কল্প করিলাম বলিয়াই বোধ করি কোন একসময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, কিন্তু হঠাৎ মনে হইল বুঝি স্বপ্নে গান শুনিতেছি। একবার ভাবিলাম রাত্রির ব্যাপার হয়ত এখনো সমাপ্ত হয় নাই; আবার মনে হইল প্রত্যূষের মঙ্গল আরতি বুঝি শুরু হইয়াছে, কিন্তু কাঁসর-ঘণ্টার সুপরিচিত দুঃসহ নিনাদ নাই। অসম্পূর্ণ অপরিতৃপ্ত নিদ্রা ভাঙিয়াও ভাঙে না, চোখ মেলিয়া চাহিতেও পারি না, কিন্তু কানে গেল ভোরের সুরে মধুর-কণ্ঠের আদরের অনুচ্চ আহ্বান—'রাই জাগো, রাই জাগো, শুক-শারী বলে, কত নিদ্রা যাও লো কালো-মানিকের কোলে।' গোঁসাইজী! আর কত ঘুমোবে গো—ওঠো!

বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মশারি তোলা, পূবের জানালা খোলা—সম্মুখে আম্রশাখায় পুষ্পিত লবঙ্গ-মঞ্জরীর কয়েকটা সুদীর্ঘ স্তবক নীচে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া আছে, তাহার ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল আকাশের কতকটা জায়গায় ফিকে-রাঙার আভাস দিয়াছে—অন্ধকার রাতে সুদূর গ্রামান্তে আগুন লাগার মত মনের কোথায় যেন একটুখানি ব্যথিত হইয়া উঠে। গোটাকয়েক বাদুড় বোধ করি উড়িয়া বাসায় ফিরিতেছিল, তাহাদের পক্ষ-তাড়নার অস্ফুট শব্দ পরে পরে কানে আসিয়া পৌঁছিল;

বুঝা গেল আর যাই হোক রাত্রিটা শেষ হইতেছে। এটা দোয়েল, বুলবুল ও শ্যামা-পাখীর দেশ। হয়ত বা উহাদের রাজধানী—কলিকাতা সহর। আর ঐ বিরাট বকুলগাছটা তাহাদের লেনদেন কাজকারবারের বড়বাজার—দিনের বেলায় ভিড় দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। নানা চেহারা, নানা ভাষা, নানা রঙ-বেরঙের পোশাক-পরিচ্ছদের অতি বিচিত্র সমাবেশ। আর রাত্রে আখড়ার চতুর্দ্দিকে বনজঙ্গলে ডালে ডালে তাহাদের অগুনতি আড্ডা! ঘুম-ভাঙার সাড়াশব্দ কিছু কিছু পাওয়া গেল—ভাবে বোধ হইল চোখেমুখে জল দিয়া তৈরী হইয়া লইতেছে, এইবার সমস্ত দিনব্যাপী নাচগানের মোচ্ছব শুরু হইবে! সবাই এরা লক্ষ্ণৌয়ের ওস্তাদ—ক্লান্তও হয় না, কসরৎ থামায় না। ভিতরে বৈষ্ণবদলের কীর্ত্তনের পালা যদিবা কদাচিৎ বন্ধ হয় বাহিরে সে বালাই নাই। এখানে ছোট-বড়, ভালো-মন্দ বাছবিচার চলে না, ইচ্ছা এবং সময় থাক না-থাক গান তোমাকে শুনিতেই হইবে। এদেশের বোধ করি এইরূপই ব্যবস্থা। মনে পড়িল কাল সমস্ত দুপুর পিছনের বাঁশবনে গোটা-দুই হর-গৌরী পাখীর চড়াগলার পিয়া-পিয়া-পিয়া ডাকের অবিশ্রান্ত প্রতিযোগিতায় আমার দিবানিদ্রার যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ আমারি ন্যায় বিক্ষুব্ধ কোন একটা ডাহুক নদীর কলমীদলের উপরে বসিয়া ততোধিক কঠিনকণ্ঠে ইহাদের বার বার তিরস্কার করিয়াও স্তব্ধ করিতে পারে নাই। ভাগ্য ভাল যে এদেশে ময়ূর মিলে না, নহিলে উৎসবে গানের আসরে তাহারা আসিয়া যোগ দিলে আর মানুষ টিকিতে পারিত না। সে যাই হোক, দিনের উৎপাত এখনো আরম্ভ হয় নাই, হয়তো আর একটু নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইতে পারিতাম, কিন্তু স্মরণ হইল গতরাত্রির সঙ্কল্পের কথা। কিন্তু গা-ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়িবারও জো নাই—প্রহরীর সতর্কতায় মতলব ফাঁসিয়া গেল। রাগ করিয়া বলিলাম, আমি রাইও নই, আমার বিছানায় শ্যামও নেই—দুপুর রাতে ঘুম ভাঙানোর কি দরকার ছিল বল ত?

বৈষ্ণবী কহিল, রাত কোথায় গোঁসাই, তোমার যে আজ ভোরের গাড়িতে কলকাতা যাবার কথা। মুখহাত ধুয়ে এসো, আমি চা তৈরী করে আনিগে। কিন্তু স্নান ক'রো না যেন। অভ্যাস নেই, অসুখ করতে পারে।

বলিলাম, তা পারে। সকালের গাড়িতে যখন হোক আমি যাবো, কিন্তু তোমার এত উৎসাহ কেন বলো ত?

সে কহিল, আর কেউ ওঠার আগে আমি তোমাকে বড় রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে চাই গোঁসাই।

স্পষ্ট করিয়া তাহার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু ছড়ানো চুলের পানে চাহিয়া ঘরের এই অত্যল্প আলোকেও বুঝা গেল সেগুলি ভিজা—স্নান সারিয়া বৈষ্ণবী প্রস্তুত হইয়া লইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে পৌঁছে দিয়ে আশ্রমেই আবার ফিরে আসবে ত ?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ।

সেই ছোট টাকার থলিটি সে বিছানায় রাখিয়া দিয়া কহিল, এই তোমার ব্যাগ। এটা পথে সাবধানে রেখো, টাকাগুলো একবার দেখে নাও।

হঠাৎ মুখে কথা যোগাইল না, তারপরে বলিলাম, কমললতা, তোমার মিছে এ পথে আসা। একদিন নাম ছিল তোমার ঊষা, আজো সেই ঊষাই আছ—একটুও বদলাতে পারনি।

কেন বল ত ?

তুমি বল ত কেন বললে আমাকে টাকা গুনে নিতে ? গুনে নিতে পারি বলে কি সত্যই মনে করো ? যারা ভাবে একরকম, বলে অন্য রকম, তাদের বলে ভণ্ড। যাবার আগে বড়গোঁসাইজীকে আমি নালিশ জানিয়ে যাব আখড়ার খাতা থেকে তোমার নামটা যেন তিনি কেটে দেন। তুমি বোষ্টমদলের কলঙ্ক।

সে চুপ করিয়া রহিল।

আমি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলাম, আজ আমার যাবার ইচ্ছে নেই।

নেই ? তা হলে আর একটু ঘুমোও। উঠলে আমাকে খবর দিও—কেমন ?

কিন্তু এখন তুমি করবে কি ?

আমার কাজ আছে। ফুল তুলতে যাব।

এই অন্ধকারে ? ভয় করবে না ?

না, ভয় কিসের ? ভোরের পূজোর ফুল আমি তুলে আনি। নইলে ওদের বড় কষ্ট হয়।

ওদের মানে অন্যান্য বৈষ্ণবীদের। এই দুটো দিন এখানে থাকিয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম যে, সকলের আড়ালে থাকিয়া মঠের সমস্ত গুরুভারই কমললতা একাকী বহন করে। তাহার কর্ত্তৃত্ব সকল ব্যবস্থায়, সকলের 'পরেই। কিন্তু স্নেহে, সৌজন্যে ও সর্ব্বোপরি সবিনয় কর্ম্মকুশলতায় এই কর্ত্তৃত্ব এমন সহজ শৃঙ্খলায় প্রবহমান যে, কোথাও ঈর্ষা, বিদ্বেষের এতটুকু আবর্জ্জনাও জমিতে পায় না। এই আশ্রম-লক্ষ্মীটি আজ উৎকণ্ঠ-ব্যাকুলতায় যাই যাই করিতেছে। এ যে কত বড় দুর্ঘটনা, কত বড় নিরুপায় দুর্গতিতে এতগুলি নিশ্চিন্ত নরনারী স্খলিত হইয়াপড়িবে তাহা নিঃসন্দেহ উপলব্ধি করিয়া আমারও ক্লেশ বোধ হইল। এই মঠে মাত্র দুটি দিন আছি, কিন্তু কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছি—ইহার আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষা না করিয়াই যেন পারি না এমনি মনোভাব। ভাবিলাম লোকে মিছাই বলে সকলে মিলিয়া আশ্রম—এখানে সবাই সমান। কিন্তু একের অভাবে যে কেন্দ্রভ্রষ্ট উপগ্রহের মত সমস্ত আয়তনই দিগ্বিদিকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে তাহা

চোখের উপরেই যেন দেখিতে লাগিলাম। বলিলাম, আর শোব না কমললতা, চলো তোমার সঙ্গে ফুল তুলে আনি গে।

বৈষ্ণবী কহিল, তুমি স্নান করোনি, কাপড় ছাড়োনি, তোমার ছোঁয়া ফুলে পূজো হবে কেন?

বলিলাম, ফুল তুলতে না দাও, ডাল নুইয়ে ধরতে দেবে ত? তাতেও তোমার সাহায্য হবে।

বৈষ্ণবী বলিল, ডাল নোয়াবার দরকার হয় না, ছোট ছোট গাছ, আমি নিজেই পারি।

বলিলাম, অন্ততঃ সঙ্গে থেকে দুটো সুখ-দুঃখের গল্প করতেও পারব ত? তাতেও তোমার শ্রম লঘু হবে।

এবার বৈষ্ণবী হাসিল, কহিল, হঠাৎ বড় দরদ গোঁসাই—আচ্ছা চলো। আমি সাজিটা আনি গে, ততক্ষণ হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নাও।

আশ্রমের বাহিরে অল্প একটু দূরে ফুলের বাগান। ঘনছায়াচ্ছন্ন আমবনের ভিতর দিয়া পথ। শুধু অন্ধকারের জন্য নয়, রাশিকৃত শুকনা পাতায় পথের রেখা বিলুপ্ত। বৈষ্ণবী আগে, আমি পিছনে, তবু ভয় করিতে লাগিল পাছে সাপের ঘাড়ে পা দিই! বলিলাম, কমললতা, পথ ভুলবে না ত?

বৈষ্ণবী বলিল, না। অন্ততঃ তোমার জন্যেও আজ পথ চিনে আমাকে চলতে হবে!

কমললতা, একটা অনুরোধ রাখবে?

কি অনুরোধ?

এখান থেকে তুমি আর কোথাও চলে যেয়ো না।

গেলে তোমার লোকসান কি?

জবাব দিতে পারিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী বলিল, মুরারিঠাকুরের একটি গান আছে—"সখি হে ফিরিয়া আপনার ঘরে যাও, জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে তারে তুমি কি আর বুঝাও।" গোঁসাই, বিকালে তুমি কলকাতায় চলে যাবে, আজ একটা বেলার বেশী বোধ করি এখানে আর থাকতে পারবে না—না?

বলিলাম, কি জানি, আগে সকালবেলাটা কাটুক।

বৈষ্ণবী জবাব দিল না, একটু পরে গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিল—

"কহে চণ্ডিদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুখ দুটি ভাই—
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তারই ঠাঁই।"

থামিলে বলিলাম, তারপরে?

তারপরে আর জানিনে।

বলিলাম তবে আর একটা কিছু গাও—

বৈষ্ণবী তেমনি মৃদুকণ্ঠে গাহিল—

> "চণ্ডিদাস বাণী শুন বিনোদিনী পীরিতি না কহে কথা,
> পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলায় তথা।"

এবারেও থামিলে বলিলাম, তারপরে?

বৈষ্ণবী কহিল, তারপরে আর নেই, এইখানেই শেষ।

শেষই বটে! দু'জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। ভারী ইচ্ছা করতে লাগিল দ্রুতপদে পাশে গিয়া কিছু একটা বলিয়া এই অন্ধকার পথটা তাহার হাত ধরিয়া চলি। জানি সে রাগ করিবে না, বাধা দিবে না, কিন্তু কিছুতেই পাও চলিল না, মুখেও একটা কথা আসিল না, যেমন চলিতেছিলাম তেমনি ধীরে ধীরে নীরবে বনের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

পথের ধারে বেড়া দিয়ে ঘেরা আশ্রমের ফুলের বাগান, ঠাকুরের নিত্যপূজার যোগান দেয়। খোলা জায়গায় অন্ধকার আর নাই, কিন্তু ফর্সাও তেমন হয় নাই। তথাপি দেখা গেল অজস্র ফুটন্ত মল্লিকায় সমস্ত বাগানটা যেন সাদা হইয়া আছে। সামনের পাতাঝরা ন্যাড়া চাঁপা গাছটায় ফুল নাই, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বোধ করি অসময়ে প্রস্ফুটিত গোটাকয়েক রজনীগন্ধার মধুর গন্ধে সে ত্রুটি পূর্ণ হইয়াছে। আর সবচেয়ে মানাইয়াছে মাঝখানটায়। নিশান্তের এই ঝাপসা আলোতেও চেনা যায় শাখায় পাতায় জড়াজড়ি করিয়া গোটা পাঁচ-ছয় স্থলপদ্মের গাছ—ফুলের সংখ্যা নাই—বিকশিত সহস্র আরক্ত আঁখি মেলিয়া বাগানের সকল দিকে তাহারা চাহিয়া আছে।

কখনো এত প্রত্যূষে শয্যা ছাড়িয়া উঠি না, এমন সময়টা চিরদিন নিদ্রাচ্ছন্ন জড়তায় অচেতনে কাটিয়া যায়—আজ কি যে ভালো লাগিল তাহা বলিতে পারি না। পূর্বে রক্তিম দিগন্তে জ্যোতির্ময়ের আভাস পাইতেছি, নিঃশব্দ মহিমায় সকল আকাশ শান্ত হইয়া আছে, আর ঐ লতায়-পাতায় শোভায়-সৌরভে ফুলে-ফুলে পরিব্যাপ্ত সম্মুখের উপবন—সমস্ত মিলিয়া এ যেন নিঃশেষিত রাত্রির বাক্যহীন বিদায়ের অশ্রুরুদ্ধ ভাষা।

করুণায়, মমতায় ও অযাচিত দাক্ষিণ্যে সমস্ত অন্তরটা আমার চক্ষুর নিমিষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—সহসা বলিয়া ফেলিলাম, কমললতা, জীবনে তুমি অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা পেয়েচ, প্রার্থনা করি এবার যেন সুখী হও।

বৈষ্ণবী সাজিটা চাঁপা-ডালে ঝুলাইয়া আগলের বাঁধন খুলিতেছিল, আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া চাহিল, হঠাৎ তোমার হ'লো কি গোঁসাই ?

নিজের কথাটা নিজের কানেও কেমন খাপছাড়া ঠেকিয়াছিল, তাহার সবিস্ময়-প্রশ্নে মনে মনে ভারী অপ্রতিভ হইয়া গেলাম। মুখে উত্তর যোগাইল না, লজ্জিতের আবরণ একটা অর্থহীন হাসির চেষ্টাও ঠিক সফল হ'ল না, শেষে চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী ভিতরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে আমিও গেলাম। ফুল তুলিতে আরম্ভ করিয়া সে নিজেই কহিল, আমি সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদপদ্মে আপনাকে নিবেদন করে দিয়েচি কখনো দাসীকে তিনি পরিত্যাগ করবেন না।

সন্দেহ হইল কথার অর্থটা বেশ পরিষ্কার নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট করিতে বলারও ভরসা হইল না। সে মৃদু-গুঞ্জনে গাহিতে লাগিল—"কালা মানিকের মালা গাঁথি নিব গলে, কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে। কানু অনুরাগে রাঙা বসন পরিয়া, দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া। যদুনাথ দাস কহে—"

থামাইতে হইল। বলিলাম, যদুনাথ দাস থাক, ওদিকে কাঁসরের বাদ্যি শুনতে পাচ্ছো কি ? ফিরবে না ?

সে আমার দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে পুনরায় আরম্ভ করিল "ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই, মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই -" আচ্ছা নতুনগোঁসাই, জানো মেয়েদের মুখের গান অনেক ভালো লোকে শুনতে চায় না, তাদের ভারী খারাপ লাগে ?

বলিলাম, জানি। কিন্তু আমি অতটা ভালো বর্ব্বর নই।

তবে বাধা দিয়ে আমাকে থামালে কেন ?

ওদিক হয়ত আরতি শুরু হয়েচে—তুমি না থাকলে তো তার অঙ্গহানি হবে।

এটি মিথ্যে ছলনা গোঁসাই।

ছলনা হবে কেন ?

কেন তা তুমিই জানো। কিন্তু এ-কথা তোমাকে বললে কে ? আমার অভাবে ঠাকুরের সেবায় সত্যিই অঙ্গহানি হতে পারে এ কি তুমি বিশ্বাস করো ?

করি। আমাকে কেউ বলেনি কমললতা—আমি নিজের চোখে দেখেচি।

সে আর কিছু বলিল না, কি একরকম অন্যমনস্কের মত ক্ষণকাল আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপরে ফুল তুলিতে লাগিল। ডালা ভরিয়া উঠিলে কহিল, হয়েচে—আর না।

স্থলপদ্ম তুললে না ?

না, ও আমরা তুলিনে, ঐখান থেকে ঠাকুরকে নিবেদন করে দিই। চল এবার যাই।

আলো ফুটিয়াছে, কিন্তু গ্রামের একান্তে এই মঠ—এদিকে বড় কেহ আসে না।

তখনো পথ ছিল জনহীন, এখনো তেমনি। চলিতে চলিতে একসময়ে আবার সেই প্রশ্নই করিলাম, তুমি কি এখান থেকে সত্যি চলে যাবে?

বার বার এ কথা জেনে তোমার কি হবে গোঁসাই?

এবারেও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম, সত্যিই কেন বার বার এ কথা জানতে চাই—জানিয়া আমার লাভ কি!

মঠে ফিরিয়া দেখা গেল ইতিমধ্যে সবাই জাগিয়া উঠিয়া প্রাত্যহিক কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। তখন কাঁসরের শব্দে ব্যস্ত হইয়া বৈষ্ণবীকে বৃথা তাড়া দিয়াছিলাম। অবগত হইলাম তাহা মঙ্গল-আরতির নয়, সে শুধু ঠাকুরদের ঘুম-ভাঙ্গানোর বাদ্য। এ তাঁদেরই সয়।

দু'জনকে অনেকেই চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাহারও চাহনিতে কৌতূহল নাই। শুধু পদ্মার বয়স অত্যন্ত কম বলিয়া সেই কেবল একটুখানি হাসিয়া মুখ নীচু করিল। ঠাকুরদের সে মালা গাঁথে। ডালাটা তাহারি কাছে রাখিয়া দিয়া কমললতা সস্নেহ কৌতুকে ভর্জ্জন করিয়া বলিল, হাসলি যে পোড়ামুখি?

সে কিন্তু আর মুখ তুলিল না। কমললতা ঠাকুর-ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল, আমিও আমার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম।

স্নানাহার যথারীতি এবং যথাসময়ে সম্পন্ন হইল। বিকালের গাড়িতে আমার যাবার কথা। বৈষ্ণবীর সন্ধান করিতে গিয়া দেখি সে ঠাকুর-ঘরে, ঠাকুর সাজাইতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র কহিল, নতুনগোঁসাই, যদি এলে আমাকে একটু সাহায্য করো না ভাই। পদ্মা মাথা-ধরে শুয়ে আছে, লক্ষ্মী-সরস্বতী দু'বোনেই হঠাৎ জ্বরে পড়েচে—কি যে হবে জানিনে। এই বাসন্তী-রঙের কাপড় দু'খানি কুঁচিয়ে দাও না গোঁসাই।

অতএব, ঠাকুরের কাপড় কুঁচাইতে বসিয়া গেলাম, যাওয়া ঘটিল না। পরের দিনও না এবং তার পরের দিনও না। বৈষ্ণবীর প্রত্যূষের ফুল তুলিবার সঙ্গী আমি। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে একটা-না-একটা কিছু কাজ আমাকে দিয়া সে করাইয়া লয়। এমনি করিয়া দিনগুলো যেন স্বপ্নে কাটে। সেবায়, সহৃদয়তায়, আনন্দে, আরাধনায়, ফুলে, গন্ধে, কীর্ত্তনে, পাখীর গানে কোথাও আর ফাঁক নাই। অথচ সন্দিগ্ধ মন মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া ভৎ'সনা করিয়া উঠে, এ কি ছেলেখেলা? বাহিরের সকল সংস্রব রুদ্ধ করিয়া গুটি-কয়েক নির্জ্জীব পুতুল লইয়া এ কি মাতামাতি? এত বড় আত্মবঞ্চনায় মানুষ বাঁচে কি করিয়া? কিন্তু তবু ভালো লাগে, যাই যাই করিয়াও পা বাড়াইতে পারি না। এদিকটায় ম্যালেরিয়া কম, তথাপি অনেকেই

এই সময়টায় জ্বরে পড়িতেছিল। গহর একটিদিন মাত্র আসিয়াছিল, আর আসে নাই; তাহারও খোঁজ লইবার সময় করিয়া উঠিতে পারি না—এ আমার হইয়াছে ভালো!

সহসা মনের ভিতরটা ভয় ও ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া উঠিল—এ আমি করিতেছি কি! সঙ্গদোষে এই সবই কি সত্য বলিয়া একদিন বিশ্বাসে দাঁড়াইবে নাকি? স্থির করিলাম, আর না—যাই কেননা ঘটুক, এই জায়গা ছাড়িয়া কাল আমাকে পলাইতে হইবে।

প্রত্যহ রাত্রিশেষে বৈষ্ণবী আসিয়া আমাকে জাগায়। ভোরের সুরে বৈষ্ণব-কবিদের ঘুম-ভাঙানোর গান। ভক্তি ও ভালোবাসার সে কি সকরুণ আবেদন। হঠাৎ সাড়া দিই না, কান পাতিয়া শুনি। চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িতে চায়। মশারি তুলিয়া সে দোর-জানালা খুলিয়া দেয়—রা'গ করিয়া উঠিয়া বসি এবং মুখহাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া সঙ্গে চলি।

দিন-কয়েকের অভ্যাসে আপনি আজ ঘুম ভাঙ্গিল। ঘর অন্ধকার। একবার মনে হইল রাত্রি এখনো পোহায় নাই, কিন্তু সন্দেহ জন্মিল। বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম—দেখি রাত কোথায়, সকাল হইয়াছে। কে একজন খবর দিতে কমললতা আসিয়া দাঁড়াইল, এমন অস্নাত, অপ্রস্তুত চেহারা পূর্ব্বে দেখি নাই।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার অসুখ নাকি?

সে ম্লান হাসিয়া কহিল, আজ তুমি জিতেচ গোঁসাই।

কিসে বলো ত?

শরীরটা আজ তেমন ভালো নেই, সময়ে উঠতে পারিনি।

আজ তবে ফুল তুলতে গেল কে?

উঠানের ধারে আধমরা একটা টগর গাছে সামান্য কয়েকটা ফুল ছিল, তাহাই দেখাইয়া কহিল, এবেলা যা করেই হোক ওতেই চলে যাবে।

কিন্তু ঠাকুরের গলার মালা?

মালা আজ তাঁদের পরাতে পারব না।

শুনিয়া মন কেমন করিয়া উঠিল সেই নির্জ্জীব পুতুলগুলোর জন্যেই; বলিলাম, স্নান করে আমি তুলে এনে দিই?

তা যাও, কিন্তু এত ভোরে নাইতে পাবে না। অসুখ করবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বড়গোঁসাইজীকে দেখচিনে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, তিনি ত এখানে নেই, পরশু নবদ্বীপে গেছেন তাঁর গুরুদেবকে দেখতে।

কবে ফিরবেন?

সে ত জানিনে গোঁসাই!

এতদিন মঠে থাকিয়াও বৈরাগী দ্বারিকাদাসের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয় নাই—কতকটা আমার নিজের দোষে, কতকটা তাঁহার নির্লিপ্ত স্বভাবের জন্য। বৈষ্ণবীর মুখে শুনিয়া ও নিজের চোখে দেখিয়া জানিয়াছি এ লোকটির মধ্যে কপটতা নাই, অনাচার নাই, আর নাই মাস্টারি করিবার ঝোঁক। বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া অধিকাংশ সময় তাঁহার নির্জ্জন ঘরের মধ্যে কাটে। ইহার ধর্ম্মমতে আমার আস্থাও নাই, বিশ্বাসও নাই, কিন্তু এই মানুষটির কথাগুলি এমন নম্র, চাহিবার ভঙ্গী এমন স্বচ্ছ ও গভীর, বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় অহর্নিশ এমন ভরপুর হইয়া আছেন যে, তাঁহার মত ও পথ লইয়া বিরুদ্ধ আলোচনা করিতে শুধু সঙ্কোচ নয়, দুঃখ বোধ হয়। আপনিই বুঝা যায় এখানে তর্ক করিতে যাওয়া একেবারে নিষ্ফল। একদিন সামান্য একটুখানি যুক্তির অবতারণা করায় তিনি হাসিমুখে এমন নীরবে চাহিয়া রহিলেন যে, কুণ্ঠায় আমার মুখেও আর কথা রহিল না। তারপর হইতে তাহাকে সাধ্যমত এড়াইয়া চলিয়াছি, তবে একটা কৌতূহল ছিল। এতগুলি নারী-পরিবৃত থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন রসের অনুশীলনে নিমগ্ন রহিয়াও চিত্তের শান্তি ও দেহের নির্ম্মলতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলার রহস্য, ইচ্ছা ছিল যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব। কিন্তু সে সুযোগ এযাত্রা বোধ করি আর মিলিল না। মনে মনে বলিলাম, আবার যদি কখনো আসা হয় ত তখন দেখা যাইবে।

বৈষ্ণবের মঠেও বিগ্রহমূর্ত্তি সচরাচর ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যে স্পর্শে করিতে পারে না, কিন্তু এ আশ্রমে সে বিধি ছিল না। ঠাকুরের বৈষ্ণব পূজারী একজন বাহিরে থাকে, সে আসিয়া যথারীতি আজও পূজা করিয়া গেল, কিন্তু ঠাকুরের সেবার ভার আজ অনেকখানি আসিয়া পড়িল আমার 'পরে। বৈষ্ণবী দেখাইয়া দেয়, আমি করি সব, কিন্তু রহিয়া রহিয়া সমস্ত অন্তর তিক্ত হইয়া উঠে। এ কি পাগলামি আমাকে পাইয়া বসিতেছে! তথাপি আজও যাওয়া বন্ধ রহিল। আপনাকে বোধ হয়, এই বলিয়া বুঝাইলাম যে, এতদিন এখানে আছি, এ বিপদে ইহাদের ফেলিয়া যাইব কিরূপে। সংসারে কৃতজ্ঞতা বলিয়াও ত একটা কথা আছে।

আরও দুইদিন কাটিল। কিন্তু আর না। কমললতা সুস্থ হইয়াছে, পদ্মা ও লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই বোনেই সারিয়া উঠিয়াছে। দ্বারিকাদাস গত সন্ধ্যায় ফিরিয়াছেন, তাঁহার কাছে বিদায় লইতে গেলাম।

গোঁসাইজী কহিলেন, আজ যাবে গোঁসাই ? আবার কবে আসবে ?

সে ত জানিনে গোঁসাই।

কমললতা কিন্তু কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাবে।

আমাদের কথাটা ইঁহার কানেও গিয়াছে, জানিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম, কহিলাম, সে কাঁদতে যাবে কিসের জন্যে?

গোঁসাইজী একটু হাসিয়া কহিলেন, তুমি জানো না বুঝি?

না।

ওর স্বভাবই এমনি। কেউ চলে গেলে ও যেন শোকে সারা হয়ে যায়।

কথাটা আরও খারাপ লাগিল, বলিলাম, যার স্বভাব শোক করা সে করবেই, আমি তাকে থামাব কি দিয়ে? কিন্তু বলিয়াই তাঁহার চোখের পানে চাহিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম আমার পিছনে দাঁড়াইয়া কমললতা।

দ্বারিকাদাস কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, ওর ওপরে রাগ ক'রো না গোঁসাই, শুনেচি ওরা তোমার যত্ন করতে পারেনি, অসুখে পড়ে তোমাকে অনেক খাটিয়েচে, অনেক কষ্ট দিয়েচে। আমার কাছে কাল নিজেই বড় দুঃখ করছিল। আর বোষ্টম-বৈরাগীর আদর-যত্ন করবার কিই বা আছে! কিন্তু আবার যদি কখনো তোমার এদিকে আসা হয় ভিখারীদের দেখা দিয়ে যেয়ো। দেবে ত গোঁসাই?

ঘাড় নাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলাম, কমললতা সেখানেই তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু অকস্মাৎ এ কি হইয়া গেল! বিদায়-গ্রহণের প্রাক্কালে কত কি বলার, কত কি শোনার কল্পনা ছিল, সমস্ত নষ্ট করিয়া দিলাম। চিত্তের দুর্ব্বলতার গ্লানি অন্তরে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল তাহা অনুভব করিতেছিলাম, কিন্তু উত্যক্ত অসহিষ্ণু মন এমন অশোভন রূঢ়তায় যে নিজের মর্য্যাদা খর্ব্ব করিয়া বসিবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই!

নবীন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গহরের খোঁজে আসিয়াছে। কাল হইতে এখনও সে ফিরে নাই। আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—সে কি নবীন, সে ত এখানেও আর আসে না!

নবীন বিশেষ বিচলিত হইল না, বলিল, তবে বোধ হয় কোন্ বনেবাদাড়ে ঘুরচে—নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করেচে—এইবার কখন সাপে কামড়ানোর খবরটা পেলেই নিশ্চিন্দি হওয়া যায়।

তার সন্ধান করা ত দরকার নবীন?

দরকার ত জানি, কিন্তু খুঁজব কোথায়। বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নিজের প্রাণটা ত আর দিতে পারিনে বাবু, কিন্তু তিনি কোথায়? একবার জিজ্ঞেস করে যেতে চাই যে?

তিনিটা কে?

ঐ যে কমললতা।

কিন্তু সে জানবে কি করে নবীন?

সে জানে না? সব জানে।

আর বিতর্ক না করিয়া উত্তেজিত নবীনকে মঠের বাহিরে লইয়া আসিলাম, বলিলাম, সত্যই কমললতা কিছুই জানে না নবীন। নিজে অসুখে পড়ে তিন-চার দিন আখড়ার বাইরেও যায়নি।

নবীন বিশ্বাস করিল না। রাগ করিয়া বলিল, জানে না? ও সব জানে। বোষ্টমী কি মন্তর জানে—ও পারে না কি? কিন্তু পড়ত একবার নব্‌নের পাল্লায়, ওর চোখ-মুখ ঘুরিয়ে কেত্তন করা বার করে দিতুম। বাপের অতগুলো টাকা ছোঁড়া ভেলকিতে উড়িয়ে দিলে!

তাহাকে শান্ত করার জন্য কহিলাম, কমললতা টাকা নিয়ে কি করবে নবীন? বোষ্টম মানুষ, মঠে থাকে, গান গেয়ে দুটো ভিক্ষে করে ঠাকুর-দেবতাদের সেবা করে, দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়া বৈ ত নয়—ওকে টাকার কাঙাল বলে ত আমার বোধ হয় না নবীন।

নবীন কতকটা ঠাণ্ডা হইয়া বসিল, ওর নিজের জন্যে নয় তা আমরাও জানি। দেখলে যেন ভদ্দরঘরের মেয়ে বলে মনে হয়। তেমনি চেহারা, তেমনি কথাবার্ত্তা। বড়বাবাজীটাও লোভী নয়, কিন্তু একপাল পুষ্যি রয়েছে যে। ঠাকুরসেবার নাম করে তাদের যে লুচি-মণ্ডা ঘি-দুধ নিত্যি চাই। নয়ন চক্কোত্তির মুখে কানাঘুষোয় শুনচি আখড়ার নামে বিশ বিঘে জমি নাকি খরিদ হয়ে গেছে। কিছুই থাকবে না বাবু, যা আছে সব বৈরাগীদের পেটে গিয়েই একদিন ঢুকবে।

বলিলাম, হয়ত গুজব সত্যি নয়। কিন্তু সে-পক্ষে তোমাদের নয়ন চক্কোত্তিও ত কম নয় নবীন।

নবীন সহজেই স্বীকার করিয়া কহিল, সে ঠিক। বিট্‌লে বামুন মস্ত ধড়িবাজ। কিন্তু বিশ্বেস না করি কি করে বলুন। সেদিন খামোকা আমার ছেলেদের নামে দশ বিঘে জমি দানপত্তর করে দিলে। অনেক মানা করলুম, শুনলে না। বাপ বহুত রেখে গেছে মানি, কিন্তু বিলোলে ক'দিন বাবু? একদিন বললে কি জানেন? বললে, আমরা ফকিরের বংশ, ফকিরি আমার ত কেউ ঠকিয়ে নিতে পারবে না? শুনুন কথা!

নবীন চলিয়া গেল। একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, আমি কিসের জন্য যে এতদিন মঠে পড়িয়া আছি এ কথা সে জিজ্ঞাসাও করিল না। জিজ্ঞাসা করিলেই যে কি বলিতাম জানি না, কিন্তু মনে মনে লজ্জা পাইতাম। তাহার কাছেই আরও একটা খবর পাইলাম, কাল কালিদাসবাবুর ছেলের ঘটা করিয়া বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সাতাশে তারিখটা আমার খেয়াল ছিল না।

নবীনের কথাগুলো মনে মনে তোলাপাড়া করিতে অকস্মাৎ বিদ্যুৎবেগে একটা সন্দেহ জাগিল—বৈষ্ণবী কিসের জন্য চলিয়া যাইতে চায়। সেই ভুরু-ওয়ালা কদাকার লোকটার কণ্ঠিবদল-করা স্বামিত্বের হাঙ্গামার ভয়ে কদাচ নয়—এ গহর। এখানে আমার থাকার সম্বন্ধে তাই বোধ করি বৈষ্ণবী সেদিন কৌতুকে বলিয়াছিল, আমি ধরে রাখলে সে রাগ করবে না গোঁসাই। রাগ করবার লোক সে নয়, কিন্তু কেন সে আর আসে না? হয়ত বা নিজের মনে মনে কি কথা সে ভাবিয়া লইয়াছে। সংসারে গহরের আসক্তি নাই, আপন বলিতেও কেহ নাই! টাকা-কড়ি বিষয়-আশয় সে যেন বিলাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচে। ভালো যদি সে বাসিয়াও থাকে, মুখ ফুটিয়া কোনদিন হয়ত সে বলিবেও না। কোথাও পাছে কোন অপরাধ স্পর্শে। বৈষ্ণবী ইহা জানে। সেই অনতিক্রম্য বাধায় চিরনিরুদ্ধ প্রণয়ের নিষ্ফল চিত্তদাহ হইতে এই শান্ত আত্মভোলা মানুষটিকে অব্যাহতি দিতেই বোধ করি কমললতা পলাইতে চায়।

নবীন চলিয়া গিয়াছে, বকুলতলায় সেই ভাঙা বেদীটার উপরে একলা বসিয়া ভাবিতেছি। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম পাঁচটার গাড়ি ধরিতে গেলে দেরি করা আর চলে না। কিন্তু প্রতিদিন না যাওয়াটাই এমনি অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল যে, ব্যস্ত হইয়া উঠিব কি আজও মন পিছু হটিতে লাগিল।

যেখানেই থাকি পুঁটুর বৌভাতে অন্নগ্রহণ করিয়া যাইব কথা দিয়াছিলাম। নিরুদ্দিষ্ট গহরের তত্ত্ব লওয়া আমার কর্তব্য। এতদিন অনাবশ্যক অনুরোধ অনেক মানিয়াছি, কিন্তু আজ সত্যকার কারণ যখন বিদ্যমান তখন মানা করিবার কেহ নাই। দেখি পদ্মা আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল, তোমাকে দিদি একবার ডাকচে গোঁসাই।

আবার ফিরিয়া আসিলাম। প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বৈষ্ণবী কহিল, কলকাতার বাসায় পৌঁছতে তোমার রাত হবে নতুনগোঁসাই। ঠাকুরের প্রসাদ দুইটি সাজিয়ে রেখেচি, ঘরে এসো।

প্রত্যহের মতই সযত্ন আয়োজন। বসিয়া গেলাম। এখানে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করার প্রথা নাই, আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইতে হয়। উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া রাখা চলে না।

যাবার সময়ে বৈষ্ণবী কহিল, নতুনগোঁসাই, আবার আসবে ত?

তুমি থাকবে ত?

তুমি বলো কতদিন আমাকে থাকতে হবে?

তুমিও বলো কতদিনে আমাকে আসতে হবে?

না, সে তোমাকে আমি বলব না।

না বলো অন্য একটা কথার জবাব দেবে?

এবার বৈষ্ণবী একটুখানি হাসিয়া কহিল, না, সেও তোমাকে আমি বলব না। তোমার যা ইচ্ছে হয় ভাবো গে গোঁসাই, একদিন আপনিই তার জবাব পাবে।

অনেকবার মুখে আসিয়া পড়িতে চাহিল—আজ আর সময় নেই কমললতা, কাল যাবো—কিন্তু কিছুতেই এ কথা বলা হ'ল না।

চলিলাম।

পদ্মা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। কমললতার দেখাদেখি সেও হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

বৈষ্ণবী তাহাকে রাগ করিয়া বলিল, হাত তুলে নমস্কার কি রে পোড়ারমুখী, পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম কর্।

কথাটায় যেন চমক লাগিল। তাহার মুখের পানে চাহিতে গিয়া দেখিলাম সে তখন আর একদিকে মুখ ফিরাইয়াছে। আর কোন কথা না বলিয়া তাহাদের আশ্রম ছাড়িয়া তখন বাহির হইয়া আসিলাম।

৯

আজ অবেলায় কলিকাতার বাসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি। তারপরে এর চেয়েও দুঃখময় বর্মায় নির্ব্বাসন। ফিরিয়া আসিবার হয়ত আর সময়ও হইবে না, প্রয়োজনও ঘটিবে না। হয়ত এই যাওয়াই শেষের যাওয়া। গনিয়া দেখিলাম আর দশদিন। দশটা দিন জীবনের কতটুকুই বা। তথাপি মনের মধ্যে সন্দেহ নাই দশদিন পূর্ব্বে যে-আমি এখানে আসিয়াছিলাম এবং যে-আমি বিদায় লইয়া আজ চলিয়াছি, তাহারা এক নয়।

অনেককেই সখেদে বলিতে শুনিয়াছি, অমুক যে এমন হইতে পারে তাহা কে ভাবিয়াছে! অর্থাৎ অমুকের জীবনটা যেন সূর্য্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণের মত তাহার অনুমানের পাঁজিতে লেখা নিভু‍্র্ল হিসাব। গরমিলটা শুধু অভাবিত নয়, অন্যায়। যেন তাহার বুদ্ধির আঁক-কষার বাহিরে দুনিয়ার আর কিছু নাই। জানেও না সংসারে কেবল বিভিন্ন মানুষই আছে তাই নয়, একটা মানুষই যে কত বিভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত হয় তাহার নির্দ্দেশ খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। এখানে একটা নিমেষও তীব্রতায় সমস্ত জীবনকেও অতিক্রম করিতে পারে।

সোজা রাস্তা ছাড়িয়া বনবাদাড়ের মধ্য দিয়া এপথ-ওপথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্টেশনে চলিয়াছিলাম। অনেকটা ছেলেবেলায় পাঠশালে যাইবার মত। ট্রেনের সময় জানি না, তাগিদও নাই—শুধু জানি ওখানে পৌঁছিলে যখন হোক গাড়ি একটা

জুটিবেই। চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময়ে মনে হইল সব পথগুলাই যেন চেনা। যেন কতদিন এপথে কতবার আনাগোনা করিয়াছি। শুধু আগে ছিল বড়; এখন কি করিয়া যেন সঙ্কীর্ণ এবং ছোট্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ঐ না খাঁয়েদের গলায়-দড়ির বাগান। তাই ত বটে! এ যে আমাদের গ্রামের দক্ষিণপাড়ার শেষপ্রান্ত দিয়া চলিয়াছি। কে নাকি কবে শূলের ব্যাথায় ঐ তেঁতুল গাছের উপরের ডালে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। করিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু প্রায় সকল গ্রামের মত এখানেও একটা জনশ্রুতি আছে। গাছটা পথের ধারে, ছেলেবেলায় চোখে পড়িলে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিত এবং চোখ বুজিয়া সবাই এক দৌড়ে স্থানটা পার হইয়া যাইতাম।

গাছটা তেমনই আছে। তখন মনে হইত ঐ অপরাধী গাছটার গুঁড়িটা যেন পাহাড়ের মত, মাথা গিয়া ঠেকিয়াছে আকাশে। আজ দেখিলাম সে বেচারার গর্ব্ব করিবার কিছু নাই, আরও পাঁচটা তেঁতুলগাছ যেমন হয় সেও তেমনি। জনহীন পল্লীপ্রান্তে একাকী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। শৈশবে একদিন যাহাকে সে যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছে, আজ বহু বর্ষ পরে প্রথম সাক্ষাতে তাহাকেই সে যেন বন্ধুর মত চোখ টিপিয়া একটুখানি রহস্য করিল—কি ভাই বন্ধু, কেমন আছ? ভয় করে না ত?

কাছে গিয়া পরমস্নেহে একবার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া লইলাম, মনে মনে বলিলাম, ভালো আছি ভাই। ভয় করবে কেন, তুমি যে আমার ছেলেবেলার প্রতিবেশী, আমার আত্মীয়।

সায়াহ্নের আলো নিবিয়া আসিতেছিল, বিদায় লইয়া বলিলাম, ভাগ্য ভালো যে দৈবাৎ দেখা গেল।

সারি সারি অনেকগুলা বাগানের পরে একটুখানি খোলা জায়গা, অন্যমনে হয়ত এটুকু পার হইয়া আসিতাম, কিন্তু সহসা বহুদিনের বিস্মৃতপ্রায় পরিচিত ভারি একটি মিষ্ট গন্ধে চমক লাগিল—এদিক-ওদিক চাহিতেই চোখে পড়িয়া গেল—বাঃ! এ যে আমাদের সেই যশোদা বৈষ্ণবীর আউশফুলের গন্ধ! ছেলেবেলায় ইহার জন্য যশোদার কত উমেদারিই না করিয়াছি। এ-জাতীয় গাছ এদিকে মিলে না, কি জানি সে কোথা হইতে আনিয়া তাহার আঙিনার একধারে পুঁতিয়াছিল। ট্যারা-বাঁকা গাঁটে-ভরা বুড়ো মানুষের মত তাহার চেহারা—সেদিনের মত আজও তাহার সেই একটিমাত্র সজীব শাখা এবং ঊর্দ্ধে গুটিকয়েক সবুজ পাতার মধ্যে তেমনি গুটিকয়েক সাদা সাদা ফুল। ইহার নীচে ছিল যশোদার স্বামীর সমাধি। বোষ্টমঠাকুরকে আমরা দেখি নাই, আমাদের জন্মের পূর্ব্বেই তিনি গোলোকে রওনা হইয়াছিলেন। তাহারই

ছোট্ট মনোহারী দোকানটি তখন বিধবা চালাইত। দোকান ত নয়, একটি ডালায় ভরিয়া যশোদা মালা-ঘুন্‌সি, আর্শি-চিরুনি, আলতা, তেলের মশলা, কাঁচের পুতুল, টিনের বাঁশী প্রভৃতি লইয়া দুপুরবেলায় বাড়ি বাড়ি বিক্রী করিত। আর ছিল তাহার মাছ ধরিবার সাজ-সরঞ্জাম। বড় ব্যাপার নয়, দু-এক পয়সা মূল্যের ডোর-কাঁটা। এই কিনিতে যখন-তখন তাহাকে ঘরে গিয়া আমরা উৎপাত করিতাম! এই আউশ গাছের একটা শুকনো ডালের উপর কাদা দিয়া জায়গা করিয়া যশোদা সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দিত। ফুলের জন্য আমরা উপদ্রব করিলে সে সমাধিটি দেখাইয়া বলিত, না বাবাঠাকুর, ও আমার দেবতার ফুল, তুললে তিনি রাগ করেন।

বৈষ্ণবী নাই, সে কবে মরিয়াছে জানি না – হয়ত খুব বেশীদিন নয়। চোখে পড়িল গাছের একধারে আর একটি ছোট মাটির ঢিপি, বোধ হয় যশোদারই হইবে। খুব সম্ভব, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আজ স্বামীর পাশেই সে একটু স্থান করিয়া লইয়াছে। স্তূপের খোঁড়া-মাটি অধিকতর উর্ব্বর হইয়া বিছুটি ও বনচাঁড়ালের গাছে গাছে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে—যত্ন করিবার কেহ নাই।

পথ ছাড়িয়া সেই শৈশবের পরিচিত বুড়ো গাছটির কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি, সন্ধ্যা-দেওয়া সেই দীপটি আছে নীচে পড়িয়া এবং তাহারি উপরে সেই শুকনো ডালটি আছে আজও তেমনি তেলে তেলে কালো হইয়া।

যশোদার ছোট্ট ঘরটি এখন সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হয় নাই—সহস্র ছিদ্রময় শতজীর্ণ খড়ের চালখানি দ্বার ঢাকিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আজও প্রাণপণে আগলাইয়া আছে।

কুড়ি-পঁচিশ বর্ষ পূর্ব্বের কত কথাই মনে পড়িল। কঞ্চির বেড়া দিয়া ঘেরা নিকানো-মুছানো যশোদার উঠান, তার সেই ছোট ঘরখানি। সে আজ এই হইয়াছে। কিন্তু এর চেয়েও ঢের বড় করুণ বস্তু তখনও দেখার বাকী ছিল। অকস্মাৎ চোখে পড়িল সেই ঘরের মধ্য হইতে ভাঙা চালের নীচে দিয়া গুঁড়ি মারিয়া একটা কঙ্কালসার কুকুর বাহির হইয়া আসিল। আমার পায়ের শব্দে চকিত হইয়া সে বোধ করি অনধিকার-প্রবেশের প্রতিবাদ করিতে চায়। কিন্তু কণ্ঠ এত ক্ষীণ যে, সে তাহার মুখেই বাধিয়া রহিল।

বলিলাম, কি রে, কোন অপরাধ করিনি ত?

সে আমার মুখের পানে চাহিয়া কি ভাবিয়া জানি না, এবার ল্যাজ নাড়িতে লাগিল।

বলিলাম, আজও তুই এখানেই আছিস?

প্রত্যুত্তরে সে শুধু মলিন চোখ দুটো মেলিয়া অত্যন্ত নিরুপায়ের মত আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এ যে যশোদার কুকুর তাহাতে সন্দেহ নাই। ফুলকাটা রাঙা পাড়ের সেলাই-

করা বগ্‌লস এখনো তাহার গলায়। নিঃসন্তান রমণীর একান্ত স্নেহের ধন এই কুকুরটা একাকী এই পরিত্যক্ত কুটীরের মধ্যে কি খাইয়া আজও যে বাঁচিয়া আছে ভাবিয়া পাইলাম না। পাড়ায় ঢুকিয়া কাড়িয়া খাওয়ার ইহার জোরও নাই, অভ্যাসও নাই, স্বজাতির সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার শিক্ষাও এ পায় নাই—অনশনে অর্দ্ধাশনে এইখানে পড়িয়াই এ-বেচারা বোধ হয় তাহারই পথ চাহিয়া আছে যে তাহাকে একদিন ভালোবাসিত। হয়ত ভাবে, কোথাও না কোথাও গিয়াছে, ফিরিয়া একদিন সে আসিবেই। মনে মনে বলিলাম, এই কি এমনি? এ প্রত্যাশা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা সংসারে এতই কি সহজ?

যাইবার পূর্ব্বে চালের ফাঁক দিয়া ভিতরটায় একবার দৃষ্টি দিয়া লইলাম। অন্ধকারে দেখা কিছুই গেল না, শুধু চোখে পড়িল দেয়ালে সাঁটা পটগুলি। রাজা-রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা জাতীয় দেবদেবতার প্রতিমূর্ত্তি নূতন কাপড়ের গাঁট হইতে সংগ্রহ করিয়া যশোদা ছবির সখ মিটাইত। মনে পড়িল ছেলেবেলায় মুগ্ধ চক্ষে এগুলি বহুবার দেখিয়াছি। বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়া, দেয়ালের কাদা মাখিয়া এগুলি আজও কোনমতে টিকিয়া আছে।

আর রহিয়াছে পাশের কুলুঙ্গিতে তেমনি দুর্দ্দশায় পড়িয়া সেই রঙ-করা হাঁড়িটি। এর মধ্যে থাকিত তাহার আলতার বাণ্ডিল, দেখামাত্রই সেকথা আমার মনে পড়িল। আরও কি কি যেন এদিকে-ওদিকে পড়িয়া আছে অন্ধকারে ঠাহর হইল না। তাহারা সবাই মিলিয়া আমাকে প্রাণপণে কিসের যেন ইঙ্গিত করিতে লাগিল, কিন্তু সে ভাষা আমার অজানা। মনে হইল, বাড়ির এক কোণে এ যেন মৃতশিশুর পরিত্যক্ত খেলাঘর। গৃহস্থালীর নানা ভাঙা-চোরা জিনিস দিয়া সযত্নে রচিত তাহার এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে সে ফেলিয়া গিয়াছে। আজ তাহাদের আদর নাই, প্রয়োজন নাই, আঁচল দিয়া বার বার ঝাড়া-মোছা করিবার তাগিদ গিয়াছে ফুরাইয়া · পড়িয়া আছে শুধু কেবল জঞ্জালগুলা কেহ মুক্ত করে নাই বলিয়া।

সেই কুকুরটা একটুখানি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া থামিল। যতক্ষণ দেখা গেল দেখিলাম সে বেচারা এইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সহিত পরিচয়ও এই প্রথম, শেষও এইখানে, তবু আগু বাড়াইয়া বিদায় দিতে আসিয়াছে। আমি চলিয়াছি কোন্ বন্ধুহীন লক্ষ্যহীন প্রবাসে, আর সে ফিরিবে তাহার অন্ধকার নিরালা ভাঙা ঘরে। এ-সংসারে পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে উভয়েরই কেহ নাই।

বাগানটার শেষে সে চোখের আড়ালে পড়িল, কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের এই অভাগ্য সঙ্গীর জন্য বুকের ভিতরটা হঠাৎ হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, চোখের জল আর সামলাইতে পারি না এমনি দশা।

চলিতে চলিতে ভাবিতেছিলাম, কেন এমন হয়? আর কোন একটা দিনে এসব

দেখিয়া হয়ত বিশেষ কিছু মনে হইত না, আজ আপন অন্তরাকাশই নাকি মেঘের ভারে ভারাতুর, তাই ওদের দুঃখের হাওয়ায় তাহারা অজস্রধারায় ফাটিয়া পড়িতে চায়।

স্টেশনে পৌঁছিলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তখনি গাড়ি মিলিল। কলিকাতার বাসায় পৌঁছিতে অধিক রাত্রি হইবে না! টিকিট কিনিয়া উঠিয়া বসিলাম, বাঁশি বাজাইয়া সে যাত্রা শুরু করিল। স্টেশনের প্রতি তাহার মোহ নাই, সজলচক্ষে বার বার ফিরিয়া চাহিবার তাহার প্রয়োজন হয় না।

আবার সেই কথাটাই মনে পড়িল—দশটাদিন মানুষের জীবনে কতটুকু, অথচ কতই না বড়।

কাল প্রভাতে কমললতা একলা যাইবে ফুল তুলিতে। তারপর চলিবে তাহার সারাদিনের ঠাকুরসেবা। কি জানি দিন-দশেকের সাথী নতুনগোঁসাইকে ভুলিতে তাহার ক'টা দিন লাগিবে!

সেদিন সে বলিয়াছিল, সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদপদ্মে নিজেকে নিবেদন করে দিয়েচি দাসীকে কখনো তিনি পরিত্যাগ করবেন না।

তাই হোক। তাই যেন হয়।

ছেলেবেলা হইতে নিজের জীবনের কোন লক্ষ্যও নাই, জোর করিয়া কোনকিছু কামনা করিতেও জানি না—সুখ-দুঃখের ধারণাও আমার স্বতন্ত্র। তথাপি এতটাকাল কাটিল শুধু পরের দেখাদেখি পরের বিশ্বাসে ও পরের হুকুম তামিল করিতে। তাই কোন কাজই আমাকে দিয়া সুনির্ব্বাহ, হয় না। দ্বিধায় দুর্ব্বল সকল সঙ্কল্প সকল উদ্যমই আমার অনতিদূরে ঠোকর খাইয়া পথের মধ্যে ভাঙিয়া পড়ে। সবাই বলে অলস, সবাই বলে অকেজো। তাই বোধ করি ওই অকেজো বৈরাগীদের আখড়াতেই আমার অন্তরবাসী অপরিচিত বন্ধু অস্ফুট ছায়ারূপে আমাকে দেখা দিয়ে গেলেন! বার বার রাগ করিয়া মুখ ফিরাইলাম, বার বার স্মিতহাস্যে হাত নাড়িয়া কি যেন ইঙ্গিত করিলেন।

আর ঐ বৈষ্ণবী কমললতা! ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান। ওর ছন্দের মিল নাই, ব্যাকরণে ভুল আছে, ভাষায় ত্রুটি অনেক, কিন্তু ওর বিচার ত সেদিক দিয়া নয়। ও যেন তাঁহাদেরই দেওয়া কীর্ত্তনের সুর—মর্ম্মে যাহার পশে সেই শুধু তাহার খবর পায়। ও যেন গোধূলি আকাশে নানা রঙের ছবি। ওর নাম নাই, সংজ্ঞা নাই—কলাশাস্ত্রের সূত্র মিলাইয়া ওর পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

আমাকে বলিয়াছিল, চল তবে গোঁসাই, এখন থেকে যাই, গান গেয়ে পথে পথে দু'জনের দিন কেটে যাবে।

বলিতে তাহার বাধে নাই, কিন্তু আমার বাধিল। আমার নাম দিল সে নতুন-গোঁসাই। বলিল, ও নামটা আমাকে যে মুখে আনতে নেই গোঁসাই। তাহার বিশ্বাস আমি তাহার গত জীবনের বন্ধু। আমাকে তাহার ভয় নাই, আমার কাছে সাধনায় তাহার বিঘ্ন ঘটিবে না! বৈরাগী দ্বারিকাদাসের শিষ্যা সে, কি জানি কোন্ সাধনায় সিদ্ধিলাভের মন্ত্র তিনি দিয়াছিলেন!

অকস্মাৎ রাজলক্ষ্মীকে মনে পড়িল—মনে পড়িল তাহার সেই চিঠি। স্নেহ ও স্বার্থে মিশামিশি সেই কঠিন লিপি। তবুও জানি এ জীবনের পূর্ণচ্ছেদে সে আমার শেষ হইয়াছে। হয়ত এ ভালোই হইয়াছে, কিন্তু সে শূন্যতা ভরিয়া দিতে কি কোথায় কেহ আছে? জানলার বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। একে একে কত কথা কত ঘটনাই স্মরণ হইল। শিকারের আয়োজন, কুমার সাহেবের সেই তাঁবু, সেই দলবল, বহুবর্ষ পরে প্রবাসে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন, দীপ্ত কালো চোখে তাহার সে কি বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি। যে মরিয়াছে বলিয়া জানিতাম তাহাকে চিনিতে পারি নাই—সেদিন শ্মশানপথে তাহার সে কি ব্যগ্র ব্যাকুল মিনতি! শেষে ক্রুদ্ধ হতাশ্বাসে সে কি তীব্র অভিমান! পথরোধ করিয়া কহিল, যাবে বললেই তোমাকে যেতে দেব নাকি? কই যাও তো দেখি? এই বিদেশে বিপদ ঘটলে দেখবে কে? ওরা, না আমি?

এবার তাহাকে চিনিলাম। এই জোরেই তাহার চিরদিনের সত্য পরিচয়। জীবনে এ আর তাহার ঘুচিল না—এ হইতে কখনো কেহ তাহার কাছে অব্যাহতি পাইল না।

আবার পথের প্রান্তে মরিতে বসিয়াছিলাম, ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়া দেখিলাম শিয়রে বসিয়া সে। তখন সকল চিন্তা সঁপিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া শুইলাম। সে ভার তাহার, আমার নয়।

দেশের বাড়িতে আসিয়া জ্বরে পড়িলাম। এখানে সে আসিতে পারে না— এখানে সে মৃত—এর বাড়া লজ্জা তাহার নাই, তথাপি যাহাকে কাছে পাইলাম সে ওই রাজলক্ষ্মী।

চিঠিতে লিখিয়াছে—তখন তোমাকে দেখিবে কে? পুঁটু? আর আমি ফিরিব শুধু চাকরের মুখে খবর লইয়া? তারপরেও বাঁচিতে বলো নাকি?

এ প্রশ্নের জবাব দিই নাই। জানি না বলিয়া নয়—সাহস হয় নাই।

মনে মনে বলিলাম, শুধু কি রূপে? সংযমে, শাসনে, সুকঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণে এই প্রখর বুদ্ধিশালিনীর কাছে ঐ স্নিগ্ধ সুকোমল আশ্রমবাসিনী কমললতা কতটুকু?

কিন্তু ওই এতটুকুর মধ্যেই এবার যেন আপন স্বভাবের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছি। মনে হইয়াছে ওর কাছে আছে আমার মুক্তি, আছে মর্য্যাদা, আছে আমার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ। ও কখনো আমার সকল চিন্তা, সকল ভালোমন্দ আপন হাতে লইয়া রাজলক্ষ্মীর মত আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে না।

ভাবিতেছিলাম কি করিব বিদেশে গিয়া? কি হইবে আমার চাকরিতে? নূতন ত নয়—সেদিনেই বা কি এমন পাইয়াছিলাম যাহাকে ফিরিয়া পাইতে আজ লোভ করিতে হইবে? কেবল কমললতা ত বলে নাই, দ্বারিকাগোঁসাইও একান্ত সমাদরে আহ্বান করিয়াছিল আশ্রমে থাকিতে। সে কি সমস্তই বঞ্চনা, মানুষকে ঠকানো ছাড়া কি এ আমন্ত্রণে কোন সত্যই নাই। এতকাল জীবনটা কাটিল যে-ভাবে, এই কি ইহার শেষ কথা? কিছুই জানিতে বাকী নাই, সব জানাই কি আমার সমাপ্ত হইয়াছে? চিরদিন ইহাকে শুধু অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষাই করিয়াছি, বলিয়াছি সব ভূয়া, সব ভুল, কিন্তু কেবলমাত্র অবিশ্বাস ও উপহাসকেই মূলধন করিয়া সংসারে বৃহৎ বস্তু কে কবে লাভ করিয়াছে?

*　　　　*　　　　*

গাড়ি আসিয়া হাওড়া স্টেশনে থামিল। স্থির করিলাম রাত্রিটা বাসায় থাকিয়া জিনিসপত্র যা-কিছু আছে, দেনা-পাওনা যা-কিছু বাকী, সমস্তই চুকাইয়া দিয়া কালই আবার আশ্রমে ফিরিয়া যাইব। রহিল আমার চাকরি, রহিল আমার বর্ম্মা যাওয়া।

বাসায় পৌঁছিলাম রাত্রি তখন দশটা। আহারের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। হাতমুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া লইতেছিলাম, পিছনে সুপরিচিত কণ্ঠের ডাক আসিল, বাবু এলেন?

সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিলাম রতন, কখন এলি রে?

এসেচি সন্ধ্যাবেলায়। বারান্দায় তোফা হাওয়া—আলিস্যিতে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

বেশ করেছিলে? খাওয়া হয়নি ত?

আজ্ঞে না।

তবেই দেখচি মুস্কিলে ফেললি রতন।

রতন জিজ্ঞাসা করিল, আপনার?

স্বীকার করিতে হইল, আমারও হয় নাই।

রতন খুশী হইয়া কহিল, তবে ত ভালই হয়েচে। আপনার প্রসাদ পেয়ে রাতটুকু কাটিয়ে দিতে পারব।

মনে মনে বলিলাম, ব্যাটা নাপতে বিনয়ের অবতার। কিছুতেই অপ্রতিভ হয় না। মুখে বলিলাম, তা হলে কাছাকছি কোন দোকানে খুঁজে ভাখ যদি প্রসাদের যোগাড় করে আনতে পারিস্, কিন্তু শুভাগমন হ'লো কিসের জন্যে? আবার চিঠি আছে নাকি?

রতন কহিল, আজ্ঞে না। চিঠি লেখালেখিতে অনেক ভজকটো। যা বলবার তিনি মুখেই বলবেন।

তার মানে আবার আমাকে যেতে হবে নাকি?

আজ্ঞে, না। মা নিজেই এসেচেন।

শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। এই রাত্রে কোথায় রাখি, কি বন্দোবস্ত করি ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু কিছু ত একটা করা চাই; জিজ্ঞাসা করিলাম, এসে পর্য্যন্ত কি ঘোড়ার গাড়িতেই বসে আছেন নাকি?

রতন হাসিয়া কহিল, মা সেই মানুষই বটে! না বাবু, আমরা চারদিন হ'লো এসেচি—এই চারটে দিনই আপনাকে দিনরাত পাহারা দিচ্চি। চলুন?

কোথায়? কতদূর?

দূরে একটু বটে, কিন্তু আমার গাড়ি ভাড়া করা আছে, কষ্ট হবে না।

অতএব, আর একদফা জামাকাপড় পরিয়া দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যাত্রা করিতে হইল। শ্যামবাজারের কোন্ একটা গলির মধ্যে একখানি দোতালা বাড়ি, সুমুখে প্রাচীরঘেরা একটুখানি ফুলের বাগান। রাজলক্ষ্মীর বুড়ো দরোয়ান দ্বার খুলিয়াই আমাকে দেখিতে পাইল; তাহার আনন্দের সীমা নাই—ঘাড় নাড়িয়া মস্ত নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবুজী?

বলিলাম, হাঁ তুলসীদাস, ভালো আছি। তুমি ভালো আছ?

প্রত্যুত্তরে সে তেমনি আর একটা নমস্কার করিল। তুলসী মুঙ্গের জেলার লোক, জাতিতে কুর্ম্মী, ব্রাহ্মণ বলিয়া আমাকে সে বরাবর বাঙলা রীতিতে পা ছুঁইয়া প্রণাম করে।

আর একজন হিন্দুস্থানী চাকর আমাদের শব্দ-সাড়ায় বোধ করি সেইমাত্র ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াছে, রতনের প্রচণ্ড তাড়ায় সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। অকারণে অপরকে ধমক দিয়া রতন এ-বাড়িতে আপন মর্য্যাদা বহাল রাখে। বলিল, এসে পর্য্যন্ত কেবল ঘুম মারচো আর রুটি সাঁটচো বাবা, তামাকটুকু পর্য্যন্ত সেজে রাখতে পারনি? যাও জল্‌দি—

এ লোকটি নূতন, ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

উপরে উঠিয়া সুমুখের বারান্দা পার হইয়া একখানি বড় ঘর—গ্যাসের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত—আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তার উপরে ফুলকাটা জাজিম ও গোটা দুই তাকিয়া। কাছেই আমার বহুব্যবহৃত অত্যন্ত প্রিয় গুড়গুড়িটি এবং ইহাদের অদূরে সযত্নে রাখা আমার জরির কাজ-করা মখমলের চটি। এটি রাজলক্ষ্মীর নিজের হাতে বোনা, পরিহাসছলে আমার একটা জন্মদিনে সে উপহার দিয়াছিল। পাশের ঘরটিও খোলা, এ-ঘরেও কেহ নাই। খোলা দরজার ভিতর দিয়া উঁকি দিয়া দেখিলাম একধারে নতুন-কেনা খাটের উপরে বিছানা পাতা। আর একধারে তেমনি নূতন আলনায় সাজানো শুধু আমারই কাপড়-জামা। গঙ্গামাটিতে যাইবার পূর্ব্বে ·গুলি তৈরী হইয়াছিল। মনেও ছিল না, কখনো ব্যবহারেও লাগে নাই।

রতন ডাকিল, মা!

যাই, বলিয়া সাড়া দিয়া রাজলক্ষ্মী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, রতন, তামাক নিয়ে আয় বাবা। তোকেও এ ক'দিন অনেক কষ্ট দিলুম।

কষ্ট কিছুই নয় মা। সুস্থ দেহে ওঁকে যে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে পেরেচি এই আমার ঢের। এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মীকে নতুন চোখে দেখিলাম। দেহে রূপ ধরে না। সেদিনের পিয়ারীকে মনে পড়িল, শুধু কয়েকটা বছরের দুঃখ-শোকের ঝড়জলে স্নান করিয়া যেন সে নবকলেবর ধরিয়া আসিয়াছে। এই দিন-চারেকের নূতন বাড়িটার বিলি-ব্যবস্থায় বিস্মিত হই নাই, কারণ তাহার একটা বেলার গাছতলার বাসাও সুশৃঙ্খলায় সুন্দর হইয়া উঠে। কিন্তু রাজলক্ষ্মী আপনাকে আপনি যেন এই ক'দিনেই ভাঙিয়া গড়িয়াছে। আগে সে অনেক গহনা পরিত, মাঝখানে সমস্ত খুলিয়া ফেলিল—যেন সন্ন্যাসিনী। আজ আবার পরিয়াছে—গোটাকয়েকমাত্র—কিন্তু দেখিয়া মনে হইল সেগুলা অতিশয় মূল্যবান। অথচ পরনের কাপড়খানা দামী নয়—সাধারণ মিলের শাড়ি—আটপৌরে, ঘরে পরিবার। মাথার আঁচলের পাড়ের নীচে দিয়া ছোট চুল গালের আশেপাশে ঝুলিতেছে, ছোট বলিয়াই বোধ হয় তাহারা শাসন মানে নাই। দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কি অত দেখচ?

দেখচি তোমাকে।

নতুন নাকি?

তাই ত মনে হচ্ছে।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

না।

মনে হচ্ছে রতন তামাক নিয়ে আসবার আগে আমার হাত দুটো তোমার গলায় জড়িয়ে দিই। দিলে কি করবে বলো ত! বলিয়াই হাসিয়া উঠিল, কহিল, ছুঁড়ে ফেলে দেবে না ত?

আমিও হাসি রাখিতে পারিলাম না, বলিলাম, দিয়েই দেখ না। কিন্তু, এত হাসি—সিদ্ধি খেয়েচ না কি?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বুদ্ধিমান রতন একটু জোর করিয়াই পা ফেলিয়া উঠিতেছিল। রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া চুপি চুপি বলিল, রতন আগে যাক, তারপরে তোমাকে দেখাচ্চি সিদ্ধি খেয়েচি কি আর কিছু খেয়েচি। কিন্তু বলিতে বলিতেই তাহার গলা হঠাৎ ভারী হইয়া উঠিল, কহিল, এই অজানা জায়গায় চার-পাঁচদিন আমাকে একলা ফেলে রেখে তুমি পুঁটুর বিয়ে দিতে গিয়েছিলে? জানো, রাতদিন আমার কি করে কেটেচে?

হঠাৎ তুমি আসবে আমি জানব কি করে?

হাঁ গো হাঁ, হঠাৎ বৈকি! তুমি সব জানতে। শুধু আমাকে জব্দ করার জন্যেই চলে গিয়েছিলে।

রতন আসিয়া তামাক দিল, বলিল, কথা আছে মা, বাবুর প্রসাদ পাব। ঠাকুরকে খাবার আনতে বলে দেব? রাত বারোটা হয়ে গেল।

বারোটা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া উঠিল—ঠাকুর পারবে না বাবা, আমি নিজে যাচ্চি। তুই আমার শোবার ঘরে একটা জায়গা করে দে।

খাইতে বসিয়া আমার গঙ্গামাটির শেষের দিনগুলোর কথা মনে পড়িল। তখন এই ঠাকুর ও এই রতনই আমার খাবার তত্ত্বাবধান করিত। তখন রাজলক্ষ্মীর খোঁজ লইবার সময় হইত না। আজ কিন্তু ইহাদের দিয়া চলিবে না—রান্নাঘরে তাহার নিজের যাওয়া চাই। কিন্তু এইটাই তাহার স্বভাব, ওটা ছিল বিকৃতি। বুঝিলাম, কারণ যাহাই হোক, আবার সে আপনাকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

খাওয়া সাঙ্গ হইলে রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, পুঁটুর বিয়ে কেমন হ'লো?

বলিলাম, চোখে দেখিনি, কানে শুনেছি ভালোই হয়েছে।

চোখে দেখনি? এতদিন তবে ছিলে কোথায়?

বিবাহের সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম, শুনিয়া সে ক্ষণকাল গালে হাত দিয়া থাকিয়া কহিল, অবাক্ করলে। আসবার আগে পুঁটুকে কিছু একটা যৌতুক দিয়েও এলে না?

সে আমার হয়ে তুমি দিও।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমার হয়ে কেন, নিজের হয়েই মেয়েটাকে কিছু পাঠিয়ে দেব।

কিন্তু ছিলে কোথায় বললে না?

বলিলাম, মুরারীপুরে বাবাজীদের আখড়ার কথা মনে আছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আছে বৈকি। বোষ্টুমীরা ওখান থেকেই ত পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করতে আসত। ছেলেবেলার কথা আমার খুব মনে আছে।

সেইখানেই ছিলাম।

শুনিয়া যেন রাজলক্ষ্মীর গায়ে কাঁটা দিল—সেই বোষ্টমদের আখড়ায়? মা গো মা—বল কি গো? তাদের যে শুনেচি সব ভয়ঙ্কর ইল্লুতে কাণ্ড! কিন্তু বলিয়াই সহসা উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া ফেলিল। শেষে মুখে আঁচল চাপিয়া কহিল, তা তোমার অসাধ্যি কাজ নেই। আরায় যে মূর্ত্তি দেখেচি! মাথায় জট পাকানো, গা-ময় রুদ্রাক্ষির মালা, হাতে পেতলের বালা—সে অপরূপ—

কথা শেষ করিতে পারিল না, হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। রাগ করিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিলাম। অবশেষে বিষম খাইয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া অনেক কষ্টে হাসি থামিলে বলিল, বোষ্টুমীরা কি বললে তোমায়? নাক-খাঁদা উল্কিপরা অনেকগুলো সেখানে থাকে যে গো!

আর একটা তেমনি প্রবল হাসির ঝোঁক আসিতেছিল, সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলাম, এবার হাসলে ভয়ানক শাস্তি দেব। কাল চাকরদের সামনে মুখ বার করতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে সরিয়া বসিল, মুখে বলিল, সে তোমার মত বীরপুরুষের কাজ নয়। নিজেই লজ্জায় বেরুতে পারবে না। সংসারে তোমার মত ভীতু মানুষ আর আছে নাকি?

বলিলাম, কিছুই জানো না লক্ষ্মী। তুমি অবজ্ঞা করলে, ভীতু বললে, কিন্তু সেখানে একজন বৈষ্ণবী বলত আমাকে অহঙ্কারী—দাম্ভিক।

কেন তার কি করেছিলে?

কিছুই না। সে আমার নাম দিয়েছিল নতুনগোঁসাই। বলতো, গোঁসাই, তোমার মত উদাসীন বৈরাগী-মনের চেয়ে দাম্ভিক মন পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

রাজলক্ষ্মীর হাসি থামিল, কহিল, কি বললে সে?

বললে, এরকম উদাসীন, বৈরাগী-মনের মানুষের চেয়ে দাম্ভিক ব্যক্তি দুনিয়ায় আর খুঁজে মেলে না। অর্থাৎ কিনা আমি দুর্দ্ধর্ষ বীর। ভীতু মোটেই নই।

রাজলক্ষ্মীর মুখ গম্ভীর হইল। পরিহাসে কানও দিল না, কহিল, তোমার উদাসী মনের খবর সে মাগী পেলে কি করে?

বলিলাম, বৈষ্ণবীদের প্রতি ওরূপ অশিষ্ট ভাষা অতিশয় আপত্তিকর।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা জানি। কিন্তু তিনি তোমার নাম ত দিলেন নতুনগোঁসাই—

তাঁর নামটি কি ?

কমললতা। কেউ কেউ রাগ করে কমলিলতাও বলে। বলে, ও যাদু জানে। বলে, ওর কীর্ত্তনগানে মানুষ পাগল হয়। সে যা চায় তাই দেয়।

তুমি শুনেচ ?

শুনেচি। চমৎকার।

ওর বয়েস কত ?

বোধ হয় তোমার মতই হবে। একটু বেশী হতেও পারে।

দেখতে কেমন ?

ভালো। অন্ততঃ মন্দ বলা চলে না। নাক-খাঁদা উল্কিপরা যাদের তুমি দেখেচ তাদের দলের নয়। এ ভদ্রঘরের মেয়ে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আমি ওর কথা শুনেই বুঝেচি। যে ক'দিন ছিলে তোমাকে যত্ন করত ত ?

বলিলাম, হাঁ। আমার কোন নালিশ নেই।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, তা করুক। যে সাধ্যি-সাধনায় তোমাকে পেতে হয় তাতে ভগবান মেলে। সে বোষ্টম-বৈরাগীর কাজ নয়। আমি ভয় করতে যাব কোথাকার কে এক কমললতাকে ? ছি! এই বলিয়া সে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়াও একটা বড় নিশ্বাস পড়িল। বোধ হয় একটু বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম, এই শব্দে হুঁস হইল। মোটা তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া চিত হইয়া তামাক টানিতে লাগিলাম। উপরে কোথায় একটা ছোট মাকড়সা ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাল বুনিতেছিল, উজ্জ্বল গ্যাসের আলোয় ছায়াটা তার মস্তবড় বীভৎস জন্তুর মত কড়িকাঠের গায়ে দেখাইতে লাগিল। আলোকের ব্যবধানে ছায়াটাও কত গুণেই না কায়াটাকে অতিক্রম করিয়া যায়।

রাজলক্ষ্মী ফিরিয়া আসিয়া আমারই বালিশের এককোণে কনুয়ের ভর দিয়া ঝুঁকিয়া বসিল। হাত দিয়া দেখিলাম তাহার কপালের চুলগুলা ভিজা। বোধ হয় এইমাত্র চোখেমুখে জল দিয়া আসিল।

প্রশ্ন করিলাম, লক্ষ্মী, হঠাৎ এরকম কলকাতায় চলে এলে যে ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, হঠাৎ মোটেই নয়। সেদিন থেকে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই এমন মন কেমন করতে লাগল যে কিছুতেই টিকতে পারলুম না, ভয় হ'লো বুঝি হার্টফেল করবো—এজন্মে আর চোখে দেখতে পাব না, এই বলিয়া সে গুড়গুড়ির নলটা আমার মুখ হইতে সরাইয়া দূরে ফেলিয়া দিল, বলিল, একটু থামো। ধুঁয়োর জালায় মুখ পর্য্যন্ত দেখতে পাইনে এমনি অন্ধকার করে তুলেচো।

গুড়গুড়ির নল গেল, কিন্তু পরিবর্ত্তে তাহার হাতটা রহিল আমার মুঠোর মধ্যে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্ধু আজকাল কি বলে?

রাজলক্ষ্মী একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, বৌমারা ঘরে এলে সব ছেলেই যা বলে তাই।

তার বেশী কিছু নয়?

কিছু নয় তা বলিনে, কিন্তু ও আমাকে কি দুঃখ দেবে? দুঃখ দিতে পার শুধু তুমি। তোমরা ছাড়া সত্যিকার দুঃখ মেয়েদের আর কেউ দিতে পারে না।

কিন্তু আমি কি দুঃখ কখনো তোমাকে দিয়েচি লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী অনাবশ্যক আমার কপালটা হাত দিয়া একবার মুছিয়া দিয়া বলিল, কখনো না। বরঞ্চ আমিই তোমাকে আজ পর্য্যন্ত কত দুঃখ দিলুম। নিজের সুখের জন্য তোমাকে লোকের চোখে হেয় করলুম, খেয়ালের ওপর তোমার অসম্মান হতে দিলুম – তার শাস্তি এখন তাই দু'কূল ভাসিয়ে দিয়ে চলচে। দেখতে পাচ্চ ত?

হাসিয়া বলিলাম, কই না!

রাজলক্ষ্মী বলিল, তাহলে মন্তর পড়ে কেউ দু'চোখে তোমার ঠুলি পরিয়ে দিয়েচে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, এত পাপ করেও সংসারে এত ভাগ্য আমার মত কারো কখনো দেখেচ? কিন্তু আমার তাতেও আশা মিটলো না, কোথা থেকে এসে জুটল ধর্ম্মের বাতিক, আমার হাতের লক্ষ্মীকে আমি পা দিয়ে ঠেলে দিলুম। গঙ্গামাটি থেকে চলে এসেও চৈতন্য হ'লো না, কাশী থেকে তোমাকে অনাদরে বিদায় দিলুম।

তাহার দুই চোখ জলে টলটল করিতে লাগিল, আমি হাত দিয়া মুছাইয়া দিলে বলিল, বিষের গাছ নিজের হাতে পুঁতে এইবার তাতে ফল ধরল। খেতে পারিনে, শুতে পারিনে, চোখের ঘুম গেল শুকিয়ে, এলোমেলো কত কি ভয় হয় তার মাথামুণ্ডু নেই—গুরুদেব তখন বাড়িতে ছিলেন, তিনি একটা কবজ হাতে বেঁধে দিলেন, বললেন, মা, সকাল থেকে এক আসনে তোমাকে দশ হাজার ইষ্টনাম জপ করতে হবে। কিন্তু, পারলুম কই? মনের মধ্যে হু-হু করে, পূজোয় বসলেই দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে—এমনি সময়ে এলো তোমার চিঠি। এতদিনে রোগ ধরা পড়ল।

কে ধরল—গুরুদেব? এবার বোধ হয় আর একটা কবজ লিখে দিলেন?

হাঁ গো দিলেন। বলে দিলেন সেটা তোমার গলায় বেঁধে দিতে।

তাই দিও, তাতে যদি তোমার রোগ সারে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সেই চিঠিখানা নিয়ে আমার দু'দিন কাটল। কোথা দিয়ে যে কাটল জানিনে। রতনকে ডেকে তার হাতে চিঠির জবাব পাঠিয়ে দিলুম।

গঙ্গায় স্নান করে অন্নপূর্ণার মন্দিরে দাঁড়িয়ে বললুম, মা, চিঠিখানা সময় থাকতে যেন তাঁর হাতে পড়ে। আমাকে আত্মহত্যা করে না মরতে হয়।

আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমাকে এমন করে বেঁধেছিলে কেন বলো ত?

সহসা জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারিলাম না। তারপর বলিলাম, এ তোমাদের মেয়েদেরই সম্ভব। এ আমরা ভাবতেও পারিনে, বুঝতেও পারিনে!

স্বীকার করো?

করি।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় একমুহূর্ত্ত আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, সত্যিই বিশ্বাস করো? এ আমাদেরই সম্ভব, পুরুষে সত্যিই এ পারে না।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। রাজলক্ষ্মী কহিল, মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখি আমাদের পাটনার লছমন সাউ। আমাকে সে বারাণসী কাপড় বিক্রী করত। বুড়ো আমাকে বড়ো ভালোবাসত, আমাকে বেটী বলে ডাকত। আশ্চর্য্য হয়ে বললে, বেটি, আপ ইঁহা? তার কলকাতায় দোকান ছিল জানতুম, বললুম, সাউজী, আমি কলকাতায় যাব, আমাকে একটি বাড়ি ঠিক করে দিতে পার?

সে বললে, পারি। বাঙালীপাড়ায় তার নিজেরই একখানা বাড়ি ছিল, সস্তায় কিনেছিল; বললে, চাও ত বাড়িটা আমি সেই টাকাতেই তোমাকে দিতে পারি।

সাউজী ধর্ম্মভীরু লোক, তার উপর আমার বিশ্বাস ছিল, রাজী হয়ে তাকে বাড়িতে ডেকে এনে টাকা দিলুম, সে রসিদ লিখে দিলে। তারই লোকজন এসব জিনিসপত্র কিনে দিয়েচে। ছ'-সাতদিন পরেই রতনদের সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এলুম, মনে মনে বললুম, অন্নপূর্ণা, দয়া তুমি আমাকে করেচ, নইলে এ সুযোগ কখনো ঘটত না। দেখা তাঁর আমি পাবই। এই ত দেখা পেলুম।

বলিলাম, কিন্তু আমাকে যে শীঘ্রই বর্ম্মা যেতে হবে লক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী বলিল, বেশ ত চল না। সেখানে অভয়া আছেন, দেশময় বুদ্ধদেবের বড় বড় মন্দির আছে—এসব দেখতে পাব।

কহিলাম, কিন্তু সে বড় নোঙরা দেশ লক্ষ্মী, শুচিবায়ুগ্রস্তদের বিচার-আচার থাকে না—সে দেশে তুমি যাবে কি করে?

রাজলক্ষ্মী আমার কানের উপর মুখ রাখিয়া চুপি চুপি কি একটা কথা বলিল, ভালো বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, আর একটু চেঁচিয়ে বলো শুনি।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না।

তারপর অসাড়ের মত তেমনিভাবেই পড়িয়া রহিল। শুধু তাহার উষ্ণ ঘন নিশ্বাস আমার গলার উপরে, গালের উপরে আসিয়া পড়িতে লাগিল।

ওঠো, ওঠো! কাপড় ছেড়ে মুখহাত ধোও—রতন চা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে যে।

আমার সাড়া না পাইয়া রাজলক্ষ্মী পুনরায় ডাকিল, বেলা হ'লো—কত ঘুমোবে?

পাশ ফিরিয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিলাম, ঘুমোতে দিলে কই? এই ত সবে শুয়েচি।

কানে গেল টেবিলের উপর চায়ের বাটিটা রতন ঠক্‌ করিয়া রাখিয়া দিয়া বোধ হয় লজ্জায় পলায়ন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ছি ছি, কি বেহায়া তুমি! মানুষকে মিথ্যে কি অপ্রতিভ করতেই পারো। নিজে সারারাত কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোলে, বরঞ্চ আমিই জেগে বসে পাখার বাতাস করলুম পাছে গরমে তোমার ঘুম ভেঙে যায়। আবার আমাকেই এই কথা! ওঠো বলচি, নইলে গায়ে জল ঢেলে দোব।

উঠিয়া বসিলাম। বেলা না হইলেও তখন সকাল হইয়াছে, জানালাগুলি খোলা। সকালের সেই স্নিগ্ধ আলোকে রাজলক্ষ্মীর কি অপরূপ মূর্ত্তিই চোখে পড়িল। তাহার স্নান, পূজা-আহ্নিক সমাপ্ত হইয়াছে, গঙ্গার ঘাটে উড়ে-পাণ্ডার দেওয়া শ্বেত ও রক্ত-চন্দনের তিলক তাহার ললাটে, পরনে নূতন রাঙা বারাণসী শাড়ি, পূবের জানালা দিয়া একটুকরা সোনালী রোদ আসিয়া বাঁকা হইয়া তাহার মুখের একাধারে পড়িয়াছে, সলজ্জ কৌতুকের চাপাহাসি তাহার ঠোঁটের কোণে, অথচ কৃত্রিম ক্রোধে আকুঞ্চিত ভ্রূ দুটির নীচে চঞ্চল চোখের দৃষ্টি যেন উচ্ছল আবেগে ঝলমল করিতেছে, চাহিয়া আজও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, কাল থেকে কি অত দেখচ বলো ত?

কহিলাম, তুমিই বলো ত কি অত দেখচি?

রাজলক্ষ্মী আবার একটু হাসিয়া বলিল, বোধ হয় দেখচ এর চেয়ে পুঁটু দেখতে ভালো কিনা, কমললতা দেখতে ভালো কিনা—না?

বলিলাম, না। রূপের দিক দিয়ে কেউ তারা তোমার কাছেও লাগে না সে এমনিই বলা যায় অত করে দেখতে হয় না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সে যাক গে? কিন্তু গুণে?

গুণে? সে বিষয়ে অবশ্য মতভেদের সম্ভাবনা আছে তা মানতেই হবে।

গুণের মধ্যে ত শুনলুম কেত্তন করতে পারে।

হাঁ, চমৎকার।

চমৎকার—তা তুমি বুঝলে কি করে?

বাঃ—তা আর বুঝিনে? বিশুদ্ধ তাল, লয়, সুর—

রাজলক্ষ্মী বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, তাল কাকে বলে ?

বলিলাম, তাল তাকে বলে ছেলেবেলায় যা তোমার পিঠে পড়ত। মনে নেই ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, নেই আবার! সে আমার খুব মনে আছে। কাল থামোকা তোমায় ভীতু বলে অসম্মান করেচি বই ত নয়, কিন্তু কমললতা শুধু তোমার উদাসীমনের খবরটাই পেলে, তোমার বীরত্বের কাহিনীটা শোনেনি বুঝি ?

না, আত্মপ্রশংসা আপনি করতে নেই, সে তুমি শুনিয়ো। কিন্তু তার গলা সুন্দর, গান সুন্দর, তাতে সন্দেহ নেই।

আমারও নেই। বলিয়াই সহসা তাহার দুই চক্ষু প্রচ্ছন্ন কৌতুকে জলিয়া উঠিল, কহিল, হাঁ গা, তোমার সেই গানটি মনে আছে ? সেই যে পাঠশালায় ছুটি হলে তুমি গাইতে, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতুম—সেই—কোথা গেলি প্রাণের প্রাণ বাপ দুর্য্যোধন রে-এ-এ-এ-এ—

হাসি চাপিতে সে মুখে আঁচল চাপা দিল, আমিও হাসিয়া ফেলিলাম।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু বড্ড ভাবের গান। তোমার মুখে শুনলে গোরু-বাছুরের চোখেও জল এসে পড়ত—মানুষ ত কোন্ ছার।

রতনের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। অনতিবিলম্বে সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আবার চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েচি মা, তৈরি হতে দেরি হবে না। এই বলিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া চায়ের বাটিটা হাতে তুলিয়া লইল।

রাজলক্ষ্মী আমাকে বলিল, আর দেরি ক'রো না, ওঠো। এবার চা ফেলা গেলে রতন ক্ষেপে যাবে! ওর অপব্যয় সহ্য হয় না। কি বলিস্ রতন ?

রতন জবাব দিতে জানে। কহিল, আপনার না সইতে পারে মা, কিন্তু বাবুর জন্যে আমার সব সয়। এই বলিয়া সে বাটিটা লইয়া চলিয়া গেল। তাহার রাগ হইলে রাজলক্ষ্মীকে সে 'আপনি' বলিত, না হইলে, 'তুমি' বলিয়া ডাকিত।

রাজলক্ষ্মী বলিল, রতন তোমাকে সত্যই বড্ড ভালোবাসে।

বলিলাম, আমারও তাই মনে হয়।

হাঁ। কাশী থেকে তুমি চলে এলে ও ঝগড়া করে আমার কাজ ছেড়ে দিলে। রাগ করে বললুম, আমি যে তোর এত করলুম রতন, তার কি এই প্রতিফল ? ও বললে, রতন নেমকহারাম নয় মা। আমিও চললুম বর্ম্মায়, তোমার ঋণ আমি বাবুর সেবা করে শোধ দেব। তখন হাতে ধরে, ঘাট মেনে তবে ওকে শান্ত করি।

একটু থামিয়া বলিল, তারপরে তোমার বিয়ের নেমতন্নপত্র এলো।

বাধা দিয়া বলিলাম, মিছে কথা ব'লো না। তোমার মতামত জানার জন্যে—

এবার সেও আমাকে বাধা দিল, কহিল, হাঁগো হাঁ, জানি। রাগ করে যদি লিখতুম করো গে—করতে ত ?

না।

না বই কি। তোমরা সব পার।

না, সবাই সব কাজ পারে না।

না, রাজলক্ষ্মী বলিতে লাগিল, কি জানি রতন মনে মনে কি বুঝলে, কেবলি দেখি আমার মুখের পানে চেয়ে তার দু'চোখ ছলছল করে আসে। তারপরে, তার হাতে যখন চিঠির জবাব দিলুম ডাকে ফেলতে, সে বললে, মা, এ চিঠি ডাকে ফেলতে পারব না—আমি নিজে নিয়ে যাব হাতে করে। বললুম, মিথ্যে কতকগুলো টাকা খরচ করে লাভ কি বাবা? রতন চোখটা হঠাৎ মুছে ফেলে বললে, কি হয়েচে আমি জানিনে মা, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় যেন পদ্মাতীরের তলা ক্ষয়ে গেছে—গাছপালা, বাড়িঘর নিয়ে কখন যে তলিয়ে যাবে তার ঠিকানা নেই! তোমার দয়ায় আমারও আর অভাব নেই মা—এ টাকা তুমি দিলেও আমি নিতে পারব না, কিন্তু বিশ্বনাথ মুখে তুলে যদি চান, আমার দেশের কুঁড়েতে তোমার দাসীটাকে কিছু প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়ো, সে বর্ত্তে যাবে।

বলিলাম, ব্যাটা নাপতে কি সেয়ানা!

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিল। বলিল, কিন্তু আর দেরি ক'রো না যাও।

দুপুরবেলা আমাকে সে খাওয়াইতে বসিলে বলিলাম, কাল পরনে ছিল আট-পৌরে কাপড়, আজ সকাল থেকে বারাণসী শাড়ির সমারোহ কেন বলো ত?

তুমি বলো ত কেন?

আমি জানিনে।

নিশ্চয় জানো। এ কাপড়খানা চিনতে পারো?

তা পারি। বর্ম্মা থেকে আমি কিনে পাঠিয়েছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সেদিন আমি ভেবে রেখেছিলুম জীবনের সবচেয়ে বড় দিনটিতে এটি পরব—তা ছাড়া কখনো পরব না।

তাই পরেচ আজ?

হাঁ, তাই পরেচি আজ।

হাসিয়া বলিলাম, কিন্তু সে ত হয়েচে, এখন ছাড়ো গে?

সে চুপ করিয়া রহিল। বলিলাম, খবর পেলাম তুমি এখুনি নাকি কালীঘাটে যাবে?

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এখনি? সে কি করে হবে? তোমাকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ত তবে ছুটি পাব।

বলিলাম, না, তখনো পাবে না। রতন বলছিল তোমার খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে এসেচে, শুধু কাল দুটিখানি খেয়েছিলে, আবার আজ থেকে শুরু হয়েচে উপবাস। আমি কি স্থির করেচি জানো? এখন থেকে তোমাকে কড়া শাসনে রাখব, যা খুশি তাই আর করতে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, তা হলে ত বাঁচি গো মশাই! খাইদাই থাকি, কোন ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না।

কহিলাম, সেইজন্যেই আজ তুমি কালীঘাটে যেতে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি, শুধু আজকের দিনটি আমাকে ভিক্ষে দাও, তারপরে আগেকার দিনে নবাব-বাদশাদের যেমন কেনা-বাঁদী থাকত তার বেশী তোমার কাছে চাইব না।

এত বিনয় কেন বলো ত?

বিনয় ত নয়, সত্যি আপনার ওজন বুঝে বলিনি, তোমাকে মানিনি তাই অপরাধের পরে অপরাধ করে কেবলই সাহস বেড়ে গেছে। আজ আমার সেই লক্ষ্মীর অধিকার তোমার কাছে আর নেই—নিজের দোষে হারিয়ে বসে আছি।

চাহিয়া দেখিলাম তাহার চোখে জল আসিয়াছে, বলিল, শুধু আজকের দিনটির জন্য হুকুম দাও, আমি মায়ের আরতি দেখে আসি গে।

বলিলাম, না হয় কাল যেয়ো। নিজেই বললে সারারাত জেগে বসে আমার সেবা করেচ—আজ তুমি বড় শ্রান্ত।

না, আমার কোন শ্রান্তি নেই। শুধু আজ বলে নয়, কত অসুখেই দেখেচি রাতের পর রাত জেগেও তোমার সেবায় আমার কষ্ট হয় না। কিসে আমার সমস্ত অবসাদ যেন মুছে দিয়ে যায়! কতদিন হ'লো ঠাকুর-দেবতা ভুলে ছিলুম, কিছুতে মন দিতে পারিনি—লক্ষ্মীটি, আজ আমাকে মানা ক'রো না—যাবার হুকুম দাও।

তবে চলো, দু'জনে একসঙ্গে যাই।

রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু উল্লাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, তাই চলো। কিন্তু মনে মনে ঠাকুর-দেবতাকে তাচ্ছিল্য করবে না ত?

বলিলাম, শপথ করতে পারব না, বরঞ্চ তোমার পথ চেয়ে আমি মন্দিরের দোরে দাঁড়িয়ে থাকব। আমার হয়ে দেবতার কাছে তুমি বর চেয়ে নিয়ো।

কি বর চাইব বলো।

অন্নের গ্রাস মুখে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন কামনাই খুঁজিয়া পাইলাম না। সেকথা স্বীকার করিয়া প্রশ্ন করিলাম, তুমি বলো ত লক্ষ্মী, কি আমার জন্যে তুমি চাইবে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাইব আয়ু, চাইব স্বাস্থ্য, আর চাইব আমার ওপর এখন থেকে যেন তুমি কঠিন হতে পার, প্রশ্রয় দিয়ে আর যেন না আমার তুমি সর্ব্বনাশ করো। করতেই ত বসেছিলে।

লক্ষ্মী, এ হ'লো তোমার অভিমানের কথা।

অভিমান ত আছেই। তোমার সে চিঠি কখনো কি ভুলতে পারব!

অধোমুখে নীরব হইয়া রহিলাম।

সে হাত দিয়া আমার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, তা বলে এও আমার সয় না। কিন্তু কঠোর হতে ত তুমি পারবে না, সে তোমার স্বভাব নয়, কিন্তু একাজ আমাকে এখন থেকে নিজেই করতে হবে, অবহেলা করলে চলবে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, কাজটা কি? আরও খাড়া উপোস?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, উপোসে আমার শাস্তি হয় না, বরং অহঙ্কার বাড়ে। ও আমার পথ নয়।

তবে পথটা কি ঠাওরালে?

ঠাওরাতে পারিনি, খুঁজে বেড়াচ্ছি।

আচ্ছা, সত্যিই আমি কখনো কঠিন হতে পারি এ তোমার বিশ্বাস হয়?

হয় গো হয়—খুব হয়।

কখ্‌খনো হয় না—এ তোমার মিছে কথা।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, মিছে কথাই ত। কিন্তু সেই হয়েচে আমার বিপদ গোঁসাই। কিন্তু বেশ নামটি বার করেচে তোমার কমললতা। কেবল ওগো হ্যাগো করে প্রাণ যায়—এখন থেকে আমিও ডাকব নতুনগোঁসাইজী বলে।

স্বচ্ছন্দে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তবু হয়ত আচমকা কখনো কমললতা বলে ভুল হবে, তাতেও স্বস্তি পাব। বলো, ঠিক না?

হাসিলাম, লক্ষ্মী, স্বভাব কখনো মলেও যায় না। বাদশাহী আমলের কেনা-বাঁদীদের মত কথাই হচ্ছে বটে। এতক্ষণে তারা তোমাকে জল্লাদের হাতে সঁপে দিত।

শুনিয়া রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, জল্লাদের হাতে নিজেই ত সঁপে দিয়েচি।

বলিলাম, চিরকাল তুমি এত দুষ্ট যে, কোন জল্লাদের সাহস নেই তোমাকে শাসন করে।

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে গিয়াই তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, এ কি! খাওয়া হয়ে এলো যে! দুধ কই? মাথা খাও, উঠে প'ড়ো না যেন। বলিতে বলিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, এ, আর সেই কমললতা!

মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া পাতের কাছে দুধের বাটি রাখিয়া পাখা-হাতে সে বাতাস করিতে বসিল, বলিল, এতকাল মনে হ'ত, এ নয়—কোথায় যেন আমার পাপ আছে। তাই, গঙ্গামাটিতে মন বসল না, ফিরে এলুম কাশীধামে। গুরুদেবকে ডাকিয়ে এনে চুল কেটে গয়না খুলে একেবারে তপস্যা জুড়ে দিলুম। ভাবলুম, আর ভাবনা নেই, স্বর্গের সোনার সিঁড়ি তৈরী হ'লো বলে। এক আপদ তুমি সে ত বিদায় হ'লো। কিন্তু সেদিন থেকে চোখের জল যে কিছুতে থামে না। ইষ্টমন্ত্র গেলুম ভুলে ঠাকুর-দেবতা করলে অন্তর্দ্ধান, বুক উঠল শুকিয়ে, ভয় হ'লো এই যদি ধর্ম্মের সাধনা তবে এসব হচ্চে কি! শেষে পাগল হবো নাকি?

আমি মুখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলাম, বলিলাম, তপস্যার গোড়াতে দেবতারা সব ভয় দেখান! টিকে থাকলে তবে সিদ্ধিলাভ হয়।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সিদ্ধিতে আমার কাজ নেই, সে আমি পেয়েচি।

কোথায় পেলে?

এখানে। এই বাড়িতে।

অবিশ্বাস্য। প্রমাণ দাও।

প্রমাণ দিতে যাব তোমার কাছে! আমার বয়ে গেছে।

কিন্তু ক্রীতদাসীরা এরূপ উক্তি কদাচ করে না।

দ্যাখো, রাগিও না বলচি। একশোবার ক্রীতদাসী-ক্রীতদাসী করো ত ভালো হবে না।

আচ্ছা, খালাস দিলাম। এখন থেকে তুমি স্বাধীন।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, স্বাধীন যে কত, এবার তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েচি। কাল কথা কইতে কইতে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, আমার গলার ওপর থেকে তোমার হাতখানি সরিয়ে রেখে আমি উঠে বসলুম। হাত দিয়ে দেখি ঘামে তোমার কপাল ভিজে—আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে একখানা পাখা নিয়ে বসলুম, মিটমিটে আলোটা দিলুম উজ্জ্বল করে, তোমার ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়ে চোখ আর ফিরুতে পারলুম না। এ যে এত সুন্দর এর আগে কেন চোখে পড়েনি? এতদিন কানা হয়ে ছিলুম কি? ভাবলুম, এ যদি পাপ তবে পুণ্যে আমার কাজ নেই, এ যদি অধর্ম্ম তবে থাক গে আমার ধর্ম্মচর্চ্চা—জীবনে এই যদি হয় মিথ্যে তবে জ্ঞান না হতেই বরণ করেছিলুম একে কার কথায়? ও কি, খাচ্চো না যে? সব দুধই পড়ে রইল যে।

আর পারিনে।

তবে কিছু ফল নিয়ে আসি?

না, তাও না।

কিন্তু বড় রোগা হয়ে গেছ যে।

যদি হয়েও থাকি সে অনেক দিনের অবহেলায়। একদিনে সংশোধন করতে চাইলেই মারা যাব।

বেদনায় মুখ তাহার পাংশু হইয়া উঠিল, কহিল, আর হবে না। যে শাস্তি পেলুম সে আর ভুলব না। এই আমার মস্ত লাভ। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, ভোর হলে উঠে এলুম। ভাগ্যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা অল্পে ভাঙে না, নইলে লোভের বশে তোমাকে জাগিয়ে ফেলেছিলুম আর কি! তারপর দরোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা নাইতে গেলুম—মা যেন সব তাপ মুছে নিলেন। বাড়ি এসে আহ্নিকে বসলুম, দেখতে পেলুম তুমি কেবল একাই ফিরে আসোনি, সঙ্গে ফিরে এসেচে আমার পূজার মন্ত্র। এসেচেন আমার ইষ্টদেবতা, গুরুদেব—এসেচে আমার শ্রাবণের মেঘ। আজও চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, কিন্তু সে আমার বুকের রক্ত নেঙড়ানো অশ্রু নয়, আমার আনন্দের উপচে-ওঠা ঝরনার ধারা—আমার সকল দিক ভিজিয়ে দিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে, বয়ে গেল। আনি গো দুটো ফল? বঁটি নিয়ে কাছে বসে নিজের হাতে বানিয়ে অনেকদিন তোমায় খেতে দিইনি—যাই? কেমন?

যাও।

রাজলক্ষ্মী তেমনি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

আমার আবার নিশ্বাস পড়িল। এ, আর সেই কমললতা!

কি জানি কে উহার জন্মকালে সহস্র নামের মধ্যে বাছিয়া তাহার রাজলক্ষ্মী নাম দিয়াছিল!

দু'জনে কালীঘাট হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন রাত্রি ন'টা। রাজলক্ষ্মী স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া সহজ-মানুষের মত কাছে আসিয়া বসিল।

বলিলাম, রাজপোশাক গেছে—বাঁচলাম।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ও আমার রাজপোশাকই বটে। কিন্তু রাজার দেওয়া যে! যখন মরব, ঐ কাপড়খানা আমাকে পরিয়ে দিতে ব'লো।

তাই হবে। কিন্তু সারাদিন ধরে আজ কি তুমি শুধু স্বপ্ন দেখেই কাটাবে, এইবার কিছু খাও।

খাই।

রতনকে বলে দিই ঠাকুর এইখানে তোমার খাবার দিয়ে যাক।

এইখানে ? বেশ যা হোক ! তোমার সামনে বসে আমি খাবো কেন ? কখনো দেখেচ খেতে ?

দেখিনি, কিন্তু দেখলে দোষ কি ?

তা কি হয়। মেয়েদের রাক্ষুসে খাওয়া তোমাদের আমরা দেখতেই বা দেবো কেন ?

ও ফন্দী আজ খাটবে না লক্ষ্মী ! তোমাকে অকারণ উপোস করতে আমি কিছুতেই দেবো না। না খেলে তোমার সঙ্গে আমি কথা কবো না।

নাই বা কইলে।

আমিও খাব না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, এইবার জিতেচ। এ আমার সইবে না।

ঠাকুর খাবার দিয়ে গেল, ফল-মূল-মিষ্টান্ন। সে নামমাত্র আহার করিয়া বলিল, রতন তোমাকে নালিশ জানিয়েচে আমি খাইনে, কিন্তু কি করে খাব বলো তা ? কলকাতায় এসেছিলুম হারা-মকদ্দমার আপীল করতে। তোমার বাসা থেকে প্রত্যহ রতন ফিরে আসত, আমি ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারতুম না পাছে সে বলে, দেখা হয়েচে, কিন্তু বাবু এলেন না। যে দুর্ব্যবহার করেচি আমার বলবার ত কিছুই নেই।

বলবার দরকার ত নেই। তখন বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকা ধরে নিয়ে যায় তেমনি নিয়ে যেতে।

কে তেলাপোকা—তুমি ?

তাই ত জানি। এমন নিরীহ জীব সংসারে কে আছে ?

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, অথচ তোমাকেই মনে মনে আমি যত ভয় করি এমন কাউকে নয়।

এটি পরিহাস। কিন্তু হেতু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

রাজলক্ষ্মী আবার ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তার হেতু তোমাকে আমি চিনি। আমি জানি মেয়েদের দিকে তোমার সত্যিকার আসক্তি এতটুকু নেই, যা আছে তা লোকদেখানো শিষ্টাচার। সংসারে কোন কিছুতেই তোমার লোভ নেই, যথার্থ প্রয়োজনও নেই। তুমি 'না' বললে তোমাকে ফেরাব কি দিয়ে ?

বলিলাম, একটু ভুল হ'লো লক্ষ্মী। পৃথিবীর একটি জিনিসে আজও লোভ আছে—সে তুমি। কেবল ঐখানে 'না' বলতে বাধে। ওর বদলে দুনিয়ার সব কিছু যে ছাড়তে পারি, শ্রীকান্তের এই জানাটাই আজও তুমি জানতে পারনি।

হাতটা ধুয়ে আসি গে, বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল

পরদিন দিনের ও দিনান্তের সর্ব্ববিধ কাজকর্ম্ম সারিয়া রাজলক্ষ্মী আসিয়া আমার কাছে বসিল। কহিল, কমললতার গল্প শুনবো, বলো।

যতটা জানি সমস্তই বলিলাম, শুধু নিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু বাদ দিলাম, কারণ ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা।

আগাগোড়া মন দিয়া শুনিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, যতীনের মরণটাই ওকে সবচেয়ে বেজেচে। ওর দোষেই সে মারা গেল।

ওর দোষ কিসে ?

দোষ বইকি। কলঙ্ক এড়াতে ওকেই ত কমললতা ডেকেছিল সকলের আগে আত্মহত্যায় সাহায্য করতে। সেদিন যতীন স্বীকার করতে পারেনি, কিন্তু আর একদিন নিজের কলঙ্ক এড়াতে তার ঐ পথটাই সকলের আগে চোখে পড়ে গেল। এমনি হয়, তাই পাপের সহায় হতে বন্ধুকে ডাকতে নেই—তাতে একের প্রায়শ্চিত্ত পড়ে অপরের ঘাড়ে। ও নিজে বাঁচল, কিন্তু ম'লো তার স্নেহের ধন।

যুক্তিটা ভালো বোঝা গেল না লক্ষ্মী।

তুমি বুঝবে কি করে ? বুঝেচে কমললতা, বুঝেচে তোমার রাজলক্ষ্মী।

ওঃ—এই ?

এই বইকি ! আমার বাঁচা কতটুকু বলো ত যখন চেয়ে দেখি তোমার পানে।

কিন্তু কালই যে বললে তোমার মনের সব কালি মুছে গিয়েছে—আর কোন গ্লানি নেই—সে কি তবে মিছে ?

মিছেই ত। কালি মুছবে ম'লে—তার আগে নয়। মরতেও চেয়েচি, কিন্তু পারিনে কেবল তোমারই জন্যে !

তা জানি। কিন্তু এ নিয়ে বার বার যদি ব্যথা দাও, আমি এমনি নিরুদ্দেশ হবো, কোথাও আর আমাকে খুঁজে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া একেবারে বুকের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল, বলিল, এমন কথা আর কখনো মুখেও এনো না। তুমি সব পারো, তোমার নিষ্ঠুরতা কোথাও বাধা মানে না।।

এমন কথা আর বলবে না বলো ?

না।

ভাববে না বলো ?

তুমি বলো আমাকে ফেলে কখনো যাবে না ?

আমি ত কখনো যাইনে লক্ষ্মী, যখনি দূরে গেছি—তুমি শুধু চাওনি বলেই।

সে তোমার লক্ষ্মী নয়—সে আর কেউ।

সেই আর কেউকেই আজও ভয় করি যে।

না, তাকে আর ভয় ক'রো না, সে রাক্ষুসী মরেচে। এই বলিয়া সে আমার সেই হাতটাকেই খুব জোর করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবে থাকিয়া হঠাৎ সে অন্য কথা পাড়িল, বলিল, তুমি কি সত্যিই বর্মাই যাবে?

সত্যিই যাবো।

কি করবে গিয়ে—চাকরি? কিন্তু আমরা ত দু'জন—কতটুকুতেই বা আমাদের দরকার?

কিন্তু সেটুকুও ত চাই!

সে ভগবান দিয়ে দেবেন। কিন্তু চাকরি করতে তুমি পারবে না, ও তোমার ধাতে পোষাবে না।

না পোষালে চলে আসব।

আসবেই জানি। শুধু আড়ি করে অতদূরে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দিতে চাও।

কষ্ট না করলেই পার।

রাজলক্ষ্মী ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করিয়া বলিল, যাও, চালাকি করো না।

বলিলাম চালাকি করিনি, গেলে তোমার সত্যিই কষ্ট হবে। রাঁধাবাড়া, বাসন-মাজা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বিছানা-পাতা—

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবে ঝি-চাকরেরা করবে কি?

কোথায় ঝি-চাকর? তার টাকা কৈ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, নাই থাক। কিন্তু যতই ভয় দেখাও আমি যাবই।

চলো। শুধু তুমি আর আমি। কাজের তাড়ায় না পাবে ঝগড়া করবার অবসর, না পাবে পূজো-আহ্নিক-উপোস করার ফুরসত।

তা হোক গে। কাজকে আমি কি ভয় করি নাকি?

করো না সত্যি, কিন্তু পেরেও উঠবে না, দু'দিন বাদেই ফেরবার তাড়া লাগাবে।

তাতেই বা ভয় কিসের? সঙ্গে করে নিয়ে যাব, সঙ্গে করে ফিরিয়ে আনব। রেখে আসতে হবে না ত। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, সেই ভালো। দাসদাসী লোকজন কেউ নেই, একটি ছোট্ট বাড়িতে শুধু তুমি আর আমি—যা খেতে দেব তাই খাবে, যা পরতে দেব তাই পরবে—না, তুমি দেখো, আমি হয়ত আর আসতেই চাইব না।

সহসা আমার কোলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কি ভাবচ?

রাজলক্ষ্মী চোখ চাহিয়া একটু হাসিল, আমরা কবে যাব?

বলিলাম, এই বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করে নাও, তারপরে যেদিন ইচ্ছে চল যাত্রা করি।

সে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া আবার চোখ বুজিল।

আবার কি ভাবচ?

রাজলক্ষ্মী চাহিয়া বলিল, ভাবচি একবার মুরারীপুরে যাবে না?

বলিলাম, বিদেশে যাবার পূর্ব্বে একবার দেখা দিয়ে আসব তাঁদের কথা দিয়েছিলাম।

তবে চল কালই দু'জনে যাই।

তুমি যাবে?

কেন ভয় কিসের? তোমাকে ভালোবাসে কমললতা, আর তাকে ভালবাসে আমার গহরদাদা। এ হয়েচে ভালো।

এসব কে তোমাকে বললে?

তুমিই বলেচ।

না, আমি বলিনি।

হাঁ, তুমিই বলেচ, শুধু জানো না কখন বলেচ।

শুনিয়া সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, সে যাই হোক, সেখানে যাওয়া তোমার উচিত নয়!

কেন নয়?

সে বেচারাকে ঠাট্টা করে তুমি অস্থির করে তুলবে।

রাজলক্ষ্মী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, কুপিত-কণ্ঠে কহিল, এতকালে আমার এই পরিচয় পেয়েচ তুমি? তোমাকে সে ভালবাসে এই নিয়ে তাকে লজ্জা দিতে যাবো আমি? তোমাকে ভালবাসা কি অপরাধ? আমিও ত মেয়েমানুষ। হয়ত বা তাকে আমিও ভালোবেসে আসব।

কিছুই তোমার অসম্ভব নয় লক্ষ্মী—চল যাই।

হাঁ চল, কাল সকালের গাড়িতেই বেরিয়ে পড়ব দু'জনে—তোমার কোন ভাবনা নেই—এ জীবনে তোমাকে অসুখী করব না আমি কখনো।

বলিয়াই সে কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া পড়িল। চক্ষু নিমীলিত, শ্বাসপ্রশ্বাস থামিয়া আসিতেছে—সহসা সে যেন কোথায় কতদূরেই না সরিয়া গেল।

ভয় পাইয়া একটা নাড়া দিয়া বলিলাম, ও কি।

রাজলক্ষ্মী চোখ মেলিয়া চাহিল, একটু হাসিয়া কহিল, কৈ না—কিছু ত নয়!

তাহার এই হাসিটাও আজ যেন আমার কেমনধারা লাগিল।

১১

পরদিন আমার অনিচ্ছায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। কিন্তু পরের দিন আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না, মুরারিপুর আখড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেই হইল। রাজলক্ষ্মীর বাহন রতন, সে নহিলে কোথাও পা বাড়ানো চলে না, কিন্তু রান্নাঘরের দাসী লালুর মাও সঙ্গে চলিল। কতক জিনিসপত্র লইয়া রতন ভোরের গাড়িতে রওনা হইয়া গিয়াছে, সেখানকার স্টেশনে নামিয়া সে খান-দুই ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া রাখিবে। আবার আমাদের সঙ্গের মোটঘাট যাহা বাঁধা হইয়াছে তাহাও কম নয়।

প্রশ্ন করিলাম, সেখানে বসবাস করতে চললে নাকি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, দু'-একদিন থাকব না? দেশের বনজঙ্গল, নদীনালা, মাঠঘাট তুমি একলা দেখে আসবে, আর আমি কি সে-দেশের মেয়ে নই? আমার দেখতে সাধ যায় না?

তা যায় মানি, কিন্তু এত জিনিসপত্র, এত রকমের খাবার-দাবার আয়োজন—

রাজলক্ষ্মী বলিল, ঠাকুরের স্থানে কি শুধুহাতে যেতে বলো? আর তোমাকে ত বইতে হবে না, তোমার ভাবনা কিসের?

ভাবনা যে কত ছিল সে আর বলিব কাহাকে? আর এই ভয়টাই বেশী ছিল যে, বৈষ্ণব-বৈরাগীর ছোঁয়া ঠাকুরের প্রসাদ সে স্বচ্ছন্দে মাথায় তুলিবে কিন্তু মুখে তুলিবে না। কি জানি সেখানে গিয়া কোন একটা ছলে উপবাস শুরু করিবে, না রাঁধিতে বসিবে বলা কঠিন। কেবল একটা ভরসা ছিল মনটি রাজলক্ষ্মীর সত্যকার ভদ্র মন। অকারণে গায়ে পড়িয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে পারে না। যদি-বা এসব কিছু করে, হাসিমুখে রহস্যে-কৌতুকে এমন করিয়াই করিবে যে আমি ও রতন ছাড়া আর কেহ বুঝিতেও পারিবে না।

রাজলক্ষ্মীর দৈহিক ব্যবস্থায় বাহুল্যভার কোনকালেই নাই, তাহাতে সংযম ও উপবাসে সেই দেহটাকে যেন লঘুতার একটি দীপ্তি দান করিয়াছে। বিশেষ করিয়া তাহার আজিকার সাজসজ্জাটি হইয়াছে বিচিত্র। প্রত্যূষে স্নান করিয়া আসিয়াছে, গঙ্গার ঘাটে উড়েপাণ্ডার সযত্ন-রচিত অলকা তিলকা তাহার ললাটে, পরণে তেমনি নানা ফুলে-ফুলে লতায়-পাতায় বিচিত্র খয়ের রঙের বৃন্দাবনী শাড়ি, গায়ে সেই কয়টি অলঙ্কার, মুখের 'পরে স্নিগ্ধ-প্রসন্নতা—আপন মনে কাজে ব্যাপৃত। কাল গোটা-দুই লম্বা আয়না লাগানো আলমারি কিনিয়া আনিয়াছে, আজ যাইবার পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি করিয়া কি সব তাহাতে সে গুছাইয়া তুলিতেছিল। কাজের সঙ্গে হাতের বালার হাঙ্গরের চোখ দুটো মাঝে মাঝে জ্বলিয়া উঠিতেছে, হীরা ও পান্না বসানো গলার হারের

বিভিন্ন বর্ণচ্ছটা পাড়ের ফাঁক দিয়া ঝলকিয়া উঠিতেছে, তাহার কানের কাছেও কি যেন একটা নীলাভ দ্যুতি, টেবিলে চা খাইতে বসিয়া আমি একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া ছিলাম। তাহার একটা দোষ ছিল বাড়িতে সে জামা অথবা সেমিজ পরিত না। তাই কণ্ঠ ও বাহুর অনেকখানি হয়ত অসর্তক মুহূর্ত্তে অনাবৃত হইয়া পড়িত, অথচ বলিলে হাসিয়া কহিত, অত পারিনে বাপু। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, দিনরাত বিবিয়ানা আর সয় না। অর্থাৎ জামাকাপড়ের বেশী বাঁধাবাঁধি শুচিবায়ু-গ্রস্তদের অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

আলমারির পাল্লা বন্ধ করিয়া হঠাৎ আয়নায় তাহার চোখ পড়িল আমার 'পরে। তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় সামালাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, রাগিয়া বলিল, আবার চেয়ে আছে? এবার বারে বারে কি আমাকে এত দেখো বলো ত? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

আমি হাসিলাম, বলিলাম, ভাবছিলাম বিধাতাকে ফরমাস দিয়ে না জানি কে তোমাকে গড়িয়েছিল।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি। নইলে এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দ আর কার? আমার পাঁচ-ছ'বছর আগে এসেচ, আসবার সময় তাঁকে বায়না দিয়ে এসেছিলে—মনে নেই বুঝি?

না, কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

চালান দেবার সময় কানে কানে তিনি বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু হ'লো চা খাওয়া? দেরি করলে যে আজও যাওয়া হবে না।

নাই বা হ'লো।

কেন বলো ত?

সেখানে ভিড়ের মধ্যে হয়ত তোমাকে খুঁজে পাব না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমাকে পাবে। আমি তোমাকে খুঁজে পেলে বাঁচি।

বলিলাম, সেও ত ভালো নয়।

সে হাসিয়া কহিল, না, সে হবে না। লক্ষ্মীটি চল। শুনেচি নতুনগোঁসাইয়ের সেখানে একটা আলাদা ঘর আছে, আমি গিয়েই তার খিলটা ভেঙে রেখে দেব। ভয় নেই, খুঁজতে হবে না—দাসীকে এমনই পাবে।

তবে চলো।

আমরা মঠে গিয়ে যখন উপস্থিত হইলাম তখন ঠাকুরের মধ্যাহ্নকালীন পূজা সেইমাত্র সমাপ্ত হইয়াছে। বিনা আহ্বানে, বিনা সংবাদে এতগুলি প্রাণী অকস্মাৎ গিয়া হাজির, তথাপি কি যে তাহারা খুশী হইল বলিতে পারি না। বড়গোঁসাই আশ্রমে নাই, গুরুদেবকে দেখিতে আবার নবদ্বীপে গিয়াছেন, কিন্তু ইতিমধ্যে জন-দুই বৈরাগী আসিয়া আমারই ঘরে আস্তানা গাড়িয়াছে।

কমললতা, পদ্মা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং আরও অনেকে আসিয়া মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিল, কমললতা গাঢ়স্বরে কহিল, নতুনগোঁসাই, তুমি যে এত শীঘ্র এসে আবার আমাদের দেখা দেবে এ আশা করিনি।

রাজলক্ষ্মী কথা কহিল, যেন কতকালের চেনা। বলিল, কমললতাদিদি, এ ক'দিন শুধু তোমার কথাই ওঁর মুখে, আরও আগে আসতে চেয়েছিলেন, কেবল আমার জন্তেই ঘটে ওঠেনি। এটা আমারই দোষে।

কমললতার মুখ ক্ষণকালের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল, পদ্মা ফিক করিয়া হাসিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল।

রাজলক্ষ্মীর বেশভূষা ও চেহারা দেখিয়া সে যে সম্ভ্রান্তঘরের মেয়ে তাহা সবাই বুঝিয়াছে, শুধু আমার সঙ্গে যে কি সম্বন্ধ ইহাই তাহারা নিঃসন্দেহে ধরিতে পারে নাই। পরিচয়ের জন্য সবাই উদগ্রীব হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর চোখে কিছুই এড়ায় না, বলিল, কমললতাদিদি, আমাকে চিনতে পারচ না?

কমললতা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

বৃন্দাবনে দেখনি কখনো?

কমললতাও নির্ব্বোধ নয়, পরিহাসটা সে বুঝিল, হাসিয়া বলিল, মনে ত পড়চে না ভাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না পড়াই ভালো দিদি। আমি এদেশেরই মেয়ে, কখনো বৃন্দাবনের ধারেও যাইনি, বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল। লক্ষ্মী-সরস্বতী ও অন্যান্য সকলে চলিয়া গেলে আমাকে দেখাইয়া কহিল, আমরা দু'জনে এক গাঁয়ে এক গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়তুম—দুটিতে যেন ভাইবোন এমনি ছিল ভাব। পাড়ার সুবাদে দাদা বলে ডাকতুম—বোনের মত আমাকে কি ভালই বাসতেন। গায়ে কখনো হাতটি পর্য্যন্ত দেননি!

আমার পানে চাহিয়া কহিল, হাঁ গা, বলচি সব সত্যি নয়?

পদ্মা খুশী হইয়া বলিল, তাই তোমাদের ঠিক একরকম দেখতে। দুজনেই লম্বা ছিপ-ছিপে—শুধু তুমি ফর্সা, আর নতুনগোঁসাই কালো, তোমাদের দেখলেই বোঝা যায়।

রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া বলিল, যাবেই ত ভাই। আমাদের ঠিক একরকম না হয়ে কি কোন উপায় আছে পদ্মা।

ও মা! তুমি আমারও নাম জানো যে দেখচি। নতুনগোঁসাই বলেচে বুঝি?

বলেচে বলেই ত তোমাদের দেখতে এলুম, বললুম, সেখানে একলা যাবে কেন, আমাকেও সঙ্গে নাও। তোমার কাছে ত আমার ভয় নেই—একসঙ্গে দেখলে কেউ কলঙ্কও রটাবে না। আর রটালেই বা কি, নীলকণ্ঠের গলাতেই বিষ লেগে থাকবে, উদরস্থ হবে না।

আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, মেয়েদের এ যে কি রকম ঠাট্টা সে তারাই জানে। রাগিয়া বলিলাম, কেন ছেলেমানুষের সঙ্গে মিথ্যে তামাশা করচ বলো ত?

রাজলক্ষ্মী ভালোমানুষের মত বলিল, সত্যি তামাশাটা কি তুমিই না হয় বলে দাও? যা জানি সরল মনে বলচি, তোমার রাগ কেন?

তাহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিলাম, সরল মনে বলচি! কমললতা, এত বড় শয়তান ফাজিল তুমি সংসারে দুটি খুঁজে পাবে না। এর কি একটা মতলব আছে, কখনো এর কথায় সহজে বিশ্বাস ক'রো না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কেন নিন্দে কর গোঁসাই! তা হলে আমার সম্বন্ধে নিশ্চয় তোমার মনেই কোন মতলব আছে?

আছেই ত।

কিন্তু আমার নেই। আমি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক।

হাঁ যুধিষ্ঠির।

কমললতাও হাসিল, কিন্তু সে উহার বলার ভঙ্গীতে। বোধ হয়, ঠিক কিছু বুঝিতে পারিল না, শুধু গোলমালে পড়িল। কারণ সেদিনও আমি ত কোন রমণীর সম্বন্ধেই নিজের কোন আভাস দিই নাই। আর দেবই বা কি করিয়া। দেবার সেদিন ছিলই বা কি!

কমললতা জিজ্ঞাসা করিল, ভাই তোমার নামটা কি?

আমার নাম রাজলক্ষ্মী। উনি গোড়ার কথাটা ছেড়ে দিয়ে বলেন শুধু লক্ষ্মী। আমি বলি, ওগো, হাঁগো। আজকাল বলচেন নতুনগোঁসাই বলে ডাকতে। বলেন, তবু স্বস্তি পাবো।

পদ্মা হঠাৎ হাততালি দিয়া উঠিল—আমি বুঝেচি।

কমললতা তাহাকে ধমক দিল—পোড়ারমুখীর ভারী বুদ্ধি! কি বুঝেচিস্ বল্ ত?

নিশ্চয় বুঝেচি। বলব?

বলতে হবে না, যা। বলিয়াই সে সস্নেহে রাজলক্ষ্মীর একটা হাত ধরিয়া কহিল, কিন্তু কথায় কথায় বেলা বাড়চে ভাই, রোদ্দুরে মুখখানি শুকিয়ে উঠেচে। খেয়ে কিছু আসোনি জানি—চল, হাত-পা ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম করবে, তারপরে সবাই মিলে তাঁর প্রসাদ পাব। তুমিও এসো গোঁসাই। এই বলিয়া সে তাহাকে মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

এইবার মনে মনে প্রমাদ গনিলাম। কারণ, এখন আসিবে প্রসাদ গ্রহণের আহ্বান। খাওয়া-ছোঁওয়ার বিষয়টা রাজলক্ষ্মীর জীবনে এমন করিয়াই গাঁথা যে, এ সম্বন্ধে সত্যাসত্যর প্রশ্নই অবৈধ। এ শুধু বিশ্বাস নয়—এ তাহার স্বভাব। এছাড়া সে

বাঁচে না। জীবনের এই একান্ত প্রয়োজনের সহজ ও সক্রিয় সজীবতা কতদিন কত সঙ্কট হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে সে-কথা কাহারো জানিবার উপায় নাই। নিজে সে বলিবে না—জানিয়াও লাভ নাই। আমি শুধু জানি, যে রাজলক্ষ্মীকে একদিন না চাহিয়াই দৈবাৎ পাইয়াছি, আজ সে আমার সকল পাওয়ার বড়। কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

তাহার যতকিছু কঠোরতা সে কেবল নিজেকে লইয়া, অথচ অপরের প্রতি জুলুম ছিল না। বরঞ্চ হাসিয়া বলিত, কাজ কি বাপু অত কষ্ট করার! একালে অত বাচতে গেলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না। আমি যে কিছুই মানি না সে জানে। শুধু তাহার চোখের উপর ভয়ঙ্কর একটা কিছু না ঘটিলেই সে খুশী। আমার পরোক্ষ অনাচারের কাহিনীতে কখনো বা সে দুই কান চাপা দিয়া আত্মরক্ষা করে, কখনো বা গালে হাত দিয়া অবাক হইয়া বলে, আমার অদৃষ্টে কেন তুমি এমন হলে। তোমাকে নিয়ে আমার যে সব গেল!

কিন্তু আজিকার ব্যাপারটা ঠিক এরূপ নয়। এই নির্জ্জন মঠে যে কয়টি প্রাণী শান্তিতে বাস করে তাহারা দীক্ষিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের জাতিভেদ নাই, পূর্ব্বাশ্রমের কথা ইহারা কেহ মনেও করে না। তাই, অতিথি কেহ আসিলে ঠাকুরের প্রসাদ নিঃসঙ্কোচ-শ্রদ্ধায় বিতরণ করে এবং প্রত্যাখ্যান করিয়াও আজও কেহ ইহাদের অপমানিত করে নাই। কিন্তু এই অপ্রীতির কার্য্যই আজ যদি অনাহূত আসিয়া আমাদের দ্বারাই সংঘটিত হয় ত পরিতাপের অবধি রহিবে না। বিশেষ করিয়া আমার নিজের। জানি, কমললতা মুখে কিছু বলিবে না, তাহাকে বলিতেও দিবে না—হয়ত বা শুধুমাত্র একটিবার আমার প্রতি চাহিয়াই মাথা নীচু করিয়া অন্যত্র সরিয়া যাইবে। নির্ব্বাক অভিযোগের জবাব যে কি, এইখানে দাঁড়াইয়া মনে মনে আমি ইহাই ভাবিতেছিলাম।

এমনি সময়ে পদ্মা আসিয়া বলিল, এসো নতুনগোঁসাই, দিদিরা তোমাকে ডাকচে। হাতমুখ ধুয়েচ?

না।

তবে এস আমি জল দিই। প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে।

প্রসাদটা কি হ'লো আজ?

আজ হ'লো ঠাকুরের অন্নভোগ।

মনে মনে বলিলাম, তবে ত সংবাদ আরও ভালো। জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রসাদ কোথায় দিলে?

পদ্মা বলিল, ঠাকুরঘরের বারান্দায়। বাবাজীমশায়ের সঙ্গে তুমি বসবে, আমরা মেয়েরা খাব পরে। আজ আমাদের পরিবেশন করবে রাজলক্ষ্মীদিদি নিজে।

সে খাবে না ?

না। সে ত আমাদের মত বোষ্টম নয়—বামুনের মেয়ে। আমাদের ছোঁয়া খেলে তার পাপ হয়।

তোমার কমললতাদিদি রাগ করলে না ?

রাগ করবে কেন, বরঞ্চ হাসতে লাগল। রাজলক্ষ্মীদিদিকে বললে, পরজন্মে আমরা দু'বোনে গিয়ে জন্মাব এক মায়ের পেটে। আমি জন্মাব আগে, আর তুমি আসবে পরে। তখন মায়ের হাতে দু'বোনে এক পাতায় বসে খাব। তখন কিন্তু জাত যাবে বললে মা তোমার কান মলে দেবে।

শুনিয়া খুশী হইয়া ভাবিলাম, এইবার ঠিক হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী কখনো কথায় তাহার সমকক্ষ পায় নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জবাব দিলে সে ?

পদ্মা কহিল, রাজলক্ষ্মীদিদিও শুনে হাসতে লাগল, বললে, মা কেন দিদি, তখন বড় বোন হয়ে তুমিই দেবে আমার কান মলে, ছোটর আস্পর্দ্ধা কিছুতেই সইবে না।

প্রত্যুত্তর শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, শুধু প্রার্থনা করিলাম ইহার নিহিত অর্থ কমললতা যেন না বুঝিতে পারিয়া থাকে।

গিয়া দেখিলাম প্রার্থনা আমার মঞ্জুর হইয়াছে, কমললতা সে-কথায় কান দেয় নাই। বরঞ্চ এই অমিলটুকু মানিয়া লইয়াই ইতিমধ্যে দু'জনের ভারী একটি মিল হইয়া গিয়াছে।

বিকালের গাড়িতে বড়গোঁসাই দ্বারিকাদাস ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে আসিল আরও জনকয়েক বাবাজী। সর্ব্বাঙ্গের ছাপছোপের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দেখিয়া সন্দেহ রহিল না যে ইহারাও অবহেলার নয়। আমাকে দেখিয়াই বড়গোঁসাই খুশী হইলেন, কিন্তু পার্ষদগণ গ্রাহ্য করিল না। না করিবারই কথা, কারণ শুনা গেল, ইহাদের একজন নামজাদা কীর্ত্তনীয়া এবং আর একজন মৃদঙ্গের ওস্তাদ।

প্রসাদ পাওয়া সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই মরা নদী ও সেই বনবাদাড়। বেণু ও বেতসকুঞ্জ চারিদিকে—গায়ের চামড়া বাঁচান দায়। আসন্ন সূর্য্যাস্তকালে তটপ্রান্তে বসিয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিব সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বোধ করি কচুজাতীয় 'আঁধার মানিক' ফুল ফুটিয়াছে। তাহার বীভৎস মাংসপচা গন্ধে তিষ্ঠিতে দিল না। মনে মনে ভাবিলাম, কবিরা ফুল

এত ভালবাসেন, কেহ এটাকে লইয়া গিয়া তাহাদের উপহার দিয়া আসে না কেন ?

সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, গিয়া দেখি সেখানে সমারোহ ব্যাপার। ঠাকুর ও ঠাকুরঘর সাজান হইতেছে, আরতির পরে কীর্ত্তনের বৈঠক বসিবে।

পদ্মা কহিল, নতুনগোঁসাই, কীর্ত্তন শুনতে তুমি ভালোবাস, আজ মনোহরদাস বাবাজীর গান শুনলে তুমি অবাক্ হয়ে যাবে। কি চমৎকার!

বস্তুতঃ বৈষ্ণব-কবিদের পদাবলীর মত মধুর বস্তু আমার আর নাই, বলিলাম, সত্যিই বড় ভালোবাসি পদ্মা। ছেলেবেলায় দু-চার ক্রোশের মধ্যে কোথাও কীর্ত্তন হবে শুনলে আমি ছুটে যেতাম, কিছুতে ঘরে থাকতে পারতাম না। বুঝি না-বুঝি তবু শেষ পর্য্যন্ত বসে থাকতাম। কমললতা, তুমি গাইবে না আজ ?

কমললতা বলিল, না গোঁসাই, আজ না। আমার ত তেমন শিক্ষা নেই, ওঁদের সামনে গাইতে লজ্জা করে। তা ছাড়া সেই অসুখটা থেকে গলা তেমনই ধরে আছে, এখনো সারেনি।

কহিলাম, লক্ষ্মী কিন্তু তোমার গান শুনতেই এসেচে। ও ভাবে আমি বুঝি বাড়িয়ে বলেচি।

কমললতা সলজ্জে কহিল, বাড়িয়ে নিশ্চয়ই বলেচ গোঁসাই। তারপরে স্মিতহাস্যে রাজলক্ষ্মীকে বলিল, তুমি কিছু মনে ক'রো না ভাই, সামান্য যা জানি তোমাকে আর একদিন শোনাব।

রাজলক্ষ্মী প্রসন্নমুখে কহিল, আচ্ছা দিদি, তোমার যেদিন ইচ্ছে হবে আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি নিজে এসে তোমার গান শুনে যাব। আমাকে বলিল, তুমি কীর্ত্তন শুনতে এত ভালোবাস, কই আমাকে ত সে-কথা বলোনি ?

উত্তর দিলাম, কেন বলব তোমাকে ? গঙ্গামাটিতে অসুখে যখন শয্যাগত, দুপুরবেলাটা কাটত শুকনো শূন্য মাঠের পানে চেয়ে, দুর্ভর সন্ধ্যা কিছুতে একলা কাটতে চাইত না—

রাজলক্ষ্মী চট্ করিয়া আমার মুখে হাত চাপা দিয়া ফেলিল, কহিল, আর যদি বলো পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব। তারপর নিজেই অপ্রতিভ হইয়া হাত সরাইয়া বলিল, কমললতাদিদি, বলে এসো ত ভাই তোমার বড়গোঁসাইজীকে, আজ বাবাজী-মশায়ের কীর্ত্তনের পরে আমি ঠাকুরদের গান শোনাব।

কমললতা সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলিল, কিন্তু বাবাজীরা বড় খুঁতখুঁতে ভাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হোক গে, ভগবানের নাম ত হবে। বিগ্রহমূর্ত্তিগুলিকে হাত দিয়া দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, ওরা হয়ত খুশী হবেন, বাবাজীদের জন্যও তত ভাবিনে দিদি, আমার এই দুর্ব্বাসা ঠাকুরটি প্রসন্ন হলে বাঁচি।

বলিলাম, হলে কিন্তু বকশিশ পাবে।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে বলিল, রক্ষে করো গোঁসাই, সকলের সম্মুখে যেন বকশিশ দিতে এসো না। তোমার অসাধ্য কাজ নেই।

শুনিয়া বৈষ্ণবীরা হাসিতে লাগিল, পদ্মা খুশী হইলেই হাততালি দেয়, বলিল, আ—মি—বু—ঝে—চি।

কমললতা তাহার প্রতি সস্নেহে চাহিয়া সহাস্যে কহিল—দূর হ পোড়ারমুখী—চুপ কর। রাজলক্ষ্মীকে কহিল, নিয়ে যাও ত ভাই ওকে, কি জানি হঠাৎ কি একটা বলে বসবে।

ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পরে কীর্ত্তনের আসর বসিল। আজ আলো জ্বলিল অনেকগুলা। মুরারিপুর আখড়া বৈষ্ণবসমাজে নিতান্ত অখ্যাত নয়, নানা স্থান হইতে কীর্ত্তনীয়া বৈরাগীর দল আসিয়া জুটিলে এরূপ আয়োজন প্রায়ই হয়। মঠে সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র মজুত আছে, দেখিলাম সেগুলা হাজির করা হইয়াছে। একদিকে বসিয়া বৈষ্ণবীগণ—সকলেই পরিচিত, অন্যদিকে উপবিষ্ট অজ্ঞাতকুলশীল অনেকগুলি বৈরাগী মূর্ত্তি—নানা বয়স ও নানা চেহারার। মাঝখানে সমাসীন বিখ্যাত মনোহরদাস ও তাঁহার মৃদঙ্গবাদক। আমার ঘরের অধুনা দখলীকার একজন ছোকরা বাবাজী দিতেছে হারমোনিয়ামে সুর। এই প্রচার হইয়াছে যে কে একজন সম্ভ্রান্তগৃহের মহিলা আসিয়াছেন কলিকাতা হইতে—তিনিই গাহিবেন গান। তিনি যুবতী, তিনি রূপসী, তিনি বিত্তশালিনী। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে দাস-দাসী, আসিয়াছে বহুবিধ খাদ্য-সম্ভার, আর আসিয়াছে কে এক নতুনগোঁসাই—সে নাকি এই দেশেরই এক ভবঘুরে।

মনোহরদাসের কীর্ত্তনের ভূমিকা ও গৌরচন্দ্রিকার মাঝামাঝি একসময়ে রাজলক্ষ্মী আসিয়া কমললতার কাছে বসিল। হঠাৎ বাবাজীমশায়ের গলাটা একটু কাঁপিয়াই সামলাইয়া গেল এবং মৃদঙ্গের বোলটা যে কাটিল না সে নিতান্তই একটা দৈবাতের লীলা। শুধু দ্বারিকাদাস দেয়ালে ঠেস দিয়া যেমন চোখ বুজিয়া ছিলেন তেমনি রহিলেন, কি জানি, হয়ত জানিতেই পারিলেন না কে আসিল আর কে আসিল না।

রাজলক্ষ্মী পরিয়া আসিয়াছে একখানি নীলাম্বরী শাড়ি, তাহারি সরু জরির পাড়ের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়াছে গায়ের নীলরঙের জামা। আর সব তেমনি আছে। কেবল সকালের উড়ে-পাণ্ডার পরিকল্পিত কপালের ছাপছোপ এবেলা অনেকখানি মুছিয়াছে—অবশিষ্ট যা আছে সে যেন আশ্বিনের ছেঁড়াখোঁড়া মেঘ, নীল আকাশে কখন মিলাইল বলিয়া। অতি শিষ্টশান্ত মানুষ, আমার প্রতি কটাক্ষেও

চাহিল না—যেন চেনেই না। তবু যে কেন একটুখানি হাসি চাপিয়া লইল সে সেই জানে। কিংবা আমারও ভুল হইতে পারে—অসম্ভব নয়।

আজ বাবাজীমশায়ের গান জমিল না। কিন্তু সে তাঁর দোষে নয়, লোকগুলোর অধীরতায়।

দ্বারিকাদাস চোখ চাহিয়া রাজলক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দিদি, আমার ঠাকুরদের এবার তুমি কিছু নিবেদন করে শোনাও, শুনে আমরাও ধন্য হই।

রাজলক্ষ্মী সেইদিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া বসিল। দ্বারিকাদাস খোলটার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওটায় কোন বাধা জন্মাবে না ত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, না।

শুনিয়া শুধু তিনি নয়, মনোহরদাসও মনে মনে কিছু বিস্ময় বোধ করিলেন। কারণ সাধারণ মেয়েদের কাছে এতটা বোধ করি তাঁহারা আশা করেন না।

গান শুরু হইল! সঙ্কোচের জড়িমা, অজ্ঞতার দ্বিধা কোথাও নাই—নিঃসংশয়ের কণ্ঠ অবাধ জলস্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিল। এ বিদ্যায় সে সুশিক্ষিতা জানি, এ ছিল তাহার জীবিকা। কিন্তু বাংলার নিজস্ব সঙ্গীতের ধারাটাও সে যে এত যত্ন করিয়া আয়ত্ব করিয়াছে তাহা ভাবি নাই। প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব কবিগণের এত বিভিন্ন পদাবলী যে তাহার কণ্ঠস্থ তাহা কে জানিত! শুধু সুরে তালে লয়ে নয়, বাক্যের বিশুদ্ধতায়, উচ্চারণের স্পষ্টতায় এবং প্রকাশভঙ্গীর মধুরতায় এই সন্ধ্যায় সে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল তাহা অভাবিত। পাথরের ঠাকুর তাহার সম্মুখে, পিছনে বসিয়া ঠাকুর দুর্ব্বাসা—কাহাকে বেশী প্রসন্ন করিতে যে তাহার এই আরাধনা বলা কঠিন। গঙ্গামাটির অপরাধের এতটুকু স্খলনও যদি ইহাতে হয়, কি জানি একথা তাহার মনের মধ্যে আজ ছিল কি না।

সে গাহিতেছিল—

> "একে পদ-পঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত, কণ্টকে জরজর ভেল,
> তুয়া দরশন-আশে কিছু নাহি জানলু চিরদুখ অব দূরে গেল।
> তোহারি মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশল ছোড়নু গৃহ-সুখ আশ,
> পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণনু, কহতঁহি গোবিন্দদাস॥"

বড়গোঁসাইজীর চোখে ধারা বহিতেছিল; তিনি আবেশ ও আনন্দের প্রেরণায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিগ্রহের কণ্ঠ হইতে মল্লিকার মালা তুলিয়া লইয়া রাজলক্ষ্মীর গলায় পরাইয়া দিলেন, বলিলেন, প্রার্থনা করি তোমার সমস্ত অকল্যাণ যেন দূর হয় ভাই।

রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল, তারপরে উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা সকলের সম্মুখে মাথায় লইল, চুপি চুপি বলিল, এ মালা তোলা

রইল, বকশিশের ভয় না দেখালে এখানেই তোমার গলায় পরিয়ে দিতুম। বলিয়াই চলিয়া গেল।

গানের আসর শেষ হইল। মনে হইল জীবনটা যেন আজ সার্থক হইল।

ক্রমশঃ প্রসাদ বিতরণের আয়োজন আরম্ভ হইল। তাহাকে অন্ধকারে একটু আড়ালে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম, ও মালা রেখে দাও, এখানে নয়, বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমার হাত থেকে পরব।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এখানে ঠাকুরবাড়িতে পরে ফেললে আর খুলতে পারবে না এই বুঝি ভয়?

না, ভয় আর নেই, সে ঘুচেছে। সমস্ত পৃথিবী আমার থাকলে তোমাকে আজ তা দান করতাম।

উঃ—কি দাতা। সে তোমারি থাকত গো।

বলিলাম, তোমাকে আজ অসংখ্য ধন্যবাদ।

কেন বলো ত?

বলিলাম, আজ মনে হচ্ছে তোমার আমি যোগ্য নই। রূপে, গুণে, রসে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, স্নেহে, সৌজন্যে পরিপূর্ণ যে ধন আমি অযাচিত পেয়েচি, সংসারে তার তুলনা নেই। নিজের অযোগ্যতায় লজ্জা পাই লক্ষ্মী, তোমার কাছে সত্যই আমি বড় কৃতজ্ঞ।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এবার কিন্তু সত্যই আমি রাগ করব।

তা ক'রো। ভাবি এ ঐশ্বর্য আমি রাখব কোথায়?

কেন, চুরি যাবার ভয় নাকি?

না, সে মানুষ ত চোখে দেখতে পাইনে লক্ষ্মী। চুরি করে তোমাকে ধরে রাখবার মত বড় জায়গাই বা সে বেচারা পাবে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী উত্তর দিল না, হাতটা আমার টানিয়া ক্ষণকাল বুকের কাছে ধরিয়া রাখিল। তারপরে বলিল, এমন করে মুখোমুখি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে লোকে হাসবে যে! কিন্তু ভাবচি, রাত্রে তোমাকে শুতে দিই কোথায়—জায়গা ত নেই।

না থাক, যেখানে হোক শুয়ে রাত্রিটা কাটবেই।

তা কাটবে, কিন্তু শরীর ত ভালো নয়, অসুখ করতে পারে যে।

তোমার ভাবনা নেই, ওরা ব্যবস্থা একটা করবেই।

রাজলক্ষ্মী চিন্তার সুরে বলিল, দেখচি ত সব, ব্যবস্থা কি করবে জানিনে; কিন্তু ভাবনা নেই আমার, আছে ওদের? এসো। যা হোক দুটি খেয়ে শুয়ে পড়বে।

বাস্তবিক লোকের ভিড়ে শোবার স্থান ছিল না। সে রাত্রে কোনমতে একটা খোলা বারান্দায় মশারি টাঙাইয়া আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল। রাজলক্ষ্মী খুঁত-

খুঁত করিতে লাগিল, হয়ত বা রাত্রে মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া গেল, কিন্তু আমার ঘুমের বিঘ্ন ঘটিল না।

পরদিন শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিতে পাইলাম রাশীকৃত ফুল তুলিয়া উভয়ে ফিরিয়া আসিল। আমার পরিবর্ত্তে কমললতা রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গী করিয়াছিল। সেখানে নির্জ্জনে তাহাদের কি কথা হইয়াছে জানি না, কিন্তু আজ তাহাদের মুখ দেখিয়া আমি ভারী তৃপ্তিলাভ করিলাম। যেন কতদিনের বন্ধু দু'জনে—তাহারা কতকালের আত্মীয়। কাল উভয়ে একত্রে এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, জাতের বিচার সেখানে প্রতিবন্ধক ঘটায় নাই। একজন অপরের হাতে খায় না এই লইয়া কমললতা আমার কাছে হাসিয়া বলিল, তুমি ভেবো না গোঁসাই, সে বন্দোবস্ত আমাদের হয়ে গেছে। আসচে বারে আমি বড় বোন হয়ে জন্মে ওর দুটি কান ভাল করে মলে দেব।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার বদলে আমিও একটা সর্ত্ত করিয়ে নিয়েচি গোঁসাই। যদি মরি, ওঁকে বোষ্টমিগিরি ইস্তফা দিয়ে তোমার সেবায় নিযুক্ত হতে হবে। তোমাকে ছেড়ে আমি মুক্তি পাব না সে খুব জানি, তখন ভূত হয়ে দিদির ঘাড়ে চাপব—সেই সিন্ধবাদের দৈত্যের মত—কাঁধে বসে সব কাজ ওকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়ব।

কমললতা সহাস্যে কহিল, তোমার মরে কাজ নেই ভাই, তোমাকে কাঁধে নিয়ে আমি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতে পারব না।

সকালে চা খাইয়া বাহির হইলাম গহরের খোঁজে। কমললতা আসিয়া বলিল, বেশী দেরি ক'রো না গোঁসাই, আর তাকেও সঙ্গে এনো। এদিকে একজন বামুন ধরে এনেচি আজ ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে। যেমন নোংরা তেমনি কুঁড়ে। রাজলক্ষ্মী সঙ্গে গেছে তার সাহায্য করতে।

বলিলাম, ভালো করোনি। রাজলক্ষ্মীর আজ খাওয়া হবে বটে, কিন্তু তোমার ঠাকুর থাকবে উপবাসী।

কমললতা সভয়ে জিভ কাটিয়া বলিল, অমন কথা ব'লো না গোঁসাই, সে কানে শুনলে এখানে আর জলগ্রহণ করবে না।

হাসিয়া বলিলাম, চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি কমললতা, কিন্তু তাকে তুমি চিনেচ।

সেও হাসিয়া বলিল, হাঁ গোঁসাই চিনেচি, শত-লক্ষেও এমন মানুষ তুমি একটিও খুঁজে পাবে না ভাই। তুমিও ভাগ্যবান।

গহরের দেখা মিলিল না, সে বাড়ি নাই। তাহার এক বিধবা মামাতো ভগিনী থাকে সুনাম গ্রামে; নবীন জানাইল সেদেশে কি এক নূতন ব্যাধি আসিয়াছে, লোক মরিতেছে বিস্তর। দরিদ্র আত্মীয়া ছেলেপুলে লইয়া বিপদে পড়িয়াছে, তাই সে গিয়াছে চিকিৎসা করাইতে। আজ দশ-বারোদিন সংবাদ নাই—নবীন ভয়ে

সারা হইয়াছে—কিন্তু কোন পথ তাহার চোখে পড়িতেছে না। হঠাৎ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার বাবু বোধ হয় আর বেঁচে নেই। মুখ্য চাষা মানুষ আমি, কখনো গাঁয়ের বার হইনি, কোথায় সে দেশ, কোথা দিয়ে যেতে হয় জানিনে, নইলে ঘরসংসার সব ভেসে গেলেও নবীন নাকি থাকে এখনো বাড়ি বসে! চক্কোত্তিমশাইকে দিনরাত্তু সাধচি, ঠাকুর দয়া করো, তোমাকে জমি বেচে আমি একশ টাকা দেব, আমাকে একবার নিয়ে চলো, কিন্তু বিটলে বামুন নড়লে না। কিন্তু এও বলে রাখচি বাবু, আমার মনিব যদি যায় মারা, চক্কোত্তিকে ঘরে আগুন দিয়ে আমি পোড়াব, তারপর সেই আগুনে নিজে মরব আত্মহত্যা করে। অত বড় নেমকহারামকে আমি জ্যান্ত রাখব না।

তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, জেলার নাম জানো নবীন।

নবীন কহিল, কেবল শুনেচি গাঁখানা আছে নাকি নদে জেলার কোন্ এক-টেরে, ইস্টিশান থেকে অনেকদূর যেতে হয় গরুর গাড়িতে। বলিল, চক্কোত্তি জানে, কিন্তু বামুন তাও বলতে চায় না।

নবীন পুরাতন চিঠিপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিল, কিন্তু সে-সকল হইতে কোন হদিস মিলিল না। কেবল মিলিল এই খবরটা যে, মাস-দুই পূর্ব্বেও বিধবা কন্যার বিয়ে বাবদ চক্রবর্ত্তী শ'দুই টাকা গহরের কাছে আদায় করিয়াছে।

বোকা গহরের অনেক টাকা, সুতরাং অক্ষম দরিদ্রেরা ঠকাইবেই, এ লইয়া ক্ষোভ করা বৃথা, কিন্তু এত বড় শয়তানিও সচরাচর চোখে পড়ে না।

নবীন বলিল, বাবু মলেই ওর ভালো, একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে বাঁচে। এক-পয়সাও আর ধার শোধ করতে হয় না।

অসম্ভব নয়। গেলাম দু'জনে চক্রবর্ত্তীর গৃহে। এমন বিনয়ী, সদালাপী-পরদুঃখ-কাতর ভদ্র ব্যক্তি সংসারে দুর্ল্লভ। কিন্তু বৃদ্ধ হইয়া স্মৃতিশক্তি তাঁহার এত ক্ষীণ হইয়াছে যে, কিছুই তাঁহার মনে পড়িল না, এমন কি জেলার নাম পর্য্যন্ত না। বহু চেষ্টায় একটা টাইমটেবল সংগ্রহ করিয়া উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত রেল স্টেশন একে একে পড়িয়া গেলাম, কিন্তু স্টেশনের আদ্যাক্ষর পর্য্যন্ত তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না। দুঃখ করিয়া বলিলেন, লোকে কত কি জিনিসপত্র টাকাকড়ি ধার বলে চেয়ে নিয়ে যায় বাবা, মনে করতে পারিনে, আদায়ও হয় না। মনে মনে বলি মাথার ওপর ধর্ম্ম আচেন, তিনিই এর বিচার করবেন।

নবীন আর সহিতে পারিল না, গর্জ্জন করিয়া উঠিল, হাঁ, তিনিই তোমার বিচার করবেন, না করেন করব আমি।

চক্রবর্ত্তী স্নেহার্দ্র-মধুরকণ্ঠে বলিলেন, নবীন, মিছে রাগ করিস্ কেন দাদা,

তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, পারলে কি আর এটুকু করিনে? গহর কি আমার পর? সে যে আমার ছেলের মত রে!

নবীন কহিল, সে-সব আমি জানিনে, তোমাকে শেষবারের মত বলচি, বাবুর কাছে আমাকে নিয়ে যাবে ত চল, নইলে যেদিন তাঁর মন্দ খবর পাব সেদিন রইলে তুমি আর আমি।

চক্রবর্ত্তী প্রত্যুত্তরে ললাটে করাঘাত করিয়া শুধু বলিলেন, কপাল নবীন, কপাল! নইলে তুই আমাকে অমন কথা বলিস্।

অতএব, পুনরায় দু'জনে ফিরিয়া আসিলাম। বাটীর বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি ক্ষণকাল আশা করিলাম অনুতপ্ত চক্রবর্ত্তী যদি এখনো ফিরিয়া ডাকে। কিন্তু কোন সাড়া আসিল না, দ্বারের ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম চক্রবর্ত্তী পোড়া কলিকাটি ঢালিয়া ফেলিয়া নিবিষ্টচিত্তে তামাক সাজিতে বসিয়াছে।

গহরের সংবাদ পাইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে আখড়ায় ফিরিয়া আসিয়া যখন পৌছিলাম তখন বেলা প্রায় তিনটা। ঠাকুর-ঘরের বারান্দায় মেয়েদের ভিড় জমিয়াছে; বাবাজীরা কেহ নাই, সম্ভবতঃ সুপ্রচুর প্রসাদসেবার পরিশ্রমে নির্জ্জীব হইয়া কোথাও বিশ্রাম করিতেছেন; রাত্রিকালে আর একদফা লড়িতে হইবে তাহার বলসঞ্চয়ের প্রয়োজন।

উঁকি মারিয়া দেখিলাম ভিড়ের মাঝখানে বসিয়া এক গণক; পাঁজি, পুঁথি, খড়ি, শেলেট, পেন্সিল প্রভৃতি গণনার যাবতীয় উপকরণ তাহার কাছে। আমার প্রতি সর্ব্বাগ্রে চোখ পড়িল পদ্মার, সে চেঁচাইয়া উঠিল, নতুনগোঁসাই এসেচে।

কমললতা বলিল, তখনি জানি গহরগোঁসাই তোমাকে এমনি ছেড়ে দেবে না, কি খেলে সে—

রাজলক্ষ্মী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—থাক্ দিদি, ও আর জিজ্ঞাসা ক'রো না।

কমললতা তাহার হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, রোদ্দুরে মুখ শুকিয়ে গেছে, রাজ্যের ধূলোবালি উঠেচে মাথায়—স্নানটান হয়েচে তো?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তেল ছোঁন না, হলেও ত বোঝা যাবে না দিদি।

অবশ্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই নবীন করিয়াছে, কিন্তু আমি স্বীকার করি নাই, অস্নাত অভুক্তই ফিরিয়া আসিয়াছি!

রাজলক্ষ্মী মহানন্দে কহিল, গণকঠাকুর আমার হাত দেখে বলেচে আমি রাজরাণী হবো।

কি দিলে?

পদ্মা বলিয়া দিল—পাঁচ টাকা। রাজলক্ষ্মীদিদির আঁচলে বাঁধা ছিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, আমাকে দিলে আমি তার চেয়েও ভালো বলতে পারতাম।

গণক উড়িয়া ব্রাহ্মণ, বেশ বাঙলা বলিতে পারে—বাঙালী বলিলেই হয়—সেও হাসিয়া কহিল, না মশাই, টাকার জন্যে নয়, টাকা আমি অনেক রোজগার করি। সত্যিই এমন ভালো হাত আমি আর দেখিনি। দেখবেন, আমার হাতদেখা কখনো মিথ্যে হবে না।

বলিলাম, ঠাকুর, হাত না দেখে কিছু বলতে পারো কি ?

সে কহিল, পারি। একটা ফুলের নাম করুন!

বলিলাম, শিমুল ফুল।

গণক হাসিয়া কহিল, শিমুল ফুলই সই! আমি এর থেকেই বলে দেব আপনি কি চান। এই বলিয়া সে খড়ি দিয়া মিনিট-দুই আঁক কষিয়া হিসাব করিয়া বলিল, আপনি চান একটা খবর জানতে।

কি খবর ?

সে আমার প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিল, না—মামলা-মকদ্দমা নয়; আপনি কোন লোকের খবর পেতে চান।

খবরটা বলতে পার ঠাকুর ?

পারি। খবর ভাল, দু'-একদিনেই জানতে পারবেন।

শুনিয়া মনে মনে একটু বিস্মিত হইলাম এবং আমার মুখ দেখিয়া সকলেই তাহা অনুমান করিল।

রাজলক্ষ্মী খুশী হইয়া বলিল, দেখলে ত। আমি বলচি ইনি খুব ভালো গোনেন, কিন্তু তোমরা কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না—হেসে উড়িয়ে দাও।

কমললতা বলিল, অবিশ্বাস কিসের? নতুনগোঁসাই, দেখাও ত ভাই তোমার হাতটা একবার ঠাকুরকে।

আমি করতল প্রসারিত করিয়া ধরিতে গণক নিজের হাতে লইয়া মিনিট দুই-তিন সযত্নে পর্য্যবেক্ষণ করিল, হিসাব করিল, তারপরে বলিল, মশায়, আপনার ত দেখি মস্ত ফাঁড়া—

ফাঁড়া? কবে?

খুব শীঘ্র। মরণ-বাঁচনের কথা!

চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মীর মুখে আর রক্ত নাই—ভয়ে সাদা হইয়া গিয়াছে।

গণক আমার হাতটা ছাড়িয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিল, দেখি মা তোমার হাতটা আর একবার—

না। আমার হাত দেখতে হবে না—হয়েছে।

তাহার তীব্র ভাবান্তর অত্যন্ত স্পষ্ট। চতুর গণক তৎক্ষণাৎ বুঝিল হিসাবে তাহার ভুল হয় নাই, বলিল, আমি ত দর্পণ মাত্র মা, ছায়া যা পড়বে তাই আমার

মুখে ফুটবে—কিন্তু রুষ্ট গ্রহকেও শান্ত করা যায়, তার ক্রিয়া আছে—সামান্য দশ-কুড়ি টাকা খরচের ব্যাপার মাত্র।

তুমি আমাদের কলকাতার বাড়িতে যেতে পার?

কেন পারব না মা, নিয়ে গেলেই পারি।

আচ্ছা।

দেখিলাম তাহার গ্রহের কোপের প্রতি পুরা বিশ্বাস আছে, কিন্তু তাহাকে প্রসন্ন করার সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ।

কমললতা বলিল, চল গোঁসাই, তোমার চা তৈরী করে দিই গে—খাবার সময় হয়েচে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি তৈরী করে আনচি দিদি, তুমি ওঁর বসবার জায়গাটা একটু ঠিক করে দাও গে। রতনকে বলো তামাক দিতে। কাল থেকে তার ছায়া দেখবার জো নেই।

অন্যান্য সকলে গণৎকার লইয়া কলরব করিতে লাগিল, আমরা চলিয়া আসিলাম।

দক্ষিণের খোলা বারান্দায় আমার দড়ির খাট, রতন ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া দিল, তামাক দিল, মুখহাত ধোয়ার জল আনিয়া দিল—কাল সকাল হইতে বেচারার খাটুনির বিরাম নাই, অথচ কর্ত্রী বলিলেন তাহার ছায়া পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। ফাঁড়া আমার আসন্ন, কিন্তু রতনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয় বলিল, আজ্ঞে না, ফাঁড়া আপনার নয়—আমার।

কমললতা নীচে বারান্দায় বসিয়া গহরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, রাজলক্ষ্মী চা লইয়া আসিল, মুখ অত্যন্ত ভারী, সুমুখের টুলে বাটিটা রাখিয়া দিয়া কহিল, ছাখো, তোমাকে একশোবার বলেচি বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ো না—বিপদ ঘটতে কতক্ষণ? তোমাকে গলায় কাপড় দিয়ে হাতজোড় করচি, কথাটা আমার শোনো।

এতক্ষণ চা তৈরী করিতে বসিয়া রাজলক্ষ্মী বোধ হয় ইহাই ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল। 'খুব শীঘ্র' অর্থে আর কি হইতে পারে?

কমললতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, বনেজঙ্গলে গোঁসাই আবার কখন গেল?

রাজলক্ষ্মী বলিল, কখন গেলেন সে কি আমি দেখে রেখেচি দিদি? আমার কি সংসারে আর কাজ নেই?

আমি বলিলাম, ও দেখেনি, ওর অনুমান। গণক ব্যাটা আচ্ছা বিপদ ঘটিয়ে গেল। শুনিয়া রতন আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া একটু দ্রুতপদেই প্রস্থান করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, গণকের দোষটা কি? সে যা দেখবে তাই ত বলবে? পৃথিবীতে ফাঁড়া বলে কি কথা নেই? বিপদ কারও ঘটে না নাকি?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে যাওয়া বৃথা। কমললতাও রাজলক্ষ্মীকে চিনিয়াছে, সেও চুপ করিয়া রহিল।

চায়ের বাটিটা আমার হাতে করামাত্র রাজলক্ষ্মী কহিল, অমনি দুটো ফল আর মিষ্টি নিয়ে আসিগে?

বলিলাম, না।

না কেন? না ছাড়া হাঁ বলতে কি ভগবান তোমাকে দেননি? কিন্তু আমার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা অধিকতর উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমার চোখ দুটো অত রাঙা দেখাচ্ছে কেন? পচা নদীর জলে নেয়ে আসোনি ত?

না, স্নান আজ করিনি।

কি খেলে সেখানে?

খাইনি কিছুই, ইচ্ছেও হয়নি।

কি ভাবিয়া কাছে আসিয়া সে আমার কপালের উপর হাত রাখিল, তারপরে জামার ভিতর আমার বুকের কাছে সেই হাতটা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া বলিল, যা ভেবেচি ঠিক তাই। কমলদিদি, দেখ ত এর গা-টা গরম বোধ হচ্ছে না?

কমললতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিল না, কহিল হ'লোই বা একটু গরম রাজু—ভয় কি?

সে নামকরণে অত্যন্ত পটু। এই নূতন নামটা আমারও কানে গেল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার মানে জ্বর যে দিদি!

কমললতা কহিল, তাই যদি হয়েই থাকে তোমরা জলে এসে ত পড়োনি? এসেচ আমাদের কাছে, আমরাই তার ব্যবস্থা করব ভাই, তোমার কিছু চিন্তা নেই।

নিজের এই অসঙ্গত ব্যাকুলতায় অপরের অবিচলিত শান্তকণ্ঠ রাজলক্ষ্মীকে প্রকৃতিস্থ করিল। সে লজ্জা পাইয়া কহিল, তাই বলো দিদি! একে এখানে ডাক্তার-বদ্যি নেই, তাতে বার বার দেখচি ওর কিছু একটা হলে সহজে সারে না—ভারী ভোগায়। আবার কোথা থেকে এসে ঐ গোণক্কার পোড়ারমুখো ভয় দেখিয়ে দিলে—

দেখালেই বা।

না ভাই দিদি, আমি দেখেচি কিনা ওদের ভালো কথা ফলে না, কিন্তু মন্দটি ঠিক খেটে যায়।

কমললতা স্মিতহাস্যে কহিল, ভয় নেই রাজু, এক্ষেত্রে খাটবে না। সকাল থেকে গোঁসাই রোদ্দুরে অনেক ঘোরাঘুরি করেচে, তাতে সময়ে স্নানাহার হয়নি, তাই

হয়ত গা একটু তপ্ত হয়েচে—কাল সকালে থাকবে না।

লালুর মা আসিয়া কহিল, মা, রান্নাঘরে বামুনঠাকুর তোমাকে ডাকচে।

যাই, বলিয়া সে কমললতার প্রতি একটা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল।

আমার রোগের সম্বন্ধে কমললতার কথাই ফলিল। জ্বরটা ঠিক সকালেই গেল না বটে, কিন্তু দু'-একদিনেই সুস্থ হইয়া উঠিলাম। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের ভিতরের কথাটা কমললতা টের পাইল এবং আরও একজন বোধ হয় পাইলেন তিনি বড়গোঁসাইজী নিজে।

যাবার দিন আমাদের আড়ালে ডাকিয়া কমললতা জিজ্ঞাসা করিল, গোঁসাই, তোমাদের বিয়ের বছরটি মনে আছে ভাই?

নিকটেই দেখি একটা থালায় ঠাকুরের প্রসাদী চন্দন ও ফুলের মালা।

প্রশ্নের জবাব দিল রাজলক্ষ্মী, বলিল, উনি ছাই জানেন—জানি আমি।

কমললতা হাসিমুখে কহিল, এ কি রকম কথা যে একজনের মনে রইল, আর একজনের রইল না?

রাজলক্ষ্মী বলিল, খুব ছোট বয়সে কিনা—তাই। ওঁর তখনো ভালো জ্ঞান হয়নি।

কিন্তু উনিই যে বয়সে বড় রে রাজু।

ইঃ ভারী বড়ো! মোটে পাঁচ-ছয় বছরের। আমার বয়স তখন আট-ন' বছর, একদিন গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে মনে মনে বললুম, আজ থেকে তুমি হলে আমার বর! বর! বর! এই বলিয়া আমাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, কিন্তু ও-রাক্ষস তক্ষুনি আমার মালা সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে ফেললে।

কমললতা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ফুলের মালা খেয়ে ফেললে কি করে?

আমি বলিলাম, ফুলের মালা নয়, পাকা বঁইচিফলের মালা। সে যাকে দেবে সেই খেয়ে ফেলবে।

কমললতা হাসিতে লাগিল, রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু সেই থেকে শুরু হ'লো—আমার দুর্গতি। ওঁকে ফেললুম হারিয়ে, তার পরের কথা জানতে চেয়ো না দিদি—কিন্তু লোকে যা ভাবে তাও না—তারা কত কিই না ভাবে। তারপরে অনেকদিন কেঁদে কেঁদে হাতড়ে বেড়ালাম খুঁজে খুঁজে—তখন ঠাকুরের দয়া হ'লো—যেমন নিজে দিয়েও হঠাৎ একদিন কেড়ে নিয়েছিলেন, তেমনি অকস্মাৎ আর একদিন হাতে হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। এই বলিয়া সে উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

কমললতা বলিল, সেই ঠাকুরের মালা-চন্দন বড়গোঁসাই দিয়েচেন পাঠিয়ে, আজ ফিরে যাবার দিনে তোমরা দু'জনকে দু'জনে পরিয়ে দাও।

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, ওর ইচ্ছে উনি জানেন, কিন্তু আমাকে ও আদেশ ক'রো না। আমার ছেলেবেলার সে রাঙা মালা আজও চোখ বুজলে ওর সেই কিশোর গলায় দুলচে দেখতে পাই। ঠাকুরের দেওয়া আমার সেই মালাই চিরদিন থাক দিদি।

বলিলাম, কিন্তু সে মালা ত খেয়ে ফেলেছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, হাঁগো রাক্ষস—এইবার আমাকে সুদ্ধ খাও। এই বলিয়া সে হাসিয়া চন্দনের বাটিতে সব কয়টি আঙুল ডুবাইয়া আমার কপালে ছাপ মারিয়া দিল।

* * * *

সকালে দ্বারিকাদাসের ঘরে গেলাম দেখা করিতে। তিনি কি একটা গ্রন্থপাঠে নিযুক্ত ছিলেন, আদর করিয়া বলিলেন, এসো ভাই, ব'সো।

রাজলক্ষ্মী মেজেতে বসিয়া বলিল, বলবার যে আর সময় নেই গোঁসাই। অনেক উপদ্রব করেচি, যাবার আগেই তাই নমস্কার জানিয়ে তোমার ক্ষমা-ভিক্ষে করতে এলুম।

গোঁসাই বলিলেন, আমরা বৈরাগী মানুষ, ভিক্ষে নিতেই পারি, দিতে পারব না ভাই! কিন্তু আবার কবে উপদ্রব করতে আসবে বল ত দিদি? আশ্রমটি যে আজ অন্ধকার হয়ে যাবে।

কমললতা বলিল, সত্য কথা গোঁসাই—সত্যিই মনে হবে বুঝি কোথাও আলো জ্বলেনি, সব অন্ধকার হয়ে আছে।

বড়গোঁসাই বলিলেন, গানে, আনন্দে, হাসিতে, কৌতুকে এ কয়দিন মনে হচ্ছিল যেন চারিদিকে আমাদের বিদ্যুতের আলো জ্বলচে—এমন আর কখনো দেখিনি। আমাকে বলিলেন, কমললতা নাম দিয়েচে নতুনগোঁসাই, আর আমি নাম দিলাম আজ আনন্দময়ী—

এইবার তাঁহার উচ্ছ্বাসে আমাকে বাধা দিতে হইল, বলিলাম, বড়গোঁসাই, বিদ্যুতের আলোটাই আমাদের চোখে লাগল, কিন্তু তার কড়কড় ধ্বনি যাদের দিবারাত্র কর্ণরন্ধ্রে পশে তাদের একটু জিজ্ঞাসা করো। আনন্দময়ীর সম্বন্ধে, অন্ততঃ রতনের মতামতটা—

রতন পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, পলায়ন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ওদের কথা তুমি শুনো না গোঁসাই, ওরা দিনরাত আমায় হিংসে করে। আমার পানে চাহিয়া কহিল, এবার যখন আসব এই রোগা-পটকা অরসিক লোকটিকে ঘরে তালাবন্ধ করে আসব—ওর জ্বালায় কোথাও গিয়ে যদি আমার স্বস্তি আছে!

বড়গোঁসাই বলিলেন, পারবে না আনন্দময়ী—পারবে না। ফেলে আসতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, নিশ্চয় পারব। সময়ে সময়ে আমার ইচ্ছে হয় গোঁসাই, যেন আমি শীগ্‌গির মরি।

বড়গোঁসাই বলিলেন, এ ইচ্ছে ত বৃন্দাবনে একদিন তাঁর মুখেও প্রকাশ পেয়েচে ভাই, কিন্তু পারেননি। হাঁ, আনন্দময়ী কথাটি তোমার কি মনে নেই? সখি! কারে দিয়ে যাব, তারা কানুসেবার কিবা জানে—

বলিতে বলিতে তিনি যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন, কহিলেন, সত্য প্রেমের কতটুকুই বা জানি আমরা? কেবল ছলনায় নিজেদের ভোলাই বৈ ত নয়! কিন্তু তুমি জানতে পেরেচ ভাই। তাই বলি, তুমি যেদিন এ প্রেম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করবে আনন্দময়ী—

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী যেন শিহরিয়া উঠিল, ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, এমন আশীর্ব্বাদ ক'রো না গোঁসাই, এ যেন না কপালে ঘটে। বরঞ্চ আশীর্ব্বাদ করো এমনি হেসে-খেলেই একদিন যেন ওঁকে রেখে মরতে পারি।

কমললতা কথাটা সামলাইয়া লইতে বলিল, বড়গোঁসাই তোমার ভালবাসার কথাটাই বলেছেন রাজু, আর কিছু নয়।

আমিও বুঝিয়াছিলাম অনুক্ষণ অন্য ভাবের ভাবুক দ্বারিকাদাস—তাঁহার চিন্তার ধারাটা সহসা আর এক পথে চলিয়া গিয়াছিল মাত্র।

রাজলক্ষ্মী শুষ্কমুখে বলিল, একে ত এই শরীর, তাতে একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে—একগুঁয়ে লোক, কারও কথা শুনতে চান না—আমি দিনরাত কি ভয়ে ভয়েই যে থাকি দিদি, সে আর জানাব কাকে?

এইবার মনে মনে আমি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম, যাবার সময়ে কথায় কথায় কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহার ঠিকানা নাই। আমি জানি, আমাকে অবহেলায় বিদায় দেওয়ার যে মর্ম্মান্তিক আত্মগ্লানি লইয়া এবার রাজলক্ষ্মী কাশী হইতে আসিয়াছে, সর্ব্বপ্রকার হাস্য-পরিহাসের অন্তরালেও কি একটা অজানা কঠিন দণ্ডের আশঙ্কা তাহার মন হইতে ঘুচিতেছে না। সেইটা শান্ত করার অভিপ্রায়ে হাসিয়া বলিলাম, তুমি যতই কেননা লোকের কাছে আমার রোগাদেহের নিন্দে করো লক্ষ্মী, এ দেহের বিনাশ নেই। আগে তুমি না মরলে আমি মরচিনে এ নিশ্চয়—

কথাটা সে শেষ করিতেও দিল না, খপ্‌ করিয়া আমার হাতটা ফেলিয়া বলিল, আমাকে ছুঁয়ে এঁদের সামনে তবে তুমি তিন সত্যি করো। বলো এ কথা কখনো মিথ্যে হবে না। বলিতে বলিতেই উদ্গত অশ্রুতে দুই চক্ষু তাহার উপচাইয়া উঠিল।

সবাই অবাক্ হইয়া রহিল। তখন লজ্জায় হাতটা আমার সে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, ঐ পোড়ারমুখো গোণক্কারটা মিছামিছি আমাকে এমনি ভয় দেখিয়ে রেখেচে যে—

এ কথাটাও সে সম্পূর্ণ করিতে পারিল না এবং মুখের হাসি ও লজ্জার বাধা সত্ত্বেও ফোঁটা-দুই চোখের জল তাহার গালের উপরে গড়াইয়া পড়িল।

আবার একবার সকলের কাছে একে একে বিদায় লওয়া হইল। বড়গোঁসাই কথা দিলেন এবার কলিকাতায় গেলে আমাদের ওখানে তিনি পদার্পণ করিবেন এবং পদ্মা কখনো শহর দেখে নাই, সেও সঙ্গে যাইবে।

স্টেশনে পৌঁছাইয়া সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়িল সেই 'পোড়ারমুখো গোণক্কার' লোকটাকে। প্লাটফর্মে কম্বল পাতিয়া বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে, আশেপাশে লোকও জুটিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ও সঙ্গে যাবে নাকি?

রাজলক্ষ্মী সলজ্জ হাসি আর একদিকে চাহিয়া গোপন করিল, কিন্তু মাথা নাড়িয়া জানাইল সেও সঙ্গে যাইবে!

বলিলাম, না, ও যাবে না।

কিন্তু ভালো না হোক, মন্দ-কিছু ত হবে না। আসুক না সঙ্গে?

বলিলাম, না, ভালো-মন্দ যাই হোক ও আসবে না। ওকে যা দেবার দিয়ে এখান থেকেই বিদায় করো, ওর গ্রহশান্তি করার ক্ষমতা এবং সাধুতা যদি থাকে যেন তোমার চোখের আড়ালেই করে।

তবে তাই বলে দিই, এই বলিয়া সে রতনকে দিয়া তাহাকে ডাকাইতে পাঠাইল। তাহাকে কি দিল জানি না, কিন্তু সে অনেকবার মাথা নাড়িয়া ও অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া সহাস্যমুখে বিদায় গ্রহণ করিল।

অনতিবিলম্বে ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইলে কলিকাতা অভিমুখে আমরাও যাত্রা করিলাম।

১২

রাজলক্ষ্মীর প্রশ্নের উত্তরে আমার অর্থাগমের বৃত্তান্তটা প্রকাশ করিতে হইল। আমাদের বর্ম্মা-অফিসের একজন বড়দরের সাহেব ঘোড়দৌড়ের খেলার সর্ব্বস্ব হারাইয়া আমার জমানো টাকা ধার লইয়াছিলেন। নিজেই সর্ত্ত করিয়াছিলেন শুধু সুদ নয়, সুদিন যদি আসে মুনাফার অর্দ্ধেক দিবেন। এবার কলিকাতায়

আসিয়া টাকা চাহিয়া পাঠাইলে তিনি কর্জের চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিয়াছেন। এই আমার সম্বল।

সেটা কত?

আমার পক্ষে অনেক, কিন্তু তোমার কাছে অতিশয় তুচ্ছ।

কত শুনি?

সাত-আট হাজার।

এ আমাকে দিতে হবে।

সভয়ে কহিলাম, সে কি কথা! লক্ষ্মী দানই করেন, তিনি হাতও পাতেন নাকি?

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, লক্ষ্মীর অপব্যয় সয় না। তিনি সন্ন্যাসী ফকিরকে বিশ্বাস করেন না—তারা অযোগ্য বলে। আনো টাকা।

কি করবে?

করব আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থান। এখন থেকে এই হবে আমার বাঁচবার মূলধন।

কিন্তু এটুকু মূলধনে চলবে কেন? তোমার একপাল দাসী-চাকরের পনেরো দিনের মাইনে দিতেই যে কুলোবে না। এর ওপর আছে গুরু-পুরুত, আছে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতা, আছে বহু বিধবার ভরণ-পোষণ—তাদের উপায় হবে কি?

তাদের জন্য ভাবনা নেই, তাদের মুখ বন্ধ হবে না। আমার নিজের ভরণ-পোষণের কথাই ভাবচি বুঝলে?

বলিলাম, বুঝেচি! এখন থেকে কোন একটা ছলনায় আপনাকে ভুলিয়ে রাখতে চাও—এই ত?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না তা নয়। সে-সব টাকা রইল অন্য কাজের জন্যে, কিন্তু তোমার কাছে হাত পেতে যা নেব এখন থেকে সেই হবে আমার ভবিষ্যতের পুঁজি। কুলোয় খাব, না হয় উপোস করব।

তা হলে তোমার অদৃষ্টে তাই আছে।

কি আছে—উপোস? এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, তুমি ভাবচ সামান্য, কিন্তু সামান্যকেই কি করে বাড়িয়ে বড় করে তুলতে হয় সে বিদ্যে আমি জানি। একদিন বুঝবে আমার ধনের সম্বন্ধে তোমরা যা সন্দেহ কর তা সত্যি নয়।

এ-কথা এতদিন বলোনি কেন?

বলিনি বিশ্বাস করবে না বলে। আবার টাকা তুমি ঘৃণায় ছোঁও না, কিন্তু তোমার বিতৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যায়।

ব্যথিত হইয়া কহিলাম, হঠাৎ এসব কথা আজ কেন বলচ লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ-কথা তোমার

কাছে আজ হঠাৎ ঠেকবে, কিন্তু এ যে আমার রাত্রিদিনের ভাবনা। তুমি কি ভাবো অধর্ম্মপথের উপার্জ্জন দিয়ে আমি ঠাকুর-দেবতার সেবা করি? সে অর্থের এক কণা তোমায় চিকিৎসায় খরচ করলে তোমাকে কি বাঁচাতে পারতুম? ভগবান আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিতেন। আমি যে তোমারই এ কথা সত্যি বলে তুমি বিশ্বাস কর কই?

বিশ্বাস করি ত।

না, করো না।

তাহার প্রতিবাদের তাৎপর্য্য বুঝিলাম না। সে বলিতে লাগিল, কমললতার সঙ্গে পরিচয় তোমার দু'দিনের, তবু তার সমস্ত কাহিনী তুমি মন দিয়ে শুনলে, তোমার কাছে তার সকল বাধা ঘুচলো—সে মুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু আমাকে কখনো জিজ্ঞাসা করলে না কোন কথা, কখনো বললে না, লক্ষ্মী তোমার সব ঘটনা আমাকে খুলে বল। কেন জিজ্ঞাসা করনি? করনি ভয়ে। তুমি বিশ্বাস কর না আমাকে, তুমি বিশ্বাস করতে পারো না আপনাকে।

বলিলাম, তাকেও জিজ্ঞাসা করিনি, জানতেও চাইনি। নিজে সে জোর করে শুনিয়েচে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবু ত শুনেচ। সে পর, তার বৃত্তান্ত শুনতে চাওনি প্রয়োজন নেই বলে। আমাকেও কি তাই বলবে নাকি?

না, তা বলব না। কিন্তু তুমি কি কমললতার চেলা? সে যা করচে তোমাকেও তাই করতে হবে?

ও-কথায় আমি ভুলব না। আমার সব কথা তোমাকে শুনতে হবে।

এ ত বড় মুস্কিল! আমি চাইনে শুনতে, তবু শুনতেই হবে।

হাঁ, হবে। তোমার ভাবনা, শুনলে হয়ত আমাকে আর ভালোবাসতে পারবে না, হয়ত বা আমাকে বিদায় দিতে হবে।

তোমার বিবেচনায় সেটা তুচ্ছ ব্যাপার নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না, সে হবে না—তোমাকে শুনতেই হবে। তুমি পুরুষমানুষ, তোমার মনে এতটুকু জোর নেই যে উচিত মনে হলে, আমাকে দূর করে দিতে পার?

এই অক্ষমতা অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া কবুল করিয়া বলিলাম, তুমি যে-সকল জোরালো পুরুষদের উল্লেখ করে আমাকে অপদস্ত করচ লক্ষ্মী, তাঁরা বীরপুরুষ—নমস্য ব্যক্তি, তাঁদের পদধূলির যোগ্যতা আমার নেই। তোমাকে বিদায় দিয়ে একটা দিনও আমি থাকতে পারব না, হয়ত তখনি ফিরিয়ে আনতে দৌড়াব এবং তুমি 'না' বলে বসলে আমার দুর্গতির অবধি থাকবে না। অতএব, এসকল ভয়াবহ

বিষয়ের আলোচনা বন্ধ কর।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তুমি জানো ছেলেবেলায় মা আমাকে এক মৈথিলী রাজপুত্রের হাতে বিক্রী করে দিয়েছিলেন?

হাঁ, আর এক রাজপুত্রের মুখে খবরটা শুনেছিলাম অনেককাল পরে। সে ছিল আমার বন্ধু।

রাজলক্ষ্মী বলিল, হাঁ, তোমার বন্ধুরই বন্ধু ছিল সে। একদিন মাকে রাগ করে বিদায় করে দিলুম, তিনি দেশে ফিরে এসে রটালেন আমার মৃত্যু। এ খবর তো শুনেছিলে?

হাঁ, শুনেছিলাম।

শুনে তুমি কি ভাবলে?

ভাবলাম, আহা! লক্ষ্মী মরে গেল!

এই? আর কিছু না?

আরও ভাবলাম, কাশীতে মরে তবু যা হোক একটা সদ্‌গতি হ'লো। আহা!

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিল,—যাও—মিথ্যে আহা! আহা! করে তোমাকে দুঃখ জানাতে হবে না। তুমি একটা 'আহাও' বলোনি আমি দিব্যি করে বলতে পারি। কই, আমাকে ছুঁয়ে বল ত?

বলিলাম, এতদিন আগেকার কথা কি ঠিক মনে থাকে? বলেছিলাম বলেই যেন মনে পড়েচে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, থাক কষ্ট করে অতদিনের পুরানো কথা আর মনে করে কাজ নেই, আমি সব জানি। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া বলিল, আর আমি? কেঁদে কেঁদে বিশ্বনাথকে প্রত্যহ জানাতুম, ভগবান আমার অদৃষ্টে এ তুমি কি করলে! তোমাকে সাক্ষী রেখে যাঁর গলায় মালা দিয়েছিলুম এ জীবনে তাঁর দেখা কি কখনো পাব না? এমনি অশুচি হয়েই চিরকাল কাটবে? সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও আমার আত্মহত্যা করে মরতে ইচ্ছে করে।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ক্লেশ বোধ হইল, কিন্তু আমার নিষেধ শুনিবে না বুঝিয়া মৌন হইয়া রহিলাম।

এই কথাগুলি সে অন্তরে অন্তরে কতদিন কতভাবে তোলাপাড়া করিয়াছে, আপন অপরাধে ভারাক্রান্ত মনে নীরবে কত মর্ম্মান্তিক বেদনাই সহ্য করিয়াছে, তবু প্রকাশ পাইতে ভরসা পায় নাই পাছে কি করিতে কি হইয়া যায়। এতদিনে এই শক্তি অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে সে কমললতার কাছে। বৈষ্ণবী আপন প্রচ্ছন্ন কলুষ অনাবৃত করিয়া মুক্তি পাইয়াছে, রাজলক্ষ্মী নিজেও আজ ভয় ও মিথ্যা মর্য্যাদার শিকল ছিঁড়িয়া তাহারি মত সহজ হইয়া দাঁড়াইতে চাই, অদৃষ্টে তাহার যাহাই

কেননা ঘটক। এ বিদ্যা দিয়াছে তাহাকে কমললতা। সংসারে একটিমাত্র মানুষের কাছেও যে এই দর্পিতা নারী হেঁট হইয়া আপন দুঃখের সমাধান ভিক্ষা করিয়াছে এই কথা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া মনের মধ্যে ভারী একটি তৃপ্তি বোধ করিলাম।

উভয়েই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া রাজলক্ষ্মী সহসা বলিয়া উঠিল, রাজপুত্র হঠাৎ মারা গেলেন, কিন্তু মা আবার চক্রান্ত করলেন আমাকে বিক্রী করবার—

এবার কার কাছে?

অপর একটি রাজপুত্র—তোমার সেই বন্ধু-রত্নটি—যাঁর সঙ্গে শিকার করতে গিয়ে—কি হ'লো মনে নেই?

বলিলাম, নেই বোধ হয়। অনেকদিনের কথা কিনা। কিন্তু তারপরে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, এ ষড়যন্ত্র খাটলো না। বললুম, মা, তুমি বাড়ি যাও। মা বললেন, হাজার টাকা নিয়েচি যে। বললুম, সে টাকা নিয়ে তুমি দেশে যাও, দালালীর টাকা যেমন করে পারি আমি শোধ দেব। বললুম, আজ রাত্রির গাড়িতেই যদি বিদায় না হও মা, কাল সকালেই দেব আমি আপনাকে আপনি বিক্রী করে মা-গঙ্গার জলে। জানো ত মা আমাকে, আমি মিথ্যে ভয় তোমাকে দেখাচ্ছিনে। মা বিদায় হলেন। তাঁর মুখেই আমার মরণ-সংবাদ পেয়ে তুমি দুঃখ করে বলেছিলে—আহা! মরে গেল! এই বলিয়া সে নিজেই একটুখানি হাসিল, বলিল, সত্যি হলে তোমার মুখের সেই আহাটুকুই আমার ঢের। কিন্তু এবার যেদিন সত্যি সত্যি মরব সেদিন কিন্তু দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলো। বলো, পৃথিবীতে অনেক বর-বধূ অনেক মালা-বদল করেচে, তাদের প্রেমে জগৎ পবিত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু তোমার কুলটা রাজলক্ষ্মী তার ন'বছর বয়সের সেই কিশোর বরটিকে একমনে যত ভালবেসেচে এ সংসারে তত ভালো কেউ কোনদিন কাউকে বাসেনি। আমার কানে কানে তখন বলবে ব'লো এই কথাগুলি? আমি মরেও শুনতে পাব।

একি, তুমি কাঁদচ যে!

সে চোখের জল আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, নিরুপায় ছেলেমানুষের ওপর তার আত্মীয়স্বজন যত অত্যাচার করেচে অন্তর্য্যামী ভগবান কি তা দেখতে পাননি ভাবো? এর বিচার তিনি করবেন না, চোখ বুজেই থাকবেন?

বলিলাম, থাকা উচিত নয় বলেই মনে করি। কিন্তু তাঁর ব্যাপার তোমরাই ভালো জানো, আমার মত পাষণ্ডের পরামর্শ তিনি কোনকালেই নেন না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কেবল ঠাট্টা! কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, আচ্ছা, লোকে যে বলে স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম্ম এক না হলে চলে না, কিন্তু ধর্ম্মে-কর্ম্মে তোমার

আমার ত সাপে-নেউলে সম্পর্ক। আমাদের তবে চলে কি করে?

চলে সাপে-নেউলের মতই! একালে প্রাণে বধ করায় হাঙ্গামা আছে, তাই একজন আর একজনকে বধ করে না, নির্ম্মম হয়ে বিদায় করে দেয়, যখন আশঙ্কা হয় তার ধর্ম্ম-সাধনায় বিঘ্ন ঘটেচে।

তারপরে কি হয়?

হাসিয়া বলিলাম, তারপরে সে নিজেই কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে। নাকে খত দিয়ে বলে আমার অনেক শিক্ষা হয়েচে, এ জীবনে এত ভুল আর করব না, রইল আমার জপ-তপ, গুরু-পুরুত—আমাকে ক্ষমা কর।

রাজলক্ষ্মীও হাসিল, কহিল, ক্ষমা পায় ত?

পায়। কিন্তু তোমার গল্পের কি হ'লো?

রাজলক্ষ্মী কহিল, বলচি। ক্ষণকাল নিষ্পলকচক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল, মা দেশে চলে গেলেন। আমাকে একজন বুড়ো ওস্তাদ গান-বাজনা শেখাতেন, লোকটি বাঙালী, এককালে সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু ইস্তফা দিয়ে আবার সংসারী হয়েছিলেন। তাঁর ঘরে ছিল মুসলমান স্ত্রী, তিনি শেখাতে আসতেন আমাকে নাচ! তাঁকে বলতুম আমি দাদামশাই—আমাকে সত্যিই বড় ভালো-বাসতেন। কেঁদে বললুম, দাদামশাই, আমাকে তুমি রক্ষে কর, এসব আর আমি পারব না। তিনি গরীব লোক, হঠাৎ সাহস করলেন না। আমি বললুম, আমার যে টাকা আছে তাতে অনেকদিন চলে যাবে। তারপর কপালে যা আছে হবে, এখন কিন্তু পালাই চলো। তারপরে তাঁদের সঙ্গে কত জায়গায় ঘুরলুম—এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগরা, জয়পুর, মথুরা—শেষে আশ্রয় নিলুম এসে পাটনায়। অর্দ্ধেক টাকা জমা দিলুম এক মহাজনের গদীতে, আর অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে ভাগে খুললুম একটা মনোহারী আর একটা কাপড়ের দোকান। বাড়ি কিনে খোঁজ করে বঙ্কুকে আনিয়ে নিয়ে দিলুম তাকে ইস্কুলে ভর্তি করে, আর জীবিকার জন্যে যা করতুম সে ত তুমি নিজের চোখেই দেখেচ।

তাহার কাহিনী শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, তারপরে বলিলাম, তুমি বলেই অবিশ্বাস হয় না—আর কেউ হলে মনে হ'তো মিথ্যা বানানো একটা গল্প শুনচি মাত্র।

রাজলক্ষ্মী বলিল, মিথ্যে বলতে বুঝি আমি পারিনে?

বলিলাম, পার হয়ত, কিন্তু আমার কাছে আজও বলোনি বলেই আমার বিশ্বাস।

এ বিশ্বাস কেন?

কেন! তোমার ভয় মিথ্যে ছলনায় পাছে কোন দেবতা রুষ্ট হন। তোমাকে

শাস্তি দিতে পাছে আমার অকল্যাণ করেন।

আমার মনের কথাই বা তুমি জানতে পার কি করে?

আমি পারি এ আমার দিবানিশির ভাবনা বলে, কিন্তু তোমার ত তা নয়।

হলে খুশী হও।

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া বলিল, না, হইনে। আমি তোমার দাসী, দাসীকে তার চেয়ে বেশী ভাববে না এই আমি চাই।

উত্তরে বলিলাম, সেই সে-যুগের মানুষ তুমি—সেই হাজার বছরের পুরানো সংস্কার!

রাজলক্ষ্মী বলিল, তাই যেন আমি হতে পারি। এমনই যেন চিরদিন থাকি! এই বলিয়া সে ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ যুগের মেয়েদের আমি দেখিনি তুমি ভাবচ? অনেক দেখেচি। বরঞ্চ তুমিই দেখনি, কিংবা দেখেচ কেবল বাইরে থেকে। এদের কারুর সঙ্গে আমাকে বদল করো ত দেখি কেমন থাকতে পার? আমাকে ঠাট্টা করছিলে নাকখত দিয়েচি বলে, তখন তুমি দেবে দশ হাত মেপে নাকে খত।

কিন্তু এ মীমাংসা যখন হবার নয় তখন ঝগড়া করে লাভ নেই। কেবল এইটুকু বলতে পারি, এঁদের সম্বন্ধে তুমি অত্যন্ত অবিচার করেচ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, অবিচার যদি করেও থাকি অত্যন্ত অবিচার করিনি তা বলতে পারি। ওগো গোঁসাই, আমিও যে অনেক ঘুরেচি, অনেক দেখেচি। তোমরা যেখানে অন্ধ সেখানেও যে আমাদের দশজোড়া চোখ খোলা।

কিন্তু সে দেখেচ রঙীন চশমা দিয়ে, তাই সমস্ত ভুল দেখেচ। দশজোড়াই ব্যর্থ।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, কি বলব আমার হাত-পা বাঁধা—নইলে এমন জব্দ করতুম যে জন্মে ভুলতে না। কিন্তু সে থাকগে, আমি সে-যুগের মত তোমার দাসী হয়েই যেন থাকি, তোমার সেবাই যেন হয় আমার সবচেয়ে বড় কাজ। কিন্তু তোমাকে আমার কথা ভাবতে আমি একটুও দেব না। সংসারে তোমার অনেক কাজ—এখন থেকে তাই করতে হবে। হতভাগীর জন্যে তোমার অনেক সময় এবং আরও অনেক কিছু গেছে—আর নষ্ট করতে আমি দেব না।

বলিলাম, এ জন্যেই ত আমি যত শীঘ্র পারি সেই সাবেক চাকরিতে গিয়ে ভর্ত্তি হতে চাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাকরি করতে তোমাকে ত দিতে পারব না।

কিন্তু মনোহারী দোকান চালাতেও ত আমি পেরে উঠব না।

কেন পেরে উঠবে না?

প্রথম কারণ, জিনিসের দাম আমার মনে থাকে না, দ্বিতীয় কারণ দাম নেওয়া এবং দ্রুত হিসেব করে বাকী ফিরিয়ে দেওয়া সে আরও অসম্ভব। দোকান ত

উঠবেই, খদ্দেরের সঙ্গে লাঠালাঠি না লাগলে বাঁচি।

তবে একটা কাপড়ের দোকান কর?

তার চেয়ে একটা জ্যান্ত বাঘ-ভালুকের দোকান করে দাও, সে বরঞ্চ চালানো সহজ হবে।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, একমনে এত আরাধনা করে কি শেষে ভগবান এমনি একটা অকর্ম্মা মানুষ আমাকে দিলেন, যাকে নিয়ে সংসারে এতটুকু কাজ চলে না।

বলিলাম, আরাধনার ক্রুটি ছিল। সংশোধনের সময় আছে, এখনো কর্ম্মঠ লোক তোমার মিলতে পারে। বেশ সুপুষ্ট নীরোগ বেঁটেখাটো জোয়ান, যাকে কেউ হারাতে কেউ ঠকাতে পারবে না, যাকে কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত, হাতে টাকাকড়ি দিয়ে নির্ভয়, যাকে খবরদারি করতে হবে না, ভিড়ের মধ্যে যাকে হারিয়ে ফেলবার উৎকণ্ঠা নেই, যাকে সাজিয়ে তৃপ্তি, খাইয়ে আনন্দ—হাঁ ছাড়া যে না বলতে জানে না—

রাজলক্ষ্মী নির্ব্বাক্‌মুখে আমার প্রতি চাহিয়াছিল, অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গে তাহার কাঁটা দিয়া উঠিল।

বলিলাম, ও কি ও?

না কিছু না।

তবে শিউরে উঠল যে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, মুখে মুখে যে ছবি তুমি আঁকলে তাঁর অর্দ্ধেক সত্যি হলেও বোধ হয় আমি ভয়ে মরে যাই।

কিন্তু আমার মত এমন অকর্ম্মা লোক নিয়েই বা তুমি করবে কি?

রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া বলিল, করব আর কি! ভগবানকে অভিসম্পাত করব, আর চিরকাল জ্বলেপুড়ে মরব। এ-জন্মে আর ত কিছু চোখে দেখিনে।

এর চেয়ে বরঞ্চ আমাকে মুরারিপুর আখড়ায় পাঠিয়ে দাও না কেন?

তাদেরই বা তুমি কি উপকার করবে?

তাদের ফুল তুলে দেব। ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যতদিন বাঁচি থাকব, তারপরে তারা দেবে আমাকে সেই বকুলতলায় সমাধি। ছেলেমানুষ পদ্মা কোন্ সন্ধ্যায় দিয়ে যাবে প্রদীপ জেলে, কখনো বা তার ভুল হবে—সে সন্ধ্যায় আলো জ্বলবে না। ভোরের ফুল তুলে তারি পাশ দিয়ে ফিরবে যখন কমললতা, কোনোদিন বা দেবে সে একমুঠো মল্লিকা ফুল ছড়িয়ে, কোনদিন বা দেবে কুন্দ। আর পরিচিত যদি কেউ কখনো আসে পথ ভুলে, তাকে দেখিয়ে বলবে, ঐখানে থাকে আমাদের নতুন-গোঁসাই। ঐ যে একটু উঁচু—ঐ যেখানটায় শুকনো মল্লিকা-কুঁদ-করবীর সঙ্গে মিশে

ঝরা-বকুলে সব ছেয়ে আছে—ঐখানে।

রাজলক্ষ্মীর চোখ জলে ভরিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, আর সেই পরিচিত লোকটি কি করবে তখন?

বলিলাম, সে আমি জানিনে। হয়ত অনেক টাকা খরচ করে মন্দির বানিয়ে দিয়ে যাবে—

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, হ'লো না। সে বকুলতলা ছেড়ে আর যাবে না। গাছের ডালে ডালে করবে পাখীরা কলরব, গাইবে গান, করবে লড়াই—কত ঝরিয়ে ফেলবে শুকনো পাতা, শুকনো ডাল, সে-সব মুক্ত করার কাজ থাকবে তার। সকালে নিকিয়ে মুছিয়ে দেবে ফুলের মালা গেঁথে, রাত্রে সবাই ঘুমোলে শোনাবে তাঁকে বৈষ্ণব কবিদের গান, তারপর সময় হলে ডেকে বলবে, কমললতাদিদি, আমাদের এক করে দিয়ো সমাধি, যেন ফাঁক না থাকে, যেন আলাদা বলে চেনা না যায়। আর এই নাও টাকা, দিয়ো মন্দির গড়িয়ে, ক'রো রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, কিন্তু লিখো না কোন নাম, রেখো না কোন চিহ্ন—কেউ না জানে কেই বা এরা, কোথা থেকেই বা এলো।

বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার ছবিটি যে হ'লো আরও মধুর, আরও সুন্দর।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এ ত কেবল কথা গেঁথে ছবি নয় গোঁসাই, এ যে সত্যি। তফাত যে ঐখানে! আমি পারব, কিন্তু তুমি পারবে না। তোমার আঁকা কথার ছবি শুধু কথা হয়েই থাকবে।

কি করে জানলে?

জানি। তোমার নিজের চেয়েও বেশী জানি। ঐ ত আমার পূজো, ঐ ত আমার ধ্যান। আহ্নিক শেষ করে কার পায়ে দিই জলাঞ্জলি? কার পায়ে দিই ফুল? সে ত তোমারই।

নীচে হইতে মহারাজের ডাক আসিল, মা, রতন নেই, চায়ের জল তৈরী হয়ে গেছে।

যাই বাবা, বলিয়া সে চোখ মুছিয়া তখনি উঠিয়া গেল।

খানিক পরে চায়ের বাটি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমার কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল, তুমি বই পড়তে এত ভালোবাসো, এখন থেকে তাই কেন করো না?

তাতে টাকা ত আসবে না?

কি হবে টাকায়? টাকা ত আমাদের অনেক আছে।

একটু থামিয়া বলিল, উপরের ঐ দক্ষিণের ঘরটা হবে তোমার পড়ার ঘর। আনন্দ ঠাকুরপো আনবে বই কিনে, আর আমি সাজিয়ে তুলব আমার মনের মত করে। ওর একপাশে থাকবে আমার শোবার ঘর, অন্যপাশে হবে আমার ঠাকুর-

ঘর। এ জন্মে রইল আমার ত্রিভুবন—এর বাইরে যেন না কখনো দৃষ্টি যায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার রান্নাঘর? আনন্দ সন্ন্যাসী-মানুষ, ওখানে চোখ না দিলে যে তাকে একটা দিনও রাখা যাবে না, কিন্তু তার সন্ধান পেলে কি করে? কবে আসবে সে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, সন্ধান দিয়েচেন কুশারীমশাই—আনন্দ আসবে বলচে খুব শীঘ্র, তারপরে সকলে মিলে যাব গঙ্গামাটিতে—থাকব সেখানে কিছুদিন।

বলিলাম, তা যেন গেলে, কিন্তু তাদের কাছে গিয়ে এবার তোমার লজ্জা করবে না?

রাজলক্ষ্মী কুণ্ঠিতহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু তারা ত কেউ জানে না কাশীতে আমি নাক-চুল কেটে সঙ সেজেছিলুম? চুল আমার অনেকটা বেড়েচে, আর নাক গেছে বেমালুম জুড়ে—দাগটুকু পর্য্যন্ত নেই। আর তুমি যে আছ সঙ্গে, আমার সব অন্যায় সব লজ্জা মুছে নিতে।

একটু থামিয়া বলিল, খবর পেয়েচি সেই হতভাগী মালতীটা এসেছে ফিরে, সঙ্গে এনেচে তার স্বামীকে। আমি তাকে দেব একটা হার গড়িয়ে।

বলিলাম, তা দিয়ো, কিন্তু আবার গিয়ে যদি সুনন্দার পাল্লায় পড়—

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না গো না, সে ভয় আর নেই, তার মোহ আমার কেটেচে। বাপরে বাপ; এমন ধর্ম্মবুদ্ধি দিলে যে দিনেরাতে না পারি চোখের জল সামলাতে, না পারি খেতে শুতে। পাগল হয়ে যে যাইনি এই ঢের। এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, তোমার লক্ষ্মী আর যাই হোক, অস্থির মনের লোক নয়! সে সত্যি বলে একবার যখন বুঝবে তাকে আর কেউ টলাতে পারবে না। একটুখানি নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিল, আমার সমস্ত মনটি যেন এখন আনন্দে ডুবে আছে, সব সময়েই মনে হয় এ জীবনের সমস্ত পেয়েছি, আর আমার কিছু চাইনে। এ যদি না ভগবানের নির্দ্দেশ হয় ত আর কি হবে বলো ত? প্রতিদিন পূজো করে ঠাকুরের চরণে নিজের জন্যে আর কিছু কামনা করিনে, কেবল প্রার্থনা করি এমনি আনন্দ যেন সংসারে সবাই পায়। তাইত আনন্দ-ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠিয়েচি তার কাজে এখন থেকে কিছু কিছু সাহায্য করব বলে।

বলিলাম, ক'রো!

রাজলক্ষ্মী নিজের মনে কি ভাবিতে লাগিল, সহসা বলিয়া উঠিল, দ্যাখো, এই সুনন্দা মেয়েটির মত এমন সৎ, এমন নির্লোভ, এমন সত্যবাদী মেয়ে দেখিনি, কিন্তু ওর বিদ্যের ঝাঁজ যতদিন না মরবে ততদিন ও বিদ্যে কাজে লাগবে না।

কিন্তু সুনন্দার বিদ্যের দর্প ত নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না, ইতরের মত নেই—আর সে-কথাও আমি বলি নি।

ও কত শ্লোক, কত শাস্ত্রকথা, কত গল্প উপাখ্যান জানে, ওর মুখে শুনে শুনেই ত আমার ধারণা হয়েছিল আমি তোমার কেউ নই, আমাদের সম্বন্ধ মিথ্যে– আর তাই ত বিশ্বাস করতে চেয়েছিলুম—কিন্তু ভগবান আমাকে ঘাড়ে ধরে বুঝিয়ে দিলেন এর চেয়ে মিথ্যে আর নেই। তবেই ছাখো ওর বিছের মধ্যে কোথায় মস্ত ভুল আছে। তাই দেখি ও কাউকেই সুখী করতে পারে না, সবাইকে শুধু দুঃখ দেয়; কিন্তু ওর বড় জা ওর চেয়ে অনেক বড়। সাদামাটা মানুষ, লেখাপড়া জানে না, কিন্তু মনের ভেতরটা দয়া-মায়ায় ভরা। কত দুঃখী দরিদ্র পরিবার ও লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতিপালন করে—কেউ জানতে পায় না। ঐ যে তাঁতীদের একটা সুব্যবস্থা হলো সে কি সুনন্দাকে দিয়ে কখনো হতো? তেজ দেখিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াতেই হয়েছে ভাবো? কখ্খনো না। সে করেচে ওর বড়জা কেঁদেকেটে স্বামীর পায়ে ধরে। সুনন্দা সমস্ত সংসারের কাছে ওর গুরুজন ভাসুরকে চোর বলে ছোট করে দিলে—এইটেই কি শাস্ত্রশিক্ষার বড় কথা? ওর পুঁথির বিছে যতদিন না মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, লোভ-মোহের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে পারবে ততদিন ওর বইয়ে-পড়া কর্ত্তব্যজ্ঞানের ফল মানুষকে অযথা বিঁধবে, অত্যাচার করবে, সংসারে কাউকে কল্যাণ দেবে না তোমাকে বলে দিলুম।

কথাগুলি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, এসব তুমি শিখলে কার কাছে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, কি জানি কার কাছে! হয়ত তোমারি কাছে। তুমি বলো না কিছুই, চাও না কিছুই, জোর করো না কারো ওপর, তাই তোমার কাছে শেখা ত কেবল শেখা নয় সত্যি ক'রে পাওয়া। হঠাৎ একদিন আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে হয় এসব এলো কোথা থেকে। সে যাকৃগে, এবার গিয়ে কিন্তু বড় কুশারীগিন্নীর সঙ্গে ভাব করব, সেবার তাঁকে অবহেলা করে যে ভুল করেছি, এবার তার সংশোধন হবে। যাবে ত গঙ্গামাটিতে?

কিন্তু বর্ম্মা? আমার চাকরি?

আবার চাকরি? এই যে বললুম, চাকরি তোমাকে আমি করতে দেব না?

লক্ষ্মী, তোমার স্বভাবটি বেশ। তুমি বল না কিছুই, চাও না কিছুই, জোর করো না কারও ওপর—খাঁটি বৈষ্ণবী-তিতিক্ষার নমুনা শুধু তোমার কাছেই মেলে।

তাই বলে যার যা খেয়াল তাতেই সায় দিতে হবে? সংসারে আর কারও সুখ-দুঃখ নেই নাকি? তুমি নিজেই সব!

ঠিক বটে! কিন্তু অভয়া! সে প্লেগের ভয়ও করেনি, সে দুর্দ্দিনে আশ্রয় দিয়ে না বাঁচালে আজ আমাকে তুমি পেতে না। আজ তাদের কি হলো এ কথা একবার ভাববে না?

রাজলক্ষ্মী এক মুহূর্তে করুণা ও কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া বলিল, তবে তুমি থাকো. আনন্দ-ঠাকুরপোকে নিয়ে আমি যাই, বর্ম্মায় গিয়ে তাঁদের ধরে আনিগে। কোন একটা উপায় এখানে হবেই।

বলিলাম, তা হতে পারে, কিন্তু সে বড় অভিমানী, আমি না গেলে হয়ত আসবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আসবে। সে বুঝবে যে তুমিই এসেচ তাদের নিতে। দেখো আমার কথা ভুল হবে না।

কিন্তু আমাকে ফেলে রেখে যেতে পারবে ত?

রাজলক্ষ্মী প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তারপরে অনিশ্চিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, সেই-ই আমার ভয়। হয়ত পারব না; কিন্তু তার আগে চল না গিয়ে দিন-কতক থাকিগে গঙ্গামাটিতে।

সেখানে কি তোমার বিশেষ কোন কাজ আছে?

আছে একটু। কুশারীমশাই খবর পেয়েচেন পাশের পোড়ামাটি গাঁ-টা তারা বিক্রী করবে। ওটা ভাবচি কিনব। সে বাড়িটাও ভালো করে তৈরী করাব, যেন সেখানে থাকতে তোমার কষ্ট না হয়। সেবারে দেখেচি ঘরের অভাবে তোমার কষ্ট হতো।

বলিলাম, ঘরের অভাবে কষ্ট হতো না, কষ্ট হতো অন্য কারণে।

রাজলক্ষ্মী ইচ্ছা করিয়াই এ কথায় কান দিল না, বলিল, আমি দেখেচি সেখানে তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকে—বেশীদিন শহরে রাখতে যে তোমাকে ভরসা হয় না, তাইত তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

কিন্তু এই ভঙ্গুর দেহটাকে নিয়ে যদি অনুক্ষণ তুমি এত বিব্রত থাকো, মনে শান্তি পাব না লক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এ উপদেশ খুব কাজের, কিন্তু আমাকে না দিয়ে নিজে যদি একটু সাবধানে থাকো হয়ত সত্যিই শান্তি একটু পেতে পারি।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ এ বিষয়ে তর্ক করা শুধু নিষ্ফল নয়, অপ্রীতিকর। তাহার নিজের স্বাস্থ্য অটুট কিন্তু সৌভাগ্য যাহার নাই, বিনাদোষেও যে তাহার অসুখ করিতে পারে এ কথা সে কিছুতেই বুঝিবে না।

বলিলাম, শহরে আমি কোনকালেই থাকতে চাইনে। সেদিন গঙ্গামাটি আমার ভালোই লেগেছিল, নিজের ইচ্ছেয় চলেও আসিনি—এ কথা আজ তুমি ভুলে গেছ লক্ষ্মী।

না গো না, ভুলিনি। সারাজীবনে ভুলবো না—এই বলিয়া সে একটু হাসিল। বলিল, সেবারে তোমার মনে হ'তো যেন কোন্ অচেনা জায়গায় এসে পড়েচ, কিন্তু এবারে গিয়ে দেখো তার আকৃতি-প্রকৃতি এমনি বদলে যাবে যে, তাকে আপনার বলে

বুঝতে একটুও গোল হবে না। আর কেবল ঘরবাড়ি থাকবার জায়গাই নয়, এবার গিয়ে আমি বদলাব নিজেকে, আর সবচেয়ে বদলে ভেঙে গড়ে তুলব নতুন করে তোমাকে—আমার নতুন গোঁসাইজীকে! কমললতাদিদি আর যেন না দাবী করতে পারে তার পথে-বিপথে বেড়াবার সঙ্গী বলে।

বলিলাম, এইসব বুঝি ভেবে ভেবে স্থির করেচ?

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, হাঁ। তোমাকে কি বিনামূল্যে অমনি অমনিই নেব তার ঋণ পরিশোধ করব না? আর আমিও যে তোমার জীবনে সত্যি করে এসেছিলুম, যাবার আগে সেই আসার চিহ্ন রেখে যাব না? এমনিই নিষ্ফলা চলে যাব? কিছুতেই তা আমি হতে দেব না।

তাহার মুখের পানে চাহিয়া শ্রদ্ধায় ও স্নেহে অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, মনে মনে ভাবিলাম, হৃদয়ের বিনিময় নর-নারীর অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা—সংসারে নিত্য নিয়ত ঘটিয়া চলিয়াছে, বিরাম নাই, বিশেষত্ব নাই; আবার এই দান ও প্রতিগ্রহই ব্যক্তিবিশেষের জীবন অবলম্বন করিয়া কি বিচিত্র বিস্ময় ও সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, মহিমা তাহার যুগে যুগে মানুষের মন অভিষিক্ত করিয়াও ফুরাইতে চাহে না। এই সেই অক্ষয় সম্পদ, মানুষকে ইহা বৃহৎ করে, শক্তিমান করে, অভাবিত কল্যাণ নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া তোলে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি বঙ্কুর কি করবে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে ত আমাকে আর চায় না। ভাবে এ আপদ দূর হলেই ভালো।

কিন্তু সে যে তোমার নিকট-আত্মীয়—তাকে যে ছেলেবেলায় মানুষ করে তুলেচ?

সেই মানুষ-করার সম্বন্ধই থাকবে, আর কিছু মানব না। নিকট-আত্মীয় আমার সে নয়।

কেন নয়? অস্বীকার করবে কি করে?

অস্বীকার করার ইচ্ছে আমারও ছিল না, এই বলিয়া সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আমার সব কথা তুমিও জানো না। আমার বিয়ের গল্প শুনেছিলে?

শুনেছিলাম লোকের মুখে; কিন্তু তখন ত আমি দেশে ছিলাম না।

না ছিলে না। এমন দুঃখের ইতিহাস আর নেই, এমন নিষ্ঠুরতাও বোধ হয় কোথাও হয়নি। বাবা মাকে কখনো নিয়ে যাননি, আমিও কখনো তাঁকে দেখিনি। আমরা দু'বোনে মামার বাড়িতেই মানুষ। ছেলেবেলা জ্বরে জ্বরে আমার কি চেহারা ছিল মনে আছে ত?

আছে।

তবে শোন। বিনাদোষে শাস্তির পরিমাণ শুনলে তোমার মত নিষ্ঠুর

লোকেরও দয়া হবে। জ্বরে ভুগি, কিন্তু মরণ হয় না! মামা নিজেও নানা অসুখে শয্যাগত, হঠাৎ খবর জুটলো দত্তদের বামুনঠাকুর আমাদের ঘর, মামার মতই স্বভাব-কুলীন। বয়সে ষাটের কাছে। আমাদের দুবোনকেই একসঙ্গে তার হাতে দেওয়া হবে। সবাই বললে এ সুযোগ হারালে আইবুড়ো নাম আর ওদের খণ্ডাবে না। সে চাইলে একশ', মামা পাইকিরি দর হাঁকলে পঞ্চাশ টাকা। এক আসনে একসঙ্গে—মেহন্নত কম। সে নাবলো পঁচাত্তরে, বললে, মশাই, দু-দুটো ভাগনীকে কুলীনে পার করবেন, একজোড়া রামছাগলের দাম দেবেন না? ভোর-রাত্রে লগ্ন, দিদি নাকি জেগে ছিল, কিন্তু আমাকে পুঁটলি বেঁধে এনে উচ্ছুগ্যু করে দিলে। সকাল হতে বাকী পঁচিশ টাকার জন্যে ঝগড়া শুরু হ'লো। মামা বললেন, ধারে কুশণ্ডিকে হোক, সে বললে, সে অতো হাবা নয়, এসব কারবারে ধারধোর চলবে না। সে গা-ঢাকা দিলে, বোধ হয় ভাবলে মামা খুঁজেপেতে এনে তাকে টাকা দিয়ে কাজটা সম্পূর্ণ করবেন। একদিন যায়, দু'দিন যায়, মা কাঁদাকাটা করেন, পাড়ার লোকেরা হাসে, মামা গিয়ে দত্তদের কাছে নালিশ করেন, কিন্তু বর আর এলো না। তাদের গাঁয়ে খোঁজ নেওয়া হলো, সেখানে সে যায়নি। আমাদের দেখিয়ে কেউ বলে আধকপালী, কেউ বলে পোড়াকপালী—দিদি লজ্জায় ঘরের বা'র হয় না—সেই ঘর থেকে ছ'মাস পরে বা'র করা হ'লো একেবারে শ্মশানে। আরও ছ'মাস পরে কলকাতার কোন একটা হোটেল থেকে খবর এল বরও সেখানে রাঁধতে রাঁধতে জ্বরে মরেচে। বিয়ে আর পুরো হলো না।

বলিলাম, পঁচিশ টাকা দিয়ে বর কিনলে ঐরকমই হয়।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবু ত সে আমার ভাগে পঁচিশ পেয়েছিল, কিন্তু তুমি পেয়েছিলে কি? শুধু একছড়া বঁইচির মালা—তাও কিনতে হয়নি—বন থেকে সংগ্রহ হয়েছিল।

কহিলাম, দাম না থাকলে তাকে অমূল্য বলে। আর একটা মানুষ দেখাও ত যে আমার মত অমূল্য ধন পেয়েচে?

তুমি বলো ত এ কি তোমার মনের সত্যি কথা?

টের পাও না?

না গো না, পাইনে, সত্যি পাইনে—কিন্তু বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল, কহিল, পাই শুধু তখন যখন তুমি ঘুমোও—তোমার মুখের পানে চেয়ে; কিন্তু সে-কথা যাক। তোমাদের দুবোনের মত শাস্তিভোগ এদেশে কতশত মেয়ের কপালেই ঘটে। আর কোথাও বোধহয় কুকুর-বেড়ালেরও এমন দুর্গতি করতে মানুষের বুকে বাজে। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, হয়ত তুমি ভাবচ আমার নালিশটা বাড়াবাড়ি, এমন দৃষ্টান্ত আর ক'টা মেলে? এর উত্তরে যদি বলতুম

একটা হলেও সমস্ত দেশের কলঙ্ক; তাতেও আমার জবাব হতো, কিন্তু সে আমি বলব না। আমি বলব, অনেক হয়। যাবে আমার সঙ্গে সেইসব বিধবাদের কাছে, যাদের আমি অল্পস্বল্প সাহায্য করি? তাঁরা সবাই সাক্ষ্য দেবেন, তাঁদের হাত-পা বেঁধে আত্মীয়স্বজনে এমনিই জলে ফেলে দিয়েছিল।

বলিলাম, তাই বুঝি তাদের ওপর এত মায়া?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমারও হ'তো যদি চোখ চেয়ে আমাদের দুঃখটা দেখতে। এখন থেকে একটি একটি করে আমিই তোমাকে সমস্ত দেখাব।

আমি দেখব না, চোখ বুজে থাকব।

পারবে না। আমার কাজের ভার একদিন ফেলে যাব আমি তোমার ওপর। সব ভুলবে, কিন্তু সে ভুলতে কখনো পারবে না। এই বলিয়া সে একটুখানি মৌন থাকিয়া অকস্মাৎ নিজের পূর্ব্বকথার অনুসরণে বলিয়া উঠিল, হবেই ত এমনি অত্যাচার। যেদেশে মেয়ের বিয়ে না হলে ধর্ম্ম যায়, জা৩ যায়, লজ্জায় সমাজে মুখ দেখাতে পারে না—হাবা-বোবা-অন্ধ-আতুর কারও রেহাই নেই সেখানে একটাকে ফাঁকি দিয়ে লোকে অন্যটাকেই রাখে, এছাড়া সে-দেশে মানুষের আর কি উপায় আছে বলো ত? সেদিন সবাই আমাদের বোন দুটিকে যদি বলি না দিত, দি দি হয়ত মরত না, আর আমি—এজন্মে এমন করে তোমাকে হয়ত পেতুম না, কিন্তু মনের মধ্যে তুমিই চিরদিন এমনি প্রভু হয়েই থাকতে। আর, তাই বা কেন? আমাকে এড়াতে তুমি পারতে না, যেখানে হোক, যতদিনে হোক নিজে এসে আমাকে নিয়ে যেতে হতোই।

একটা জবাব দিব ভাবিতেছি হঠাৎ নীচ হইতে বালক-কণ্ঠে ডাক আসিল, মাসীমা?

আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কে?

ও-বাড়ির মেজবৌয়ের ছেলে, এই বলিয়া সে ইঙ্গিতে পাশের বাড়টা দেখাইয়া সাড়া দিল—ক্ষিতীশ, ওপরে এসো বাবা!

পরক্ষণেই একটি ষোল-সতেরো বছরের সুশ্রী বলিষ্ঠ কিশোর ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমাকে দেখিয়া প্রথমটা সঙ্কুচিত হইল, পরে নমস্কার করিয়া তাহার মাসীমা-কেই কহিল, আপনার নামে কিন্তু বারো টাকা চাঁদা পড়েছে মাসীমা।

তা পড়ুক বাবা, কিন্তু সাবধানে সাঁতার কেটো, কোনো দুর্ঘটনা না হয়।

নাঃ—কোন ভয় নেই মাসীমা।

রাজলক্ষ্মী আলমারি খুলিয়া তাহার হাতে টাকা দিল, ছেলেটি দ্রুতবেগে সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে নামিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, মা বলে দিলেন ছোটমামা পরশু সকালে এসে সমস্ত এস্টিমেট করে দেবেন। বলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিল।

প্রশ্ন করিলাম, এস্টিমেট কিসের?

বাড়িটা মেরামত করতে হবে না? তেতলার ঘরটা আধখানা করে তারা ফেলে রেখেচে, পুরো করতে হবে না?

তা হবে, কিন্তু এত লোককে তুমি চিনলে কি করে?

বাঃ, এরা যে সব পাশের বাড়ির লোক; কিন্তু আর না, যাই—তোমার খাবার তৈরীর সময় হয়ে গেল। এই বলিয়া সে উঠিয়া নীচে চলিয়া গেল।

১৩

এক সকালে স্বামীজী আনন্দ আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে আসার নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে রতন জানিত না, বিষণ্নমুখে আসিয়া আমাকে খবর দিল, বাবু, গঙ্গামাটির সেই সাধুটা এসে হাজির হয়েচে। বলিহারি তাকে, খুঁজে খুঁজে বা'র করেচে ত!

রতন সর্ব্বপ্রকার সাধুসজ্জনকেই সন্দেহের চোখে দেখে, রাজলক্ষ্মীর গুরুদেবটিকে ত সে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না, বলিল, দেখুন, এ আবার মাকে কি মতলব দেয়। টাকা বার করে নেবার কত ফন্দিই যে এই ধার্ম্মিক ব্যাটারা জানে।

হাসিয়া বলিলাম, আনন্দ বড়লোকের ছেলে, ডাক্তারি পাশ করেচে, তার নিজের টাকার দরকার নেই।

হুঁঃ—বড়লোকের ছেলে! টাকা থাকলে নাকি কেউ আবার এপথে যায়! এই বলিয়া সে তাহার সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিয়া চলিয়া গেল। রতনের আসল আপত্তি এইখানে, মায়ের টাকা কেহ বার করিয়া লইবার সে ঘোরতর বিরুদ্ধে। অবশ্য, তাহার নিজের কথা স্বতন্ত্র।

বজ্রানন্দ আসিয়া আমাকে নমস্কার করিল, কহিল, আর একবার এলুম দাদা। খবর ভালো ত? দিদি কই?

বোধ হয় পূজায় বসেচেন, সংবাদ পাননি নিশ্চয়ই।

তবে সংবাদটা নিজে দিই গে। পূজো করা পালিয়ে যাবে না, এখন একবার রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। পূজোর ঘরটা কোন্ দিকে দাদা? নাপ্‌তে ব্যাটা গেল কোথায়—চায়ের একটু জল চড়িয়ে দিক না।

পূজার ঘরটা দেখাইয়া দিলাম। আনন্দ রতনের উদ্দেশে একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া সেইদিকে প্রস্থান করিল।

মিনিট-দুই পরে উভয়েই আসিয়া উপস্থিত হইল, আনন্দ কহিল, দিদি, গোটা-পাঁচেক টাকা দিন, চা খেয়ে একবার শিয়ালদার বাজারটা ঘুরে আসি গে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কাছেই যে একটা ভালো বাজার আছে আনন্দ, অত দূরে যেতে হবে কেন ? আর তুমিই বা যাবে কিসের জন্যে, রতন যাক না।

কে, রত্না ? ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই দিদি, আমি এসেচি বলেই হয়ত ও বেছে বেছে পচা মাছ কিনে আনবে—বলিয়াই হঠাৎ দেখিল রতন দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ; জিভ কাটিয়া বলিল, রতন, দোষ নিও না বাবা, আমি ভেবেছিলুম, তুমি বুঝি ও পাড়ায় গেছ—ডেকে সাড়া পাইনি কিনা।

রাজলক্ষ্মী হাসিতে লাগিল, আমিও না হাসিয়া পারিলাম না। রতন কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিল না, গম্ভীর মুখে বলিল, আমি বাজারে যাচ্চি মা, কিষণ চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েচে। —বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী কহিল, রতনের সঙ্গে আনন্দের বুঝি বনে না ?

আনন্দ বলিল, ওকে দোষ দিতে পারি নে দিদি। ও আপনার হিতৈষী—বাজে লোকজন ঘেঁষতে দিতে চায় না ; কিন্তু আজ ওর সঙ্গ নিতে হবে, নইলে খাওয়াটা ভালো হবে না। বহুদিন উপবাসী।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়া ডাকিয়া বলিল, রতন, আর গোটা-কয়েক টাকা নিয়ে যা বাবা, বড় দেখে একটা রুইমাছ আনতে হবে কিন্তু। ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মুখ-হাত ধুয়ে এসো গে ভাই, আমি চা তৈরী করে আনচি। এই বলিয়া সেও নীচে নামিয়া গেল।

আনন্দ কহিল, দাদা, হঠাৎ তলব হ'লো কেন ?

সে কৈফিয়ৎ কি আমার দেবার, আনন্দ ?

আনন্দ সহাস্যে কহিল, দাদার দেখচি এখনো সেই ভাব রাগ পড়েনি। আবার গা-ঢাকা দেবার মতলব নেই ত ? সেবার গঙ্গামাটিতে কি হাঙ্গামাতেই ফেলেছিলেন। এদিকে দেশশুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন, ওদিকে বাড়ির কর্তা নিরুদ্দেশ। মাঝখানে আমি—নতুন লোক—এদিকে ছুটি, ওদিকে ছুটি, দিদি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন, রতন লোক তাড়াবার উয্যুগ করলে—সে কি বিভ্রাট ! আচ্ছা মানুষ আপনি।

আমিও হাসিয়া ফেলিলাম, রাগ এবারে পড়ে গেছে, ভয় নেই।

আনন্দ বলিল, ভরসাও নেই। আপনাদের মত নিঃসঙ্গ, একাকী লোকেদের আমি ভয় করি। কেন যে নিজেকে সংসারে জড়াতে দিলেন তাই আমি অনেক সময়ে ভাবি।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্ট ! মুখে বলিলাম, আমাকে দেখচি তা হলে ভোলোনি, মাঝে মাঝে মনে করতে ?

আনন্দ বলিল, না দাদা, আপনাকে ভোলাও শক্ত, বোঝাও শক্ত, মায়া কাটানো আরও শক্ত। বিশ্বাস না হয় বলুন, দিদিকে ডেকে সাক্ষী মানি। আপনার সঙ্গে

পরিচয় ত মাত্র দু-তিনদিনের, কিন্তু সেদিন যে দিদির সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও কাঁদতে বসিনি—সেটা নিতান্তই সন্ন্যাসী-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলে।

বলিলাম, সেটা বোধ হয় দিদির খাতিরে। তাঁর অনুরোধেই ত এতদূরে এলে।

আনন্দ কহিল, নেহাৎ মিথ্যে নয় দাদা। ওঁর অনুরোধ ত অনুরোধ নয়, যেন মায়ের ডাক। পা আপনি চলতে শুরু করে। কত ঘরেই ত আশ্রয় নিই, কিন্তু ঠিক এমনটি আর দেখিনে। আপনিও ত শুনেছি অনেক ঘুরেচেন, কোথাও দেখেচেন এঁর মত আর একটি?

বলিলাম, অনেক—অনেক।

রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়াই সে আমার কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল, চায়ের বাটিটা আনন্দের কাছে রাখিয়া দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি অনেক গা?

আনন্দ বোধ করি একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল, আমি বলিলাম, তোমার গুণের কথা। উনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন বলেই আমি সজোরে তার প্রতিবাদ করছিলাম।

আনন্দ চায়ের বাটিটা মুখে তুলিতেছিল, হাসির নাড়ায় খানিকটা চা মাটিতে পড়িয়া গেল। রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল।

আনন্দ বলিল, দাদা, আপনার উপস্থিত বুদ্ধিটা অদ্ভুত। ঠিক উল্টোটি চক্ষের পলকে মাথায় এলো কি করে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, আশ্চর্য্য কি আনন্দ? নিজের মনের কথা চাপতে চাপতে আর গল্প বানিয়ে বলতে বলতে এ বিদ্যের উনি একেবারে মহামহোপাধ্যায় হয়ে গেছেন।

বলিলাম, আমাকে তা হলে তুমি বিশ্বাস করো না?

একটুও না।

আনন্দ হাসিয়া কহিল, বানিয়ে বলার বিদ্যেয় আপনিও কম নয় দিদি। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—একটুও না।

রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, জ্বলেপুড়ে শিখতে হয়েচে ভাই। তুমি কিন্তু আর দেরি ক'রো না, চা খেয়ে স্নান করে নাও, কাল গাড়িতে তোমার যে খাওয়া হয়নি তা বেশ জানি। ওঁর মুখে আমার সুখ্যাতি শুনতে গেলে তোমার সমস্তদিনে কুলোবে না। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

আনন্দ কহিল, আপনাদের মত এমন দুটি লোক সংসারে বিরল। ভগবান আশ্চর্য্য মিল করে আপনাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন।

তার নমুনা দেখলে ত?

নমুনা সেই প্রথমদিন সাঁইথিয়া স্টেশনে গাছতলাতেই দেখেছিলুম। তারপরে আর একটিও কখনো চোখে পড়ল না।

আহা! কথাগুলো যদি ওঁর সামনেই বলতে আনন্দ!

আনন্দ কাজের লোক, কাজের উদ্যম ও শক্তি তাহার বিপুল। তাহাকে কাছে পাইয়া রাজলক্ষ্মীর আনন্দের সীমা নাই। দিনেরাতে খাওয়ার আয়োজন ত প্রায় ভয়ের কোঠায় গিয়া ঠেকিল। অবিশ্রাম দু'জনের কত পরামর্শই যে হয় তাহার সবগুলো জানি না, শুধু কানে আসিয়াছে যে গঙ্গামাটিতে একটা ছেলেদের ও একটা মেয়েদের ইস্কুল খোলা হবে। এখানে বিস্তর গরীব এবং ছোটজাতের লোকের বাস, উপলক্ষ বোধ করি তাহারাই; শুনিতেছি একটা চিকিৎসার ব্যাপারও চলিবে। এই সকল বিষয়ে কোনদিন আমার কিছুই পটুতা নাই। পরোপকারের বাসনা আছে কিন্তু শক্তি নাই, কোন কিছু একটা খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে ভাবিলেও আমার শ্রান্ত মন আজ নয় কাল করিয়া দিন পিছাইতে চায়। তাহাদের নূতন উদ্যোগে মাঝে মাঝে আনন্দ আমাকে টানিতে গিয়াছে, কিন্তু রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বাধা দিয়া বলিয়াছে, ওঁকে আর জড়িয়ো না আনন্দ, তোমার সমস্ত সঙ্কল্প পণ্ড হয়ে যাবে।

শুনিলে প্রতিবাদ করিতেই হয়, বলিলাম, এই যে সেদিন বললে আমার অনেক কাজ, এখন থেকে আমাকে অনেক কিছু করতে হবে!

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, আমার ঘাট হয়েচে গোঁসাই, অমন কথা আর কখনো মুখে আনব না।

তবে কি কোনদিন কিছুই করব না?

কেন করবে না? কেবল অসুখ-বিসুখ করে আমাকে ভয়ে আধমরা করে তুলো না, তাতেই তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আনন্দ কহিল, দিদি, সত্যিই ওঁকে আপনি অকেজো করে তুলবেন।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আমাকে করতে হবে না ভাই, যে-বিধাতা ওঁকে সৃষ্টি করেচেন, তিনিই সে ব্যবস্থা করে রেখেচেন—কোথাও ত্রুটি রাখেননি।

আনন্দ হাসিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার ওপর এক গোণকার পোড়ারমুখো এমনি ভয় দেখিয়ে রেখেচে যে, উনি বাড়ির বা'র হলে আমার বুক টিপটিপ করে—যতক্ষণ না ফেরেন কিছুতে মন দিতে পারি নে।

এর মধ্যে আবার গোণকার জুটলো কোথা থেকে? কি বললে সে?

আমি ইহার উত্তর দিলাম, বলিলাম, আমার হাত দেখে সে বললে, মস্ত ফাঁড়া—জীবন-মরণের সমস্যা।

দিদি, এসব আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি বলিলাম, হাঁ করেন, আলবৎ করেন। তোমার দিদি বলেন, ফাঁড়া বলে কি পৃথিবীতে কথা নেই? কারও কখনো কি বিপদ ঘটে না?

আনন্দ হাসিয়া কহিল, ঘটতে পারে, কিন্তু হাত গুনে বলবে কি করে দিদি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা জানিনে ভাই, শুধু আমার ভরসা আমার মত ভাগ্যবতী যে, তাকে কখনো ভগবান এত বড় দুঃখে ডোবাবেন না।

আনন্দ স্তব্ধমুখে ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া অন্য কথা পাড়িল।

ইতিমধ্যে বাড়ির লেখাপড়া, বিলি-ব্যবস্থার কাজ চলিতে লাগিল, রাশীকৃত ইট-কাঠ, চুন-সুরকি, দরজা-জানলা আসিয়া পড়িল—পুরাতন গৃহটিকে রাজলক্ষ্মী নূতন করিয়া তুলিবার আয়োজন করিল।

সেদিন বৈকালে আনন্দ কহিল, দাদা, চলুন একটু ঘুরে আসি গে।

ইদানীং আমার বাহির হইবার প্রস্তাবেই রাজলক্ষ্মী অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকে, কহিল, ঘুরে আসতে আসতেই যে রাত হয়ে যাবে আনন্দ, ঠাণ্ডা লাগবে না?

আজ আমার নিজের শরীরটাও বেশ ভালো ছিল না, বলিলাম, ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ উঠতেও তেমন ইচ্ছে হচ্চে না আনন্দ।

আনন্দ বলিল, ওটা জড়তা। সন্ধ্যেটা ঘরে বসে থাকলে অনিচ্ছে আরো চেপে ধরবে—উঠে পড়ুন।

রাজলক্ষ্মী ইহার সমাধান করিতে কহিল, তার চেয়ে একটা কাজ করিনে আনন্দ? ক্ষিতীশ পরশু আমাকে একটি ভালো হারমোনিয়ম কিনে দিয়ে গেছে, এখনো সেটা দেখবার সময় পাইনি। আমি দুটো ঠাকুরদের নাম করি, তোমরা দু'জনে বসে শোনো—সন্ধ্যাটা কেটে যাবে। এই বলিয়া সে রতনকে ডাকিয়া বাক্সটা আনিতে কহিল।

আনন্দ বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ঠাকুরদের নাম মানে কি গান নাকি দিদি?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

দিদির কি সে বিদ্যেও আছে নাকি?

সামান্য একটুখানি! তারপরে আমাকে দেখাইয়া কহিল, ছেলেবেলায় ওঁর কাছেই হাতেখড়ি।

আনন্দ খুশী হইয়া বলিল, দাদাটি দেখচি বর্ণচোরা আম, বাইরে থেকে ধরবার জো নেই।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী হাসিতে লাগিল, কিন্তু আমি সরলমনে তাহাতে যোগ দিতে পারিলাম না। কারণ, আনন্দ বুঝিবে না কিছুই, আমার আপত্তিকে ওস্তাদের বিনয় বাক্য কল্পনা করিয়া ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করিতে থাকিবে, এবং হয়ত বা শেষে রাগ করিয়া বসিবে। পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপের দুর্যোধনের গানটা জানি, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর পরে এ আসরে সেটা মানানসই হইবে না।

হারমোনিয়ম আসিলে প্রথমে সচরাচর প্রচলিত দুই-একটা 'ঠাকুরদের' গান গাহিয়া রাজলক্ষ্মী বৈষ্ণব-পদাবলী আরম্ভ করিল, শুনিয়া মনে হইল সেদিন মুরারিপুর আখড়াতেও বোধ করি এমনটি শুনি নাই। আনন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল, আমাকে দেখাইয়া মুগ্ধচিত্তে কহিল, এ কি সমস্তই ওঁর কাছে শেখা দিদি?

সমস্তই কি কেউ একজনের কাছে শেখে আনন্দ?

সে ঠিক। তারপরে সে আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, দাদা, এবার কিন্তু আপনাকে অনুগ্রহ করিতে হইবে। দিদি একটু ক্লান্ত।

না হে, আমার শরীর ভালো নেই।

শরীরের জন্য আমি দায়ী, অতিথির অনুরোধ রাখবেন না?

রাখবার জো নেই হে, শরীর বড় খারাপ।

রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সামালাইতে পারিল না, হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আনন্দ ব্যাপারটা এবারে বুঝিল, কহিল, দিদি, তবে বলুন কার কাছে এত শিখলেন?

আমি বলিলাম, যাঁরা অর্থের পরিবর্তে বিদ্যা দান করেন তাঁদের কাছে। আমার কাছে নয় হে, দাদা কখনো এ বিদ্যের ধার দিয়েও চলেননি!

আনন্দ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আমিও সামান্য কিছু জানি দিদি, কিন্তু বেশী শেখবার সময় পাইনি। সুযোগ যদি হ'লো এবার আপনার শিষ্যত্ব নিয়ে শিক্ষা-সম্পূর্ণ করব। কিন্তু আজ কি এখানেই থেমে যাবেন, আর কিছু শোনাবেন না?

রাজলক্ষ্মী বলিল, আজ ত সময় নেই ভাই, তোমাদের খাবার তৈরী করতে হবে যে।

আনন্দ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তা জানি। সংসারের ভার যাঁদের ওপর, সময় তাঁদের কম। কিন্তু বয়সে আমি ছোট, আপনার ছোটভাই, আমাকে শেখাতে হবে। অপরিচিত স্থানে একলা যখন সময় কাটতে চাইবে না তখন এই দয়া আপনার স্মরণ করব।

রাজলক্ষ্মী স্নেহে বিগলিত হইয়া কহিল, তুমি ডাক্তার, বিদেশে তোমার এই স্বাস্থ্যহীন দাদাটির প্রতি দৃষ্টি রেখো ভাই, আমি যতটুকু জানি তোমাকে আদর করে শেখাব।

কিন্তু এ ছাড়া আপনার কি আর চিন্তা নেই দিদি?

রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল।

আনন্দ আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, দাদার মত ভাগ্য সহসা চোখে পড়ে না।

আমি ইহার উত্তর দিলাম, বলিলাম, এমন অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিই কি সহসা চোখে পড়ে আনন্দ? ভগবান তাদের হাল ধরবার মজবুত লোক দেন, নইলে তারা অকূলে ভেসে যায়—কোন কালে ঘাটে ভিড়তে পারে না। এমনি করেই সংসারে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় ভায়া, কথাটা মিলিয়ে দেখো, প্রমাণ পাবে।

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত্ত নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল তাহার অনেক কাজ।

ইহার দিন-কয়েকের মধ্যেই বাড়ির কাজ শুরু হইল; রাজলক্ষ্মী জিনিসপত্র একটা ঘরে বন্ধ করিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল; বাড়ির ভার রহিল বুড়া তুলসীদাসের পরে।

যাবার দিনে রাজলক্ষ্মী আমার হাতে একখানা পোস্টকার্ড দিয়া বলিল, আমার চার পাতা জোড়া চিঠির এই জবাব এল—পড়ে দেখ। বলিয়া চলিয়া গেল।

মেয়েলী অক্ষরে গুটিদুই-তিন ছত্রের লেখা। কমললতা লিখিয়াছে, সুখেই আছি বোন। যাদের সেবায় আপনাকে নিবেদন করেছি আমাকে ভালো রাখার দায় যে তাদের ভাই। প্রার্থনা করি তোমরা কুশলে থাকো। বড়গোসাইজী তাঁহার আনন্দময়ীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ইতি—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণাশ্রিতা—কমললতা

সে আমার নাম উল্লেখও করে নাই। কিন্তু এই কয়টি অক্ষরের আড়ালে কত কথাই না তাহার রহিয়া গেল। খুঁজিয়া দেখিলাম একফোঁটা চোখের জলের দাগ কি কোথাও পড়ে নাই; কিন্তু কোন চিহ্নই চোখে পড়িল না।

চিঠিখানা হাতে করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। জানালার বাহিরে রৌদ্র-তপ্ত নীলাভ আকাশ, প্রতিবেশী-গৃহের একজোড়া নারিকেল বৃক্ষের পাতার ফাঁক দিয়া কতকটা অংশ তাহার দেখা যায়, সেখানে অকস্মাৎ দুটি মুখ পাশাপাশি যেন ভাসিয়া আসিল। একটি আমার রাজলক্ষ্মী—কল্যাণের প্রতিমা; অপরটি কমললতার—অপরিস্ফুট, অজানা—যেন স্বপ্নে দেখা ছবি।

রতন আসিয়া ধ্যান ভাঙিয়া দিল, বলিল, স্নানের সময় হয়েচে বাবু, মা বলে দিলেন।

স্নানের সময়টুকুও উত্তীর্ণ হইবার জো নাই।

আবার একদিন সকালে গঙ্গামাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেবার আনন্দ ছিল অনাহূত অতিথি, এবারে সে আমন্ত্রিত বান্ধব। বাড়িতে ভিড় ধরে না, গ্রামের আত্মীয়-অনাত্মীয় কত লোকই যে আমাদের দেখিতে আসিয়াছে, সকলের মুখেই প্রসন্ন হাসি ও কুশল প্রশ্ন।

রাজলক্ষ্মী কুশারীগৃহিণীকে প্রণাম করিল; সুনন্দা রান্নাঘরে কাজে নিযুক্ত ছিল, বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে প্রণাম করিয়া বলিল, দাদা, আপনার শরীরটা ত ভালো দেখাচ্চে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ভালো আর কবে দেখায় ভাই? আমি ত পারলুম না, এবার তোমরা যদি পার এই আশাতেই তোমাদের কাছে এনে ফেললুম।

আমার বিগত দিনের অস্বাস্থ্যের কথা বড়গিন্নীর বোধ হয় মনে পড়িল, স্নেহার্দ্রকণ্ঠে ভরসা দিয়া কহিলেন, ভয় নেই মা, এদেশের জল-হাওয়ায় উনি দু'দিনেই সেরে উঠবেন।

অথচ, নিজে ভাবিয়া পাইলাম না, কি আমার হইয়াছে এবং কিসের জন্যই বা এত দুশ্চিন্তা!

অতঃপর নানাবিধ কাজের আয়োজন পূর্ণোদ্যমে শুরু হইল! পোড়ামাটি ক্রয় করার কথাবার্ত্তা দামদস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থানান্বেষণ প্রভৃতি কিছুতেই কাহারো আলস্য রহিল না।

শুধু আমিই কেবল মনের মধ্যে উৎসাহ বোধ করি না। হয়ত এ আমার স্বভাব, হয়ত বা ইহা আর কিছু একটা যাহা দৃষ্টির অগোচরে ধীরে ধীরে আমার সমস্ত প্রাণ-শক্তির মূলোচ্ছেদ করিতেছে। একটা সুবিধা হইয়াছিল আমার ঔদাস্যে কেহ বিস্মিত হয় না, যেন আমার কাছে অন্য কিছু প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। আমি দুর্ব্বল, আমি অসুস্থ, আমি কখন আছি কখন নাই। অথচ কোন অসুখ নাই, খাই-দাই থাকি। আনন্দ তাহার ডাক্তারি-বিদ্যা লইয়া মাঝে মাঝে আমাকে নাড়াচাড়া দিবার চেষ্টা করিলেই রাজলক্ষ্মী সস্নেহ অনুযোগে বাধা দিয়া বলে, ওকে টানাটানি করে কাজ নেই ভাই, কি হতে কি হবে, তখন আমাদের ভুগে মরতে হবে।

আনন্দ বলে, যে ব্যবস্থা করেচেন ভোগার মাত্রা এতে বাড়বে বই কমবে না দিদি। এ আপনাকে সাবধান করে দিচ্চি।

রাজলক্ষ্মী সহজেই স্বীকার হইয়া বলে, সে আমি জানি আনন্দ, ভগবান আমার জন্মকালে এ দুঃখ কপালে লিখে রেখেচেন।

ইহার পরে আর তর্ক চলে না।

দিন কাটে কখনো বই পড়িয়া, কখনো নিজের বিগত কাহিনী খাতায় লিখিয়া, কখনো বা শূন্য মাঠে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইয়া। এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে কর্ম্মের প্রেরণা আমাতে নাই, লড়াই করিয়া হুটোপুটি করিয়া, সংসারে দশজনের ঘাড়ে চড়িয়া বসার সাধ্যও নাই, সঙ্কল্পও নাই। সহজে যাহা পাই তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মানি। বাড়ি-ঘর টাকা-কড়ি বিষয়-আশয় মান-সম্ভ্রম এসকল আমার কাছে ছায়াময়। অপরের দেখাদেখি নিজের জড়ত্বকে যদিবা কখনো কর্ত্তব্যবুদ্ধির তাড়নায় সচেতন করিতে যাই অচিরকাল মধ্যেই দেখি আবার সে চোখ বুজিয়া ঢুলিতেছে—শত ঠেলাঠেলিতেও আর গা নাড়িতে চাহে না। শুধু দেখি একটা বিষয়ে তন্দ্রাতুর মন কলরবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে, সে ঐ মুরারিপুরের দশটা দিনের স্মৃতির আলোড়নে। ঠিক যেন কানে শুনিতে পাই বৈষ্ণবী কমললতার সস্নেহ অনুরোধ— নতুনগোঁসাই এইটি করে দাও না ভাই! ঐ যাঃ—সব নষ্ট করে দিলে? আমার ঘাট হয়েচে গো, তোমায় কাজ করতে বলে—নাও ওঠো। পদ্মা পোড়ারমুখী গেল কোথায়, একটু জল চড়িয়ে দিক না, চা-খাবার যে তোমার সময়ে হয়েচে গোঁসাই।

সেদিন চায়ের পাত্রগুলি সে নিজে ধুইয়া রাখিত পাছে ভাঙে। আজ তাহাদের প্রয়োজন গিয়াছে ফুরাইয়া, তথাপি কখনো কাজে লাগার আশায় কি জানি সেগুলি সে যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে কিনা।

জানি সে পালাই পালাই করিতেছে। হেতু জানি না, তবু মনে সন্দেহ নাই মুরারিপুর আশ্রমে দিন তাহার প্রতিদিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। হয়ত, একদিন এই খবরটাই অকস্মাৎ আসিয়া পৌঁছিবে। নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল, পথে পথে সে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে মনে করিলেই চোখে জল আসিয়া পড়ে। দিশেহারা মন সান্ত্বনার আশায় ফিরিয়া চাহে রাজলক্ষ্মীর পানে। সকলের সকল শুভ-চিন্তায় অবিশ্রাম কর্ম্মে নিযুক্ত—কল্যাণ যেন তাহার দুই হাতের দশ অঙ্গুলি দিয়া অজস্রধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। সুপ্রসন্ন মুখে শান্তি ও পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধ ছায়া, করুণায় মমতায় হৃদয়-যমুনা কূলে কূলে পূর্ণ- নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের সর্ব্বব্যাপী মহিমায় আমার চিত্তলোকে সে যে-আসনে অধিষ্ঠিত, তাহার তুলনা করিতে পারি এমন কিছুই জানি না।

বিদুষী সুনন্দার দুর্নিবার্য্য প্রভাব স্বল্পকালের জন্যও যে তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল ইহারই দুঃসহ পরিতাপে পুনরায় আপন সত্তাকে সে ফিরিয়া পাইয়াছে। একটা কথা সে আজও আমাকে কানে কানে বলে, তুমি কম নও গো, কম নও। তোমার চলে যাবার পথ বেয়ে সর্ব্বস্ব যে আমার চোখের পলকে ছুটে পালাবে এ কে জানত বলো? উঃ—সে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ভাবলেও ভয় হয় সে দিনগুলো আমার কেটেছিল কি করে? দম বন্ধ হয়ে মরে যাইনি এই আশ্চর্য্য। আমি উত্তর দিতে পারি না, শুধু নীরবে চাহিয়া থাকি।

আমার সম্বন্ধে আর তাহার ত্রুটি ধরিবার জো নাই। শতকর্ম্মের মধ্যেও শতবার অলক্ষ্যে আসিয়া দেখিয়া যায়। কখনো হঠাৎ আসিয়া কাছে বসে, হাতের বইটা সরাইয়া দিয়া বলে, চোখ বুজে একটুখানি শুয়ে পড়ো তো, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই? অত পড়লে চোখ ব্যথা করবে যে!

আনন্দ আসিয়া বাহির হইতে বলে, একটা কথা জেনে নেবার আছে আসতে পারি কি?

রাজলক্ষ্মী কহে, পারো। তোমার কোথায় আসতে মানা আনন্দ?

আনন্দ ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলে, এই অসময়ে দিদি কি ওঁকে ঘুম পাড়াচ্চেন নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া জবাব দেয়, তোমার লোকসানটা হ'লো কি? না ঘুমালেও ত তোমার পাঠশালায় বাছুরের পাল চরাতে যাবেন না?

দিদি দেখচি ওঁকে মাটি করবেন।

নইলে নিজে যে মাটি। নির্ভাবনায় কাজকর্ম্ম করতে পারি নে।

আপনারা দু'জনেই ক্রমশঃ ক্ষেপে যাবেন, এই বলিয়া আনন্দ বাহির হইয়া যায়।

ইস্কুল তৈরীর কাজে আনন্দের নিশ্বাস ফেলিবার ফুরসত নাই, সম্পত্তি খরিদের হাঙ্গামায় রাজলক্ষ্মী গলদ্‌ঘর্ম্ম, এমনি সময়ে কলিকাতার বাড়ি ঘুরিয়া বহু ডাকঘরের ছাপছোপ পিঠে লইয়া বহু বিলম্বে নবীনের সাংঘাতিক চিঠি আসিয়া পৌঁছিল—গহর মৃত্যুশয্যায়। শুধু আমারই পথ চাহিয়া আজও সে বাঁচিয়া আছে। খবরটা আমাকে যেন শূল দিয়া বিঁধিল। ভগিনীর বাটি হইতে সে কবে ফিরিয়াছে জানি না। সে যে এতদূর পীড়িত তাহাও শুনি নাই—শুনিবার বিশেষ চেষ্টাও করি নাই—আজ আসিয়াছে একেবারে শেষ সংবাদ। দিন ছয়ের পূর্ব্বের চিঠি, এখনো বাঁচিয়া আছে কিনা তাই বা কে জানে? তার করিয়া খবর পাবার ব্যবস্থা এদেশেও নাই, সে দেশেও নাই। ও চিন্তা বৃথা।

চিঠি পাইয়া রাজলক্ষ্মী মাথায় হাত দিল—তোমাকে যেতে হবে ত।

হাঁ।

চলো, আমিও সঙ্গে যাই।

সে কি হয়? তাদের এ বিপদের মাঝে তুমি যাবে কোথায়!

প্রস্তাবটা যে অসঙ্গত সে নিজেই বুঝিল, মুরারিপুর আখড়ার কথা আর সে মুখে আনিতে পারিল না, বলিল, রতনের কাল থেকে জ্বর, সঙ্গে যাবে কে? আনন্দকে বলব?

না। আমার তল্পি বইবার লোক সে নয়।

তবে কিষণ সঙ্গে যাক।

তা যাক, কিন্তু প্রয়োজন ছিল না।

গিয়ে রোজ চিঠি দেবে বলো?

সময় পেলে দেব।

না, সে শুনব না। একদিন চিঠি না পেলে আমি নিজে যাব, তুমি যতই রাগ করো।

অগত্যা রাজী হইতে হইল, এবং প্রত্যহ সংবাদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই দিনই বাহির হইয়া পড়িলাম। চাহিয়া দেখিলাম দুশ্চিন্তায় রাজলক্ষ্মীর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে, সে চোখ মুছিয়া শেষবারের মত সাবধান করিয়া কহিল, শরীরের অবহেলা করবে না বলো।

না গো, না।

ফিরতে একটা দিনও বেশী দেরি করবে না বলো?

না, তাও করব না।

অবশেষে গরুর গাড়ি রেল-স্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করিল।

*　　　*　　　*　　　*

আষাঢ়ের এক অপরাহ্ণবেলায় গহরদের বাটীর সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার সাড়া পাইয়া নবীন বাহিরে আসিয়া আমার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষের প্রবল কণ্ঠের এই বুকফাটা কান্নায় শোকের একটা নূতন মূর্তি চোখে দেখিতে পাইলাম। সে যেমন গভীর, তেমনি বৃহৎ ও তেমনি সত্য। গহরের মা নাই, ভগিনী নাই, কন্যা নাই, জায়া নাই, অশ্রুজলের মালা পরাইয়া এই সঙ্গিহীন মানুষটিকে সেদিন বিদায় দিতে কেহ ছিল না, তবু মনে হয় তাহাকে সজ্জাহীন ভূষণহীন কাঙালবেশে যাইতে হয় নাই, তাহার লোকান্তরের যাত্রাপথে শেষ পাথেয় নবীন একাকী দু'হাত ভরিয়া ঢালিয়া দিয়াছে।

বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, গহর কবে মারা গেল নবীন?

পরশু। কাল সকালে আমরা তাঁকে মাটি দিয়ে এসেচি।

মাটি কোথায় দিলে?

নদীর তীরে, আমবাগানে। তিনি বলেছিলেন।

নবীন বলিতে লাগিল, মামাতো-বোনের বাড়ি থেকে জ্বর নিয়ে ফিরলেন, সে জ্বর আর সারল না।

চিকিৎসা হয়েছিল ?

এখানে যা হবার সমস্তই হয়েছিল—কিছুতেই কিছু হ'লো না। বাবু নিজেই সব জানতে পেরেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আখড়ার বড় গোঁসাইজী আসতেন ?

নবীন কহিল, মাঝে মাঝে। নবদ্বীপ থেকে তাঁর গুরুদেব এসেচেন, তাই রোজ আসতে সময় পেতেন না। আর একজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা করিতে লাগিল, তবু সঙ্কোচ কাটাইয়া প্রশ্ন করিলাম, ওখান থেকে আর কেউ আসত না নবীন ?

নবীন বলিল, হাঁ, কমললতা ?

তিনি কবে এসেছিলেন ?

নবীন বলিল, রোজ। শেষ তিনদিন তিনি খাননি, শোননি, বাবুর বিছানা ছেড়ে একবারটি উঠেননি।

আর প্রশ্ন করিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম।

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবেন এখন—আখড়ায় ?

হাঁ।

একটু দাঁড়ান, বলিয়া সে ভিতরে গিয়া একটা টিনের বাক্স বাহির করিয়া আনিয়া আমার কাছে দিয়া বলিল, এটা আপনাকে দিতে তিনি বলে গিয়েচেন।

কি আছে এতে নবীন ?

খুলে দেখুন, বলিয়া সে আমার হাতে চাবি দিল। খুলিয়া দেখিলাম দড়ি দিয়া বাঁধা তাহার কবিতার খাতাগুলা। উপরে লিখিয়াছে, শ্রীকান্ত, রামায়ণ শেষ করার সময় হ'লো না। বড় গোঁসাইকে দিও, তিনি যেন মঠে রেখে দেন, নষ্ট না হয়। দ্বিতীয়টি লাল শালুতে বাঁধা ছোট পুঁটুলি। খুলিয়া দেখিলাম নানা মূল্যের একতাড়া নোট এবং আমাকে লেখা আর একখানি পত্র। সে লিখিয়াছে—ভাই শ্রীকান্ত, আমি বোধ হয় বাঁচব না। তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানিনে। যদি না হয় নবীনের হাতে বাক্সটি রেখে গেলাম, নিও। টাকাগুলি তোমার হাতে দিলাম, কমললতার যদি কাজে লাগে দিও। না নিলে যা ইচ্ছে ক'রো। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।—গহর।

দানের গর্ব্ব নাই, কাকুতি-মিনতি নাই। শুধু মৃত্যু আসন্ন জানিয়া এই গুটি-কয়েক কথায় বাল্যবন্ধুর শুভ কামনা করিয়া তাহার শেষ নিবেদন রাখিয়া গিয়াছে। ভয় নাই, ক্ষোভ নাই, উচ্ছ্বসিত হা-হুতাশে মৃত্যুকে সে প্রতিবাদ করে নাই। সে কবি, মুসলমান ফকির-বংশের রক্ত তাহার শিরায়—শান্তমনে এই শেষ রচনাটুকু সে তাহার বাল্যবন্ধুর উদ্দেশে লিখিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত চোখের জল আমার পড়ে নাই, কিন্তু আর তাহারা নিষেধ মানিল না, বড় বড় ফোঁটায় চোখের কোণ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনমান তখন সমাপ্তির দিকে, পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপিয়া একটা কালো মেঘের স্তর উঠিতেছে উপরে, তাহারই কোন একটা সঙ্কীর্ণ ছিদ্রপথে অস্তোন্মুখ সূর্য্যরশ্মি রাঙা হইয়া আসিয়া পড়িল প্রাচীর-সংলগ্ন সেই শুষ্কপ্রায় জাম গাছটার মাথায়। ইহারই শাখা জড়াইয়া উঠিয়াছিল গহরের মাধবী ও মালতী-লতার কুঞ্জ। সেদিন শুধু কুঁড়ি ধরিয়াছিল, ইহারই গুটিকয়েক আমাকে সে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কেবল কাঠপিঁপড়ার ভয়ে পারে নাই। আজ তাহাতে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল, কতক ঝরিয়াছে তলায়, কতক বাতাসে উড়িয়া ছড়াইয়াছে আশেপাশে, ইহারই কতকগুলি কুড়াইয়া লইলাম বাল্যবন্ধুর স্বহস্তের শেষ দান মনে করিয়া।

নবীন বলিল, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বলিলাম, নবীন, বাহিরের ঘরটা একবার খুলে দাও না দেখি।

নবীন ঘর খুলিয়া দিল। আজও রহিয়াছে সেই বিছানাটি তক্তপোশের একধারে গুটানো, একটি ছোট পেন্সিল, কয়েক টুকরো ছেঁড়া কাগজ—এই ঘরে গহর সুর করিয়া শুনাইয়াছিল তাহার স্বরচিত কবিতা—বন্দিনী সীতার দুঃখের কাহিনী। এই গৃহে কতবার আসিয়াছি, কতদিন খাইয়াছি, শুইয়াছি, উপদ্রব করিয়া গিয়াছি, সেদিন হাসিমুখে যাহারা সহিয়াছিল আজ তাহাদের কেহ জীবিত নাই। আজ সমস্ত আসা-যাওয়া শেষ করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

পথে নবীনের মুখে শুনিলাম এমনি একটি ছোট নোটের পুঁটলি তাহার ছেলেদের হাতেও গহর দিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট সম্পত্তি যাহা রহিল পাইবে তাহার মামাতো ভাইবোনেরা এবং তাহার পিতার নির্ম্মিত একটি মসজেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলাম মস্ত ভিড়। গুরুদেবের শিষ্য-শিষ্যা অনেক সঙ্গে আসিয়াছে, বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে এবং হাবভাবে তাহাদের শীঘ্র বিদায় হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। বৈষ্ণবসেবাদি বিধিমতেই চলিতেছে অনুমান করিলাম।

দ্বারিকাদাস আমাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আমার আগমনের হেতু তিনি জানেন। গহরের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মুখে কেমন যেন একটা বিব্রত উদ্‌ভ্রান্ত ভাব—পূর্ব্বে কখনো দেখি নাই। আন্দাজ করিলাম হয়ত এতদিন ধরিয়া এতগুলি বৈষ্ণব-পরিচর্য্যায় তিনি ক্লান্ত, বিপর্য্যস্ত, নিশ্চিন্ত হইয়া আলাপ করিবার সময় নাই।

খবর পাইয়া পদ্ম আসিল, আজ তাহার মুখেও হাসি নাই, যেন সঙ্কুচিত—পলাইতে পারিলে বাঁচে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতাদিদি এখন বড় ব্যস্ত, না পদ্ম?

না, ডেকে দেবো দিদিকে?—বলিয়া চলিয়া গেল। এ-সমস্তই আজ এমন অপ্রত্যাশিত খাপছাড়া যে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। একটু পরে কমললতা

আসিয়া নমস্কার করিল, বলিল, এস গোঁসাই, আমার ঘরে বসবে চল।

আমার বিছানা প্রভৃতি স্টেশনে রাখিয়া শুধু ব্যাগটাই সঙ্গে আনিয়াছিলাম, আর ছিল গহরের সেই বাক্সটা আমার চাকরের মাথায়। কমললতার ঘরে আসিয়া সেগুলো তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, একটু সাবধানে রেখে দাও, বাক্সটায় অনেকগুলা টাকা আছে।

কমললতা বলিল, জানি। তারপরে খাটের নীচে সেগুলো রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চা খাওয়া হয়নি বোধ হয়?

না।

কখন এলে?

বিকেলবেলা।

যাই, তৈরী করে আনিগে, বলিয়া চাকরটাকে সঙ্গে করিয়া উঠিয়া গেল।

পদ্মা মুখ-হাত ধোয়ার জল দিয়া চলিয়া গেল, দাঁড়াইল না।

আবার মনে হইল ব্যাপার কি!

খানিক পরে কমললতা চা লইয়া আসিল, আর কিছু ফল-মূল-মিষ্টান্ন ও-বেলার ঠাকুরের প্রসাদ। বহুক্ষণ অভুক্ত—অবিলম্বে বসিয়া গেলাম।

অনতিবিলম্বে ঠাকুরের সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের শব্দ আসিয়া পৌঁছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, কই তুমি গেলে না?

না, আমার বারণ।

বারণ! তোমার! তার মানে?

কমললতা ম্লান হাসিয়া কহিল, বারণ মানে বারণ গোঁসাই। অর্থাৎ ঠাকুরঘরে যাওয়া আমার নিষেধ।

আহারে রুচি চলিয়া গেল—বারণ করলে কে?

বড়গোঁসাইজীর গুরুদেব। আর তাঁর সঙ্গে এসেচেন যাঁরা—তাঁরা।

কি বলেন তাঁরা?

বলেন আমি অশুচি, আমার সেবায় ঠাকুর কলুষিত হন।

অশুচি তুমি? বিদ্যুদ্বেগে একটা কথা মনে জাগিল—সন্দেহ কি গহরকে নিয়ে?

হাঁ তাই।

কিছুই জানি না, তবু অসংশয়ে বলিয়া উঠিলাম, এ মিথ্যে—এ অসম্ভব!

অসম্ভব কেন গোঁসাই?

তা জানি না কমললতা, কিন্তু এত বড় মিথ্যে আর নেই। মনে হয় মানুষের সমাজে এ তোমার মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর ঐকান্তিক সেবার শেষ পুরস্কার।

তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল, বলিল, আর আমার দুঃখ নেই। ঠাকুর

অন্তর্য্যামী, তাঁর কাছে ত ভয় ছিল না, ছিল শুধু তোমাকে। আজ আমি নির্ভয় হয়ে বাঁচলুম গোঁসাই।

সংসারে এত লোকের মাঝে তোমার ভয় ছিল শুধু আমাকে? আর কাউকে নয়?

না—আর কাউকে না। শুধু তোমাকে।

ইহার পরে দু'জনেই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, বড়গোঁসাইজী কি বলে?

কমললতা কহিল, তাঁর ত কোন উপায় নেই। নইলে কোন বৈষ্ণবই যে এ মঠে আর আসবে না। একটু পরে বলিল, এখানে থাকা চলবে না, একদিন আমাকে যেতে হবে তা জানতুম, শুধু এমনি করে যেতে হবে তা ভাবিনি গোঁসাই। কেবল কষ্ট হয় পদ্মার কথা মনে করে। ছেলেমানুষ, তার কোথাও কেউ নেই—বড়গোঁসাই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তাকে নবদ্বীপে, দিদি চলে গেলে সে বড্ড কাঁদবে। যদি পার তাকে একটু দেখো। এখানে থাকতে যদি না চায় আমার নাম করে তাকে রাজুকে দিও—ওর যা ভালো সে তা করবেই করবে।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই টাকাগুলো কি হবে? নেবে না?

না, আমি ভিখিরী, টাকা নিয়ে আমি কি করব বলো তো?

তবু যদি কখনো কাজে লাগে—

কমললতা এবার হাসিয়া বলিল, টাকা আমারো ত একদিন অনেক ছিল গো, কি কাজে লাগল? তবু যদি কখনো দরকার হয় তুমি আছ কি করতে? তখন তোমার কাছে চেয়ে নেব—অপরের টাকা নিতে যাব কেন?

এ কথায় কি যে বলিব ভাবিয়া পাইলাম না, শুধু তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

সে পুনশ্চ কহিল, না গোঁসাই, আমার টাকা চাইনে, যাঁর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করেচি, তিনি আমাকে ফেলবেন না। যেখানেই যাই সব অভাব তিনিই পূর্ণ করে দেবেন। লক্ষীটি, আমার জন্যে ভেবো না।

পদ্মা ঘরে আসিয়া বলিল, নতুন গোঁসাইয়ের জন্য প্রসাদ কি এ ঘরেই আনব দিদি?

হাঁ, এখানেই নিয়ে এস। চাকরটিকে দিলে?

হাঁ, দিয়েচি।

তবু পদ্মা যায় না, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তুমি খাবে না দিদি?

খাবো রে পোড়ারমুখী, খাবো। তুই যখন আছিস তখন না খেয়ে কি দিদির নিস্তার আছে?

পদ্মা চলিয়া গেল।

সকালে উঠিয়া কমললতাকে দেখিতে পাইলাম না, পদ্মার মুখে শুনিলাম সে বিকালে আসে। সারাদিন কোথায় থাকে কেহ জানে না। তবু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না, রাত্রের কথা স্মরণ করিয়া কেবলি ভয় হইতে লাগিল, পাছে সে চলিয়া গিয়া থাকে, আর দেখা না হয়।

বড়গোঁসাইজীর ঘরে গেলাম। খাতাগুলি রাখিয়া বলিলাম, গহরের রামায়ণ। তার ইচ্ছে এগুলি মঠে থাকে।

দ্বারিকাদাস হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তাই হবে নতুনগোঁসাই। যেখানে মঠের সব গ্রন্থ থাকে তার সঙ্গেই এটি তুলে রাখব।

মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলাম, তার সম্বন্ধে কমললতার অপবাদ তুমি বিশ্বাস কর গোঁসাই?

দ্বারিকাদাস মুখ তুলিয়া কহিলেন, আমি? কখ্‌খনো না।

তবু ত তাকে চলে যেতে হচ্চে?

আমাকেও যেতে হবে গোঁসাই। নির্দোষীকে দূর করে যদি নিজে থাকি, তবে মিথ্যেই এ পথে এসেছিলাম, মিথ্যেই এতদিন তাঁর নাম নিয়েচি।

তবে কেনই বা তাকে যেতে হবে? মঠের কর্ত্তা ত তুমি—তুমি ত তাকে রাখতে পার?

গুরু! গুরু! গুরু! বলিয়া দ্বারিকাদাস অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। বুঝিলাম গুরুর আদেশ—ইহার অন্যথা নাই।

আজ আমি চলে যাচ্চি গোঁসাই, বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিবার কালে তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন; দেখি চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, আমাকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন, আমিও প্রতিনমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ক্রমে অপরাহ্নবেলা সায়াহ্নে গড়াইয়া পড়িল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি আসিল, কিন্তু কমললতার দেখা নাই। নবীনের লোক আসিয়া উপস্থিত, আমাকে স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবে, ব্যাগ মাথায় লইয়া কিষণ ছটফট করিতেছে—সময় আর নাই—কিন্তু কমললতা ফিরিল না। পদ্মার বিশ্বাস সে আর একটু পরেই আসিবে, কিন্তু আমার সন্দেহ ক্রমশঃ প্রত্যয়ে দাঁড়াইল—সে আসিবে না। শেষ-বিদায়ের কঠোর পরীক্ষায় পরাঙ্মুখ হইয়া সে পূর্ব্বাহ্ণেই পলায়ন করিয়াছে, দ্বিতীয় বস্ত্রটুকুও সঙ্গে লয় নাই। কাল আত্মপরিচয় দিয়াছিল ভিক্ষুক বৈরাগিণী বলিয়া, আজ সেই পরিচয়ই সে অক্ষুণ্ণ রাখিল।

যাবার সময় পদ্মা কাঁদিতে লাগিল। আমার ঠিকানা দিয়া বলিলাম, দিদি বলেচে আমাকে চিঠি লিখতে—তোমার যা ইচ্ছে তাই আমাকে লিখে জানিও পদ্মা।

কিন্তু আমি ত ভালো লিখতে জানিনে, গোঁসাই।

তুমি যা লিখবে আমি তাই পড়ে নেব?

দিদির সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

আবার দেখা হবে পদ্মা, আজ আমি যাই, বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম

১৪

সমস্ত পথ চোখ যাহাকে অন্ধকারেও খুঁজিতেছিল, তাহার দেখা পাইলাম রেলওয়ে স্টেশনে: লোকের ভিড় হইতে দূরে দাঁড়াইয়া আমাকে দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল, একখানি টিকিট কিনে দিতে হবে গোঁসাই—

সত্যিই কি তবে সকলকে ছেড়ে চললে?

এ-ছাড়া ত আর উপায় নেই।

কষ্ট হয় না কমললতা?

এ কথা কেন জিজ্ঞেসা করো গোঁসাই, জানো ত সব।

কোথায় যাবে?

যাব বৃন্দাবনে। কিন্তু অতদূরের টিকিট চাইনে—তুমি কাছাকাছি কোন একটা জায়গার কিনে দাও।

অর্থাৎ আমার ঋণ যত কম হয়। তারপর শুরু হবে পরের কাছে ভিক্ষে, যতদিন না পথ শেষ। এই ত?

ভিক্ষে কি এই প্রথম শুরু হবে গোঁসাই? আর কি কখনো করিনি?

চুপ করিয়া রহিলাম। সে আমার পানে চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইল, কহিল, দাও বৃন্দাবনেরই টিকিট কিনে।

তবে চল এক সঙ্গে যাই।

তোমারো কি ঐ এক পথ নাকি?

বলিলাম, না, এক নয়, তবু যতটুকু এক করে নিতে পারি।

গাড়ি আসিলে দু'জনে উঠিয়া বসিলাম। পাশের বেঞ্চে নিজের হাতে তাহার বিছানা করিয়া দিলাম।

কমললতা ব্যস্ত হইয়া উঠিল—ও কি করচ গোঁসাই?

করচি যা কখনো কারো জন্যে করিনি—চিরদিন মনে থাকবে বলে।

সত্যি কি মনে রাখতে চাও?

সত্যি মনে রাখতে চাই কমললতা। তুমি ছাড়া যে-কথা আর কেউ জানবে না।

কিন্তু আমার যে অপরাধ হবে, গোঁসাই।

না, অপরাধ হবে না—তুমি স্বচ্ছন্দে ব'সো।

কমললতা বসিল, কিন্তু সঙ্কোচের সহিত। গাড়ি চলিতে লাগিল কত গ্রাম, কত নগর, কত প্রান্তর পার হইয়া—অদূরে বসিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার জীবনের কত কাহিনীই বলিতে লাগিল। তাহার পথে বেড়ানোর কথা, তাহার মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ডবাসের কথা, কত তীর্থভ্রমণের গল্প, শেষে দ্বারিকাদাসের আশ্রমে মুরারিপুর আশ্রমে আসা। আমার মনে পড়িয়া গেল ঐ লোকটির বিদায়কালের কথাগুলি ; বলিলাম, জানো কমললতা, বড়গোঁসাই তোমার কলঙ্ক বিশ্বাস করেন না।

করেন না ?

একেবারে না। আমার আসবার সময়ে তাঁর চোখে জল পড়তে লাগল, বললেন, নির্দ্দোষীকে দূর করে যদি নিজে থাকি নতুনগোঁসাই, মিথ্যে তাঁর নাম নেওয়া, মিথ্যে আমার এ-পথে আসা। মঠে তিনিও থাকবেন না কমললতা, এমন নিষ্পাপ মধুর আশ্রমটি একেবারে ভেঙে নষ্ট হয়ে যাবে।

না, যাবে না, একটা কোন পথ ঠাকুর নিশ্চয় দেখিয়ে দেবেন।

যদি কখনো তোমার ডাক পড়ে, ফিরে যাবে সেখানে ?

না।

তাঁরা যদি অনুতপ্ত হয়ে তোমাকে ফিরে চান ?

তবুও না।

একটু পরে কি ভাবিয়া কহিল, শুধু যাব যদি তুমি যেতে বল। আর কারো কথায় না।

কিন্তু কোথায় তোমার দেখা পাব ?

এ প্রশ্নের উত্তর সে দিল না, চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে ডাকিলাম, কমললতার সাড়া আসিল না, চাহিয়া দেখিলাম সে গাড়ির এককোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়াছে। সারাদিনের শ্রান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া তুলিতে ইচ্ছা হইল না। তারপরে নিজেও কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না। হঠাৎ একসময়ে কানে গেল—নতুনগোঁসাই ?

চাহিয়া দেখি সে আমার গায়ে হাত দিয়া ডাকিতেছে। কহিল, ওঠ, তোমার সাঁইথিয়ায় গাড়ি দাঁড়িয়েছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম, পাশের কামরায় কিষণ ছিল, ডাকিয়া তুলিতে সে আসিয়া ব্যাগ নামাইল, বিছানা বাঁধিতে গিয়া দেখা গেল যে দু-একখানায় তাহার শয্যা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম সে তাহা ইতিপূর্ব্বেই ভাঁজ করিয়া আমার বেঞ্চের একধারে

রাখিয়াছে। কহিলাম, এইটুকুও তুমি ফিরিয়ে দিলে?

কতবার ওঠানামা করতে হবে, এ বোঝা বইবে কে?

দ্বিতীয় বস্ত্রটিও সঙ্গে আনোনি—সেও কি বোঝা? দেব দু'-একটা বা'র করে?

বেশ যা হোক তুমি। তোমার কাপড় ভিখিরীর গায়ে মানাবে কেন?

বলিলাম, কাপড় মানাবে না, কিন্তু ভিখারীকেও খেতে হয়। পৌঁছুতে আরও দু'দিন লাগবে, গাড়িতে খাবে কি? যে খাবারগুলো আমার সঙ্গে আছে তাও কি ফেলে দিয়ে যাব—তুমি ছোঁবে না?

কমললতা এবার হাসিয়া বলিল, ইস্ রাগ দ্যাখো। ওগো, ছোঁব গো ছোঁব, থাক্ ওসব, তুমি চলে গেলে আমি পেটভরে গিলবো। সময় শেষ হইতেছে, আমার নামিবার মুখে কহিল, একটু দাঁড়াও ত গোঁসাই, কেউ নেই, আজ লুকিয়ে তোমায় একটা প্রণাম করে নিই। বলিয়া হেঁট হইয়া আজ সে আমার পায়ের ধুলা লইল।

প্ল্যাটফর্মে নামিয়া দাঁড়াইলাম। রাত্রি তখনো পোহায় নাই। নীচে ও উপরে অন্ধকার স্তরে একটা ভাগাভাগি শুরু হইয়াছে, আকাশের একপ্রান্তে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ শীর্ণ শশী, অপর প্রান্তে উষার আগমনী। সেদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন ঠাকুরের ফুল তুলিতে এমনি সময়ে তাহার সাথী হইয়াছিলাম। আর আজ?

বাঁশী বাজাইয়া সবুজ আলোর লণ্ঠন নাড়িয়া গার্ডসাহেব যাত্রার সঙ্কেত করিল। কমললতা জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া এই প্রথম আমার হাত ধরিল, কণ্ঠে কি যে মিনতির সুর তাহা বুঝাইব কি করিয়া, বলিল, তোমার কাছে কখনো কিছু চাইনি—আজ একটি কথা রাখবে?

হাঁ রাখব, বলিয়া চাহিয়া রহিলাম।

বলিতে তাহার একমুহূর্ত বাধিল, তারপর কহিল, আমি জানি, আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও। আমার জন্য ভেবে আর তুমি মন খারাপ করো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তাহার সেই হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলাম, তোমাকে তাঁকেই দিলাম কমললতা, তিনিই তোমার ভার নিন। তোমার পথ, তোমার সাধনা নিরাপদ হোক—আমার বলে আর তোমাকে অসম্মান করব না।

হাত ছাড়িয়া দিলাম, গাড়ি দূর হইতে দূরে চলিল, গবাক্ষপথে তাহার আনত মুখের 'পরে স্টেশনের সারি সারি আলো কয়েকবার আসিয়া পড়িয়া আবার সমস্ত অন্ধকারে মিলাইল। শুধু মনে হইল হাত তুলিয়া সে যেন আমাকে শেষ নমস্কার জানাইল।

বামুনের মেয়ে

বামুনের মেয়ে

১

পাড়া-বেড়ানো শেষ করিয়া রাসমণি অপরাহ্ণবেলায় ঘরে ফিরিতেছিলেন। সঙ্গে দশ-বারো বৎসরের নাতিনীটি আগে আগে চলিয়াছিল। অপ্রশস্ত পল্লীপথের এধারে বাঁধা একটি ছাগশিশু ওধারে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। সম্মুখে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি নাতিনীর উদ্দেশে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওলো ছুঁড়ী, দড়িটা ডিঙ্গুসনি, ডিঙ্গুসনি। ডিঙুলি? হারামজাদী সগ্‌গপানে চেয়ে পথ হাঁটচ! চোখে দেখতে পাও না যে ছাগল বাঁধা রয়েচে।

নাতিনী কহিল, ছাগল ঘুমোচ্চে ঠাকুমা।

ঘুমুচ্চে! আর দোষ নেই? এই শনি-মঙ্গলবারে কি না তুই দড়িটা সচ্ছন্দে ডিঙিয়ে গেলি?

তাতে কি হয় ঠাকুমা?

কি হয়? পোড়ারমুখী বামুনের ঘরের ন'-দশ বছরের বুড়ো-ধাড়ী মেয়ে এটা শেখোনি যে, ছাগল-দড়ি ডিঙোতে মাড়াতে নেই—কিছুতে নেই! আবার বলে কি না, কি হয়! না বাপু ব্যাটা-বেটীদের ছাগল-পোষার জালায় মানুষের পথে-ঘাটে চলা দায় হ'লো। এঁ্যা! এই মঙ্গলবারের বারবেলায় মেয়েটা যে দড়িটা ডিঙিয়ে ফেললে—কেন? কিসের জন্যে পথের ওপর ছাগল বাঁধা? বলি তাদের ঘরে কি ছেলেমেয়ে নেই? তাদের কি একটা ভালো-মন্দ হতে জানে না?

অকস্মাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়িল বারো-তেরো বছরের একটি দুলেদের মেয়ের প্রতি। সে ত্রস্তব্যস্ত হইয়া তাহার ছাগশিশুটিকে সরাইবার জন্য আসিতেছিল। তখন অনুপস্থিতকে ছাড়িয়া তিনি উপস্থিতকে লইয়া পড়িলেন। তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, তুই কে লা? মরণ আর কি, একেবারে গা ঘেঁসে চলেচিস্ যে! চোখে-কানে দেখতে পাস্‌নে? বলি, মেয়েটার গায়ে তোর আঁচলটা ঠেকিয়ে দিলিনে ত?

দুলে মেয়েটি ভয়ে জড়-সড় হইয়া বলিল, না মাঠান, আমি ত হেথা দিয়ে যাচ্চি!

রাসমণি মুখখানা অতিশয় বিকৃত করিয়া কহিলেন, হেথা দিয়ে যাচ্চি! তোর হেথা দিয়ে যাবার দরকার কি লা? ছাগলটা বুঝি তোর? বলি কি জেতের মেয়ে তুই?

আমরা দুলে মাঠান।

দুলে! এঁ্যা, এই অবেলায় মেয়েটাকে ছুঁয়ে দিয়ে তুই নাওয়ালি?

তাঁহার নাতিনী বলিয়া উঠিল, আমাকে ত ছোঁয়নি ঠাকুমা—

রাসমণি ধমক দিলেন, তুই থাম পোড়ারমুখী। আমি দেখলুম যেন দুলে-ছুঁড়ীর আঁচলের ডগাটা তোর গায়ে ঠেকে গেল। যা—এই পড়ন্তবেলায় পুকুরে ডুব দিয়ে মর্ গে যা। দিয়ে তবে বাড়ি ঢুকবি। না বাপু, জাতজন্ম আর রইল না। ছোটলোকের বড় বাড়বাড়ন্ত হয়েচে, দেবতা-বামুন আর গেরাহ্যিই করে না! হারামজাদী, দুলে-পাড়া থেকে ছাগল বাঁধতে এসেচে বামুন-পাড়ার মধ্যে?

দুলে মেয়েটির ভয় ও লজ্জার অবধি ছিল না। সে ছাগলশিশুটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া শুধু বলিল, মাঠান, আমি ছুঁইনি।

ছুঁস্‌নি যদি তবে এ-পাড়ায় এসেছিস্ কেন?

মেয়েটি হাত তুলিয়া অদূরে কোন একটা অদৃশ্য গৃহ নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, ঠাকুরমশাই তেনার ওই গইলের ধারে আমাদের থাকতে দিয়েচে। মাকে আর আমাকে দাদামশাই তেইড়ে দিয়েচে না!

যাহারই হোক এবং যেজন্যই হোক, একজনের দুর্গতির ইতিহাসে রাসমণির ক্রুদ্ধ হৃদয় কথঞ্চিত প্রফুল্ল হইল এবং এই রুচিকর সংবাদ সবিস্তারে আহরণ করিতে তিনি কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বটে? বলি, কবে তাড়িয়ে দিলে লো?

পরশু আত্তিরে মাঠান।

ও—তুই এককড়ে দুলের মেয়ে বুঝি? তাই বল্। এককড়ে মরতে-না-মরতে বুড়ো তোদের বে'র করে দিলে? ছোটজাতের মুখে আগুন! তা বাপু, দিলে বলেই কি তোরা বামুন-পাড়ায় এসে থাকবি? তোদের আস্পদ্দাও বড় কম নয় লা! কে আনলে তোর মাকে? রামতনু বাঁড়ুয্যের জামাই বুঝি? নইলে এমন বিদ্যে আর কার! ঘর-জামাই ঘর-জামাইয়ের মত থাক্, তা না, শ্বশুরের বিষয় পেয়েচিস বলে পাড়ার মধ্যে হাড়ি-ডোম-দুলে-ক্যাওরা এনে বসাবি।

এই বলিয়া রাসমণি হাঁক দিয়া ডাকিলেন, বলি, সন্ধ্যা—ও সন্ধ্যা, ঘরে আছিস গা?

সামান্য একটুখানি পোড়ো জমির ওধারে রামতনু বাঁড়ুয্যের খিড়কী। তাঁহার ডাক শুনিয়া অদূরবর্ত্তী খিড়কীর দ্বার খুলিয়া একটি উনিশ-কুড়ি বছরের সুশ্রী মেয়ে মুখ বাহির করিয়া সাড়া দিল—কে ডাকে গা? ওমা, দিদিমা যে! কেন গা! বলিতে বলিতে সে বাহির হইয়া আসিল।

রাসমণি কহিলেন, তোর বাপের আক্কেলটা কি রকম শুনি বাছা? তোর দাদামশাই রামতনু বাঁড়ুয্যে—একটা ডাকসাইটে কুলীন, তার ভিটে-বাড়িতে আজ প্রজা বসল কিনা বাগ্দী-দুলে! কি ঘেন্নার কথা মা!

এই বলিয়া গালে একবার হাত দিয়াই পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, তোর মাকে একবার ডাক। জগো এর কি বিহিত করে করুক, নইলে চাটুয্যেদাদাকে গিয়ে

আমি নিজে জানিয়ে আসব। সে ত একটা জমিদার! একটা নামজাদা বড়লোক! সে কি বলে একবার শুনি।

সন্ধ্যা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে দিদিমা?

ডাক না একবার তোর মাকে। তাকে বলে যাচ্চি কি হয়েচে।

এই বলিয়া নাতিনীকে দেখাইয়া কহিলেন, এই যে মেয়েটা মঙ্গলবারের বারবেলায় ছাগল-দড়ি ডিঙিয়ে ফেললে, ওই যে দুলে-ছুঁড়ী আঁচল ঘুরিয়ে বাছাকে ছুঁয়ে দিলে—

সন্ধ্যা দুলে মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুই ছুঁয়ে ফেলেচিস্?

সে বেচারা তখনও ছাগশিশু বুকে করিয়া একধারে দাঁড়াইয়াছিল, কাঁদ কাঁদ গলায় অস্বীকার করিয়া বলিল, না দিদিঠান—

রাসমণির নাতিনীটিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, না সন্ধ্যাদিদি, ও আমাকে ছোঁয়নি, ওই হোথা দিয়ে—

কিন্তু কথাটা তাহার পিতামহীর হুঙ্কারে ওই পর্য্যন্তই হইয়া রহিল।

ফের 'নেই' কচ্চিস্ হারামজাদী? চল্, আগে বাড়ি চল্! ছুঁয়েচে কি না সেখানে গিয়ে দেখাচ্চি।

সন্ধ্যা হাসিয়া কহিল, জোর করে নাওয়ালে ও আর কি করবে দিদিমা।

তাহার হাসিতে রাসমণি জ্বলিয়া গেলেন। বলিলেন, জোর করি, না করি, সে আমি বুঝব, কিন্তু তোর বাপের ব্যাভারটা কি রকম? কোন্ ভদ্দরলোকটা ভিটে-বাড়িতে ছোটজাত ঢোকায় শুনি। লোকে কথায় বলে, দুলে। সেই দুলে এনে বামুন-পাড়ায় ঢুকিয়েচে! বলি, ঘর-জামাই ঘর-জামাইয়ের মত থাকলেই ত ভাল হয়।

পিতার সম্বন্ধে এই অপমানকর উক্তিতে ক্রোধে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সেও কঠিন হইয়া জবাব দিল, বাবা ত আর পরের ভিটেয় ছোটজাত ঢোকাতে যানান দিদিমা। ভাল বুঝেচেন নিজের জায়গায় আশ্রয় দিয়েচেন, তাতে তোমারই বা এত গায়ের জ্বালা কেন?

আমার গায়ের জ্বালা কেন? কেন জ্বালা দেখবি তবে? যাব একবার চাটুয্যেদাদার কাছে? গিয়ে বলব?

তা বেশ ত, গিয়ে বল গে না। বাবা ত তাঁর জায়গায় দুলে বসাননি যে, তিনি বড়লোক বলে বাবার মাথাটা কেটে নেবেন!

বটে! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! ওগো, সে আর কেউ নয়—গোলোক চাটুয্যে! তোর বাপ বুঝি এখনো তারে চেনেনি? আচ্ছা—

হাঙ্গামা শুনিয়া জগদ্ধাত্রী বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই রাসমণি অগ্নিকাণ্ডের মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। চীৎকারে সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া বলিলেন, শোন্ জগো, তোর বিদ্যেধরী মেয়ের আস্পর্দ্ধার কথাটা একবার

শোন্। লেখাপড়া শেখাচ্চিস্ কি না? বলে, বলিস্ তোর গোলোক চাটুয্যেকে বাবার মাথাটা যেন কেটে নেয়! বলে, বেশ করেচি নিজের জায়গায় হাড়ি-দুলে বসিয়েচি—কারো বাপ-ঠাকুর্দ্দার জায়গায় বসাইনি—অমন ঢের বড়লোক দেখেচি, যে যা পারে তা করুক। শোন্, তোর মেয়ের কথাগুলো একবার শোন্!

জগদ্ধাত্রী বিস্মিত ও কুপিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বলেচিস্ এইসব কথা?

সন্ধ্যা মাথা নাড়িয়া কহিল, না, আমি এমন করে বলিনি।

রাসমণি তাহারই মুখের উপর হাত নাড়িয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বললিনে? এরা সবাই সাক্ষী নেই?

কিন্তু পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর অনির্ব্বচনীয় কৌশলে উচ্চ সপ্তক হইতে একেবারে খাদের নিখাদে নামাইয়া লইয়া জগদ্ধাত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, মা, ভাল কথাই বলেছিলুম। মঙ্গলবারের বারবেলায় মেয়েটা ছাগল-দড়ি ডিঙিয়ে ফেললে, তাই বললুম, আহা, কে এমন করে পথের ওপর ছাগল বাঁধলে গা? তাই না শুনতে পেয়ে দুলে-ছুঁড়ীটা ছুটে এসে বাছার মুখের ওপর আঁচল ঘুরিয়ে মারলে! বলে ঠাকুরমশায়ের জায়গায় ছাগল বেঁধেচি, তুমি বলবার কে? তাই মা, তোমার মেয়েকে ডেকে শুধু এই কথাটি বলেচি, দিদি, এই যে অবেলায় মেয়েটার নাইতে হবে, বারবেলায় ছাগল-দড়ি ডিঙিয়ে ফেললে—তা তোমার বাবা যদি এদের দুলে-পাড়া থেকে তুলে এনে বসিয়েই থাকে ত দিদি, ছাগল-টাগলগুলো একটু দেখে-শুনে বাঁধতে বলে দিস্—আচার-বিচারের জ্ঞান-গম্যি ত নেই—নইলে চাটুয্যেদাদা, বুড়োমানুষ, এই পথেই ত আসা-যাওয়া করে—মাড়ামাড়ি করে আবার রেগে-টেগে উঠবে—মা, এই। এতেই তোমার মেয়ে আমায় মারতে যা বাকী রেখেচে। বলে, যা যা, তোর চাটুয্যেদাদাকে ডেকে আন্ গে। তার মত বড়লোক আমি ঢের দেখেচি। তার বাপের জায়গায় যখন হাড়ী-দুলে প্রজা বসাব, তখন যেন সে শাসন করতে আসে। আচ্ছা, তুমিই বল দিকি মা, এইগুলো কি মেয়ের কথা?

জগদ্ধাত্রী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কহিলেন, বলেচিস্ এইসব?

সন্ধ্যা এতক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে রাসমণির মুখের প্রতি চাহিয়াছিল, মায়ের কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া ঘাড় ফিরাইয়া শুধু বলিল, না।

বলিস্‌নি তবে কি মাসী মিছে কথা কইচে?

বল্ মা, তাই একবার তোর মেয়েকে বল্।

সন্ধ্যা মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া মায়ের প্রশ্নের উত্তর দিল, জানিনে মা, কার কথা মিছে। কিন্তু তোমার আপনার মেয়ের চেয়ে এই পাতানো-মাসীকেই যদি বেশ চিনে থাকো ত না হয় তাই।

এই বলিয়া দ্বিতীয় প্রশ্নের পূর্ব্বেই খোলা দ্বার দিয়া দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল।

উভয়েই বিস্ফারিত নেত্রে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন এবং অবসর বুঝিয়া দুলে-মেয়েটাও তাহার ছাগলছানা বুকে করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল।

রাসমণি বলিলেন, দেখলি ত জগো, তোর মেয়ের তেজ! শুনলি ত কথা! বলে, পাতানো মাসী! কুলীনের ঘরের মেয়ে, তাই। নইলে বিয়ে হলে এ-বয়েসে যে পাঁচ-ছ ছেলের মা হতে পারত। পাতানো মাসী—শুনলি ত!

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া রহিলেন এবং রাসমণি নিজেও একটু স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, হাঁ জগো, শুনলুম নাকি অমর্ত্ত চক্কোত্তির ছেলেটাকে তোরা আজও বাড়িতে ঢুকতে দিস? বলি, কথাটা কি সত্যি?

জগদ্ধাত্রী মনে মনে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

রাসমণি বলিতে লাগিলেন, আমি ত সেদিন পুলিনের মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ফেললুম। বললুম, সে মেয়ে জগদ্ধাত্রী—আর কেউ নয়। হরিহর বাঁড়ুয্যেমশায়ের নাতনী, রামতনু বাঁড়ুয্যের কন্যা। যারা শূদ্দুর বলে কায়েতের বাড়িতে পর্য্যন্ত পা ধোয় না। তারা দেবে ঐ মেলেচ্ছ ছোঁড়াটাকে উঠোন মাড়াতে! তোরা বলচিস্ কি?

এই হিতৈষিণীর দরদের কাছে লজ্জা পাইয়া জগদ্ধাত্রী শুধু একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, কথাটা ঠিকই বলেচ মাসী, তবে কি জানো মা, ছেলেবেলা থেকেই ওর আসা-যাওয়া আছে, আমাকে খুড়ীমা বলতে অজ্ঞান, তাই, কালে-ভদ্রে যদি কখনো আসে ত মুখ ফুটে বলতে পারিনে, অরুণ, তুমি আর আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকো না। মা-বাপ নেই, বাছাকে দেখলেই কেমন যেন মায়া হয়।

রাসমণি প্রথমে অবাক্ হইলেন, পরে ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, অমন মায়ার মুখে আগুন!

অকস্মাৎ সেই ক্রোধ অতি উচ্চ ধাপে চড়িয়া গেল এবং তাহারই সহিত কণ্ঠস্বরের সমতা রক্ষা করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওই একগুঁয়ে ছোঁড়াটাকে কি তোরা সোজা বজ্জাত ঠাওরাস্? অমন নচ্ছার গাঁয়ের মধ্যে আর দুটি নেই তোকে বলে দিলুম। চাটুয্যেদাদা, একটা জমিদার মানুষ—তিনি নিজে স্বয়ং ছোঁড়াটাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, অরুণ, জলপানির লোভ দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ব'সো গে যাও। বিলেতে যেয়ো না। কিন্তু কথাটা কি ছোঁড়া শুনলে? অত বড় একটা মানী লোকের মান রাখলে? উল্টে ছোঁড়া নাকি বিলেতে যাবার সময় ঠাট্টা করে বলেছিল, বিলেতে গিয়ে জাত যায় আমার সেও ভাল, কিন্তু গোলোক চাটুয্যের মত বিলেতে পাঁটা-ভেড়া চালান দিয়ে টাকা করতেও চাইনে; সমাজের মাথায় চড়ে, লোকের জাত মেরে বেড়াতেও পারব না। উঃ—আমি যদি সেখানে থাকতুম জগো, ঝেঁটিয়ে ছোঁড়ার মুখ সোজা করে দিতুম। যে গোলোক চাটুয্যে—ভাত খেয়ে গোবর দিয়ে মুখ ধোয়, তাকে কিনা—

জগদ্ধাত্রী বিনীত-কণ্ঠে বলিতে গেলেন, কিন্তু অরুণ ত কখনো কারও নিন্দে করে না মাসী?

তবে বুঝি আমি মিছে কথা কইচি! চাটুয্যেদাদা বুঝি তবে—

না না, তিনি বলবেন কেন? তবে, লোকে নাকি অনেক কথা বানিয়ে বলে—

তোর এক কথা জগো! লোকের ত আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তাই গেছে বানিয়ে বলতে। আচ্ছা, তাই বা বিলেতে গিয়ে কোন্ দিগ্‌গজ হয়ে এলি? শিখে এলি চাষার বিদ্যে! শুনে হেসে বাঁচিনে! চক্কোত্তিই হ, আর যাই হ, বামুনের ছেলে ত বটে! দেশে কি চাষী ছিল না? এখন তুই কি যাবি হাল-গরু নিয়ে মাঠে মাঠে লাঙ্গল দিতে? মরণ আর কি!

তাঁহার কণ্ঠস্বরের তীব্র সৌরভ ক্রমে ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, গন্ধ পাইয়া পাছে পাড়ার সমাজদার মধুমক্ষীর দল জুটিয়া যায়, এই ভয়ে জগদ্ধাত্রী আস্তে আস্তে বলিলেন, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন মাসী, একটু ভেতরে গিয়ে বসবে চল না?

না মা, বেলা গেল আর বসব না। মেয়েটাকেও ত আবার নাইয়ে-ধুইয়ে ঘরে তুলতে হবে। দুলি ছুঁড়ীটা বুঝি পালিয়েচে?

হাঁ ঠাকুমা, তোমরা যখন কথা কচ্ছিলে; কিন্তু সে আমাকে ছোঁয়নি—

ফের 'নেই' কচ্চিস্ হারামজাদী! কিন্তু জগো, ব্যাগত্তা করি বাছা, পাড়ার ভেতর আর হাড়ি-দুলে ঢোকাস্‌নি। জামাইকে বলিস্।

বলবো বই কি মাসী, আমি কালই ওদের দূর করে দেব। আর থাকলে ত আমাদেরই পুকুর-ঘাট সরবে, ওদের জল মাড়া-মাড়ি করে আমাদেরই ত হাঁটতে হবে।

তবে, তাই বল্ না মা। তা হলে কি আর জাত-জন্ম থাকবে! আমি ত সেই কথাই বলেছিলুম, কিন্তু আজকালকার মেয়েছেলেরা নাকি কিছু মানতে চায়? তাই ত চাটুয্যেদাদা সেদিন শুনে অবাক্ হয়ে বললেন, রাসু, আমাদের জগদ্ধাত্রীর মেয়েটাকে নাকি তার বাপ লেখাপড়া শিখুচ্ছে? তারা করচে কি! মানা করে দে—মানা করে দে—মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে যে একেবারে গোল্লায় যাবে!

জগদ্ধাত্রীর ভয়ের পরিসীমা রহিল না। কহিলেন, চাটুয্যেমামা বুঝি বলছিলেন?

বলবে না? সে হ'লো সমাজের মাথা, গাঁয়ের একটা জমিদার। তার কানে আর কোন্ কথাটা না ওঠে বল্। এই ত আমারও—ধর্ না কেন, বুড়ো হতে চললুম—লেখাপড়ার ত ধার ধারিনে, কিন্তু কোন্ শাস্তরটি না জানি বল্? কারও বাপের সাধ্যি আছে বলে, রাসি বামুনি একটা অশাস্তর কাজ করেচে? এই যে মেয়েটা ছাগল-দড়ি ডিঙোবা-মাত্তর শিউরে উঠে বললুম, ওলো ছুঁড়ী, করলি কি, আজ যে মঙ্গলবারের বারবেলা! কই কোন পণ্ডিত বলে যাক্ দিকি—না, এতে দোষ নেই! তা হবার জো নেই মা, তা হবার জো নেই। আমরা বাপ-মায়ের কাছে শিক্ষে পেয়েছিলুম। কিন্তু ডাকো দিকি তোমার লিখিয়ে-পড়িয়ে মেয়েকে কেমন বলতে পারে?

জগদ্ধাত্রী নিঃশব্দে ত্রুটি স্বীকার করিয়া কহিলেন, একটু বসলে হ'ত না মাসী ?

না মা, বেলা গেছে—আর একদিন আসব। নে খেঁদী, বাড়ি চল্। এই বলিয়া নাতিনীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কয়েকপদ চলিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হা জগো, অমন পাত্তরটি হাতছাড়া করলি কেন বল্ দেখি ?

না, হাতছাড়া ঠিক নয়, তবে ঘর-বাড়ি কিছুই নেই, বয়েস হয়েচে—তোমার জামায়ের মত হয় না বাছা।

রাসমণি বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, শোন কথা একবার! বলি, তার ঘর নেই, তোর ত আছে? তোর আর ছেলেও নেই, মেয়েও নেই যে তার জন্যে ভাবনা। এক মেয়ে, সেই মেয়ে-জামাই নিয়ে ঘর করতিস্, সে কি অমন্দ হ'তো বাছা? আর বয়স? কুলীনের ছেলের চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়স কি আবার একটা বয়স? রসিকপুরের জয়রাম মুখুয্যের দৌউত্তুর। তার আবার বয়সের খোঁজ কে করে জগো? তা ছাড়া মেয়ের বয়সের দিকেও একবার তাকা দিকিনি? আর গড়িমসি করবি ত বিয়ে দিবি কবে? শেষে কি তোর ছোটপিসীর মত চিরটাকাল খুবড়ো রাখবি ?

জগদ্ধাত্রী সলজ্জভাবে কহিলেন, আমিও তাই বলি মাসি, কিন্তু মেয়ের বাপ যে একেবারে—

কথাটাকে সম্পূর্ণ করিতে দিবার ধৈর্য্যও রাসমণির রহিল না। জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, মেয়ের বাপ বলবে না কেন? আহা! তাঁর নিজেরই যেন কত ঘর-বাড়ি জমিদারী ছিল! হাসালি বাপু তোরা! তা ছাড়া, ঐ অরুণদের বৈঠকে দিন-রাত বসা-দাঁড়ানো গান-বাজনা করা—শুনি হুকো পর্য্যন্ত নাকি চলে যাচ্চে—ও-কথা সে বলবে না ত কি চাটুয্যেদাদা বলবে? হদ্দ করলি জগো। কিন্তু তাও বলে দিচ্ছি বাছা, ঘর-বর যখন মিলেচে, তখন না না করে দেরি করে শেষকালে অতিলোভে তাঁতি নষ্ট করিস্নে। তোর ছোটপিসী গোলাপী থুবড়ো হয়ে মোলো, তোর বাপের বড় মেজ, দুই পিসির বিয়েই হ'লো না। আর তোরি কি সময়ে বিয়ে হ'ত বাছা, যদি না তোর বাপ-মা কাশীতে গিয়ে পড়ত? বেয়ান কাশী-বাসিনী, কামড়-কোমড় নেই, জামাই স্কুলে পড়চে—ঘর-বর যাই মিলে গেল, অমনি ধা করে তোদের দু'হাত এক করে দিয়ে মেয়ে-জামাই নিয়ে দেশের লোক দেশে ফিরে এলো। ভাঙচির ভয়ে বিয়ের আগে কাউকে খবরটুকু পর্য্যন্ত দিলে না। তা ভালই করেছিল, নইলে বিয়ে হ'তই কিনা তাই বা কে জানে! নে খেঁদি চল্! জয়রাম মুখুয্যের নাতি—তার আবার ঘর-বাড়ি, তার আবার বয়স, তার আবার কালো-ধলো—কালে কালে কতই শুনব! নে, এগো বাছা, আর দেরি করিস্নে। কাপড়-চোপড় কাচতে, সন্ধ্যা দিয়ে আহ্নিক-মালা সারতে আজ দেখচি এক প্রহর রাত হয়ে যাবে। কিন্তু তাও বলি

বাপু, খিষ্টেন-ফিষ্টেনকে বাড়ি ঢুকতে দেওয়া, মেয়ের সঙ্গে হাসি-তামাসা করতে দেওয়া ভাল নয়। কথাটা টি টি হয়ে গেলে মেয়ের পাত্তর পাওয়া ভার হবে বাছা। নে না খেঁদি, চল্ না। পরের কথা পেলে তুই যে আর নড়তে চাস্‌নে দেখি।

বকিতে বকিতে নাতনীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রাসমণি প্রস্থান করিতেছিলেন, জগদ্ধাত্রী শঙ্কিত বিরসমুখে কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ যেন তাঁহার চমক ভাঙিয়া গেল। কহিলেন, ওমা খেঁদি, একটু দাঁড়া দিকি বাছা। ক্ষেত থেকে কাল একঝুড়ি নতুন মুক্তকেশী বেগুন, আর একটা কচি নাউ এসেছিল, তার গোটা কতক আর নাউয়ের একফালি সঙ্গে নিয়ে যা দিকি মা—আমি চট্ করে এনে দিই—

এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে বাটীর দিকে যাইতেছিলেন, রাসমণি পুলকিত বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, ওমা, বেগুন বুঝি এর মধ্যে উঠল? বলিয়াই কণ্ঠস্বর একমুহূর্ত্তে খাটো করিয়া নাতিনীকে কহিলেন, ওলো খেঁদি, মুখপোড়া মেয়ে! ঠুঁটোর মত দাড়িয়ে রইল, সঙ্গে সঙ্গে যা না! এবং পরক্ষণেই তাহাকে পিছন হইতে ডাকিয়া কহিলেন, ছুটে আসিস্ খেঁদি—আমি ততক্ষণ একটু এগোই।

২

সম্মুখের একটা দাওয়ায় বসিয়া সন্ধ্যা নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতেছিল, জগদ্ধাত্রী আহ্নিক সারিয়া পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ক্ষণকাল কন্যার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, সকাল থেকে কি অত সেলাই হচ্ছে সন্ধ্যে, বেলা যে দুপুর বেজে গেছে—নাওয়া-খাওয়া করবিনে? পরশু সবে পথ্যি করেচিস্, আবার কিন্তু পিত্তি পড়ে অসুখ হবে তা ব'লে দিচ্চি।

সন্ধ্যা দাঁত দিয়া বাড়তি সুতাটা কাটিয়া ফেলিয়া কহিল, বাবা যে এখনো আসেননি মা।

তা জানি। কেবল বিনি-পয়সার চিকিচ্ছে সারতে কত বেলা হবে সেইটে জানিনে। আর বেশ ত, আমি ত আছি, তোর উপোস করে থাকবার দরকারটা কি?

সন্ধ্যা নীরবে কাজ করিতে লাগিল, জবাব দিল না।

মা প্রশ্ন করিলেন, সেলাইটা কিসের হচ্ছে শুনি?

মেয়ে অনিচ্ছুক অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, এই দুটো বোতাম পরিয়ে দিচ্চি।

তা জানি মা, জানি! নইলে আমার কাপড়খানা সেরে রাখতে বসেচিস্ কি না, তা জিজ্ঞেস করিনি; কিন্তু কি বাপ-সোহাগীই হয়েছিস্ সন্ধ্যে, যেন পৃথিবীতে ও আর কারও নেই। কোথায় একটা বোতাম নেই, কোথায় কাপড়ের কোণে একটু

খোঁচা লেগেচে, কোন্ পিরানটায় একটু দাগ ধরেচে, জুতো-জোড়াটার কোথায় এক-রাত সেলাই কেটেচে—এই নিয়েই দিবারাত্তির আছিস্, এ-ছাড়া সংসারে আর যেন কোন কাজ নেই তোর।

সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, বাবার যে কিছু নজরে পড়ে না মা।

জবাব শুনিয়া মা খুশী হইলেন না, বলিলেন, পড়বে কি করে,—বিনি-পয়সার ডাক্তারিতে সময় পেল ত! বলি, দুলে মাগীরা গেল?

যাবে বই কি মা।

কিন্তু সে কবে? ছোঁয়া-ন্যাপা করে জাতজন্ম ঘুচে গেলে, তার পরে? আবার যে বড়ো ছুচে স্থতো পরাচ্চিস্। উঠবিনে বুঝি?

তুমি যাও না মা, আমি এখুনি যাচ্চি।

এই অসুখ শরীরে যা ইচ্ছে তুমি কর গে মা—তোমাদের দুজনের সঙ্গে বকতে বকতে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। সংসারে আর আমার দরকার নেই—এইবার আমি শাশুড়ীর কাছে গিয়ে কাশীবাস করব—তা কিন্তু তোমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্চি।

এই বলিয়া জগদ্ধাত্রী ক্রোধভরে একটা পিতলের কলসী তুলিয়া লইয়া খিড়কীর পুকুরের দিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যা আনত-মুখে মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিল, জননীর কোন কথার উত্তর দিল না। তাহার সেলাই প্রায় শেষ হইয়াছিল, ছুঁচ-স্থতা প্রভৃতি এখনকার মত একটা ছোট সাবানের বাক্সে গুছাইয়া রাখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল; তাহার পিতার সোরগোলে চমকিয়া মুখ তুলিল। তিনি সদাই ব্যস্ত—এইমাত্র বাড়ি ঢুকিয়াছেন, হাতে একটা হোমিওপ্যাথি ঔষধের ছোট বাক্স এবং বগলে চাপা কয়েকখানি ডাক্তারি বই। মেয়েকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, সন্ধ্যে, ওঠ ত মা, চট্ করে আমার বড় ওষুধের বাক্সটা একবার,—কি যে করি কিছুই ভেবে পাইনে—এমনি মুস্কিলের মধ্যে—

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পিতার হাতের বাক্স ও বইগুলো লইয়া একধারে রাখিয়া দিল। বারান্দায় ইতিপূর্ব্বে যে মাদুরখানা পাতিয়া রাখিয়াছিল তাহারই উপর হাত ধরিয়া বসাইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে করিতে বলিল, আজ কেন তোমার এত দেরি হ'লো বাবা?

দেরি! আমার কি নাবার-খাবার ফুরসত আছে তোরা ভাবিস? যে রুগীটির কাছে না যাব তারই রাগ, তারই অভিমান। প্রিয় মুখুয্যের হাতের একফোঁটা ওষুধ না পেলে যেন আর কেউ বাঁচবে না। ভয় যে নেহাৎ মিথ্যে তা যদিও বলতে পারিনে, কিন্তু প্রিয় মুখুয্যে ত একটাই—দুটো ত নয়! তাদের বলি—এই নন্দ মিত্তির

লোকটা যা হোক একটু প্র্যাক্‌টিস ত করচে—দু-একটা ওষুধ ও যে না জানে তা নয় —কিন্তু তা হবে না। মুখুয্যেমশাইকে নইলে চলবে না। আর তাদের বা কি বলি। একটা ওষুধের সিম্‌টম্‌ যদি মুখস্থ করবে! আরে, এত সহজ বিদ্যে নয়—এত সহজ নয়! তা হলে সবাই ডাক্তার হ'ত। সবাই প্রিয় মুখুয্যে হ'ত।

বাবা, জামাটা ছেড়ে ফেলো না—

ছাড়চি মা। এই আজই—ধাঁ করে যে পল্‌সেটিলা দিয়ে ফেললি, প্র্যাক্‌টিস ত কচ্চিস্‌, কিন্তু বল্‌ দেখি তার অ্যাকশন? দেখি আমার মত কেমন তুই কণ্ঠস্থ বলে যেতে পারিস্‌। সন্ধ্যে, ধর দিকি মা বইখানা, একবার পল্‌সেটিলাটা—

তোমার আবার বই কি হবে বাবা! আজ খাওয়া-দাওয়ার পরে ওই ওষুধটাই তোমার কাছে পড়ে নেব। দেবে পড়িয়ে বাবা?

দেব বইকি মা—দেব বইকি। নক্সের সঙ্গে তফাতটা হচ্চে আসলে—ওই বইখানা একবার—

তোমার পায়ে ততক্ষণ তেলটুকু মাখিয়ে দিই না, বাবা। বড্ড বেলা হয়ে গেছে —মা আবার রাগ করবেন। বলিয়া সে একবার উদ্বিগ্ননেত্রে দেখিয়া লইল তাহার জননী ঘাট হইতে ফিরিতেছেন কিনা এবং আপত্তি করিবার পূর্ব্বেই তেলের বাটি হইতে খানিকটা তেল লইয়া বাবার পায়ে মাখাইয়া দিল।

হুঃ—একটু সবুর করলিনে মা। একবার দেখে নিয়ে—

আজ কাকে কাকে দেখলে বাবা? আচ্ছা, পঙ্কা জেলের ঠাকুর্দ্দাদা—

সে বুড়ো? ব্যাটা মরবে, মরবে, মরবে, তুই দেখে নিস্‌ সন্ধ্যে। আর ঐ পরাণ চাটুয্যে—ও হারামজাদার নামে আমি কেস্‌ করে তবে ছাড়ব। যে রুগীটি পাবো, অমনি তাকে গিয়ে ভাঙচি দিয়ে আসবে! একদিনের বেশী যে কেউ আমার ওষুধ খেতে চায় না সে কেন? সে কেবল ওই নচ্ছার বোম্বেটে পাজী উল্লুকের জন্যে। কি করেচে জানিস্‌? পঙ্কার ঠাকুর্দ্দাকে যাই একটি রেমিডি সিলেক্ট করে দিয়ে এসেচি, অমনি ব্যাটা পিছনে গিয়ে বলেচে, কই দেখি কি দিলে?

সন্ধ্যা ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, তার পরে?

তাহার পিতা ততোধিক ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, ব্যাটা বজ্জাত, ঢক্‌ঢক্‌ ক'রে সমস্ত শিশিটা খেয়ে ফেলে বলেছে, ছাই ওষুধ! এই ত সমস্ত খেয়ে ফেললুম। কই আমার ওষুধ সে খাক্‌ ত দেখি! এই না বলে এক শিশি ক্যাস্টর অয়েল দিয়ে এসেচে! তারা বলে, ঠাকুর, তোমার ওষুধ সে এক চুমুকে খেয়ে ফেললে, তার ওষুধ তুমি খেতে পার ত তোমার ওষুধ আমরা খাব; নইলে না।

সন্ধ্যা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বলিল, সে ত তুমি খাওনি বাবা?

নাঃ—তা কি আর খাই! কিন্তু এতটা বেলা পর্য্যন্ত বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়ালুম একটা রুগী যোগাড় করতে পারলুম না। পরাণের নামে আমি নিশ্চয় কেস করব তোকে বললুম সন্ধ্যে।

ক্ষোভে অভিমানে সন্ধ্যার চোখে জল আসিতে চাহিল। এই পিতাটিকে সংসারে সর্ব্বপ্রকার আঘাত, উপদ্রব, লাঞ্ছনা, উপহাস, পরিহাস হইতে বাঁচাইবার জন্য সে যেন অহরহ তাহার দশ হাত বাড়াইয়া আড়াল করিয়া রাখিত। সজলকণ্ঠে কহিল, কেন বাবা তুমি পরের জন্যে রোদে রোদে ঘুরে বেড়াবে! এই বাড়িতেই যে কতজন তোমার ওষুধের জন্যে এসে ফিরে গেল।

কথাটার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল। পল্লীর গরীব-দুঃখীরা ঔষধ চাহিতে আসে বটে, কিন্তু সে সন্ধ্যার কাছে, তাহার পিতার কাছে নয়। বাবার কাছেই সে ছোট-খাটো রোগের চিকিৎসা করিতে শিখিয়াছিল এবং তাহার দেওয়া ঔষধ প্রায় নিষ্ফলও হইত না। কিন্তু গুরুটিকে রোগীরা যমের মত ভয় করিত। তাই তাহারা সতর্ক হইয়া খোঁজখবর লইয়া এমন সময়েই বাড়ি ঢুকিত, যেন হঠাৎ মুখুয্যেমশায়ের হাতের মধ্যে গিয়া না পড়িতে হয়। সন্ধ্যা ইহা জানিত, কিন্তু বাবার জন্য মিথ্যা বলিতে তাহার বাধিত না।

কিন্তু পিতা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—ফিরে গেল? কে কে? কারা কারা? কতক্ষণ গেল? কোন্ পথে গেল? নাম-ধাম জেনে নিয়েছিস্ ত!

সন্ধ্যা মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া কহিল, নাম-ধামে আমাদের কি দরকার বাবা, তারা আপনিই আবার আসবে অখন।

আঃ, তোদের জ্বালায় আর পারিনে বাপু। নামটা জিজ্ঞেস করতে কি হয়েছিল? এখুনি ত একবার ঘুরে আসতে পারতুম। দেরিতে কঠিন দাঁড়াতে পারে—কিছুই বলা যায় না—এখন একটি ফোঁটায় যে সারিয়ে দিতুম।

সন্ধ্যা নীরবে তেল মাখাইতে লাগিল, কিছুই বলিল না।

পিতা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, কখন আসবে বলে গেল?

বিকেলবেলায় হয়ত—

হয়ত! দেখ দিকি কিরকম অন্যায়টাই হয়ে গেল! ধর্, যদি কোনগতিকে নাই আসতে পারে? ওরে—ও সন্ধ্যে, বিপ্‌নের কাছে গিয়ে পড়ল না ত? পরানে হারামজাদা ত ঐ খোঁজেই থাকে, সে ত এর মধ্যে খবর পায়নি? না বাপু, আর পারিনে আমি। বাড়িতে কি ছাই দুটি মুড়ি-মুড়কিও ছিল না? দুটো দুটো দিয়ে কি ঘণ্টাখানেক বসিয়ে রাখতে পারতিস্‌নে? যা না বলে দেব, যেটি না দেখব—কে? কে? কে উঁকি মারচ হে? চলে এস না? আরে রামময় যে? খোঁড়াচ্চ কেন বল দিকি?

তাঁহার সাদর আহ্বান ও কলকণ্ঠে একজন চাষীগোছের মধ্যবয়সী লোক উঠানে

আসিয়া দাঁড়াইল এবং একান্ত নিস্পৃহ-স্বরে কহিল, আজ্ঞে না, ও কিছু না—

কিছু না? বিলক্ষণ! দিব্যি খোঁড়াচ্চ যে! আঃ—তেল-মাখানোটা একটু রাখ না সন্ধ্যে! কিছু না? স্পষ্ট আরনিকা কেস দেখতে পাচ্চি—না না, তামাসা নয় রামময়, কৈ দেখি পা-টা?

পা দেখানোর প্রস্তাবে রামময় একটিবার করুণচক্ষে সন্ধ্যার মুখের পানে কটাক্ষে চাহিয়া বলিল, আজ্ঞে হা, এই পা-টা একটু মুচড়ে কাল পড়ে গিয়েছিলুম!

প্রিয়বাবু কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, দেখলি ত সন্ধ্যে, দেখেই বলেচি কিনা আরনিকা। আমরা দেখলেই যে বুঝতে পারি! হুঁ, পড়লে কি ক'রে?

আজ্ঞে, ঐ যে বললুম পা মুচড়ে। দারজার পাশেই একটা জল যাবার ছোট নর্দ্দমার ওপর থেকে ছেলেগুলো তক্তাখানা সরিয়ে ফেলেছিল, অন্যমনস্ক হয়ে—

অন্যমনস্ক? এ্যাগ্‌নস্—এপিস্! সন্ধ্যে, মা, মনে রাখবে স্বভাবটাই আসল জিনিস। মহাত্মা হেরিং বলেচেন—হুঁ, অনমনস্ক হয়ে—তারপর?

যেই পা বাড়াব অমনি দুমড়ে পড়ে—

থামো, থামো। এই যে বললে মুচড়ে? মোচড়ানো আর দোমড়ানো এক নয় রাম।

আজ্ঞে, না। তা ঐ পা মুচড়ে পড়ে গেলুম বটে।

হুঁ—অন্যমনস্ক! মনে থাকে না! এই বলে, এই ভোলে। এ্যাগ্‌নস্! এপিস্ হুঁ—তার পরে?

তার পর আর কি ঠাকুরমশাই, কাল থেকেই বেদনায় পা ফেলতে পারচিনে।

এই বলিয়া লোকটা উৎসুক-চক্ষে একবার সন্ধ্যার মুখের প্রতি চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিল।

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি কহিল, বেলা হয়ে যাচ্চে, একটু আরনিকা -

আঃ—থাম্ না সন্ধ্যে। কেসটা স্টাডি করতে দে না। সিমিলিয়া সিমিলিবস্! রেমিডি সিলেক্ট করা ত ছেলেখেলা নয়! বদনাম হয়ে যাবে। হুঁ, তার পরে? বেদ্‌নাটা কি রকম বল্ দেখি রামময়?

আজ্ঞে বড্ড বেদ্‌না ঠাকুরমশাই।

আহা তা নয়, তা নয়। কি রকমের বেদ্‌না? ঘর্ষণবৎ, না মর্ষণবৎ? সূচীবিদ্ধবৎ, না বৃশ্চিক-দংশনবৎ? কন্‌কন্ করছে, না ঝন্‌ঝন্ করচে?

আজ্ঞে হা, ঠাকুরমশাই, ঠিক ওই-রকম করচে।

তা হলে ঝন্‌ঝন্ করচে। ঠিক তাই। তার পরে?

তার পরে আর কি হবে ঠাকুরমশাই, কাল থেকে ব্যথায় মরে যাচ্চি—

থামো, থামো! কি বললে? মরে যাচ্ছ?

রামময় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, তা বইকি মুখুয্যেমশাই। খুঁড়িয়ে চলচি, পা ফেলতে পারিনে—আর মরা নয় ত কি। তা ছাড়া ছোঁড়াগুলো যে বজ্জাত—কথা শোনে না, বারণ মানে না—এই তক্তাখানা নিয়েই তাদের যত খেলা। আবার কোন্‌দিন হয়ত আঁধারে পড়ে মরব দেখতে পাচ্চি। যা হয় একটু ওষুধ দিয়ে দেন ঠাকুরমশাই—ভারী বেলা হয়ে গেল!

বাবা, আর্‌নিকা দু' ফোঁটা—

প্রিয়বাবু মেয়ের প্রতি চাহিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, না মা, না! এ আর্‌নিকা কেস নয়। বিপ্‌নে হলে তাই দিয়ে দিত বটে। চার ফোঁটা একোনাইট তিরিশ শক্তি। দু'ঘণ্টা অন্তর খাবে।

সন্ধ্যা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, একোনাইট বাবা?

হাঁ মা, হাঁ। মৃত্যুভয়! মৃত্যুভয়! পড়ে মরব! সিমিলিয়া সিমিলিবস্ কিউরেণ্টার্। মহাত্মা হেরিং বলেচেন, রোগের নয়, রুগীর চিকিৎসা করবে। মৃত্যুভয়ে একোনাইট প্রধান। বিপ্‌নে হলে—হুঃ—তবু হারামজাদা চিকিৎসা করতে আসে! রামময়, শিশি নিয়ে যাও আমার মেয়ের সঙ্গে। দু'ঘণ্টা অন্তর চারবার খাবে। ও-বেলা গিয়ে দেখে আসব। ভাল কথা, পরাণে যদি এসে বলে, কৈ দেখি কি দিলে? খবরদার শিশি বার ক'রো না বলে দিচ্ছি। হারামজাদা ঢকঢক করে হয়ত সবটা খেয়ে ফেলে আবার ক্যাস্টর অয়েল রেখে যাবে। উঃ—পেটটা মুচড়ে মুচড়ে উঠচে যে!

রামময়কে ঔষধ দিতে সন্ধ্যা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ক্যাস্টর অয়েল অতখানি ত সব খেয়ে আসোনি বাবা?

নাঃ—উঃ—গাড়ুটা কই রে?

তবে বুঝি তুমি—

না—না—না—দে না শীগ্‌গির গাড়ুটা! পোড়া বাড়িতে যদি কোথাও কিছু পাওয়া যাবে! তবে থাক গে গাড়ু। বলিতে বলিতেই প্রিয়বাবু ঊর্দ্ধশ্বাসে খিড়কীর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

রামময় কহিল, দিদিঠাকরুণ, ওষুধটা তা হলে—

সন্ধ্যা চকিত হইয়া বলিল, ওষুধ? হাঁ, এই যে দিই এনে।

ওই যে তুমি বললে অর্‌নি না কি, তাই দু'ফোঁটা দিয়ে দাও দিদিঠাকরুণ—মুখুয্যেমশায়ের ওষুধটা না হয়—

সন্ধ্যা অন্তরে ব্যথা পাইয়া কহিল, আমি কি বাবার চেয়ে বেশী বুঝি রামময়?

রামময় লজ্জিত হইয়া বলিল, না—তা না—তবে মুখুয্যেমশায়ের ওষুধটা বড় জোর ওষুধ কিনা দিদিঠাকরুণ—আমি রোগা মানুষ—বরঞ্চ গিয়েই না হয় সাঁতরাদের

মেধোকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পাঠিয়ে দেব—কাল থেকে তার পেট নাবাচ্চে—দাঠাকুরের ওষুধ দিলেই ভাল হয়ে যাবে। আমাকে ঐ তোমার ওষুধটাই আজ দাও দিদিমণি।

সন্ধ্যা বিষণ্ণমুখে কহিল, আচ্ছা, এসো এই দিকে!

এই বলিয়া সে রামময়কে সঙ্গে লইয়া বারান্দা দিয়া পাশের একটা ঘরে চলিয়া গেল।

জগদ্ধাত্রী ঠাকুরঘরের জন্য এক ঘড়া জল আনিতে পুকুরে গিয়াছিলেন, বাড়ি ঢুকিয়াই জলপূর্ণ কলসীটা দাওয়ার উপর ধপ করিয়া বসাইয়া দিয়া ক্রুদ্ধস্বরে ডাক দিলেন, সন্ধ্যে?

সন্ধ্যা ঘরের মধ্যে সাড়া দিল, যাই মা।

মা কহিলেন, তোর বাবা এখনো ফেরেনি? ঠাকুরপূজো আজ তা হলে বন্ধ থাক্?

মেয়ে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, বাবা ত অনেকক্ষণ এসেচেন মা। তেল মেখে নাইতে গেছেন।

কই, পুকুরে ত দেখলুম না?

তিনি যে কোথায় ছুটিয়া গেলেন সন্ধ্যা তাহা জানিত। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আজ বোধ হয় তা হলে নদীতে গেছেন। অনেকক্ষণ হ'লো, এলেন বলে।

জগদ্ধাত্রী কিছুমাত্র শান্ত হইলেন না, বরঞ্চ অধিকতর উত্তপ্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, এঁকে নিয়ে আর ত পারিনে সন্ধ্যে, হয় উনিই কোথাও যান, না হয় আমিই কোথাও চলে যাই। বার বার বলে দিলুম, ভট্চায্যিমশাই আসতে পারবেন না, আজ একটু সকাল সকাল ফিরো। তবু এই বেলা—ঠাকুরের মাথায় একটু জল পর্য্যন্ত পড়তে পেলে না—তা ছাড়া কাল রাত্তিরে কি করে এসেচে জানিস্? বিরাট পরামাণিকের সুদের সমস্ত টাকা মকুফ করে একেবারে রসিদ দিয়ে এসেছে।

সন্ধ্যা আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া কহিল, কে বললে মা?

কেন, বিরাটের নিজের বোনই বলে গেল যে। ভাজকে নিয়ে সে পুকুরে নাইতে এসেছিল।

সন্ধ্যা একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ভাইবোনে তাদের ঝগড়া মা, হয়ত কথাটা সত্যি নয়।

মা রাগিয়া বলিলেন, কেন তুই সব কথা ঢাকতে যাস বল দিকি সন্ধ্যে? জ্বর বলে বিরাট নাপতে ডেকে নিয়ে গেচে, ওষুধ খেয়েচে, ধন্বন্তরি বলে পায়ের ধুলো নিয়েচে, জমিদার বলে, গৌরী সেন বলে ন্যাজ চুলকে দিয়েচে—তারা বলে আর হেসে লুটোপুটি! টাকা যাক, কিন্তু মনে হ'লো যেন আর ঘরে ফিরে কাজ নেই—ওই কলসীটাই আঁচলে জড়িয়ে পুকুরে ডুবে মরি। আজকাল যেন বড্ড বাড়িয়ে তুলেচে সন্ধ্যে, আমি সংসার চালাই বা কি ক'রে বল্ দিকি?

কত টাকা মা ?

কত ! দশ-বারো টাকার কম নয় বললুম ! এক মুঠো টাকা কিনা স্বচ্ছন্দে—

কথাটা তাঁহার সমাপ্ত হইতে পাইল না। প্রিয়বাবু আর্দ্রবস্ত্রে ব্যতিব্যস্তভাবে বাড়ি ঢুকিতে ঢুকিতে চেঁচাইয়া ডাকিলেন, সন্ধ্যে গামছা—গামছা—গামছাটা একবার দে দিকি মা। একোনাইট তিরিশ শক্তি –বাক্সর একেবারে কোণের দিকে—

জগদ্ধাত্রী অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, একোনাইট ঘোচাচ্চি আমি। শ্বশুরের অন্নে জমিদার সাজতে লজ্জা করে না তোমার ? কে বললে বিরাট নাপতেকে সুদ ছেড়ে দিতে ? কার জায়গায় তুমি হাড়ী-দুলে এনে বসাও ? কার জমি তুমি ‘গোচর’ বলে দান করে এসো ? চিরকাল তুমি হাড়-মাস আমার জ্বালিয়ে খেলে ! আজ, হয় আমি চলে যাই, না হয় তুমি আমার বাড়ি থেকে বার হয়ে যাও।

সন্ধ্যা তীব্রকণ্ঠে কহিল, মা, দুপুরবেলা এ-সব তুমি কি শুরু করলে বল ত ?

মা তেমনিভাবে জবাব দিলেন, এর আবার দুপুর-সকাল কি ? কে ও ? ঠাকুরপুজো সেরে উনুনের ছাই-পাঁশ দুটো গিলে যেন বাড়ি থেকে দূর হয়ে যায়। আমি অনেকে সয়েচি, আর সইতে পারব না, পারব না, পারব না !

বলিতে বলিতেই তিনি অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া দ্রুতবেগে তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

হুঁ, বলিয়া প্রিয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, বললুম তাদের জমিদার বলেই কি সুদের এতগুলো টাকা ছেড়ে দিতে পারি বিরাট ? তোরা বলিস্ কি ? কিন্তু কে কার কথা শোনে ? আর তাদেরই বা দোষ কি ? ওষুধ খাবে ত পথ্যির যোগাড় নেই। নেট্রাম দু'শ শক্তি একটা ফোঁটা দিয়ে—

সন্ধ্যার দুই চক্ষে অশ্রু টলটল্ করিতেছিল, সে অলক্ষ্যে আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, কেন বাবা তুমি মাকে না জানিয়ে এসব হাঙ্গামার মধ্যে যাও ?

আমি ত বলি যাব না—কিন্তু প্রিয় মুখুয্যে ছাড়া যে গাঁয়ে কিছুটি হবার যো নেই, তাও ত দেখতে পাই। কোথায় কার রোগ হয়েচে, কোথায় কার—

বক্তব্য সম্পূর্ণ করিতে না দিয়াই সন্ধ্যা চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ শুষ্কবস্ত্র ও গামছা আনিয়া পিতার হাতে দিয়া কহিল, আর দেরি করো না বাবা, ঠাকুরপুজোটি সেরে ফেলো। আমি আসচি।

এই বলিয়া সে তাহার ঘরে চলিয়া গেল এবং প্রিয়বাবুও মাথা মুছিতে মুছিতে বোধ করি বা ঠাকুর-ঘরের উদ্দেশেই প্রস্থান করিলেন। বলিতে বলিতে গেলেন—ইঃ—আবার যে পেটটা কামড়াতে লাগলো ! পরাণের নামে—ইঃ—

৬

যে গোলোক চাটুয্যে মহাশয়ের নামে বাঘ ও গরুতে একত্রে একঘাটে জলপান করে বলিয়া সেদিন রাসমণি বারংবার সন্ধ্যাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই হিন্দুকুলচূড়ামণি পরাক্রান্ত ব্যক্তিটি এইমাত্র তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানের পট্টবস্ত্র ও শিখাসংলগ্ন টাটকা করবী পুষ্প দেখিয়া মনে হয় অনতিবিলম্বেই তাঁহার সকালের আহ্নিক ও পূজা সারা হইয়াছে। বাহিরের লোকজন তখনও হাজির হইয়া উঠিতে পারে নাই, ভৃত্য হুঁকায় নল করিয়া তামাক দিয়া গিয়াছিল, সুডৌল ভুঁড়িটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া, অন্যমনস্ক-মুখে তাঁহাই পান করিবার আয়োজন করিতেছিলেন, এমনি সময়ে অন্দরের কবাটটা নড়িয়া উঠার শব্দে চোখ তুলিয়া বলিলেন, কে ?

অন্তরাল হইতে সাড়া আসিল, আমি। কিছু না খেয়েই যে বাইরে চলে এলেন বড় ? রাগ হ'লো নাকি ?

গোলোক কহিলেন; রাগ ? না, রাগ-অভিমান আর কার ওপর করব বল ? সে তোমার দিদির সঙ্গে সঙ্গেই গেছে ? বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, না, এখন আর কিছু খাব না। আজ গোকুল ঠাকুরের তিরোভাব—সেই সন্ধ্যার পরেই একেবারে সন্ধ্যে-আহ্নিক সেরে একটু দুধ-গঙ্গাজল মুখে দেব। এমনি করে যে কটি দিন যায়। বলিয়া আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হুঁকার নলটা মুখে দিলেন।

যে মেয়েটি নেপথ্য হইতে কথা কহিতেছিল, সে দ্বারটা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া, ঘরে আর কেহ আছে কিনা দেখিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। মেয়েটি বিধবা। দেখিতে কুশ্রী নয়, বয়সও বোধ করি চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যেই। পরিধানে মিহি সাদা ধুতি, হাতে কোন অলঙ্কার নাই, কিন্তু গলায় ইষ্টকবচ-বাঁধা একছড়া মোটা সোনার হার। একটুখানি হাসিয়া কহিল, আপনি, ওই-সব ঠাট্টা করেন, লোকে কি মনে করে বলুন ত ? তা ছাড়া আমাকে কি ফিরে যেতে হবে না ? বলিয়া পরক্ষণেই মুখখানি বিষন্ন করিয়া কহিল, যাকে সেবা করতে এলুম তিনি ত ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন, এখন ফিরে গিয়ে কি বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীকে আবার দেখতে-শুনতে হবে না ? আপনি বলুন !

গোলোক তামাক টানিতে টানিতে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সে ত বটেই। আমার সংসার অচল বলে ত আর কুটুম্বের মেয়েকে ধরে রাখা যায় না। আর তাই যদি না হবে ঘরের লক্ষ্মীই বা এ-বয়সে ছেড়ে যাবে কেন ? মধুসূদন ! বেশ, তাই যাও একটা ভাল দিন দেখিয়ে। বোনের সেবা করতে এসেছিলে, সেবা দেখিয়ে

গেলে বটে ! গ্রামে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল ।

জ্ঞানদা মৌন হইয়া রহিল । গোলোক কোঁচার খুঁট দিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া মিনিটখানেক নিঃশব্দে তামাক খাইয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন, সতী-লক্ষ্মী তাঁর দিন ফুরলো, চলে গেলেন । সেজন্য দুঃখ করিনে—কিন্তু সংসারটা বয়ে গেল । মেয়েরা সব বড় হয়েছে, যে যার স্বামী-পুত্র নিয়ে শ্বশুরঘর করচে, তাদের জন্য ভাবিনে, কিন্তু ছোঁড়াটা এবার ভেসে যাবে ।

জ্ঞানদা আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বালাই ষাট ! আপনি ও-সব মুখে আনেন কেন ?

গোলোক মুখ তুলিয়া একটু ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, না আনাই উচিত বটে, কিন্তু সমস্তই চোখের ওপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি কিনা ! মধুসূদন ! তুমিই সত্য ! ঘর-সংসারেও মন নেই, বিষয়-কর্ম্মও বিষের মত ঠেকচে । যে ক'টা দিন বাঁচি, ব্রত-উপোস করতে আর তাঁর নাম নিতেই কেটে যাবে । সেজন্যে চিন্তা নেই—একমুঠো একসন্ধ্যে জোটে ভালো, না জোটে ক্ষতি নেই কিন্তু ওই ছোঁড়াটার আখের ভেবেই—মধুসূদন ! তুমিই ভরসা !

জ্ঞানদার দুই চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল । গোলোকের স্ত্রী তাঁহার মামাত ভগিনী হইলেও সহোদরার ন্যায়ই স্নেহ করিতেন । তাই কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি জ্ঞানদাকে স্মরণ করিলে সে না আসিয়া কোনমতেই থাকিতে পারে নাই । সেই দিদি আজ মাসাধিক কাল হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাবার সময় নাকি ইহারই হাতে তাঁহার বছর-দশেকের ছেলেটিকে সঁপিয়া গিয়াছেন ।

সে করুণকণ্ঠে কহিল, কিন্তু আমি ত চিরকাল এখানে থাকতে পারিনে চাটুয্যেমশায় । লোকেই বা বলবে কি বলুন ?

গোলোক দুই চক্ষু দৃপ্ত করিয়া কহিলেন, লোকে বলবে তোমাকে ? এই গাঁয়ে বাস করে ? ইহার অধিক কথা আর তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, হওয়ার প্রয়োজনও ছিল না ।

জ্ঞানদা নিজেও ইহা জানিত, তাই সে চুপ করিয়া রহিল ।

গোলোক কহিতে লাগিলেন, আমার কথায় কথা কইলে তাকে আর কোথাও বাস করতে হবে এ গাঁয়ে হবে না । সে বড় ভাবিনে, ভাবি কেবল ছেলেটার জন্যে । সে নাকি তোমাকে বড্ড ভালবাসত, তাই মরবার সময় তার সন্তানকে তোমারই হাতে দিয়ে গেল ; কই আমার হাতে ত দিলে না ?

জ্ঞানদা কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিল, সব ত বুঝি চাটুয্যেমশায়, কিন্তু আমার বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ী যে এখনো বেঁচে রয়েছেন ? আমি ছাড়া যে তাঁদের গতি নেই !

গোলোক তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিলেন, গতি নেই ! তুমিও যেমন ! হাঁ,

মুখুয্যে বেঁচে থাকত ত একটা কথা ছিল ; কিন্তু তাকে ত চোখেও দেখনি। তের বছরে বিধবা হয়েচ—

জ্ঞানদা বলিল, হ'লাম বা বিধবা, চাটুয্যেমশাই—শ্বশুর-শাশুড়ী যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তাঁদের সেবা আমাকে করতেই হবে।

গোলোক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তবে যাও আমাদের সব ভাসিয়ে দিয়ে। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ ছোটগিন্নী—

জ্ঞানদা রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, আবার ছোটগিন্নী। বলেচি না আপনাকে, লোকে হাসি-তামাসা করে। কেন নাম ধ'রে ডাকতে কি হয় ?

গোলোক মুখখানা ঈষৎ প্রফুল্ল করিয়া বলিলেন, করলেই বা তামাসা ছোটগিন্নী। সম্পর্কটাই যে হাসি-তামাসার।

জ্ঞানদা হঠাৎ একটু হাসিয়া ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, না, তা হবে না, আপনি চিরকাল নাম ধ'রে ডেকেচেন—তাই ডাকবেন।

গোলোক কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। বলিয়া দেখিতে দেখিতে তাঁহার শ্মশ্রু-গুম্ফহীন মুখখানা বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে একটা উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া কতকটা যেন নিজের মনে বলিতে লাগিলেন, বুকের মধ্যে দিবারাত্রি হু হু করে জ্বলে যাচ্চে—হায় রে ! আমার আবার হাসি, আমার আবার তামাসা ! তবে মাঝে মাঝে—তা যাক, নাই বললুম। কেউ অসন্তোষ হয়, জীবনে যা করিনি, আজই কি তা করব ? বিষয় বিষ ! সংসার বিষ ! কবে তোমার শ্রীচরণে একটু আশ্রয় পাব ! মধুসূদন !

জ্ঞানদা ছলছল চক্ষে নীরবে চাহিয়া রহিল। গোলোক বলিতে লাগিলেন, আবার জ্বালার ওপর জ্বালা, এর ওপর দিনরাত ঘটকের উৎপাত। তারা সবাই জানে, লুকোতে পারিনে, বলি—কথা তোমাদের মানি, কুলীনের কুল কুলীনকেই রাখতে হয় এও জানি ; আবার শোকে-তাপে অকালে-অসময়ে চুলগুলো পেকেচে তাও সত্যি, কিন্তু তবু ত পাকা চুল ! এ নিয়ে আবার বিবাহ করা, আবার একটা বন্ধন ঘাড়ে করা সাজে, না মানায় ? তুমি বল না ছোটগিন্নী ?

জ্ঞানদা শুষ্ক একটুখানি হাসিয়া কহিল, বেশ ত, করুন না একটি বিয়ে।

গোলোক কহিলেন, ক্ষ্যাপা না পাগল ! আবার বিয়ে ! লক্ষ্মীর মত তুমি যার ঘরে আছ—যতই বল না, অনাথ বোনপোটাকে ভাসিয়ে যেতে পারবে না। সে মরণকালে হাতে তুলে দিয়ে গেছে—তার মান তোমাকে রাখতেই হবে, আমার আবার —কে ?

ভৃত্য মুখ বাড়াইয়া সংবাদ দিল, চোঙদারমশাই এসেচেন।

গোলোক মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন, আঃ, আর পারিনে। কাজ, কাজ,

বিষয়, বিষয়—আমার যে এদিকে সব বিষ হয়ে গেছে, তা কাকেই বা বোঝাই, কে বা বোঝে! মধুসূদন! কবে নিস্তার করবে! যা না, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আসতে বল্ গে।

ভৃত্য অন্তর্হিত হইল, জ্ঞানদাও ও-দিকে দরজার বাহিরে গিয়া চাপাকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, এ বেলা কি তা হলে সত্যিই কিছু খাবেন না?

গোলোক মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না। প্রভু গোকুল ঠাকুরের তিরোভাবের দিন একটা পর্ব্বদিন। ছোটগিন্নী, আমাদের মত সেকেলে লোকগুলো আজও এসব মেনে চলে বলেই তবু এখনো চন্দ্র-সূর্য্য আকাশে উঠচে, জোয়ার-ভাঁটা নদীতে খেলচে। মধুসূদন! তোমারই ইচ্ছা!

জ্ঞানদা কহিল, তা হোক, একটু দুধ-গঙ্গাজল মুখে দিতে দোষ নেই। একটু শীগ্‌গির করে আসবেন, আমি নিয়ে বসে থাকব। এই বলিয়া সে অন্দরের কবাট রুদ্ধ করিয়া দিল।

সম্মুখের দ্বার দিয়া ভৃত্যের পশ্চাতে একজন ভদ্র ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন, গোলোক তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, এসো চোঙদার, বসো। ভেবে মরি, একটা খবর দিতেও কি পারো না। ভুলো, যা, শূদ্রের হুকোয় শীগ্‌গির জল করে তামাক নিয়ে আয়।

বিষ্ণু চোঙদার প্রণাম করিয়া গোলোকের পদধূলি লইয়া ফরাসের একধারে উপবেশন করিয়া প্রথমে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, তারপরে কহিলেন, দম ফেলবার ফুরসুত ছিল না বড়কর্ত্তা, তা খবর! যাক, পাঁচশ আর তিনশ— এই আটশ জাহাজে তুলে দিয়ে তবে এলুম। আঃ—কি হাঙ্গামা!

দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাগল ও ভেড়া চালান দিবার গোপন কারবারে এই বিষ্ণু চোঙদার ছিল তাঁহার অংশীদার। তিন মাসের মধ্যে তিন হাজার পশু যোগান দিবার সর্ত্তে লেখাপড়া হইয়াছিল। তাই খবরটা শুনিয়া গোলোক খুশী হইলেন না। অপ্রসন্ন-মুখে বলিলেন, মোটে আটশ। কনটাক্টো ত তিন হাজারের—এখনো ঢের বাকী হে!

চোঙদার ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, ছাগল-ভেড়া কি আর পাওয়া যাচ্চে বড়কর্ত্তা, সব চালান, সব চালান—এই আটশ যোগাড় করতেই যেন জিব বেরিয়ে গেছে। তবু ত হরেন রামপুর থেকে চিঠি লিখেছে, আট-দশদিনেই আরও পাঁচ-সাতশ রেলে পাঠাচ্চে, কেবল নাবিয়ে নিয়ে জাহাজে তুলে দেওয়া। আর সময় ত তিন মাসের—হয়েই যাবে নারায়ণের ইচ্ছেয়।

গোলোক আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, তোমার উপরেই ভরসা। আমাকে ত এখন একরকম গেরস্ত-সন্ন্যাসী বললেই হয়—তোমার বৌঠাকরুণের মৃত্যুর পর থেকে টাকা-কড়ি, বিষয়-আশয় একেবারে বিষ হয়ে গেছে। কেবল ঐ নাবালক ছেলেটার জন্যে।

তা টাকায় টাকা উতোর পড়বে বলে মনে হয় না ?

চোঙদার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু টাকাটা পিটবে এবার আহম্মদ সাহেব। সাতশোর কনটাক্টো পেয়েচে—আরও বেশী পেতো, শুধু সাহস করলে না টাকার অভাবে।

গোলোক চোখের একটা ইঙ্গিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, বড় নাকি ?

চোঙদার বলিলেন, হুঁ, নইলে আমি ছেড়ে দিই!

গোলোক ডান হাতটা মুখের সম্মুখে তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, দুর্গা দুর্গা, রাম রাম! সক্কালবেলায় ও-কথা কি মুখে উচ্চারণ করতে আছে হে চোঙদার! জাতে ম্লেচ্ছ, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই, তা হাজার-দশেক টাকা মারবে বলে মনে হয়, না ?

চোঙদার কহিলেন, বেশী! বেশী!

গোলোক বলিলেন, লড়াইটা বেশীদিন চললে ব্যাটা দেখচি লাল হয়ে যাবে। তাই ত হে!

চোঙদার কহিলেন, নিঃসন্দেহ। তবে, বহুত টাকার খেলা—একসঙ্গে জোটাতে পারলে হয়।

গোলোক কহিলেন, কনটাক্টো দেখিয়ে কর্জ্জ করবে—শক্ত হবে কেন ?

চোঙদার মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, তা বটে, কিন্তু পেলে হয়। আমাকে বলছিল কিনা।

খবর শুনিয়া গোলোক উৎসুক হইয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, বলছিল নাকি ? সুদ কি দিতে চায় ?

চোঙদার কহিলেন, চার পয়সা ত বটেই। হয়ত—

এই 'হয়ত' টাকে গোলোক শেষ করিতে দিলেন না। রাগ করিয়া বলিলেন, চার পয়সা! টাকায় টাকা মারবে, আর সুদের বেলায় চার পয়সা! দশ আনা ছ আনা হয় ত, না হয় একবার দেখা করতে বোলো।

চোঙদার কিছু আশ্চর্য্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, টাকাটা আপনিই দেবেন নাকি সাহেবকে ? কথাটা কিন্তু জানাজানি হয়ে গেলে—

মুহূর্ত্তে গোলোক নিজেকে সাবধান করিয়া লইয়া একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন, রাধামাধব! তুমি ক্ষেপলে চোঙদার! বরঞ্চ, পারি ত নিষেধ করেই দেব। আর জানাজানির মধ্যে ত তুমি আর আমি। কিন্তু তাও বলি, টাকা ধার ও নেবেই, নিয়ে বাপের শ্রাদ্ধ করবে, কি বাই-নাচ দেবে, কি গরু চালান দেবে, তাতে মহাজনের কি ? এই বলিয়া তাহার মুখের প্রতি সম্মতির জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া নিজেই বলিলেন, তা নয় চোঙদার, শুধু একটা কথার কথা বলচি যে, অত খোঁজ নিতে গেলে মহাজনের চলে না; কিন্তু আমাকে ত চিরকাল দেখে আসচ, ব্রাহ্মণের ছেলে,

ধর্ম্মপথে থেকে ভিক্ষে করি সে ভালো, কিন্তু অধর্ম্মের পয়সা যেন কখনো না ছুঁতে হয়। কেবল তাঁর পদেই চিরদিন মতি স্থির রেখেচি ব'লেই আজ পাঁচখানা গ্রামের সমাজপতি! আজ মুখের একটা কথায় বামুনকে শূদ্দুর, শূদ্দুরকে বামুনের দলে তুলে দিতে পারি। মধুসূদন! তুমিই ভরসা! সেবার ভারী অসুখে জয়গোপাল ডাক্তার বললে, সোডার জল আপনাকে খেতেই হবে। আমি বললুম, ডাক্তার, জন্মালেই মরতে হবে সেটা কিছু বেশী কথা নয়, কিন্তু গোলোক চাটুয্যেকে ও-কথা যেন আর দ্বিতীয়বার না কানে শুনতে হয়। কেনারামের পুত্র হররাম চাটুয্যের পৌত্র—যাঁর একবিন্দু পাদোদকের আশায় স্বয়ং ভাঁড়াবহাটীর রাজাকেও পালকি-বেহারা পাঠিয়ে দিতে হ'ত!

চোগুদার দ্বিতীয়বার প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ও-কথা কে আর অস্বীকার করবে বলুন—ও ত পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে।

গোলোক প্রত্যুত্তরে শুধু কেবল একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

চোগুদার প্রস্থানের উপক্রম করিতে তিনি ডাকিয়া কহিলেন, আর দেখ, হরেনের কাছ থেকে এলে রেলের রসিদটা একবার দেখিয়ে যেয়ো।

চোগুদার ঘাড় নাড়িয়া কহিল, যে আজ্ঞে।

গোলোক কহিলেন, তা হলে আটশ আর পাঁচশ হ'লো! বাকী রইল সতেরশ—মাস-তিনেক সময় আছে—হয়ে যাবে, কি বল হে?

চোগুদার বলিলেন, আজ্ঞে, হয়ে যাবে বইকি।

গোলোক কহিলেন, তাই তোমাকে তখনই বলেছিলুম চোগুদার, একেবারে ওটা পুরোপুরি হাজার-পাঁচেকের কন্‌ট্রাক্টোই করে ফেল। তখন সাহস করলে না—

চোগুদার কহিলেন, আজ্ঞে, অতগুলো ছাগল-ভেড়া যদি যোগাড় না হয়ে ওঠে—

গোলক প্রতিবাদ করিলেন না, কহিলেন, তাই ভাল, তাই ভাল। ধর্ম্মপথে একের জায়গায় আধ, আধের জায়গায় সিকি হয় সেও ঢের, কিন্তু অধর্ম্মের পথে মোহরও কিছু নয়। বুঝলে না চোগুদার? মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

চোগুদার আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিলে ভগবদ্ভক্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী চাটুয্যে মহাশয় দগ্ধ হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া চিন্তিতমুখে তামাক টানিতে লাগিলেন, বিষয়কর্ম্ম বোধ করি বা বিষের মতই বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু এমনি সময়ে অন্দরের দিকের কবাটটা ঈষৎ উদ্ঘাটিত করিয়া দাসী মুখ বাড়াইয়া কহিল, মাসীমা একবার ভেতরে ডাকচেন।

গোলোক চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন বল্ ত সদু?

দাসী কহিল, একটুখানি জলখাবার নিয়ে বসে আছেন মাসীমা।

গোলোক হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, তোর মাসীর জ্বালায় আমি পারিনে সদু। পর্ব্বদিনটায় যে একবেলা উপবাস করব সে বুঝি তার সইল না! এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যাইতে যাইতে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া গেলেন, সংসারে থেকে পরকালের দুটো কাজ করার কতই না বিঘ্ন; মধুসূদন! হরি!

৪

সন্ধ্যার শরীরটা কিছুদিন হইতে তেমন ভাল চলিতেছিল না। প্রায়ই জ্বর হইত এবং পিতার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া সে যেন ধীরে ধীরে মন্দের দিকেই পথ করিতেছিল। মা বিপিন ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইবেন বলিয়া প্রত্যহ ভয় দেখাইতেছিলেন এবং ইহা লইয়া মাতায় কন্যায় একটু-না-একটু কলহ প্রায় প্রতিদিনই ঘটিতেছিল। আজ সায়াহ্নবেলায় সন্ধ্যা সম্মুখের বারান্দায় একটি খুটি ঠেস দিয়া বসিয়া মাতৃ-প্রদত্ত সাগুর বাটিটা চোখ বুজিয়া নিঃশেষ করিল এবং তাড়াতাড়ি একটি পান মুখে পুরিয়া দিয়া কোনমতে সেগুলোর ঊর্দ্ধগতি নিবারণ করিল। এই খাদ্যবস্তুটার প্রতি তাহার অতিশয় বিতৃষ্ণা ছিল, কিন্তু তথাপি না খাওয়া এবং কম খাওয়া লইয়া আর তাহার কথা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইল না। কোথাও-না-কোথাও হইতে মা যে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, ইহা সে নিশ্চয় জানিত। ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় সে একখানা বই পড়িতেছিল—তাহার খোলা পাতাটা উপুড় করিয়া তাহার কোলের উপর রাখা ছিল, সেইখানা পুনরায় হাতে তুলিয়া লইয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেই শুনিতে পাইল প্রাঙ্গণের একপ্রান্ত হইতে ডাক আসিল, খুড়ীমা, কই গো?

যে বাড়ি ঢুকিয়াছিল সে অরুণ। তাহার জামা-কাপড় এবং পরিশ্রান্ত চেহারা দেখিলেই বুঝা যায় সে এইমাত্র অন্যত্র হইতে আসিতেছে।

মুহূর্ত্তের জন্য সন্ধ্যার পাণ্ডুর মলিন মুখের উপর একটা রক্তিমাভা দেখা দিয়া গেল। সে চোখ তুলিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি বুঝি কোলকাতা থেকে আসচ অরুণদা?

অরুণ কাছে আসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, হাঁ, কিন্তু তোমাকে এমন শুকনো দেখাচ্চে কেন? আবার জ্বর নাকি?

সন্ধ্যা বলিল, ঐ-রকম কিছু একটা হবে বোধ হয়; কিন্তু তোমার চেহারাও তো খুব তাজা দেখাচ্ছে না।

অরুণ হাসিয়া কহিল, চেহারার আর অপরাধ কি? সারাদিন নাওয়া-খাওয়া

নেই—আচ্ছা প্যাটার্ন ফরমাস করেছিলে যা হোক, খুঁজে খুঁজে হয়রান। এই নাও।

এই বলিয়া সে পকেট হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া সন্ধ্যার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, খুড়ীমা কই? কাকা বেরিয়েচেন বুঝি! গেল শনিবারে কিছুতেই বাড়ি আসতে পারলাম না—তাই ওটা আনতে দেরি হয়ে গেল। কি বুনবে, পাখী-পক্ষী, না ঠাকুর-দেবতা? না গোলাপফুলের—

সন্ধ্যা কহিল, সে ভাবনার ঢের সময় আছে; কিন্তু যা আনতে সাতদিন দেরি হ'লো, তা দিতে কি ঘণ্টাখানেক সবুর সইত না? ইস্টিসান থেকে বাড়ি না গিয়ে এখানে এলে কেন?

অরুণ সহাস্যে কহিল, নাওয়া-খাওয়া ত? সে সন্ধ্যার পরে। কিন্তু ঘন ঘন এত অসুখ হতে লাগল কেন বল ত?

তাহার 'সন্ধ্যা' কথাটার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় কটাক্ষ সন্ধ্যার কর্ণমূলে আঘাত করিয়া একটুখানি রাঙা করিয়া দিল, কিন্তু যেন লক্ষ্যই করে নাই এমনিভাবে সে রাগ করিয়া কহিল, তারই বা আর বাকী কি অরুণদা? যাও, আর মিছিমিছি দেরি করতে হবে না।

প্রত্যুত্তরে অরুণ পুনরায় হাসিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নিজের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। তিনি ক্রোধে সমস্ত মুখখানা কালো করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, পানটা আর চিবোস্‌নে সন্ধ্যে, ওটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে যত পারিস্ হাসি-তামাশা কর্। বলিয়াই কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত-মাত্র না করিয়া দ্রুতপদে ঘরে চলিয়া গেলেন।

অকস্মাৎ কি যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। অরুণ বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল নির্ব্বাক হইয়া রহিল এবং সন্ধ্যা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণের জন্য সায়াহ্নের আকাশতল হইতে সমস্ত আলো যেন একেবারে নিবিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত একভাবে থাকিয়া, মুখের পান ফেলিয়া দিয়া, সহসা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিল, কেন তুমি এ-বাড়িতে আর আস অরুণদা? আমাদের সর্ব্বনাশ না করে কি তুমি ছাড়বে না?

প্রথমটা অরুণ একটা কথাও কহিতে পারিল না, তারপরে ধীরে ধীরে শুধু বলিল, মুখের পান ফেলে দিলে সন্ধ্যা—আমি কি সত্যিই তোমার অস্পৃশ্য?

সন্ধ্যা হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, তোমার জাত নেই—ধর্ম্ম নেই; কেন তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে?

আমার জাত নেই? ধর্ম্ম নেই?

না নেই। তুমি বিলেত গেছ—তুমি ম্লেচ্ছ। সেদিন মা তোমাকে পেতলের ঘটিতে জল খেতে দিয়েছিল, তোমার মনে নেই?

অরুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, না, আমার মনে নাই। কিন্তু তোমার কাছে আজ আমি অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ!

সন্ধ্যা চোখ মুছিয়া কহিল, শুধু আমার কাছে নয়, সকলের কাছে। শুধু আজ নয়, যখন থেকে কারও নিষেধ শোনোনি—বিলেতে চলে গেলে, তখন থেকে।

অরুণ কহিল, কিন্তু আমি মনে করেছিলাম—

কিন্তু কি মনে করিয়াছিল তাহা আর বলিতে পারিল না। নিমেষমাত্র স্থির থাকিয়া কহিল, আমি আর হয়ত এ-বাড়িতে আসব না, কিন্তু আমাকে তুমি ঘৃণা ক'রো না সন্ধ্যা -- আমি ঘৃণিত কাজ কখনো করিনি।

সন্ধ্যা কহিল, তোমার কি ক্ষিদে-তেষ্টা পায়নি অরুণদা? তুমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল ঝগড়াই করবে?

অরুণ কহিল, না, ঝগড়া আমি করব না। যে ঘৃণা করে, তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিবাদ করবার মত ছোট আমি নই। এই বলিয়া অরুণ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, —সন্ধ্যা সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া যেন পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় বসিয়া রহিল।

মা সুমুখে আসিয়া প্রসন্নমুখে কহিলেন, যাক, আর বোধ হয় আসবে না।

সন্ধ্যা চকিত হইয়া বলিল, না।

মা বলিলেন, খামোকা ছুঁয়ে দিলে, যা, কাপড়খানা ছেড়ে ফেল গে।

সন্ধ্যা মায়ের মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাপড়খানা পর্য্যন্ত ছেড়ে ফেলতে হবে?

তাহার ম্লানমুখের অন্তরের ছবি জননীর চোখে পড়িল না, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, হবে না? খ্রীষ্টেন মানুষ—বিধবা গিন্নী-বান্নী হলে যে নেয়ে ফেলতে হ'তো! সেদিন রাসুমাসী—হাঁ, বড়াই করে বটে—কিন্তু বিচের-আচার শিখতে হয় ত ওর কাছে। দুলে-ছুঁড়ী ছুঁলে কি ছুঁলে না, তবু নাতনীটাকে অবেলায় ডুব দিইয়েই তবে দোরে তুললে!

সন্ধ্যা কহিল, বেশ ত মা যাচ্চি।

মা ঘাড় নাড়িয়া বামনাই আচার-বিচার সম্বন্ধে বোধ হয় আরও কিছু উপদেশ দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পিছন হইতে ডাক শুনিলেন, জগো, ঘরে আছিস্ গা?

গোলোক চাটুয্যেমশায় একেবারে উঠানের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছিলেন; জগদ্ধাত্রী ফিরিয়া চাহিয়া সাড়া দিলেন, ও মা, চাটুয্যেমামা যে! কি ভাগ্য!

কিন্তু সেদিনকার রাসুমাসী ও কন্যার ঘটনাটা স্মরণ করিয়া তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। সন্ধ্যা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, গোলোক মায়ের উত্তর না দিয়া মেয়েকেই সম্ভাষণ করিলেন, সহাস্যে কহিলেন, বলি আমার সন্ধ্যে নাতনী কেমন আছিস্ গো? যেন রোগা দেখাচ্ছে না?

সন্ধ্যা বলিল, না, ভালো আছি ঠাকুর্দ্দা।

জগদ্ধাত্রী শুষ্কমুখে একটু-হাসি আনিয়া বলিলেন, হাঁ, ভালই বটে! মাস ঘুরতে চলল মামা, রোজ অসুখ, রোজ জ্বর। আজও ত সাবু খেয়ে রয়েচে।

গোলোক কহিলেন, তাই নাকি? তা হবে না কেন বাছা,—কোথায় আজ ও কাঁখে-কোলে ছেলে-পুলে নিয়ে ঘরকন্না করবে, না তোরা ওকে টাঙিয়ে রেখে দিলি! পাত্রস্থ করবি কবে? বয়স যে—

জগদ্ধাত্রী বয়সের কথাটা তাড়াতাড়ি চাপিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি করব মামা, আমি একা মেয়েমানুষ আর কতদিকে সামলাবো! তোমার জামাই গেরাহ্যি করে না—ডাক্তারি নিয়েই উন্মত্ত,—আমার এমন ধিক্কার হয় মামা, যে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শাশুড়ীর কাছে কাশীতে পালিয়ে গিয়ে থাকি। তারপরে যার যা কপালে আছে হোক।—বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ হইয়া উঠিল!

গোলোক কহিলেন, পাগলাটা এখন করচে কি?

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, তাই একেবারে বদ্ধ পাগল হ'য়ে গেলেও যে বাঁচি, ঘরে শিকল দিয়ে ফেলে রেখে দি। এ যে দুয়ের বার—জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, একেবারে খাক্ করে দিলে! এই বলিয়া তিনি চোখের কোণটা আঁচলে মুছিয়া ফেলিলেন।

গোলোক সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, তাই বটে, তাই বটে—আমি অনেক কথাই শুনতে পাই। তা তোরাও ত বাপু ধনুকভাঙ্গা পণ করে আছিস্ স্বয়ং কার্ত্তিক নইলে আর মেয়ের বিয়ে দিবি না। আমাদের ভারী কুলীনের ঘরে তা কি কখনো হয়; না, হয়েচে বাছা? শুনিস্‌নি, তখনকার দিনে কত কুলীনকে গঙ্গাযাত্রা করেও কুলীনের কুল রক্ষা করতে হ'তো? মধুসূদন, তুমিই সত্য!

জগদ্ধাত্রী ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, কে তোমাকে বলচে মামা, জামাই আমার ময়ূরে চড়ে না এলে মেয়ে দেব না? মেয়ে আগে, না কুল আগে? বংশে কেউ কখনো শূদ্দুর বলে কায়েতের ঘরে পা ধুলে না, আর আমি চাই কার্ত্তিক! ছোট ঘরে যাব না এই আমার পণ—তা মেয়ে জলে ফেলে দিতে হয় দেব।

গোলোক খুশী হইয়া বলিলেন, এই ত কথা! আচ্ছা, আমি দেখচি।

যাই যাই করিয়াও সন্ধ্যা নতশিরে আরক্ত-মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। গোলক তাহার প্রতি চাহিয়া সহাস্যে রহস্য করিয়া বলিলেন, কার্ত্তিক যখন চাসনে জগো, তখন মেয়েকে না হয় আমার হাতেই দে না! সম্পর্কেও বাধবে না, থাকবেও রাজরাণীর মত। কি বলিস্ নাতনী—পছন্দ হবে?

অন্য সময়ে সন্ধ্যা পরিহাসে যোগ দিতে পারিত, কিন্তু অরুণ হইতে আরম্ভ করিয়া পিতার প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়া পর্য্যন্ত সে ক্রোধে, দুঃখে, লজ্জায় জ্বলিয়া যাইতেছিল,

মুখ তুলিয়া কঠিনভাবে জবাব দিল, পছন্দ কেন হবে না ঠাকুর্দ্দা? দড়ির খাটের চতুর্দ্দোলায় চেপে আসবেন এই দিক দিয়ে, আমি মালা গেঁথে দাঁড়িয়ে থাকব তখন। এই বলিয়া দ্রুতপদে খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে যে ভয়ানক রাগ করিয়া গেল তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ব্যর্থ পরিহাসের এই তীব্র লাঞ্ছনায় প্রথমটা গোলোক অবাক্ হইয়া গেলেন, পরে হাঃ হাঃ করিয়া খানিকটা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন, মেয়ে ত নয়, যেন বিলিতি পল্টন! এ না হয় দাদা-নাতনী সম্পর্ক—বলতেও পারে, কিন্তু সেদিন রাম্মুর মুখে শুনলাম নাকি, যা মুখে এসেচে তাই বলেচে! মা-বাপ পর্য্যন্ত রেয়াৎ করেনি।

গোড়ায় জগদ্ধাত্রীর ঠিক এই ভয়ই ছিল, কেবল মাঝখানে আশা করিয়াছিলেন পরিহাসের মধ্য দিয়া বুঝি এবারের মত ফাঁড়া কাটিয়া গেল। হয়ত কাটিয়াই যাইত, শুধু মেয়েটাই আবার নিরর্থক খোঁচা মারিয়া বিবরের সর্পকে বাহিরে আনিয়া দিল। কন্যার প্রতি তাঁহার বিরক্তির অবধি রহিল না, কিন্তু প্রকাশ্যে সবিনয়ে কহিলেন, না মামা, সন্ধ্যা ত সে-সব কিছুই বলেনি। মাসি তিনকে ভাল করেন, সে ত তুমি বেশ জানো?

গোলোক কহিলেন, তা জানি। কিন্তু আমার কাছে করে না।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, আমি যে তখন দাঁড়িয়ে মামা?

গোলোক হাসিয়া বলিলেন, তা হলে ত আরও ভাল। শাসন করতেও বুঝি পারলিনে?

এই হাসিটুকুতে জগদ্ধাত্রী মনে মনে একটু বল পাইয়া সক্রোধে কহিলেন, শাসন? তুমি দেখো দিকি মামা, ওর কি দুর্গতিটাই আমি করি!

গোলক স্নিগ্ধভাবে বলিলেন, থাক দুর্গতি করে কাজ নেই—বিয়ে হলে, সংসার ঘাড়ে পড়লে আপনিই সব শুধরে যাবে, তবে শাসনে একটু রাখিস্। কালটা বড় ভয়ানক কিনা। অরুণ আসে আর?

জগদ্ধাত্রী ভয়ে মিথ্যা বলিয়া ফেলিলেন, অরুণ? নাঃ—

গোলোক বলিলেন, ভালই। ছোঁড়াটাকে দিস্‌নে আসতে। অনেক রকম কানাকানি শুনতে পাই কিনা!

অরুণকে সন্ধ্যা ছেলেবেলা হইতে দাদা বলিয়া ডাকে। সে বিলাত যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল, কিন্তু সে ব্রাহ্মণ বংশের এতটাই নীচের ধাপের যে, এই স্নেহ কখনও কোন কারণেই যে আর কোন আকারে রূপান্তরিত হইয়া উঠিতে পারে, এ সংশয় স্বপ্নেও মায়ের মনে ছায়াপাত করে নাই। কিন্তু কিছুদিন হইতে সন্ধ্যার আচরণে ও কথায়-বার্ত্তায় মাঝে মাঝে এমনই একটা তীব্র জ্বালা আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিত যে তাহার মুদ্রিত চক্ষেও তাহার আভাস পড়িত, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জিনিসটা এতখানিই অসম্ভব যে এ লইয়া উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন

অনুভব করিতেন না। এখন ইহারই স্পষ্ট ইঙ্গিত অপরের মুখে শুনিয়া সহসা তিনি ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। তিক্তকণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন, শুনলে, অনেক জিনিসই শোনা যায় মামা, কিন্তু আমার মেয়ের কথা নিয়ে লোকেরই বা এত মাথা-ব্যথা কেন ?

গোলোক মৃদু হাসিয়া ধীরভাবে বলিলেন, তা সত্যি বাছা ; কিন্তু সময়ে সাবধান না হলে লোকের পোড়ার মুখও যে বন্ধ করা যায় না জগো !

জগদ্ধাত্রী ইহারও প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময়েই সন্ধ্যার কাণ্ড দেখিয়া তিনি ভয়ে বিস্ময়ে ও নিদারুণ ক্রোধে নির্ব্বাক্ হইয়া গেলেন। সন্ধ্যা পুকুর হইতে স্নান করিয়া বাড়ি ঢুকিতেছিল, তাহার কাপড় ভিজা, মাথার চুলের বোঝা হইতে জল ঝরিতেছে, এখনও মুছিবার অবকাশ হয় নাই—এই অবস্থায় পাশ কাটাইয়া সে দ্রুতবেগে নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

গোলোক কহিলেন, মেয়ের জ্বর বললিনে জগো ? সন্ধ্যেবেলায় নেয়ে এল যে ?

জগদ্ধাত্রী কেবলমাত্র জবাব দিলেন, কি জানি মামা! কিন্তু মনে মনে তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, এ তাঁহারই বিরুদ্ধে অরুণের অপমানের গূঢ় সুকঠোর প্রতিশোধ।

গোলোক কহিলেন, এমন অত্যাচার করলে যে বাড়াবাড়িতে দাঁড়াবে !

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, দাঁড়ালেই বা কি করব বল ? ও আমার হাতের বাইরে।

গোলোক মাথা নাড়িতে-নাড়িতে বলিলেন, তা বুঝেচি। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি এ-বাড়ির কর্ত্তাটা কে ? তুই, না জামাই, না তোর মেয়ে ?

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, সবাই কর্ত্তা।

গোলোক কহিলেন, তা হলে তাদের বলিস্ যে, পাড়ার মধ্যে দুলে-বাগ্দী প্রজা রাখা চলবে না। তারা এর একটা ব্যবস্থা না করলে শেষে আমাকেই করতে হবে। মধুসূদন তুমিই ভরসা !

প্রত্যুত্তরে জগদ্ধাত্রী সক্রোধে ডাক দিলেন, সন্ধ্যে, এদিকে আয় !

সন্ধ্যা ঘরের মধ্যে বোধ হয় মাথা মুছিতেছিল, একটুখানি মুখ বাড়াইয়া সাড়া দিল, কেন মা ?

মা বলিলেন, দুলে মাগাদের সরাবি, না আমাকেই কাল নাইবার আগেই ঝাঁটা মেরে তাড়াতে হবে ?

সন্ধ্যা কহিল, দুঃখী অনাথা মেয়ে দুটোকে ঝাঁটা মারা ত শক্ত কাজ নয় মা, কিন্তু ওরা কি কারও কোন ক্ষতি করেচে ?

গোলোক ইহার জবাব দিলেন। কহিলেন, ক্ষতি করে বই কি। পরশু বেড়িয়ে যাবার সময় দেখি পথের ওপর দাঁড়িয়ে ছাগলটাকে ফ্যান খাওয়াচ্চে। ছিটকে

ছিটকে পড়চে ত? বলিয়া তিনি জগদ্ধাত্রীর মুখের পানে চাহিলেন।

জগদ্ধাত্রী তৎক্ষণাৎ সমর্থন করিয়া কহিলেন, পড়বে বই কি মামা।

গোলোক কহিলেন, তবে সেই বল্। না জেনে সাপের বিষ খাওয়া যায়, কিন্তু জেনে ত আর পারা যায় না!

সন্ধ্যার প্রতি চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, তোমার কাঁচা বয়স নাতনী, তুমি না হয় রাত্তিরেও নাইতে পার, কিন্তু আমি ত পারিনে।

সন্ধ্যা অন্তরের দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ চাপিয়া রাখিয়া বলিল, সে জানি ঠাকুর্দ্দা. কিন্তু বাবা যখন ওদের স্থান দিয়েচেন, তখন আর কোথাও একটা আশ্রয় না দিয়েও ত তাঁর অপমান করতে পারিনে।

মেয়ের এই মান-অপমানের ধারণায় মায়ের মুখ দিয়া রাগে কথা বাহির হইল না; কিন্তু গোলোক বলিলেন, বেশ ত, তারই বা অভাব কি সন্ধ্যা? অরুণের বাড়ির পিছনে ত ঢের জায়গা আছে, তাকেই বল না আশ্রয় দিতে। বাগদী-দুলে হোক, তবু তারা হিঁদু—তাতে তার জাত যাবে না। এই বলিয়া তিনি জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

তাঁহার রসিকতার রস-গ্রহণ জগদ্ধাত্রী যত বেশী না করুন, অরুণের কথায় পাছে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়েটা ভয়ানক কঠোর কিছু বলিয়া বসে এই ভয়ে তাঁহার উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না!

ঠিক তাহাই ঘটিল। সন্ধ্যার কণ্ঠস্বরে পরিহাসের তরলতা উছলিয়া উঠিল; কিন্তু কথাগুলা শুনাইল যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি শক্ত,—কহিল, গেলেই বা কে তার জমা-খরচ রাখচে বলুন? যে জাতই মানেই না, তার আবার যাওয়া আর থাকা!

গোলোক হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুখ তাঁহার কালো হইয়া উঠিল। বলিলেন, তোমার সঙ্গে এই সব বুঝি পরামর্শ চলে?

সন্ধ্যা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, হায়, হায়, ঠাকুর্দ্দা, সে আপনাদেরই গ্রাহ্য করে না—কুকুর-বেড়ালের সামিল মনে করে, তা আমি! এই বলিয়া সে বাদ-প্রতিবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়া চক্ষের পলকে ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

জগদ্ধাত্রী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ধমক দিয়া উঠিলেন, হতভাগী! পরের ছেলের নামে তুই মিথ্যে অপবাদ দিস। তাকে কে না জানে? সে কখনো এ-কথা বলেনি—আমি গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে বলতে পারি।

ঘরের মধ্য হইতে কোন প্রত্যুত্তর আসিল না।

গোলোক কহিলেন, না জগো, আজকালকার ছেলে-মেয়েরা সব এমনই বটে, তা বেশ, না হয় কুকুর-বেড়ালই হলুম; কিন্তু একটা কথা বলে যাই আজ, আর

মেয়ের বিয়ে দিতে দেরি করিসনে। যেথানে হোক দিয়ে ফেলে পাপ চুকিয়ে দে, চুকিয়ে দে।

জগদ্ধাত্রী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, দাও না মামা একটা দেখেশুনে। আর যে আমি ভাবতে পারিনে!

গোলোক মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, আচ্ছা, দেখি। কিন্তু কি জানিস মা, এক মেয়ে, দূরে বিয়ে দিয়ে কিছুতে থাকতে পারবিনে, কেঁদে-কেটে মরে যাবি। আমাদের অভাবের ঘরে পাত্রের বয়স দেখতে গেলে চলে না। তবে কাছাকাছি হয়, দু'বেলা চোখের দেখাটা দেখতে পাস্ ত তার চেয়ে সুখ আর নেই।

জগদ্ধাত্রী চোখ মুছিয়া করুণকণ্ঠে কহিলেন, কোথায় পাব মামা এত সুবিধে? তবে ঘর-জামাই—

গোলোক কথাটা শেষ করিতেও দিলেন না, বলিলেন, ছি ছি, অমন কথা মুখেও আনিস্‌নে জগো, ঘর-জামাইয়ের কাল আর নেই, তাতে বড় নিন্দে। আর যদিও বা একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ ধরে আনিস্, গাঁজা-গুলি আর আর মাতলামি করেই তোর যথাসর্ব্বস্ব উড়িয়ে দেবে। বলি, নিজের কথাটাই একটু ভেবে দেখ্ না।

ইহার নিহিত ইঙ্গিত অনুভব করিয়া জগদ্ধাত্রী চোখের নিমেষে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, চিরকালটাই দেখছি মামা, চিরকালটাই জ্বলে-পুড়ে মরচি।

গোলোক মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, তবে তাই বল্। বিনা কাজকর্ম্মে বসে বসে খেলেই এমনি হবে। এ কি আর তোর মত বুদ্ধিমতী বুঝতে পারে না?

জগদ্ধাত্রী আপ্যায়িত হইয়া কহিলেন, বুঝি বই কি, ভেতরে ভেতরে সব বুঝি; কিন্তু আমি মেয়েমানুষ, কোনদিকে যে কূলকিনারা দেখতে পাইনে।

গোলোক আশ্বাস দিয়া কহিলেন, পাবি, পাবি। তাড়াতাড়ি কি—দেখি না একটু ভেবে-চিন্তে। কিন্তু আজ যাই, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

জগদ্ধাত্রী মিনতি করিয়া বলিলেন, মামা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রইলে, একটু বসবে না?

গোলোক বলিলেন, না মা, সন্ধ্যে-আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্চে—আজ আর বিলম্ব করব না। এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। জগদ্ধাত্রী তাঁহাকে আগাইয়া দিতে সদর দরজার বাহির পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

৫

সকালবেলায় প্রিয় মুখুয্যেমশাই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া প্র্যাক্‌টিসে চলিতেছিলেন, বগলে চাপা একতাড়া হোমিওপ্যাথি বই, হাতে তোয়ালে-বাঁধা ঔষধের বাক্স, পিছনে পিছনে এককড়ি দুলের বিধবা স্ত্রী মিনতি করিয়া চলিয়াছিল, বাবাঠাকুর, তুমি দয়া না করলে আমরা যাই কোথাকে ?

প্রিয়র মুখ ফিরাইয়া কথা কহিবার অবকাশ ছিল না, তিনি বাঁ হাতটা পিছনে নাড়িয়া বলিয়া দিলেন, না, না, না—তোদের আর আমি রাখতে পারব না, তোরা বড় বজ্জাত। কেন তুই ছাগলকে ফ্যান খাওয়ালি ?

দুলেবৌ বিস্মিত হইয়া বলিল, সকলের প্যাঁটা-পেটি ত ফ্যান খায় বাবাঠাকুর ?

প্রিয়নাথ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, ফের মিছে কথা হারামজাদী! কারুর ছাগল ফ্যান খায় না। ছাগল খায় ঘাস।

দুলেবৌ কহিল, ঘাস খায়, পাতা-পত্তর খায়, ফ্যানও খায় বাবাঠাকুর।

প্রিয় তেমনি হাত নাড়িয়া বলিয়া দিলেন, না, না, তোদের আর আমি রাখব না, তোরা আজই দূর হ! গোলোক চাটুয্যে বলে গেছে, বামুনপাড়ায় তোরা ছাগলকে ফ্যান খাইয়েচিস্। আর তোদের ওপর আমার দয়া নেই—তোরা বড় বজ্জাত।

দুলেবৌ শেষ মিনতি করিয়া কহিল, ফ্যানটুকু কি তবে ফেলে দেব বাবাঠাকুর।

প্রিয় অসঙ্কোচে কহিলেন, হাঁ দিবি। তোদের গরু থাকত খাওয়াতিস্, দোষ ছিল না; কিন্তু এ যে ভয়ানক কথা। আজই উঠে যা বুঝলি ? উঃ—বড্ড বেলা হয়ে গেছে—সল্‌ফর দেবার সময় বয়ে যায়। বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতবেগে প্রস্থানের উদ্যম করিতেই দুলেবৌ পিছন হইতে করুণস্বরে কহিল, বাবাঠাকুর, কাল চোপ্‌পর রাত মেয়েটার পেটে লক্ষ্মীর দানাটুকু যায়নি—

প্রিয় তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কেন, কেন ? পেট নাবাচ্চে ? গা বমি বমি করচে ?

দুলেবৌ মাথা নাড়িল।

তবে কি ? পেট ফুলেচে ? ক্ষিদে নেই ?

ক্ষিদে বড্ড বাবাঠাকুর।

প্রিয় কহিলেন, ওঃ তাই বল্। সেও যে একটা মস্ত রোগ—ন্যাট্রাম, আইয়োডম্, আরও ঢের ওষুধ আছে। এতক্ষণ বলিস্‌নে কেন—দেখেশুনে যে একদাগ খাইয়ে দিতে পারতাম। চল্ দেখি

দুলেবৌ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, ওষুধ চাই না বাবাঠাকুর, দুটো চাল পেলে মেয়েটাকে ফুটিয়ে দিই—

প্রিয় ক্ষণকাল বিস্মিতের মত চাহিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, ওষুধ চাইনে চাল চাই! দূর হ হারামজাদী আমার সুমুখ থেকে। ছোটজাতের মুখে আগুন!

দুলেবৌ লজ্জিত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে প্রিয় ধমক দিয়া বলিলেন, খেতে পাস্‌নি ত সন্ধ্যের কাছে বল্ গে না।

দুলেবৌ শুধু নীরবে মুখ তুলিয়া চাহিল।

প্রিয় কহিলেন, গিন্নীর কাছে গিয়ে যেন মরিস্‌নে। ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে থাক্ গে, দিদিঠাকরুণ এলে বলিস আমার বড় ওষুধের বাক্সে একটা আট-আনি আছে দিতে। কিন্তু খবরদার বলে দিচ্চি, ব্যামো হলে আগে আমাকে ডাকতে হবে। তখন যে বিপনের কাছে গিয়ে—কে হে, ত্রৈলোক্য নাকি? ষষ্ঠীচরণ যে! বলি বাড়ির সব খবর ভাল ত?

দুলেবৌ আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল, ত্রৈলোক্য ও ষষ্ঠীচরণ সম্মুখে আসিয়া প্রাতঃ প্রণাম করিয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে খবর সব ভাল। সবাই ভাল আছে।

প্রিয় অস্ফুটে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, ভাল, ভাল। যে দিনকাল পড়েচে, আমার ত নাইবার-খাইবার সময় নেই। ঘরে ঘরে সর্দ্দি-কাশি, একটু অবহেলা করেচ কি ব্রঙ্কাইটিস। সকালেই যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

ত্রৈলোক্য কহিল, আজ্ঞে, আপনারই কাছে।

প্রিয় উৎসাহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, কেন আমার কাছে কেন?

ত্রৈলোক্য কহিল, লোকজনের চলাচলের বড় দুঃখ হচ্চে জামাইবাবু, তাই খালটার ওপরে একটা সাঁকো তৈরী করচি। আপনার ওই বৈকুণ্ঠের দরুণ ছোট বাঁশঝাড়টা না দিলে ত আর কিছু হয় না।

প্রিয় রাগ করিয়া বলিলেন, কিন্তু আমি দিতে যাব কেন? গাঁয়ে কি আর মানুষ নেই?

বুড়ো ষষ্ঠীচরণ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এইবার সে ঘাড় নোয়াইয়া আর একটা প্রণাম করিয়া বলিল, যদি অভয় দেন ত বলি জামাইবাবু, এ-গাঁয়ে আপনি ছাড়া আর মানুষ নেই। আপনি দয়া করেন ত দশজনে চলে বাঁচবে, নইলে আমরা চাষী-মানুষ কোথায় পাব বাঁশ কেনবার টাকা?

প্রিয় এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, লোকজনের কি কষ্ট হচ্ছে নাকি?

ত্রৈলোক্য কহিল, মরে যাচ্ছে বাবাঠাকুর, হাত-পা ভেঙে একেবারে মরে যাচ্ছে।

প্রিয় কহিলেন, কিন্তু গিন্নী শুনলে যে ভারী রাগ করবে।

ষষ্ঠীচরণ কহিল, আপনি দিলে মাঠাকরুণ করবেন কি? তখন না-হয় সবাই গিয়ে তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ব।

প্রিয় চিন্তিত-মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, লোকজনের কষ্ট হচ্চে, আচ্ছা নাও গে যাও—কিন্তু গিন্নী যেন শুনতে না পায়। উঃ—বড় বেলা হয়ে গেল রস্কে বাগ্দীর পরিবারটা রাত্রে কেমন ছিল কে জানে! ব্রায়োনিয়ার অ্যাক্‌শনটা—নড়লে-চড়লে ব্যথা—হতেই হবে। আচ্ছা চললুম। বলিয়া প্রিয় দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

বুড়া যষ্ঠীচরণ একটু হাসিল; কিন্তু ত্রৈলোক্য কহিল, ক্ষ্যাপাটে লোকে বলে বটে, কিন্তু খুড়ো, পাগলাঠাকুর ছাড়া গরীব-দুঃখীর দরদও কেউ বোঝে না। মন যেন গঙ্গাজলের মত সাদা। এই বলিয়া সে যেদিকে পাগলাঠাকুর অন্তর্হিত হইয়াছিল সেই দিকে মুখ করিয়া দুই হাত জোড় করিয়া একটা নমস্কার করিল।

ষষ্ঠীচরণ বলিল, হুকুম হয়ে গেল, আর দেরি নয় ত্রৈলোক্য, কাজটা শেষ করে ফেলতে পারলে হয়।

ত্রৈলোক্য ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তাই চল খুড়ো।

৬

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। অরুণ তাহার পড়িবার ঘরের মধ্যে টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া কড়িকাঠের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিল। তাহার ক্রোড়ের উপর বই খোলা, কিন্তু একটু মনোযোগ করিলেই দেখা যাইত যে, এ কেবল সন্ধ্যার অজুহাতেই পড়া বন্ধ হয় নাই, বরঞ্চ আলো যখন যথেষ্ট ছিল, তখনও ঐ বই ওখানে অমনি করিয়াই পড়িয়াছিল। বস্তুতঃ সেইদিন হইতে সে কাজেও যায় নাই, বাড়ির বাহির পর্য্যন্ত হয় নাই। এই কয়টা দিন তাহার কেবল একটা কথাই বার বার মনে পড়িয়াছে যে, একজনের কাছে সে একেবারে অস্পৃশ্য হইয়া গেছে! ঘৃণা এবং অশুচিতা এতদূরে গিয়াছে যে, তাহাকে ছুঁইয়া ফেলিলেও একজনের মুখের পান ফেলিয়া দিবার প্রয়োজন হয়।

সহসা তাহার চিন্তা বাধা পাইল। দ্বারের কাছে একটা শব্দ শুনিয়া সে চোখ নামাইয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে ওখানে?

আমি সন্ধ্যা,—বলিয়া সাড়া দিয়া সন্ধ্যা দরজা খুলিয়া চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইল।

অরুণ ব্যস্ত হইয়া পা নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একান্ত বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তুমি এখানে? এমন সময় যে? ঘরে এসে ব'সো।

সন্ধ্যা কহিল, আমার বসবার সময় নেই। আমি পুকুরে গা ধুতে এসে তোমার এখানে লুকিয়ে এসেচি। আমার একটা মান রাখবে অরুণদা?

অরুণ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, মান? তোমাদের? নিশ্চয় রাখব সন্ধ্যা।

তা আমি জানতুম, বলিয়া সন্ধ্যা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বাবার কাছে শুনলুম এ কদিন তুমি কাজে যাওনি, বাড়ি থেকে পর্য্যন্ত বেরোওনি—কেন শুনি?

আমার শরীর ভাল নেই।

সন্ধ্যা কহিল, না থাকা আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু তা নয়। বাবা তা হলে সকলের আগে সেই কথাটাই বলতেন।

অরুণ চুপ করিয়া রহিল। সন্ধ্যা নিজেও একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, কারণ আমি জানি অরুণদা; কিন্তু আমাদের বাড়িতে তুমি আর কখনো যেয়ো না।

অরুণ আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—শুধু কেবল তোমাদের বাড়িতে নয়—এ-গ্রামের বাস তুলে দিয়ে আর কোথাও যাব কি না, যেথায় বিনা দোষে মানুষে মানুষকে এত হীন, এত লাঞ্ছিত করে না—আমি সেই কথাই দিন-রাত ভাবচি।

সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, জন্মভূমি ত্যাগ করে চলে যাবে?

অরুণ বলিল, জন্মভূমিই ত আমাকে ত্যাগ করচে সন্ধ্যা। আজ তোমার কাছেও আমি এমন অশুচি হয়ে গেছি যে, তোমাকেও মুখের পান ফেলে দিতে হ'লো। এই ঘৃণা সয়েও কি আমাকে তুমি এই গ্রামে থাকতে বল?

সন্ধ্যা নিরুত্তরে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। অরুণ কহিল, আচারের নাম দিয়ে এই চিরাগত সংস্কার তোমাদের মনটাকে হয়ত আর স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না. কিন্তু যেখানে করে, সেখানের মানুষের হাত থেকে মানুষের এই লাঞ্ছনা মানুষকে যে বেদনায় কতদূর বিদ্ধ করতে পারে, এই কথাটা যে একদিন আমাকে এমন করে অনুভব করতে হবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু এ লাঞ্ছনা কি তুমি নিজেই টেনে আনোনি অরুণদা?

অরুণ কহিল, কি জানি। কিন্তু, আচ্ছা সন্ধ্যা, প্রায়শ্চিত্ত করলে কি এর কোন উপায় হয় বলতে পার?

সন্ধ্যা বলিল, হতে পারে, কিন্তু একদিন আত্মমর্য্যাদা হারাবার ভয়ে তুমি রাজী হওনি —আবার আজ যদি নিজেই তাকে বিসর্জ্জন দাও ত, আমি বলি অরুণদা, তুমি আর যাই কর, এখানে আর থেকো না।

অরুণ কহিল, কিন্তু তোমার ঘৃণা যে সেখানেও আমাকে টিকতে দেবে না!

কিন্তু তাতেই বা তোমার কতটুকু ক্ষতি-বৃদ্ধি?

অরুণ কহিল, সন্ধ্যা! এ-কথা তুমিও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলে?

সন্ধ্যা বলিল, তুমি যে আমার লজ্জার, আমার সঙ্কোচের আবরণটুকু রাখতে

দিলে না অরুণদা! আভাসে ইঙ্গিতে তোমাকে কতবার জানিয়েচি, সে কিছুতেই হয় না, তবুও তোমার ভিক্ষার জবরদস্তি যেন কোনমতেই শেষ হতে চায় না। বাবা রাজী হতে পারেন, মাও ভুলতে পারেন, কিন্তু আমি ভুলতে পারিনে, আমি কত বড় বামুনের মেয়ে!

অরুণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, আর আমি?

সন্ধ্যা বলিল, তুমিও আমার স্বজাতি—কিন্তু তবুও বাঘ আর বেড়াল ত এক নয় অরুণদা! কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজেই যেন মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

অরুণ আর কথা কহিল না, কেবল তাহার মুখের উপর হইতে নিজের বিস্মিত ব্যথিত চোখ দুটি সরাইয়া লইল।

সন্ধ্যা জোর করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তুমি যেখানেই যাও না অরুণদা, আমাকে কিন্তু সহজে ভুলতে পারবে না। অনেককাল তোমার মনে থাকবে, বার বার এত অপমান তোমাকে কেউ করেনি।

অরুণ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যেজন্যে এসেছিলে তা ত এখনো বলনি?

সন্ধ্যা প্রত্যুত্তরে শুধু একটু হাসিল। এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, পৃথিবীতে আশ্চর্য্যের আর অন্ত নেই। তারপরে কি একটা বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া কহিল, অথচ আমার মান তুমি না রাখলে পৃথিবীতে আর কেউ রাখবার নেই। এ তোমার বিশ্বাস হয় অরুণদা?

অরুণ শুধু নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যা কহিল, এককড়ি দুলের বিধবা স্ত্রীকে আর তার মেয়েকে এককড়ির বাপ তাড়িয়ে দিয়েচে, কিন্তু আমার বাবা তাদের ডেকে এনেচেন। আমি দিয়েচি তাদের আশ্রয়।

কোথায়?

আমাদের পুরানো গোয়াল-ঘরে। কিন্তু বামুনপাড়ার মধ্যে তারা থাকতে পারে না।

অরুণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

সন্ধ্যা বলিল, কেন কি। তারা যে দুলে। তারা আমাদের পুকুরঘাট থেকে খাবার জল নেয়, তারা পথের ওপর ছাগলকে ফ্যান খাওয়ায়—গোলোকঠাকুর্দ্দা না জেনে পাছে মাড়িয়ে ফেলে—মা প্রতিজ্ঞা করেচেন কাল সকালে তাদের ঝাঁটা মেরে বিদায় করে তবে স্নান করবেন। তুমি তাদের স্থান দাও অরুণদা—তাদের কিছু নেই—তারা একেবারে নিরাশ্রয়।

অরুণ কহিল, বেশ, কিন্তু কোথায় স্থান দেব?

সন্ধ্যা বলিল, তা আমি জানিনে—যেখানে হোক। তুমি ছাড়া আর আমি কাকে গিয়ে বলব?

অরুণ একটু ভাবিয়া বলিল, আমার উড়ে মালীটা বাড়ি চলে গেছে—তার ঘরটাতে কি তারা থাকতে পারবে? না হয় একটু-আধটু সারিয়ে দেব।

সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিল না, কেবল আধোমুখে মাথা নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

অরুণ কহিল, তা হলে তাদের পাঠিয়ে দাও গে। মালীটা ফিরে এলে তার অন্য ব্যবস্থা করে দেব।

সন্ধ্যা ইহারও জবাব দিতে পারিল না। তেমনি নত-নেত্রে থাকিয়া বোধ হয় আপনাকে সামলাইতে লাগিল। তারপর আস্তে আস্তে বলিল, এখন আমার মুখেও পান নেই, গা-ধুতেও এসেছিলাম। এই সময়ে তোমাকে একটু প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে যাই। এই বলিয়া সে গড় হইয়া নমস্কার করিয়া তাহার পায়ের ধুলো মাথায় দিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অরুণ তাহাকে ফিরিয়া ডাকিবার, বা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিল না, কেবল সেইদিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

৭

বোধ করি দিন-দুই পরে হইবে, জগদ্ধাত্রী তাঁহার পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলেন, পথের মধ্যে রাসমণি দেখা দিলেন। তাঁহার সমস্ত চোখমুখ উত্তেজনা ও আগ্রহের আতিশয্যে কাঁদ কাঁদ হইয়া উঠিয়াছে; কাছে আসিয়া গদগদ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, জগো, মা আমার, তোর পাগলি মেয়েটা কি শেষে এমন তপিস্তেই করেছিল! অ্যাঁ, এ যে স্বপনের অতীত!

জগদ্ধাত্রী কিছুই বুঝিলেন না, কিন্তু এর মুখে কেবল মেয়েটার নাম শুনিয়াই মনে মনে ভয় পাইলেন। উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েচে মাসী। কি করেচে সন্ধ্যে?

রাসমণি বলিলেন, যা করেচে তা পৃথিবীতে কোন্ মেয়ে কবে করেচে শুনি? যা, ভিজে কাপড়ে, ভিজে চুলে গিয়ে শ্রীধরকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার কর্ গে। পঞ্চাননের আর বিশালাক্ষির থানে পুজো পাঠিয়ে দে গে। কিন্তু আমাকে বাছা, ইষ্টিকবজখানি গলায় ধারণ করতে একটি সরু সোনার গোট করিয়ে দিতে হবে, তা কিন্তু আগে থেকে বলে রাখচি।

জগদ্ধাত্রী আকুল হইয়া কহিলেন, কি হয়েছে মাসী? খুলে না বললে বুঝব কি করে?

রাসমণি একটু হাসিয়া বলিলেন, খুলে বলতে হবে? তবে বলি। তোরা মায়ে-ঝিয়ে ঢের পুণ্যি করেছিলি, নইলে এ কখনো হয় না। ভেবে মরছিলি মেয়েটার বিয়ে দিবি কি করে,—এখন যা—একেবারে রাজার শাশুড়ী হয়ে ব'স্ গে।

কথা শুনিয়া জগদ্ধাত্রী দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাসমণি সদয়কণ্ঠে কহিলেন, তোর একার দোষ নেই জগো, শুনে আমিও অমনি করে চেয়েছিলুম, মনে হ'লো বুঝি-বা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখচি।

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, খুলে বল না মাসী কি হয়েচে? আমি যে আকাশ-পাতাল ভেবে মরে গেলুম।

রাসমণি তখন জগদ্ধাত্রীর বাম বাহুটা নিজের মুঠার মধ্যে গ্রহণ করিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেন, কথাটা গোপনে রাখিস্ মা, আহ্লাদে এখুনি জানাজানি করে ফেলিস্‌নে—ভাঙ্‌চি পড়ে যেতে পারে। আমাকে ছাড়া নাকি চাটুয্যেদাদা আর জন-প্রাণীকে বিশ্বাস করেন না, তাই সকালেই ডেকে আমাকে বললেন, রাসু, জগদ্ধাত্রীকে খবরটা দিয়ে এসো গে দিদি। তার মেয়ের জন্যে আর ভেবে মরতে হবে না—আমার হাতেই সঁপে দিয়ে একেবারে রাজার শাশুড়ী হয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে ঘরে বসুক গে। মনে ভাবলাম, আমারও বৈকুণ্ঠপুরী শূন্য খাঁ খাঁ করচে—ছেলেটাও মানুষ হচ্ছে না—যাক, এক কাজে দু'কাজ হবে। একটা ব্রাহ্মণের কুলরক্ষাও করা হবে, গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়েই থাকবে। তাদেরও ত সবেমাত্র ওই মেয়েটি—

কিন্তু কথাটাকে তিনি রাজার ভাবী শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া আর শেষ করিতে পারিলেন না। শুনিতে শুনিতে জগদ্ধাত্রী একেবারে যেন কাঠ হইয়া গিয়াছিলেন।

রাসমণি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, কি হ'লো রে জগো?

জগদ্ধাত্রী নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, নাঃ মাসী, গোলোকমামা তোমাকে তামাশা করেচেন।

তামাশা কি লো? এতটা বয়স হ'লো তামাশা কাকে বলে জানিনে? তা ছাড়া ভাই-বোনে তামাশা?

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, তামাশা বই কি মাসী। একি কখন হতে পারে?

রাসমণি একটু হাসিলেন, বলিলেন তা সত্যি বাছা—আমারও প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল বুঝি-বা স্বপনই দেখচি। কিন্তু পরেই বুঝলাম, না, জেগেই আছি। মেয়েটার অদৃষ্ট বটে! নইলে কুলীনের মেয়ের ভাগ্যে এ কেউ

কখনো দেখেচে না শুনেচে। আশীর্ব্বাদ করি জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে থাক্, কিন্তু যা-যা বলে দিলুম আজকেই কর গে বাছা। আর কথাটা না যেন পাঁচ-কান হয়। আগে ভালোয় ভালোয় আশীর্ব্বাদটা হয়ে যাক।

জগদ্ধাত্রী বাক্‌শূন্য হইয়া রহিলেন।

রাসমণি পুনশ্চ কহিলেন, এই সামনের অঘ্রাণের পরেই নাকি এক বচ্ছর অকাল। আমার চাটুয্যেদাদার ইচ্ছেটা—, বলিয়া একটুখানি তিনি মুচকি হাসিয়া কহিলেন, আর হবে নাই বা কেন বল্? মেয়ে যে একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমে। দেখলে মুনির মন টলে যায়, তা আবার গোলোক চাটুয্যে! বলিয়া সহাস্যে জগদ্ধাত্রীর বাহুর উপরে একটু আঙুলের চাপ দিয়া কহিলেন, যাও মা, ভিজে কাপড়ে আর দাঁড়িয়ো না আমিও যাই, বেলা হয়ে গেল—ও-বেলা আবার তখন আসব, ঢের কথা আছে।

এই বলিয়া তিনি আর সময় নষ্ট না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

জগদ্ধাত্রী অনেকটা যেন টলিতে টলিতে বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুর-ঘরের বারান্দার উপর জলপূর্ণ কলসীটাকে ধপ করিয়া রাখিয়া দিয়া সিক্ত বস্ত্রে সেইখানেই বসিয়া পড়িতে তাঁহার দুই চক্ষু তপ্ত অশ্রুতে ভরিয়া গেল!

তাঁহার ওই একমাত্র সন্তান। তাঁহার বড় আদরের সন্ধ্যা রূপে ও গুণে যথার্থই লক্ষ্মীর প্রতিমা, সেই প্রতিমার বিসর্জ্জনের আহ্বান আসিল গোলোক চাটুয্যের নরককুণ্ডে। যে গোলোক কন্যার মাতামহের অপেক্ষাও বয়োজ্যেষ্ঠ, তাহারই হাতে সমর্পন করার চেয়ে যে তাহার মৃত্যু ভাল, এ তাঁহার বুকের মধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু মুখ দিয়া 'না' কথাটাও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজেও নাকি ব্রাহ্মণ কুলীনেরই মেয়ে—সমাজে এবং পরিবারে ইহা যে কিছুই বিচিত্র নয়—ইহার চেয়েও বহুতর দুর্গতি নাকি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—তাই নিজের মেয়ের কথা স্মরণ করিয়া অন্তরটা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে থাকিলেও, ইহাকে অসম্ভব বলিয়া নিবাইয়া ফেলিবার একবিন্দু জল কোনদিকে চাহিয়া খুঁজিয়া পাইলেন না। একাকী বসিয়া নিঃশব্দে কেবলই অশ্রু মুছিতে লাগিলেন, এবং কেবলই মনে হইতে লাগিল, অচির-ভবিষ্যতে হয়ত ইহাই একদিন সত্য হইয়া উঠিবে—হয়ত এই মানুষটার দুর্জ্জয় বাসনাকে বাধা দিবার কোন উপায় তিনি খুঁজিয়া পাইবেন না। উহার সেদিনকার সকৌতুক রহস্যালাপের কথাগুলাই তাঁহার ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবলই স্মরণ হইতে লাগিল— তাঁহার মধ্যে যে এতখানি গরল গোপন ছিল, তাহা কে সন্দেহ করিতে পারিত!

সদর দরজা দিয়া সন্ধ্যা একখানা চিঠি পড়িতে পড়িতে এক-পা এক-পা করিয়া প্রবেশ করিল। পড়া বোধ হয় তখনও শেষ হয় নাই, কোনদিকে না চাহিয়াই ডাক দিল, মা, মা-গো?

জগদ্ধাত্রী তাড়াতাড়ি চোখ দুটি মুছিয়া সাড়া দিলেন, কেন মা ?

তাঁহার ভারী গলার আওয়াজে সন্ধ্যা চমকিয়া মুখ তুলিল, ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে মা ?

জগদ্ধাত্রী কন্যার তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কিছুই ত হয়নি মা।

সন্ধ্যা আরও নিকটে আসিয়া নিজের অঞ্চলে মায়ের অশ্রুজল সযত্নে মুছাইয়া দিয়া করুণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আবার বাবা কি আজ কিছু করেচেন মা ?

জগদ্ধাত্রী শুধু বলিলেন, না।

মেয়ে তাহা বিশ্বাস করিল না। আস্তে আস্তে জননীর পাশে বসিয়া কহিল, সংসারে সব জিনিস মানুষের মনের মত হয় না মা। সবাই ত আমার বাবাকে পাগলা ঠাকুর বলে ডাকে, তুমিও কেন তাঁকে তাই মনে ভাবো না।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, তারা ভাবতে পারে তাঁদের কোন লোকসান নেই—কিন্তু আমার মত কাউকে ত জ্বালা পোহাতে হয় না সন্ধ্যে!

এই জ্বালা যে কি এবং তাঁহার জন্যে কাহাকে যে কোথায় যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, ইহা সে কোনদিন ভাবিয়া পাইত না, আজও পাইল না এবং এই তাহার নিরীহ, নির্ব্বিরোধ পরদুঃখকাতর অল্পবুদ্ধি পিতার দুঃখে তাহার চিত্ত স্নেহে ও সমবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া চোখ দুটি ছলছল করিয়া আসিল; কহিল, আমার যদি সাধ্য থাকত মা, তা হলে বাবাকে নিয়ে আমি বনেজঙ্গলে পাহাড়-পর্ব্বতে এমন কোথাও চলে যেতেম, পৃথিবীর কাউকে তাঁর জন্যে আর জ্বালা সইতে হ'তো না।

জগদ্ধাত্রী তাঁহার কন্যার চিবুক হইতে তাড়াতাড়ি হাত দিয়া চুম্বন গ্রহণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, বালাই! ষাট! কিন্তু আমি যেন তোর সৎমা। তাঁর অর্দ্ধেকও তুই যদি আমাকে ভালোবাসতিস্ সন্ধ্যে।

সন্ধ্যা কহিল, তোমাকে কি ভালোবাসিনে মা ?

মা বলিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে তোর যেন সারা প্রাণটা পড়ে আছে—পায়ে কাঁকরটি না ফোটে এমনি তোর ভাব। তুই বেশ জানিস তাঁর ওষুধে কিছু হয় না, তবু তুই প্রাণটা দিতে বসেচিস, কিন্তু আর কারও ওষুধ খাবিনে—পাছে তাঁর লজ্জা হয়। এ-সব কি আমি টের পাইনে সন্ধ্যে!

সন্ধ্যা দুই হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিল, তাই বই কি! বাবার মত ডাক্তার কি কোথাও আছে নাকি!

মা বলিলেন, নেই সে কথা সত্যি।

সন্ধ্যা রাগ করিয়া বলিল, যাও—তোমাকে ঠাট্টা করতে হবে না। মানুষের অসুখ বুঝি একদিনেই ভাল হয়ে যায়? আমি ত আগের চেয়ে ঢের সেরে উঠেচি।

এই বলিয়াই এ প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া কহিল, দুলেবৌরা উঠে গেছে মা। বাঁচা গেছে।

কখন গেল ?

কি জানি ! বোধ হয় ভোরে উঠেই চলে গেছে।

তাহার কৃত্রিম ঔদাসীন্য মাকে ভুলাইতে পারিল না। তিনি প্রশ্ন করিলেন, কোথায় উঠে গেল জানিস ?

সন্ধ্যা তেমনি তাচ্ছিল্যভরে কহিল, অরুণদার ওই পিছনের বাগানটাতে বুঝি। তার উড়ে মালীর একটা ভাঙা পোড়ো-ঘর ছিল না ? তাতেই বোধ হয়।

জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, অরুণের কাছে কে তাদের পাঠালো ? তুমি বুঝি ?

সন্ধ্যা মনে মনে বিপদগ্রস্ত হইয়া কোনমতে সোজা মিথ্যাটা বাঁচাইয়া বলিল, অরুণদার কাছে আমি কেন তাদের পাঠাতে যাব মা ? আমি কাউকে কারো কাছে পাঠাইনি।

এই বলিয়া সে নিরতিশয় বিশ্রী প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি উল্টাইয়া দিয়া হাতের চিঠিটা মেলিয়া ধরিয়া কহিল, আসল কথাটাই তোমাকে এখনো বলা হয়নি মা। আমার সন্ন্যাসিনী ঠাকুরমা এবার কাশী থেকে সত্যি সত্যিই আসবেন লিখেচেন। তিনি ত কখনো মিথ্যা বলেন না মা—এবার বোধ হয় তাঁর দয়া হয়েচে।

জগদ্ধাত্রী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মার চিঠি ?—কবে আসবেন লিখেচেন ?

তাঁহার কাশীবাসিনী সন্ন্যাসী শ্বশ্রূ কাশী ছাড়িয়া একটা দিনের জন্যও কোথাও যাইতে চাহিতেন না। এবার জগদ্ধাত্রী তাঁহাকে অনেক করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাঁহার একমাত্র পৌত্রীর বিবাহে তাঁহাকে কেবল উপস্থিত হওয়া নয়, কন্যা দান করিতে হইবে। শাশুড়ী দান করিতে কোনমতেই সম্মত হয় নাই, কিন্তু যথাসময়ে উপস্থিত হইবেন বলিয়া জবাব দিয়াছেন।

সন্ধ্যা নিজের বিবাহের কথায় লজ্জা পাইয়া বলিল, তোমার চিঠির জবাব তুমি পড় না মা। বলিয়া কাগজখানি মায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া হঠাৎ ব্যগ্র হইয়া কহিল, ও মা, তুমি যে এখন পর্য্যন্ত ভিজে কাপড়েই রয়েচো—যাই তোমার শুক্‌নো কাপড়খানা দৌড়ে নিয়ে আসি। এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

জগদ্ধাত্রী চিঠিখানি মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন, বৌ বলে এতকাল পরে কি সত্যিই দয়া হ'লো মা! বলিয়া উঠিয়া তিনিও ধীরে ধীরে ঠাকুরঘরের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন—অকস্মাৎ তাঁহার স্বামী অত্যন্ত সোরগোল করিয়া বাড়ি ঢুকিলেন। তিনি বলিতেছিলেন—দুটো দিন যাইনি, দুটো দিন দেখিনি, অমনি হাইপোকণ্ড্রিয়া ডেভেলপ করেচে !

স্বামীর সহিত জগদ্ধাত্রীর বড় একটা কথা হইত না, কিন্তু তাঁহার এই অতি-ব্যস্ততা এবং বিশেষ করিয়া বেলা বারোটার পূর্ব্বে আজ অকস্মাৎ প্রত্যাবর্ত্তন দেখিয়া তিনি

মনে মনে কিছু বিস্মিত হইলেন। মুখ তুলিয়া শ্রান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার কি হয়েচে?

প্রিয় কহিলেন, অরুণের। ঠিক হাইপোকণ্ড্রিয়া! আমি যা ডায়াগনোস্ করব, কারুর বাবার সাধ্যি আছে কাটে? কৈ, বিপ্‌নে বলুক ত এর মানে কি!

অন্য সময়ে জগদ্ধাত্রী বোধহয় আর দ্বিতীয় কথা কহিতেন না, কিন্তু অরুণের নাম শুনিয়া কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন, কহিলেন, কি হয়েছে অরুণের?

প্রিয় কহিলেন, ঐ ত বললুম গো। বিপ্‌নেই বুঝবে না, তা তুমি। তবু তা সে যা হোক একটু প্র্যাক্‌টিস্-ফ্রাক্‌টিস্ করে। জিনিসপত্র বাঁধা হচ্ছে—বাড়ি ঘর-দোর-জমি-জায়দাদ বিক্রী হবে—হারাণ কুণ্ডুকে খবর দেওয়া হয়েচে—ভাগ্যে গিয়ে পড়লুম। যেদিকে যাব না, যেদিকে একদিন নজর রাখব না, অমনি একটা অঘটন ঘটে বসবে! এমনি করে আমার ত প্রাণ বাঁচে না বাপু। সন্ধ্যে! কোথা গেলি আবার? ধাঁ করে মেটিরিয়া-মেডিকাখানা নিয়ে আয় ত মা, একটা রেমিডি সিলেক্ট করে তারে খাইয়ে দিয়ে আসি।

যাই বাবা, বসিয়া সাড়া দিয়া একখানা মোটা বই হাতে সন্ধ্যা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

জগদ্ধাত্রী রাগ করিয়া কহিলেন, পায়ে পড়ি তোমার, খুলেই বল না ছাই কি হয়েচে অরুণের?

প্রিয় চমকিয়া উঠিলেন, তারপরে বলিলেন, আহা হাইপো—মানসিক ব্যাধি। আজকালের মধ্যেই সে দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়—হারাণ কুণ্ডুকে সমস্ত বেচে দিয়ে। তা হবে না, হবে না—ওসব হতে আমি দেব না। একটি ফোঁটা দু'শ শক্তির—

সন্ধ্যা বিবর্ণ নতমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। জগদ্ধাত্রী ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, বাড়ি-ঘর বিক্রী করে চলে যাবে অরুণ? সে কি পাগল হয়ে গেল?

প্রিয় হাতখানা সুমুখে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, উঁহু, তা নয়, তা নয়। নিছক হাইপোকণ্ড্রিয়া! পাগল নয়—তারে বলে ইন্‌স্যানিটি। তার আলাদা ওষুধ। বিপ্‌নে হলে তাই বলে বসত বটে, কিন্তু—

জগদ্ধাত্রী কটাক্ষে একবার মেয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া লইলেন এবং স্বামীর অনর্গল বক্তৃতা সহসা দৃঢ়কণ্ঠে থামাইয়া দিয়া অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, তোমার নিজের কথা আমার শোনবার সময় নেই! অরুণ কি দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাচ্চে?

প্রিয় বলিলেন, চাইচে? একেবারে ঠিকঠাক। কেবল আমি গিয়ে

ফের আমি? অরুণ কবে যাবে?

প্রিয় থতমত খাইয়া বলিলেন, কবে? আজও যেতে পারে, কালও যেতে পারে, শুধু হারাণ কুণ্ডু ব্যাটা—

জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, হারাণ কুণ্ডু সমস্ত কিনবে বলেচে?

প্রিয় বলিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়। সে ব্যাটা ত কেবল ওই চায়। জলের দামে পেলে—

জগদ্ধাত্রী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, এ কথা গ্রামের আর কেউ জানে?

প্রিয় বলিলেন, কেউ না, জনপ্রাণী নয়। কেবল আমি ভাগ্যে—

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, তোমার ভাগ্যের কথা জানবার আমার সাধ্য নেই। তুমি শুধু তাকে একবার ডেকে দিতে পার? বলবে, তোমার খুড়ীমা এখ্খুনি একবার অতি অবশ্য ডেকেচেন।

সন্ধ্যা এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটি কথাও কহে নাই, নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, এইবার সে চোখ তুলিয়া চাহিল। তাহার মুখ অতিশয় পাণ্ডুর এবং কথা কহিতে গিয়া ওষ্ঠাধরও কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পরেই সে দৃঢ়স্বরে বলিল, কেন মা তাকে তুমি বার বার অপমান করতে চাও? তোমার কাছে তিনি কি এমন অপরাধ করেচেন শুনি।

জগদ্ধাত্রী ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, কে তাকে অপমান করতে চাইচে সন্ধ্যে?

সন্ধ্যা কহিল, মা, তুমি কখ্খনো তাঁকে এ বাড়িতে ডেকে পাঠাতে পারবে না।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, ডেকে দুটো ভাল কথা বলতেও কি দোষ?

সন্ধ্যা বলিল, ভাল হোক, মন্দ হোক, তিনি থাকুন বা যান, বাড়ি বিক্রী করুন বা না করুন, আমাদের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ যে, এ তুমি বলতে যাবে? এ-বাড়িতে যদি তুমি তাঁকে ডেকে আনো মা, আমি তোমারই দিব্যি করে বলচি, ঐ পুকুরের জলে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে মরব! বলিতে বলিতেই সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল, জননীর প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা মাত্র করিল না।

দুঃসহ বিস্ময়ে জগদ্ধাত্রী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—কেবল প্রিয়বাবু চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা বইখানা দিয়ে যা না ছাই! বেলা হয়ে গেল, একটা রেমিডি সিলেক্ট করে ফেলি, সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা ফিরিয়া আসিয়া হাতের বইটা পিতার পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল, তিনি সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ঔষধ-নির্ব্বাচনে মনোনিবেশ করিলেন।

জগদ্ধাত্রী কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, তুমি মেয়ের বিয়ে দিবে না ঠিক করেচ?

প্রিয় কাজ করিতে করিতে বলিলেন, দেব না? নিশ্চয়ই দেব।

কবে দেবে? শেষে একটা কিছু হয়ে গেলে দেবে?

হুঁ।

জগদ্ধাত্রী একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া কহিলেন, রসিকপুরে যাও না একবার?

প্রিয় খোলা পাতার একটা স্থান আঙুল দিয়া চাপিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন,

কহিলেন, রসিকপুরে? কার কি হয়েচে? কেউ খবর দিয়ে গেছে নাকি? কখন দিয়ে গেল?

জগদ্ধাত্রী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জয়রাম মুখুয্যের নাতির সঙ্গে যে বিয়ের একটা কথা হয়েছিল, যাও না, গিয়ে একবার পাত্রটিকে দেখেই এসো মা।

প্রিয় কহিলেন, কিন্তু যাই কখন? দেখলে ত, একটা বেলা না থাকলে কি কাণ্ড হয়ে যায়। অরুণের ওই দশা, আবার চাটুয্যেমশায়ের ওখান থেকে খবর দিয়ে গেছে তাঁর শালীর নাকি ভারী অসুখ।

জগদ্ধাত্রী কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কার, জ্ঞানদার অসুখ? কি হ'ল আবার তার!

প্রিয় বলিলেন, অম্বল! অম্বল! থাবার দোষে অজীর্ণ রোগ। কেবল গা বমি-বমি—অরুণের ওখান থেকে ফিরে গিয়ে একটা ফোঁটাই—

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, তাঁদের ওষুধ দেবার ঢের লোক আছে। তোমার পায়ে পড়ি, একবার যাও রসিকপুরে। পাত্রটিকে একবার দেখে এসে যা হোক করে মেয়েটার একটা উপায় কর।

গৃহিণীর অশ্রুবিকৃত কণ্ঠস্বর বোধ করি প্রিয়বাবুকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিল। কহিলেন, কিন্তু পাত্রটি যে শুনি ভারী বকাটে! কেবল নেশা-ভাঙ—

জগদ্ধাত্রী আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, করুক নেশা-ভাঙ, হোক গে বকাটে, তবু মেয়েটা দু'দিন নোয়া-সিঁদুর পরতে পাবে! তুমি কি? তোমার হাতে আমার বাপ-মা যদি মেয়ে দিতে পেরে থাকেন, তুমিই বা পারবে না কেন?

এই বলিয়া তিনি অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

প্রিয় অবাক্ হইয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তাহার পরে বইখানা মুড়িয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, দু'দুটো সাঙ্ঘাতিক রুগী হাতে—এমনধারা করলে কি রেমিডি সিলেক্ট করা যায়! বলিয়া পুনশ্চ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বইটা বগলে চাপিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

৮

স্নান, পূজাহ্নিক এবং যথাবিহিত সাত্ত্বিক জলযোগাদি সমাপনান্তর মূর্ত্তিমান ব্রাহ্মণের ন্যায় চাটুয্যেমহাশয় ধীরে ধীরে নীচে অবতরণ করিলেন, এবং বোধ হয় সোজা বাহিরেই যাইতেছিলেন, হঠাৎ কি মনে করিয়া পাশের বারান্দাটা ঘুরিয়া

ভাঁড়ার-ঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ উদ্বেগে পরিপূর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আঁ, এসব কি হচ্চে বল দিকি ছোটগিন্নী? অসুখ শরীরে গৃহস্থালীর ছাই-পাঁশ খাটুনিগুলো কি না খাটলেই নয়? তাই আমি বলি! আচ্ছা, দেহ আগে, না কাজ আগে?

জ্ঞানদা বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতেছিল, কুটিতেই লাগিল। তাহার কাষ্ঠ পাদুকার বিকট খটাখট্ শব্দও যেমন তাহার কানে যায় নাই, তাঁহার উৎকণ্ঠিত অনুযোগও তেমনি যেন তাহার কানে গেল না।

গোলোক একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিলেন, ব্যাপার কি? আজ সকালে, আছ কেমন?

জ্ঞানদা মুখ তুলিল না, হাতের বেগুনটার প্রতি চোখ রাখিয়াই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ভালো!

গোলোক অতিশয় আশ্বস্ত হইলেন, কহিলেন, ভালো, ভালো। আমি জানি কিনা, প্রিয় হোক খ্যাপা পাগলা, কিন্তু ওষুধ দেয় যেন ধন্বন্তরী। কিন্তু যেমন বলে যাবে টাইম মত খেতে হবে। তাচ্ছিল্য করলে চলবে না তা কিন্তু বলে যাচ্চি।

জ্ঞানদা এত কথার কোন জবাব দিল না, অধোমুখে কাজ করিতেই লাগিল।

গোলোক কিছুক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, প্রিয়কে বিশেষ করে বলে দিয়েচি দুটি বেলা এসে দেখে যাবে,—সকালে এসেছিল ত?

জ্ঞানদা তেমনি নত-মুখেই মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

গোলোক খুশী হইয়া বলিলেন, আসবে বই কি! আসবে বই কি! সে যে আমার ভারী অনুগত। কিন্তু ঝি বেটি গেল কোথায়? সে যাবে ওষুধ দিয়ে, আর তুমি এদিকে খেটে খেটে শরীর পাত করবে, তা আমি হতে দিতে পারব না। বলি, গেল কোথা সব? থাক্ এ সব পড়ে। যাও ওপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করগে—মধুসূদন! তুমিই ভরসা! এই বলিয়া গোলোক পরের এবং নিজের লৌকিক ও পারলৌকিক উভয় কর্ত্তব্যই আপাতত শেষ করিয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

তাঁহার খড়মের একটুখানি শব্দে চকিত হইয়া এতক্ষণে জ্ঞানদা মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার মুখে সেদিনের সেই প্রসন্ন হাসিটুকু আজ নাই, আজ তাহা চিন্তা ও বিষাদের ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন। চোখ দুটি আরক্ত, পল্লবপ্রান্তে অশ্রুর আভাস যেন তখনও বিদ্যমান—সেই সজল দৃষ্টি গোলোকের প্রতি স্থির করিয়া অকস্মাৎ গাঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তুমি কি প্রিয়বাবুর মেয়ে সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে চেয়েচ? আমাকে ঠকিয়ো না, সত্যি বল।

গোলোক থতমত খাইয়া হঠাৎ জবাব দিতে পারিলেন না, কিন্তু পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, আমি? সন্ধ্যাকে? নাঃ। কে বললে?

জ্ঞানদা কহিল, যেই বলুক। রাসুদিদিকে তুমি তার মায়ের কাছে পাঠিয়েছিলে, সামনের অঘ্রাণেই সমস্ত স্থির হয়ে গেছে? ভগবানের দোহাই, সত্যি কথা বল।

গোলোক অস্ফুট তর্জ্জনে শাসাইয়া বলিলেন, রাসি-বামনী বলে গেছে? আচ্ছা দেখছি তাকে! আমি—

জ্ঞানদা বলিয়া উঠিল, কেন তবে তুমি আমার এ সর্ব্বনাশ করলে? মুখ দেখাবার, দাঁড়াবার যে আর আমার কোথাও স্থান নেই। বলিতে বলিতেই তাহার বিকৃত-কণ্ঠ বুক-ফাটা ক্রন্দনে একেবারে সহস্রধারে কাটিয়া পড়িল।

গোলোক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে সভয় দৃষ্টিপাত করিয়া হাত তুলিয়া চাপা গলায় বলিতে লাগিলেন, আহা! কর কি, কর কি! লোকজন শুনতে পাবে যে! মিছে—মিছে—মিছে কথা গো! ঠাট্টা—

জ্ঞানদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, না কখ্খনো ঠাট্টা নয় কখ্খনো এ মিথ্যে নয়। এ সত্যি! এ সত্যি! তুমি সব পার। তোমার অসাধ্য কাজ নেই।

না না, বলচি এ ঠাট্টা—তামাসা—নাতনী-সুবাদে—আহা হা! চুপ কর না—ঝি-চাকর এসে পড়বে যে! বলিতে বলিতে গোলোক খট্ খট্ করিয়া শশব্যস্তে পলায়ন করিলেন।

জ্ঞানদার হাতের বেগুন হাতেই রহিল, সে মুখের মধ্যে অঞ্চল গুঁজিয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত রোদন প্রাণপণে নিরোধ করিল।

বাটীর দাসী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া জানাইল, মাসীমা, ঝি সঙ্গে করে কানা দাদামশাই যে স্বয়ং এসে হাজির গো!

জ্ঞানদা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিল। তাহার সেই অশ্রু-কলুষিত ব্যথিত দৃষ্টির সম্মুখে দাসী বিস্ময়ে লজ্জায় বলিল, তোমাদের সেই পুরোনো ঝিকে সঙ্গে নিয়ে তোমার শ্বশুরমশাই এসেচেন মাসীমা। কি হয়েচে গা?

খবর শুনিয়া জ্ঞানদার মুখের উপর রক্তের লেশমাত্রও যেন আর রহিল না। মুখোমুখি মৃত্যুকে দেখিয়াও মানুষ বোধ হয় এমন পাণ্ডুর হইয়া যায় না।

দাসী ভীত হইয়া কহিল, কি হয়েচে মাসীমা?

জ্ঞানদা ইহারও উত্তর দিল না, কেবল বিহ্বল শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

দাসী পুনরায় বলিল, তোমার কি কোন অসুখ করেচে মাসীমা?

এতক্ষণে জ্ঞানদা মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ। বাবা কতক্ষণ এসেচেন কালী?

ঝি বলিল, সে ত জানিনে মাসীমা। এইমাত্র দেখলুম তিনি উঠানে দাঁড়িয়ে বাবুর সঙ্গে কথা কইচেন।

জ্ঞানদা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবুর সঙ্গে?

ঝি বলিল, হাঁ। আমি বাইরে থেকে আসছিলুম, বাবু ডেকে বলে দিলেন,

কালী, তোমার মাসীমাকে খবর দাও গে তাঁর শ্বশুরমশাই তাকে নিতে এসেচেন। ও মা, ঐ যে নিজেই আসচেন! বলিয়া ঝি একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই লাঠির শব্দে বুঝা গেল এ লাঠি যাঁর তাঁকে চোখের চেয়ে লাঠির উপরে চলাচলের পথটা অধিক নির্ভর করিতে হয়।

পরক্ষণেই একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকের পশ্চাতে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি লাঠির দ্বারা পথ ঠাহর করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন এবং ডাকিয়া বলিলেন, আমার মা কোথায় গো?

জ্ঞানদা উঠিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ মানুষ চিনিতে না পারিলেও চেহারাটা দেখিতে পাইলেন। তিনি আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, বুড়ো-বুড়ীকে এমন করে ভুলে কি করে আছিস মা?

যে স্ত্রীলোকটি সঙ্গে আসিয়াছিল সে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, তা সত্যি বৌদিদি। বুড়ী শাশুড়ী মরে—কেবল মুখে তাঁর আমার বৌমাকে নিয়ে এসো—আমার বৌমাকে এনে দাও। কেমন করে এতদিন ভুলে আছ বল ত?

জ্ঞানদা এ অভিযোগের কোন জবাব দিল না। কেবল এক হাতে অশ্রু মুছিতে মুছিতে অন্য হাতে বৃদ্ধ শ্বশুরের হাত ধরিয়া তাঁহাকে বারান্দায় আনিল এবং স্বহস্তে আসন পাতিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন, চাটুয্যেমশাইকে দু'খানা চিঠি দিলাম; কিন্তু একটারও জবাব পেলাম না। মনে ভাবলাম, তিনি বড়লোক, নানা কাজ তাঁর, আমাদের মত গরীবকে উত্তর দেবার কথা হয়ত তাঁর মনেই নেই; কিন্তু মা ত আমার এই দুঃখীরই ঘরের লক্ষ্মী—

যে দাসী সঙ্গে আসিয়াছিল অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, হ'লেই বা ভগিনীপতি বড়লোক, তাই বলে ঘরের বৌকে আর কে কতদিন পরের বাড়ি ফেলে রাখতে পারে, বৌদিদি? তা ছাড়া, যার সেবা করতে আসা, সেই বোনই যখন মারা গেল। আমি বলি—

বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিলেন, থাক্ সদু, ওসব কথা। বৌমা! তোমার শাশুড়ীঠাকরুণ বড় পীড়িত। আজ দিন ভালো দেখেই তিনি পাঠিয়ে দিলেন যে, আমার বৌমাকে একবার—

সদু বলিল, বৌদিদি, তোমার জন্যেই বুঝি প্রাণটা তাঁর বেরুচ্চে না। আজ ক'দিন থেকে কেবল বলচেন—সদু, মা আমার, যা তুই একবার এঁকে নিয়ে। এনে একবার দেখা আমার মাকে। বলিতে বলিতে সদুর গলা করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ কহিলেন, চাটুয্যেমশায় যে আমার চিঠি দুটো পাননি, তা ত আর আমি

জানিনে। আমরা কত কথাই না তোলাপাড়া করছিলাম। বড় ভালো লোক—সাধু ব্যক্তি। শুনেই বললে, বিলক্ষণ! আপনাদের বৌ আপনারা নিয়ে যাবেন তাতে বাধা দেবে কে? পাল্‌কি বেহারা বলে দিলেন। তোমার শাশুড়ীর অসুখ শুনে দুঃখ করে বার বার বলতে লাগলেন, আমার বড় বিপদের দিনে জ্ঞানদাকে আপনারা পাঠিয়েছিলেন, এখন আপনাদের বিপদের সময় এমন পাষণ্ড সংসারে কে আছে যে তাকে ফিরে পাঠাতে আপত্তি করবে! এখ্‌খুনি নিয়ে যান, আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিচ্চি।

জ্ঞানদা এতক্ষণ একেবারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল, অকস্মাৎ বিবর্ণমুখে বলিয়া উঠিল, চাটুয্যেমশাই বললেন এই কথা? এখ্‌খুনি পাঠাবেন? আজই?

সৌদামিনী খুশী হইয়া কহিল, হাঁ—বললেন বইকি! বরঞ্চ এমনও বলে দিলেন যে, খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়লে তিনটের গাড়ি ধরে অনায়াসে কাল সকাল নাগাদ বাড়ি পৌঁছান যাবে। তা ছাড়া ঘরে মর-মর রুগী, কোথাও কি একটা দিনও দেরি করবার জো আছে বৌদিদি! আহা! বুড়ী যেন কেবল হা-পিত্যেস্ করে তোমার পথ চেয়ে আছে।

জ্ঞানদা কেবল যেন কলের পুতুলের মত তাহার পূর্ব্ব কথাটাই আবৃত্তি করিতে পারিল। কহিল, উনি বললেন পাঠাবেন আজই।

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, হা মা, আজই বইকি! থাকবার ত জো নেই।

কিন্তু সৌদামিনী বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার কণ্ঠস্বরে তাহা অপ্রকাশও রহিল না। কহিল, শোন কথা একবার! শাশুড়ী মরে—যার ঘরের বৌ তিনি নিজে এসেচেন নিতে—কে পাঠাবে না শুনি? তা ছাড়া আর থাকাই বা এখানে কি জন্যে? ভালো, তোমার ভগ্নিপতিকে জিজ্ঞেসা করেই না হয় পাঠাও না বৌদিদি?

কিন্তু পাঠাতে হইল না। বোধ করি কাছেই কোথাও তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন, খট্‌খট্ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাবটা তাঁহার অত্যন্ত ব্যস্ত! বৃদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, না, মুখুয্যেমশাই, বসে গল্প করলে চলবে না, বেলা বেড়ে যাচ্ছে, স্নানাহ্নিক সেরে আহারাদির পরে একটু বিশ্রাম করে বেরুতেই সময় হয়ে যাবে। ওদিকে আবার বারবেলা পড়বে। বিলক্ষণ! পাঠাতে আপত্তি! আমাদের না হয় একটু কষ্টই হবে, তা বলে সে কি কথা। শাশুড়ীঠাকরুণের অত বড় ব্যারাম, আমার যে সহস্র ঝঞ্ঝাট—এতটুকু ফুরসত নেই, নইলে যে নিজে গিয়ে জ্ঞানদাকে রেখে আসতাম! চিঠি কি একটাও পেলাম! তা হলে আপনাকে না-কি আবার কষ্ট করে আসতে হয়! পিয়ন বেটারা সব হয়েচে—কালী কোথায় গেলি? ভুলোকে না হয় এইখানেই বল্ না এক কল্‌কে তামাক দিয়ে যেতে। নিন

মুখুয্যেমশাই, আর দেরি নয়, উঠুন। জ্ঞানদা, একটুখানি চট্‌পট্ নাও দিদি—ওদিকে আবার তিনটের গাড়ি ধরাই চাই। আঃ—চোঙদারটা আবার বাইরে বসে· গিন্নী স্বর্গীয় হওয়া থেকে কি যেন মন হয়েচে মুখুয্যেমশাই, কিছু মনেই থাকে না। মধুসূদন! তুমিই ভরসা! তুমিই ভরসা! বলিতে বলিতে গোলোক চাটুয্যেমশাই যে-পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে সমস্ত বাড়িটা খড়মের কঠোর শব্দ মুখরিত করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

জ্ঞানদা একটা কথারও জবাব দিল না—কেবল সেইদিকে চাহিয়া পাথরের ন্যায় শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভুলো আসিয়া কহিল, মাসীমা, খোকাবাবু নাইবার জন্যে কাঁদছে। নদীতে কি নিয়ে যাব?

জ্ঞানদা তেমনি নিশ্চল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, ভৃত্যের আবেদন বোধ হয় তাহার কানেই গেল না।

বৃদ্ধ শ্বশুর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, মা, আমি তা হলে বাইরে যাই, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।

সদু কহিল, আমার ষষ্ঠী, বৌদিদি, এবেলা ভাত খাব না বলে দিয়ো।

জ্ঞানদা সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বাবা, আমি যাব না।

বৃদ্ধ চমকাইয়া উঠিলেন, কহিলেন, যাবে না? কেন মা, আজ ত বেশ দিন!

সৌদামিনি ষষ্ঠীর ফলার ভুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, আমরা যে ভট্‌চাযি্য-মশায়কে দিয়ে দিন-ক্ষণ দেখিয়ে তবে বাড়ি থেকে বার হয়েচি বৌদি!

জ্ঞানদা শুধু বলিল, না বাবা, আমি যেতে পারব না।

গোলোকের বছর দশেকের ছেলেটা ছুটিয়া আসিয়া তাহার গায়ে পড়িয়া বলিল, মাসীমা, তুমি বলে দাও না মাসীমা, আমি যাবই নদীতে নাইতে—হুঁ—যাবই কিন্তু—

জ্ঞানদা কাহাকেও কিছু কহিল না, কেবল সেই দুর্দান্ত ছেলেটাকে সবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া হু হু রবে কাঁদিয়া উঠিল।

৯

তাহার পর জ্ঞানদা সেই যে ঘরে কবাট দিল আর খুলিল না। বৃদ্ধ শ্বশুর সমস্ত দুপুরবেলাটা বিমূঢ় বুদ্ধিভ্রষ্টের ন্যায় নীরবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইয়া গেলেন. সঙ্গে সৌদামিনীও গেল। অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানের হেতু সেও বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু সে মেয়েমানুষ অমন করিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া যাওয়া

তাহার সাধ্য নয়। যাইবার পূর্ব্বে জ্ঞানদার রুদ্ধ দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া যে গুটি-কয়েক কথা বলিয়া গেল তাহা সুন্দরও নয়, মধুরও নয়; কিন্তু কোন কথার কোন জবাবই জ্ঞানদা দিল না। এমন কি তাহার একবিন্দু কান্নার শব্দ পর্য্যন্ত সে বাহিরে আসিতে দিল না। ছেলেবেলা বিধবা হওয়ার দিন হইতে যে শাশুড়ী তাহাকে এতকাল বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, একটি দিনের জন্য কোন দুঃখ দেন নাই, আজ তিনি মৃত্যুশয্যায়, কেবল তাহারই মুখ চাহিয়া তাঁহার দুঃখের জীবন মুক্তি পাইতেছে না, অথচ তাহার অশক্ত অন্ধ শ্বশুর রিক্তহস্তে ফিরিয়া চলিলেন—এ যে কি এবং কি করিয়া যে এই ব্যথা সে তাহার রুদ্ধ কক্ষের মধ্যে একাকী বহন করিতে লাগিল, সে কেবল জগদীশ্বরই দেখিলেন, বাহিরে তাহার আর কোন সাক্ষ্য রহিল না।

বৃদ্ধের যাইবার সময় গোলোক দেখা করিলেন, সবিনয়ে পাথেয় দিতে চাহিলেন এবং জ্ঞানদার না যাওয়ার বিস্ময় ও বেদনা তাঁহার বৃদ্ধকেও যেন অতিক্রম করিয়া গেল।

গোলোক বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য বসিয়া আছে। মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিল। গোলোক নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন না, ঘাড়টা একটুখানি নাড়িয়া বলিলেন, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম বাবাজী।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, আজ্ঞে, শুনেই ত মুখে দুটি ভাত দিয়েই ছুটে আসচি চাটুয্যেমশাই।

গোলোক বলিলেন, তা তো আসচ হে—কিন্তু ঘটকালী ত করে বেড়াও, বলি দেশের খবর-টবর কিছু রাখো? হাঁ, ঘটক ছিলেন বটে তোমার পিতামহ রামতারণ শিরোমণি। সমাজটি ছিল নখ-দর্পণে।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, আজ্ঞে, আমার অপরাধ কি? এ-সব কি মেয়েমানুষের কাজ? কিন্তু, যাই হোক—জগো বামনীর মেয়েটার কি আস্পর্দ্ধা বলুন দেখি চাটুয্যেমশাই? রাঙুপিসার কাছে শুনে পর্য্যন্ত আমরা যেন রাগে জ্বলে যাচ্চি।

গোলোক অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন. কি, কি? ব্যাপারটা কি বল দেখি?

আপনি কি কিছু শোনেননি?

না না, কিছু না। হয়েচে কি?

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, আপনারও গৃহ শূন্য, ও মেয়েটারও আর বিয়ে হয় না। শুনলাম আপনি নাকি দয়া করে দুটো ফুল ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মণের কুলটা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ছুঁড়ী নাকি তেজ করে সকলের সুমুখে বলেচে—কথাটা উচ্চারণ করতে মুখে বাধে মশায়—বলেচে নাকি, ঘাটের মড়ার গলায় ছেঁড়া-জুতোর মালা গেঁথে পরিয়ে দেব! তার মা-বাপও নাকি তাতে সায় দিয়েচে!

রাগে গোলোকের চোখমুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু এক নিমিষে নিজেকে

সামলাইয়া লইয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া কহিলেন, বলেচে না-কি? ছুঁড়ী আচ্ছা ফাজিল ত!

ক্রুদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় কহিল, হোক ফাজিল, কিন্তু তাই বলে আপনাকে বলবে এই কথা! জানে না সে আপনার পায়ে মালা দিলে তার ছাপ্পান্ন পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে! আপনি বলেন কি?

গোলোক প্রশান্ত হাসিমুখে কহিলেন, ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ! রাগ করতে নেই হে মৃত্যুঞ্জয়—রাগ করতে নেই। আমার মর্য্যাদা সে জানবে কি—জানো তোমরা, জানে দশখানা গ্রামের লোক।

মৃত্যুঞ্জয় গলাটা কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি তা হলে সত্যি নয়? আপনি কি তা হলে রাসুপিসীকে দিয়ে—

গোলোক কহিলেন, রাধামাধব! তুমিও ক্ষেপলে বাবাজী। যার অমন গৃহলক্ষ্মী যায়, সে নাকি আবার—! বলিয়া অকস্মাৎ প্রবল নিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

তাঁহার ভক্তি-গদ্‌গদ উচ্ছ্বাসের প্রত্যুত্তরে মৃত্যুঞ্জয় কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া শুধু তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

গোলোক কয়েক মুহূর্ত্ত পরে উদাসকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, ছাই-পাঁশ মনেও পড়ে না কিছু—লোকজনেরা ত দিবারাত্রি খেয়ে ফেললে আমাকে—এঁকে বাঁচান, ওঁকে রক্ষা করুন, অমুকের কুল উদ্ধার করুন,—আমাকে ত জানো, চিরকাল অন্যমনস্ক উদাসীন লোক—হয়ত বা মনের ভুলে কাউকে কিছু বলেও থাকব—মধুসূদন! তুমিই ভরসা! তুমিই গতি মুক্তি!

ঘটক মৃত্যুঞ্জয় পাইয়া বসিল। সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে তাই যদি হয়, আমাদের প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যের মেয়েটিকে আপনার পায়ে স্থান দিতেই হবে। ব্রাহ্মণ গরীব, মেয়েটির বয়সও তের-চোদ্দ হলো—কিন্তু যেমন লক্ষ্মী, তেমনি সুরূপা।

গোলোক বলিলেন, তুমি পাগল হলে মৃত্যুঞ্জয়! আমার ওসব সাজে, না ভাল লাগে? তা মেয়েটি বুঝি এরই মধ্যে বছর-চোদ্দ হলো? বেশ একটু বাড়ন্ত গড়ন বলেই শুনেচি, না?

মৃত্যুঞ্জয় উৎসাহিত হইয়া কহিল, আজ্ঞা হাঁ, খুব খুব। তা ছাড়া যেমন শান্ত, তেমনি সুন্দরী।

গোলোক মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, হাঃ। আমার আবার সুন্দরী! আমার আবার সুরূপা! যে লক্ষ্মীর প্রতিমে হারালাম! মধুসূদন! কারও দুঃখই সইতে পারিনে, শুনলে দুঃখই হয়। তেরো-চোদ্দ যখন বলেচে তখন পনের-ষোল হবে। ব্রাহ্মণ বড় বিপদেই পড়েচে বল?

মৃত্যুঞ্জয় মাথা নাড়িয়া কহিল, তাতে আর সন্দেহ কি!

গোলোক কহিলেন. বুঝি সমস্তই মৃত্যুঞ্জয়। কুলীনের কুল রাখা কুলীনেরই কাজ। না রাখলে প্রত্যবায় হয়। কিন্তু একে শোক-তাপের শরীর, বয়স ধর পঞ্চাশের কাছে ঘেঁষেই আসচে কিন্তু কি যে স্বভাব, অপরের বিপদ শুনলেই প্রাণটা যেন কেঁদে ওঠে—না বলতে পারিনে।

মৃত্যুঞ্জয় পুনঃ পুনঃ শির সঞ্চালন করিতে লাগিল। গোলোক পুনশ্চ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই স্বভাব-কুলীনের গ্রামে সমাজের মাথা হওয়া যে কি ঝক্‌মারি তা আমি জানি। কে খেতে পাচ্চে না, কে পরতে পাচ্চে না, কার চিকিৎসা হচ্চে না—এ সকল ত আছেই, তার ওপর এই সব জুলুম হলে ত আমি আর বাঁচিনে মৃত্যুঞ্জয়। প্রাণকৃষ্ণ গরীব—তা মেয়েটি বেশ ডাগর হয়ে উঠেচে? তের-চোদ্দ নয়, পনের-ষোলর কম হবে না কিছুতেই—ত ব'লো না হয় প্রাণকৃষ্ণকে একবার দেখা করতে—

মৃত্যুঞ্জয় ব্যগ্র হইয়া বলিল, আজই—গিয়েই পাঠিয়ে দেব—বরঞ্চ সঙ্গে করেই না হয় নিয়ে আসব।

গোলোক উদাস-কণ্ঠে কহিলেন, এনো, কিন্তু বড় বিপদে ফেললে মৃত্যুঞ্জয়—গরীব ব্রাহ্মণের এ বিপদে না বলবই বা কি করে। মধুসূদন! ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন! যা করাবেন তাই করতে হবে। আমরা নিমিত্ত বই ত নয়!

মৃত্যুঞ্জয় নীরব হইয়া রহিল।

গোলোকের হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, হাঁ ছাখো, তোমাকে যেজন্যে ডেকে পাঠিয়েচি তাই এখনো বলা হয়নি। বলচি মাসটা বড় টানাটানি চলচে; তোমার সুদের টাকাটা—

মৃত্যুঞ্জয় করুণস্বরে বলিল, এ মাসটা যদি একটু দয়া করে—

গোলোক কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। আমি কষ্ট দিয়ে এক পয়সাও নিতে চাইনে; কিন্তু বাবাজী, তোমাকেও আমার একটি কাজ করে দিতে হবে।

মৃত্যুঞ্জয় প্রফুল্ল হইয়া কহিল, যে আজ্ঞে। আজ্ঞা করুন?

গোলোক বলিলেন, সনাতন হিন্দুধর্ম্মটি বাঁচিয়ে সমাজ রক্ষা করে চলা ত সোজা দায়িত্ব নয় মৃত্যুঞ্জয়। এ মহৎ ভার যার মাথার উপর থাকে তার সকল দিকে চোখ-কান খুলে রাখতে হয়। প্রিয় মুখুয্যের মায়ের সম্বন্ধে কি একটা নাকি গোল ছিল! এই খবরটি বাবা তোমাকে তাদের গ্রামে গিয়ে অতি গোপনে সংগ্রহ করে আনতে হবে। সে ছিলেন বটে তোমার পিতামহ শিরোমণি মহাশয়, বিশ-ত্রিশখানা গ্রামের নাড়ীর খবর ছিল তার কণ্ঠস্থ—ভূপতি চাটুয্যের যে দশটি বচ্ছর

হুঁকো-নাপ্‌তে বন্ধ করে দিয়েছিলাম—তায়াকে শেষে বাপ্‌ বাপ্‌ করে ছিন্নভিন্ন হয়ে গাঁ ছেড়ে পালাতে হ'লো, সে ত তোমার পিতামহের সাহায্যেই। কিন্তু তোমরা বাবা তাঁর কীর্ত্তি বজায় রাখতে পারলে না, এ-কথা আমাকে বলতেই হবে।

মৃত্যুঞ্জয় তাহার পূর্ব্বপুরুষের তুলনায় নিজের হীনতা উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কহিল, আপনি দেখবেন চাটুয্যেমশাই, আমি একটি হপ্তার মধ্যেই তাদের পেটের খবর টেনে বার করে আনব।

গোলোক উৎসাহ দিয়া বলিলেন, তা তুমি পারবে, পারবে। কত বড় বংশের ছেলে! কিন্তু দেখ বাবাজী, এ নিয়ে এখন আর পাঁচ-কান করবার আবশ্যক নেই। কথাটা তোমার আমার মধ্যেই গোপনে থাক্; সমাজের মান-মর্য্যাদা রক্ষা করতে হলে অনেক বিবেচনার প্রয়োজন। তা ছাখো, কেবল সুদ কেন, তোমার আসল টাকাটাও আমি বিবেচনা করে দেখব। কষ্টে পড়েচ, এ-কথা যদি আগে জানাতে—

মৃত্যুঞ্জয় পুলকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে,—আমরা আপনার চরণেই ত পড়ে আছি। আমি কালই এর সন্ধানে যাব, বলিয়া সে গমনোদ্যত হইল।

গোলোক জিভ কাটিয়া কহিলেন, অমন কথা মুখেও এনো না বাবাজী। আমি নিমিত্তমাত্র—তাঁর শ্রীচরণে কীটাণুকীটের ন্যায় পড়ে আছি। এই বলিয়া তিনি উপরের দিকে শিবনেত্র করিয়া হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া যাইতেছিল, অন্যমনস্ক গোলোক সহসা কহিলেন, আর ছাখো, প্রাণকৃষ্ণকে একবার পাঠিয়ে দিতে যেন ভুলো না। ব্রাহ্মণের বিপদের কথা শুনে পর্য্যন্ত প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠচে। নারায়ণ! মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

১০

প্রসিদ্ধ জয়রাম মুখোর দৌহিত্র শ্রীমান্ বীরচন্দ্র বন্দ্যোর সহিতই সন্ধ্যার বিবাহ স্থির হইয়া গেছে। আগামীকল্য বরপক্ষ আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন, বাড়িতে তাহার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। অগ্রহায়ণের শেষাশেষি বিবাহ, একটিমাত্র দিন আছে, তাহার পরে দীর্ঘদিনব্যাপী অকাল। এ সূত্রে বহু বৎসর পরে বহু সাধ্যসাধনায় শাশুড়ী কাশী হইতে আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পরে ভাঁড়ার-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া প্রদীপের আলোতে জগদ্ধাত্রী মিষ্টান্ন রচনা করিতেছিলেন এবং তাঁহারই অদূরে কম্বলের আসনে বসিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ী কালীতারা মালা জপ করিতেছিলেন।

শীতের আভাস দিয়াছে, তাঁহার গায়ে একখানি গেরুয়া রঙের লুই, পরিধানে সেই রঙে রঞ্জিত বস্ত্র; পুত্রবধূর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিয়ের বুঝি আর দিন-দশেক বাকী রইল বৌমা?

জগদ্ধাত্রী মুখ তুলিয়া চাহিলেন; কহিলেন, কোথায় দশ দিন মা? এই আজ নিয়ে ন' দিন। কাজটা হয়ে গেলি যেন বাঁচি। এ পোড়া দেশে কিছুই যেন না হলে আর ভরসা হয় না।

শাশুড়ী একটু হাসিয়া কহিলেন, সব দেশেই ভয় মা, কেবল তোমাদের গ্রামেই নয়। কিন্তু এতে আশা-ভরসাই বা কি আছে বৌমা, অমন লক্ষ্মীর প্রতিমা মেয়েকে যখন জলে ফেলেই দিচ্চ।

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া কাজ করিতে লাগিলেন, উত্তর দিলেন না।

শাশুড়ী বলিলেন, প্রিয়র কাছে সমস্তই শুনেচি। আজ সকালে স্নানের পথে অরুণকেও দেখলাম। এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে তোমার পছন্দ হলো না বৌমা?

জগদ্ধাত্রী বিশেষ খুশী হইলেন না, বলিলেন, কিন্তু কেবল পছন্দই ত সব নয় মা?

শাশুড়ী বলিলেন, নয় মানি; কিন্তু ফিরে এসে সন্ধ্যার কাছে তার কথা পেড়ে একটু একটু করে যতটুকু পেলাম তাতেই যেন দুঃখে আমার বুক ফাটতে লাগল। হাঁ বৌমা, মা হয়েও কি এ তোমার চোখে পড়ল না?

চোখে তাঁহার বহুদিন পড়িয়াছে, কিন্তু স্বীকার করা যে একেবারে অসম্ভব। বরঞ্চ সভয়ে এদিকে-ওদিকে চাহিয়া চাপা-গলায় বলিলেন, কাজ-কর্ম্মের বাড়ি, কেউ যদি এসে পড়ে ত শুনতে পাবে, মা।

শাশুড়ী আর কিছুই বলিলেন না, কিন্তু জগদ্ধাত্রী নিজের কণ্ঠস্বরের রুক্ষতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, আচ্ছা মা, তুমি কি করে এমন কথা বল? তোমার এত বড় কুলের মর্য্যাদা ভাসিয়ে দিয়ে কি করে লোকের কাছে মুখ দেখাবে বল ত? তা ছাড়া, তার ত জাতও নাই। যারা তার হয়ে তোমার কাছে ওকালতি করেচে, এ কথাটা কি তোমাকে তারা বলেচে?

জগদ্ধাত্রী মনে করিলেন, ইহার পরে আর কাহারও বলিবার কিছু থাকিতেই পারে না; কিন্তু শাশুড়ী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, বলেচে বই-কি। কিন্তু তার কিছুই যায়নি বৌমা, সমস্তই বজায় আছে। কেবল তার বিদ্যা-বুদ্ধির জন্যেই বলচিনে। ছোট জাত বলে যে অনাথা মেয়ে দুটোকে তোমরা তাড়িয়ে দিলে, সে তাদেরই বুকে তুলে নিলে। তার জাত ভগবানের বরে অমর হয়ে গেছে; বৌমা, তাকে আর মানুষ মারতে পারে না।

জগদ্ধাত্রী মনে মনে কুপিত হইয়া বলিলেন, অনাথা বলেই কি হাড়ি-দুলে হয়ে বামুনের ভিটে-বাড়িতে বাস করবে মা? এই কি শাস্তরে বলে?

শাশুড়ী বলিলেন, শাস্তরে কি বলে তা ঠিক জানিনে বৌমা। কিন্তু নিজের ব্যথা যে কত তা ত ঠিক জানি। আমার কথা কাউকে বলবার নয়, কিন্তু এ ব্যথা যদি পেতে, ত বুঝতে বৌমা, ছোটজাত বলে মানুষকে ঘৃণা করার শাস্তি ভগবান প্রতি নিয়ত কোথা দিয়ে দিচ্চেন। এই যে কুলের মর্য্যাদা, এ যে কত বড় পাপ, কত বড় ফাঁকির বোঝা, এ যদি টের পেতে ত নিজের মেয়েটাকে এমন করে বলি দিতে পারতে না। জাত আর কুলই সত্যি, আর দুটো মানুষের সমস্ত জীবনের সুখ-দুঃখ কি এত বড়ই মিথ্যে মা?

জগদ্ধাত্রী ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, তা হলে কি এই মিথ্যে নিয়েই পৃথিবী চলচে মা?

শাশুড়ী একটু ম্লান হাসিয়া কহিলেন, পৃথিবী ত চলে না বৌমা, চলে কেবল আমাদের অভিশপ্ত জাতের। আমি বিদেশে থাকি, অনেক বয়স হ'লো, অনেক দেখলাম, অনেক দুঃখ পেলাম—আমি জানি যাকে বংশের মর্য্যাদা বলে ভাবচ, যথার্থ সে কি। কিন্তু কথাটা তোমাকে খুলে বলতেও পারব না, হয়ত বুঝতেও তুমি পারবে না। তবুও এই কথাটা আমার মনে রেখো মা, মিথ্যাকে মর্য্যাদা দিয়ে যত উঁচু করে রাখবে তার মধ্যে তত গ্লানি, তত পঙ্ক, তত অনাচার জমা হয়ে উঠতে থাকবে। উঠচেও তাই।

জগদ্ধাত্রী কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মেয়েকে আসিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেলেন। সন্ধ্যা খিড়কির বাগানে এতক্ষণ তাহার ফুলগাছে জল দিতেছিল, বাড়িতে প্রবেশ করিয়া হাতের ঘটিটা প্রাঙ্গণের চাতালের উপর রাখিয়া দিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মায়ের প্রতি চাহিয়া কহিল, ও-কি মা? চন্দ্রপুলি বুঝি? বলিয়াই হঠাৎ পিতামহীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ ঠাকুরমা, সকলের নাড়ু আছে, আমাদের নাই কেন?

কালীতারা সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, তা ত আমি জানিনে দিদি।

সন্ধ্যা কহিল, বাঃ—তোমার শাশুড়ীকে বুঝি এ কথা জিজ্ঞেসা করোনি।

কালীতারা বলিলেন, কি করে আর জিজ্ঞেস করব ভাই, জন্মে ত কোনদিন শ্বশুরবাড়ির মুখ দেখিনি।

জগদ্ধাত্রী ইহা জানিতেন, তিনি লজ্জিত-মুখে নীরবে কাজ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ঠাকুরমা, তোমার সবসুদ্ধ কতগুলি সতীন ছিল? একশ'? দু'শ? তিনশ'? চারশ'?

ঠাকুরমা পুনরায় হাসিলেন—ঠিক জানিনে দিদি, কিন্তু অসম্ভবও নয়। আমার বিয়ে হয়েছিল আট বছর বয়সে, তখনই তাঁর পরিবার ছিল ছিয়াশিটি। তারপরেও অনেক বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু সে বোধ হয় তিনি নিজেও জানতেন না, তা আমি জানব কি করে?

সন্ধ্যা বলিল, আহা, তাঁর লেখা ত ছিল? সেই খাতাখানা যদি কেড়ে রাখতে ঠাকুরমা, তা হলে বাবাকে দিয়ে আমি খোঁজ করাতুম তাঁরা সব এখন কে কোথায় আছেন। হয়ত আমার কত কাকা, কত জ্যাঠাইমা, কত ভাই-বোন সব আছেন, না ঠাকুরমা? আহা, তাঁদের যদি সব জানতে পারা যেত!

একটুখানি হাসিয়াই প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ঠাকুরমা, ঠাকুর্দামশাই কালে-ভদ্রে কখনো এলে তাঁকে ক'টাকা দিতে হ'তো? দর-দস্তুর নিয়ে তোমাদের সঙ্গে বুঝি ঝগড়া বেধে যেতো—না?

জগদ্ধাত্রী রাগ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, জ্যাঠামি রেখে ঠাকুরের শেতলের জোগাড়টা সেরে ফেল্ দিকি, সন্ধ্যে!

ঠাকুরমা নিজেও একটু হাসিয়া বলিলেন, সমস্তই ত জানো দিদি, কিন্তু তবু ত তোমাদের মোহ কাটে না?

এই সকল বিরুদ্ধ আলোচনা জগদ্ধাত্রীর গোড়া হইতেই ভাল লাগিতেছিল না এবং মনে মনে তিনি বিরক্তও কম হইতেছিলেন না, শাশুড়ীর কথার উত্তরে বলিলেন, তখনকার দিনের কথা জানিনে মা, কিন্তু এখন অত বিয়েও কেউ করে না, ওসব অত্যাচারও আর নেই। আর জন-কতক লোক যদি একসময়ে অন্যায় করেই থাকে, তাই বলে কি বংশের সম্মান কেউ ছেড়ে দেয় মা? আমি বেঁচে থাকতে ত সে হবে না?

গৃহস্বামিনী পুত্রবধূর উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে শাশুড়ী নীরব রহিলেন, কিন্তু সন্ধ্যা ব্যথিত হইয়া উঠিল; সে পিতামহীর আর একটু কাছে গিয়া কোমল-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেন তাঁরা অমন অত্যাচার করতেন ঠাকুরমা? তাদের কি মায়াও হ'তো না?

ঠাকুরমা সন্ধ্যার হাত ধরিয়া তাহাকে পার্শ্বে টানিয়া লইয়া বলিলেন, মায়া কি করে হবে দিদি? একটি রাত ছাড়া যার সঙ্গে আর জীবনে হয়তো কখনো দেখা হবে না, তার জন্যে কি কারো প্রাণ কাঁদে! আর সে অত্যাচার কি আজই থেমে গেছে? তোমার ওপর যা হতে যাচ্ছে সে কি কারও চেয়ে কম অত্যাচার দিদি?

জগদ্ধাত্রী হাতের কাজ রাখিয়া দিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত কঠোর স্বরে মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তুই ঠাকুর-ঘরে যাবি, না আমি কাজ-কর্ম্ম ফেলে রেখে উঠে যাব, সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা মায়ের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কথাও কহিল না, উঠিবারও চেষ্টা করিল না। ধীরে ধীরে পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু, যে জিনিসটা এত সম্মান—এত দিন ধরে এমনভাবে আসচে ঠাকুরমা, তাকে কি নষ্ট হতে দেওয়াই ভাল?

এবার শাশুড়ীও বধূর রূক্ষ কথায় বিশেষ কর্ণপাত করিলেন না। নাতিনীর প্রশ্নের জবাবে বলিলেন, কিছু একটা দীর্ঘদিন ধরে কেবল চলে আসচে বলেই তা ভাল হয়ে যায় না দিদি, সম্মানের সঙ্গে হলেও না। মাঝে মাঝে তাকে যাচাই করে,

বিচার করে নিতে হয়। যে মমতায় চোখ বুজে থাকতে চায় সে-ই মরে। আমার সকল কথা কাউকে বলবার নয় ভাই, কিন্তু এ নিয়ে সমস্ত জীবনটাই নাকি আমাকে অহরহ বিষের জ্বালা সইতে হয়েছে। বলিতে বলিতে তাঁহার গলা যেন ভিতরে অব্যক্ত যাতনায় বুজিয়া আসিল।

সন্ধ্যা তাঁহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, থাক গে ঠাকুরমা এ-সব কথা।

তিনি অন্য হাত দিয়া পৌত্রীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া নীরবে আপনাকে আপনি একমুহূর্ত্তে সংবরণ করিয়া ফেলিলেন, তারপর সহজকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, সন্ধ্যা, দেশের রাজা একদিন শুধু গুণের সমষ্টি ধরেই ব্রাহ্মণকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন, তারপরে আবার এমন দুর্দ্দিনও এসেছিল যেদিন এই দেশেরই রাজার আদেশে তাঁদেরই বংশধরদের কেবল দোষের সংখ্যা গণনা করেই মেলবন্ধ করা হয়েছিল। যে সম্মানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, ত্রুটি এবং অনাচারের উপর তার ভিতরের মিথ্যেটা যদি জানতে দিদি, তা হলে আজ যে বস্তু তোমাদের এত মুগ্ধ করে রেখেচে, শুধু কেবল সেই কুল নয়—ছোট-জাত বলে যে দুলে-মেয়ে দুটোকে তোমরা তাড়িয়ে দিলে, তাদেরও ছোটো বলতে তোমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হ'তো।

জগদ্ধাত্রী ক্রোধ এবং বিরক্তি আর সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু সন্ধ্যা চুপ করিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার সত্যবাদিনী সন্ন্যাসিনী পিতামহী ভিতরের কি একটা অত্যন্ত লজ্জা ও ব্যথার ইতিহাস কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার বুক ফাটিতেছে। তাহার হঠাৎ মনে হইল, তাহার পিতামহের বহুবিবাহের সহিত ইহার কি যেন একটা ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া সে সলজ্জে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি ঠাকুরমা, আমাদের মধ্যে খুব বেশি অনাচার প্রবেশ করেচে? যা নিয়ে আমরা এত গল্প করি তার কি অনেকখানি ভুয়ো?

পিতামহী কহিলেন, এর যে কতখানি ভুয়ো সে যে আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না! কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিতেও যে তাঁর চোখে জল আসিয়া পড়িল তাহা সন্ধ্যার অন্ধকারেও সন্ধ্যার অবিদিত রহিল না। তিনি হাত দিয়া চোখ দুটি মুছিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, কিন্তু এখন আমি মাঝে মাঝে কি মনে করি জানস্ সন্ধ্যা? মানুষে মানুষে ব্যবধানের এই যে মানুষের হাতেগড়া গণ্ডি, এ কখনো ভগবানের নিয়ম নয়। তাঁর প্রকাণ্ড মিলনের মুক্ত সিংহদ্বারে মানুষে যতই কাঁটার উপর কাঁটা চাপায়, ততই গোপন গহ্বরে তার অত্যাচারের বেড়া অনাচারে

শতচ্ছিদ্র হতে থাকে। তাদের মধ্যে দিয়ে কেবল পাপ আর আবর্জনাই কেবল লুকিয়ে প্রবেশ করে।

অতঃপর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার নিশ্চয় মনে হইতে লাগিল, ইহার সহিত তাহার পিতামহের বহুবিবাহের সত্যিই কি একটা কদর্য্য সম্বন্ধ আছে এবং কিছু না বুঝিয়াও তাহার কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল।

ঠাকুরমা বলিলেন, যাও দিদি, ঠাকুর-ঘরের কাজটি সেরে ফেল গে, নইলে তোমার মা বড় রাগ করবেন।

সন্ধ্যা অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, তিনি নিজেই করে নেবেন এখন। বলিয়াই সে তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল, চল না ঠাকুরমা, আমার ঘরে গিয়ে একটু সেকালের গল্প করবে।

এই বলিয়া সে একরকম জোর করিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিয়া নিজের ঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

১১

রাত্রি খুব বেশী হয় নাই, বোধ হয় একপ্রহর হইয়া থাকিবে, কিন্তু শীতের দিনের পল্লীগ্রামে ইহারই মধ্যে অত্যন্ত গভীর মনে হইতেছিল। জ্ঞানদার শয়ন-কক্ষের এক কোণে একটা মাটির প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। ঘরের মেঝেয় বসিয়া জ্ঞানদা এবং তাহারই অদূরে বসিয়া রাসমণি হাত-মুখ নাড়িয়া বুঝাইয়া বলিতেছেন, কথা শোন্ জ্ঞানদা, পাগলামি করিস্‌নে। ওষুধটুকু দিয়ে গেছে খেয়ে ফ্যাল্। আবার যেমন ছিল সব তেমনি হবে, কেউ জানতেও পারবে না।

জ্ঞানদা অশ্রুরুদ্ধ-স্বরে বলিল, এমন কথা আমাকে তোমরা কেমন করে বল দিদি! পাপের ওপর এত বড় পাপ আমি কি করে করব? নরকেও যে আমার জায়গা হবে না!

রাসমণি ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, আর এত বড় কুলে কালি দিয়েই বুঝি তুমি স্বর্গে যাবে ভেবেচ? যা রয়-সয় তাই কর্ জ্ঞানদা, আদিখ্যেতা করে এত বড় একটা দেশপূজ্য লোকের মাথা হেঁট করে দিস্‌নে।

জ্ঞানদা হাতজোড় করিয়া কাঁদিয়া বলিল, ও আমি কিছুতে খেতে পারব না—আমাকে বিষ দিয়ে তোমরা মেরে ফেলবে, আমি টের পেয়েচি।

রাসমণি মুখখানা অতিশয় বিকৃত করিয়া কহিলেন, তবে, তাই বল, মরবার ভয়ে খাব না! মিছে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিস্‌নে।

জ্ঞানদা কহিল, কিন্তু ও যে বিষ!

রাসমণি বলিলেন, বিষ তা তোর কি! তুই ত আর মরচিস্ নে। বলিয়াই তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর চক্ষের নিমিষে কোমল ও করুণ করিয়া কহিলেন, পাগলী আর বলে কাকে! আমরা কি তোকে খারাপ জিনিস খেতে বলতে পারি বোন! এ কি কখনো হয়? রাসি বামনীকে এমন কথা কি কেউ বলতে পারে? তা নয় দিদি— কপালের দোষে যে শত্রুটা তোর পেটে জন্মেচে, সেই আপদ-বালাইটা ঘুচে যাক্— কতক্ষণেরই বা মামলা—তারপরে যা ছিলি তাই হ—খা দা, ঘুরে বেড়া, তীর্থ-ধর্ম্ম বার-ব্রত কর্—এ কথা কেই বা জানবে, আর কে-ই বা শুনবে।

জ্ঞানদা অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে আনতে বলে দি বোন?

জ্ঞানদা মুখ তুলিল না, কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, না, আমি ওসব কিছুতেই খাবো না—আমি কখ্খনো তাহলে আর বাঁচব না।

রাসমণি ভয়ানক রাগ করিয়া বলিলেন, এ ত তোর ভারি ছিষ্টিছাড়া অন্যায় জ্ঞানদা? খেতে না চাস্, যা এখান থেকে। পুরুষমানুষ, একটা অ-কাজ না হয় করেই ফেলেচে, তা বলে মেয়েমানুষের এমন জেদ ধরলে ত চলে না। চাটুয্যেদাদা ত বলচেন, বেশ, যা হবার হয়েচে, ওকে আমি পঞ্চাশটা টাকা দিচ্চি, ও কাশী-বৃন্দাবনে চলে যাক। তারপরে ত তাঁকে আর দোষ দিতে পারিনে জ্ঞানদা? টাকাটাও ত কম নয়? একসঙ্গে একমুঠো!

জ্ঞানদা কহিল, আমি টাকা চাইনে দিদি, টাকা নিয়ে আমি কি করব? আমি যে কাউকে কোথাও চিনিনে—আমি কেমন করে কার কাছে গিয়ে এ-মুখ নিয়ে দাঁড়াব?

রাসমণি বলিলেন, এ তোমার জব্দ করার মতলব নয় জ্ঞানদা? লোকে কথায় বলেচে কাশী-বৃন্দাবন! এত লোকের স্থান হয়, আর তোমারই হবে না?

জ্ঞানদা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, রাসুদিদি, আমি সব জানি। কাল ওঁর প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে, তাও জানি। আজ, তাই আমাকে বিষ দিয়ে হোক, কাশীতে পাঠিয়ে হোক, বাড়ি থেকে দূর করা চাই। কিন্তু ভগবান! বলিতে বলিতে সে সহসা ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দুই হাত জোড় করিয়া কহিতে লাগিল, ভগবান! তোমার পায়ে এত লোকের যখন স্থান হয়, তখন আমারও হবে। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে কখনো কোন পাপ করিনি, হয়ত কখনো করতেও হ'তো না—কিন্তু তুমি ত সব জানো? এর সমস্ত শাস্তির বোঝা কি কেবল নিরুপায় বলে আমার মাথাতেই তুলে দেবে?

ভগবানের নামে রাসমণির বোধ করি বিরক্তির অবধি রহিল না, তিনি ধমক দিয়া বলিলেন, আ-মর। শাপমন্যি দিস্ কেন? কচি খুকি! চোর মরে সাত বাড়ি

জড়িয়ে—এ হয়েচে তাই। তুমি আস্কারা না দিলে পুরুষমানুষের দোষ কি! কই বলুক ত দেখি এমন ব্যাটাছেলে কে আছে রাসী বামনীকে?

ইহার আর উত্তর কি? জ্ঞানদা নীরবে অঞ্চলে চোখ মুছিতে লাগিল। রাসমণি অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় বলিলেন, বেশ ত জ্ঞানদা, ক্যাওরা-বৌয়ের ওষুধ খেতে যদি তোমার ভয় হয়, প্রিয় মুখুয্যেকে ত বিশ্বেস হয়? সেই না হয় একটা কিছু দেবে যাতে—

জ্ঞানদা অবাক্ হইয়া বলিল, তিনি দেবেন?

রাসমণি বলিলেন, হুঁ? দেবে না আবার! চাটুয্যেদাদা বললে দিতে পথ পাবে না। খবর দেওয়া হয়েচে, এসে পড়ল বলে। তখন কিন্তু না বললে আর হবে না বলে দিচ্চি।

জ্ঞানদা চুপ করিয়া রহিল: রাসমণি অধিকতর উৎসাহজনক আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অদূরে প্রাঙ্গণে জুতার শব্দ ও প্রিয় মুখুয্যের গলা শোনা গেল—

আঃ! এখানে একটা আলো দেয় না কেন? লোকজন সব গেল কোথায়? বলিতে বলিতে খট্‌খট্ করিয়া তিনি ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বগলে চাপা ছোট-বড় চার-পাঁচখানা বই তক্তাপোশের উপর এবং হাতের বাক্সটা নিচে রাখিতে রাখিতে বসিলেন, আজ কেমন আছে জ্ঞানদা?—উঁহুঁ—ও চলবে না,—ও চলবে না—ঠাণ্ডা পড়েচে, মাটিতে বসা চলবে না—রেমিডিটা একটু পাল্টে দিতে হ'লো দেখচি! এ কে, মাসী যে! কতক্ষণ? ভালো ত সব? তোমার নাতনীকে কাল রাস্তায় দেখলাম—তেমন ভাল বলে ত মনে হ'লো না? ক্ষিদে কেমন? কাল নিয়ে গিয়ে তার জিভটা একবার দেখিয়ো দিকি। মরবার ফুরসত নেই, কোনদিকে যে যাই! যেদিকে নজর না রাখব অমনি—কাল মেয়েটার বিয়ে, মাসী, কাল কিন্তু সকালবেলাতেই যাওয়া চাই। মেয়ের বিয়ে, কাল কিছু আর বা'র হ'তে পারব না—কিন্তু রুগীগুলোর কি যে হবে তাই কেবলি ভাবচি। একটা ত নয়! এমন হয়েছে যে প্রিয় মুখুয্যেকে ছেড়ে আর বিপ্‌নেকে ডাকতেই চায় না। তারই বা চলে কি করে? দুঃখও হয়, তবু যা হোক একটু শিখেচে ত! দাও হাতটা একবার দেখি। পঞ্চা গয়লার শুনলাম বুকে সর্দ্দি বসে গেছে—খপ্‌ করে একবার দেখে আসতে হবে। দাও হাতটা একবার—

জ্ঞানদা হাত বাড়াইয়া দিল না, নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

রাসমণি বলিলেন, ছুড়ীর ব্যারামটা কি ঠাওরালে বল দিকি জামাই?

প্রিয় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, ডিস্—গরহজম—অজীর্ণ—অম্বল! অম্বল!

কিন্তু প্রশ্নকারিণীর মৃদু মৃদু শিরশ্চালনা দেখিয়া তাঁহার ডাক্তারি-বিদ্যা একেবারে নির্বিবার উপক্রম করিল। ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, কেন, কেন? নয় কেন? বিপ্‌নে

এসেছিল বুঝি? কি বললে সে? কৈ, দেখি কি ওষুধ দিয়ে গেল?

রাসমণির মুখে সত্য-মিথ্যা, উগ্র-কোমল, ভাল-মন্দ কিছুই বাধে না, ভূমিকা করিয়া কথা কহিবার প্রয়োজন তাঁহার দৈবাৎ ঘটে—কিন্তু তবুও—তাঁহাকে আজ সাবধান হইতে হইল। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, বিপিন ডাক্তারকে ডাকা হয়নি, পরাণ চাটুয্যেও আসেনি—তোমার কাছে কি আবার তারা? ডাক্তারির তারা জানে কি? এ কথা চাটুয্যেদাদা যে সকলের কাছে বলে বেড়ায়।

বলবে না? এ যে সবাই বলবে। বিপ্‌নেকে যে আমি দশ বচ্ছর শেখাতে পারি। সেবার পল্‌সেটিলা দিয়ে—

মাসী বলিলেন, তা ছাড়া ছুঁড়ী এমন কাণ্ড করে বসল বাবা যে, আপনার লোক ছাড়া পরকে ডাকবার পর্য্যন্ত জো নেই।

প্রিয় উত্তপ্ত হইয়া কহিলেন, আমি থাকতে পর ঢুকবে এখানে ডাক্তারি করতে! তবে কি জানো মাসী, এ-সব রোগে একটু টাইম লাগে—কিন্তু তাও বলে যাচ্ছি, দুটির বেশি তিনটি রেমিডি আমি দেব না। কেমন জ্ঞানদা, গা-বমিটা আমার দুটি ফোঁটা ওষুধে থামল কিনা? ঠিক বল?

জ্ঞানদার আনত-শির একেবারে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহিল। তাহার হইয়া রাসমণি বলিলেন, তোমাকে ছাড়া ও আর কাউকে বিশ্বাস করে না বাবা, তোমার ওষুধ যেন ওর ধন্বন্তরী। কিন্তু ব্যামোটা যে তা নয়, পিওনাথ। অদিষ্টের ফেরে পোড়া-কপালীর অসুখটা যে হয়ে দাঁড়িয়েচে উল্টো।

প্রিয় হাতটা তুলিয়া কহিলেন, উল্টো নয় মাসী, উল্টো নয়। বিপ্‌নে মিস্ত্রিরের হাত পড়লে তাই হয়ে দাঁড়ায় বটে; কিন্তু কিছু ভয় নেই, এ প্রিয় মুখুয্যে।

রাসমণি ললাটে একটুখানি করাঘাত করিয়া বলিলেন, তুমি বাঁচাও ত ভয় নেই সত্যি, কিন্তু সর্ব্বনাশী যে এদিকে সর্ব্বনাশ করে বসেচে! এখন তার মত একটু ওষুধ দিয়ে উদ্ধার না করলে যে কুলে কালি পড়বার জো হ'লো বাবা।

কিন্তু এত অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছেও তাঁহার শেষ কথাটা যে বেশ প্রাঞ্জল হইয়া উঠিল না, তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া মাসী চক্ষের নিমিষে অনুভব করিলেন এবং ইহাই যথেষ্ট পরিস্ফুট করিতে প্রিয়নাথকে তিনি ঘরের একধারে টানিয়া লইয়া গিয়া কানে কানে গুটিকয়েক কথা বলিতেই সে চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, বল কি মাসী? জ্ঞানদা—?

মাসী কহিলেন, কি আর বলব বাবা, কপালের লেখা কে খণ্ডাবে বল? এখন দাও একটু ওষুধ পিওনাথ, যাতে গোলোক চাটুয্যের উঁচু মাথা না নীচু হয়! একটা দেশের মাথা, সমাজের শিরোমণি! পুরুষমানুষ—তার দোষ কি বাবা? কিন্তু তার ঘরে এসে তুই ছুঁড়ি কি ঢলাঢলিটা করলি বল্ দিকি!

প্রিয়র মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। একবার জ্ঞানদার মুখখানা তিনি দেখিবার চেষ্টা করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, তোমরা বরঞ্চ বিপিন ডাক্তারকে খবর দাও মাসী, এসব ওষুধ আমার কাছে নেই। বলিয়া তিনি হেঁট হইয়া নিজের বাক্সটা এবং বইগুলা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাসমণি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, বল কি পিওনাথ, আর কি পাঁচ-কান করা যায়? হাজার হোক তুমি আপনার জন, আর বিপিন ডাক্তার পর—শূদ্দুর, বামুনের মান-মর্য্যাদা কি তারে বলা যায়?

কিন্তু বলিবার পূর্ব্বেই সহসা দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে গোলোক প্রবেশ করিলেন এবং প্রিয়র বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মিনতি করিয়া কহিলেন, বিষের ভয়ে ও যে আর কারও ওষুধ খেতে চায় না বাবা, নইলে কষ্ট তোমাকে দিতাম না। এ বিপদটি তোমাকে উদ্ধার করতেই হবে প্রিয়নাথ।

প্রিয় হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, না না, ওসব নোঙরা কাজের মধ্যে আমি নেই! আমি রুগী দেখি, রেমিডি সিলেক্ট করি, বাস। বিপিন- টিপিনকে ডেকে পরামর্শ করুন—আমি ওসব জানি-টানিনে। বলিয়া আর একবার তিনি বইগুলি বগলে চাপিবার আয়োজন করিলেন।

গোলোক সেই হাতটা তাহার আর একবার নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া প্রায় কাঁদ কাঁদ গলায় কহিতে লাগিলেন, প্রিয়নাথ, বুড়োমানুষের কথাটা রাখো বাবা। সম্পর্কে তোমার আমি শ্বশুরই হই। রাখবে না জানলে যে তোমাকে আমরা বলতাম না! দোহাই বাবা, একটা উপায় করে দাও—হাতে ধরচি তোমার—

প্রিয়নাথ হাতটা পুনরায় ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, সম্পর্কে শ্বশুর হ'ন বলে কি আপনার কথায় জীবহত্যা করব? আচ্ছা লোক ত আপনি! পরলোকে জবাব দেব কি?

গোলোক দ্বারের কাছে সরিয়া গেলেন। তাহার মুখের চেহারা, চোখের ভাব গলায় স্বর সমস্তই যেন অদ্ভুত জাদুবলে এক নিমেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কর্কশ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত রাত্রে তুমি ভদ্রলোকের বাড়ির ভেতরে ঢুকেচ কেন? এখানে তোমার কি দরকার?

প্রশ্ন শুনিয়া প্রিয় শুধু আশ্চর্য্য নয়, হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; বলিলেন, কি দরকার! বাঃ– বেশ ত! চিকিৎসা করতে কে ডেকে পাঠালে? বাঃ—

গোলোক চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বাঃ—? চিকিৎসার তুই কি জানিস্, হারামজাদা নচ্ছার। কে তোকে ডেকেচে? কোথা দিয়ে বাড়ি ঢুকলি? খিড়কির দরজা কে তোকে খুলে দিলে?

জ্ঞানদার প্রতি ফিরিয়া কহিলেন, হারামজাদী! তাই অন্ধ শ্বশুর কেঁদে কেঁদে

ফিরে গেল, যাওয়া হ'লো না? বুড়ো শাশুড়ী মরে—আমি নিজে কত বললুম, জ্ঞানদা যাও, এ-সময়ে তাঁর সেবা করো গে। কিছুতে গেলিনি এইজন্যে। রাত-দুপুরে চিকিচ্ছে করবার জন্যে? দাঁড়া হরামজাদী, কাল যদি না তোর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গ্রামের বার করে দিই ত আমার নাম গোলোক চাটুয্যেই নয়।

জ্ঞানদার মাথায় কাপড় নাই—কখন পড়িয়া গেছে জানিতেই পারে নাই—মুখেও কথা নাই—কেবল দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে যেন একেবারে পাথর হইয়া রহিল।

গোলোক রাসমণির প্রতি চাহিয়া কহিলেন, রাসু, চোখে দেখলি ত এদের কাণ্ড? আমি দশখানা গ্রামের সমাজের কর্তা, আমার বাড়িতে পাপ! এ যে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হ'লো রে!

রাসমণি নিজেও এতক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন, কহিলেন, হ'লোই ত দাদা!

গোলোক কহিলেন, কিন্তু সাক্ষী রইলি তুই।

রাসমণি কহিল, রইলুম বইকি। আমি বলি রাত্রিতে ত একটু হাত আজাড় হ'লো—দেখে আসি জ্ঞানদা কেমন আছে, দেখি না, বেশ দুটিতে বসে বসে হাসি-তামাশা খোস-গল্প হচ্ছে!

জ্ঞানদা ইহার কোন উত্তর দিল না, তেমনি প্রসারিত-চক্ষে পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিল।

প্রিয় আচ্ছন্ন অভিভূতের মত দাঁড়াইয়াছিলেন, গোলোক ছোঁ মারিয়া তাঁহার হাত হইতে বইগুলি কাড়িয়া লইয়া তাঁহার গলায় সজোরে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিলেন, বেরো ব্যাটা পাজি নচ্ছার আমার বাড়ি থেকে। কি বলব, তুই রামতনু বাঁড়ুয্যের জামাই, নইলে জুতিয়ে আজ আধ-মরা করে তোকে থানায় চালান দিতাম! বলিয়া পুনশ্চ একটা ধাক্কা দিলেন এবং যে চাকর-দাসীরা গোলযোগ শুনিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদেরই মধ্য দিয়া তাঁহাকে বারংবার ঠেলিতে ঠেলিতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন।

প্রিয় বলিতে গেলেন, বাঃ—বেশ মজা ত!

চাকর-দাসীরাও সঙ্গে সঙ্গে গেল এবং রাসমণিও নীরবে তাহাদেরই পিছনে পিছনে নিঃসাড়ায় সরিয়া পড়িলেন।

রহিল কেবল জ্ঞানদা— তেমনি নিশ্চল, তেমনি বাক্যহীন, তেমনি অচেতন মূর্ত্তির মত বসিয়া।

আজ সমস্তদিন ধরিয়াই কাছে ও দূর হইতে সানাইয়ের করুণ সুর মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছিল। অগ্রাণের আজিকার দিনটি ছাড়া অনেকদিন পর্য্যন্ত বিবাহের দিন নাই; তাই বোধ হয় এই ছোট গ্রামখানির মধ্যেই প্রায় চার-পাঁচটা বাড়িতে শুভ-বিবাহের আয়োজন চলিয়াছে! আজ সন্ধ্যার বিবাহ।

নানা কারণে অরুণ এখনো পর্য্যন্ত বাসস্থান ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিতে পারে নাই। পূর্ব্বের মত আবার সে কাজকর্ম্মও শুরু করিয়াছে—বাহির হইতে জীবনে তাহার কোন পরিবর্ত্তনও দেখা যায় না, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই দেখা যাইতে পারিত যে, দেশের প্রতি মমতাবোধটা তাহার যেন একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যে-সকল হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তাহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল, তাহারা যেন তেমনি দূরে সরিয়া গিয়াছে। গ্রামে সে 'একঘরে,' এতগুলো বিবাহবাটীর কোনটা হইতেই তাহার নিমন্ত্রণ ছিল না—সামাজিকতা রাখিতে তাহার কোথাও যাইবার নাই—আজ সকল বাটীর দরজাই তাহার কাছে রুদ্ধ।

সন্ধ্যার পর হইতে তাহার দোতলায় পড়িবার ঘরটিতে সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। শীতের হাওয়া বহিতেছে, কিন্তু তবুও ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করা হয় নাই—সব কয়টাই খোলা খাঁ খাঁ করিতেছিল। নির্ম্মেঘ নির্ম্মল আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় ভাসিয়া যাইতেছে—তাহারই একটুকরা পিছনের মুক্ত বাতায়নের ভিতর দিয়া আসিয়া তাহার পায়ের কাছে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার সম্মুখের খোলা বারান্দার অদূরে একটা ছোট নারিকেল বৃক্ষের মাথার উপর পাতায়-পাতায় জ্যোৎস্নার আলোক পড়িয়া ঝকঝক করিতেছিল, সে তাহার প্রতি অর্দ্ধ-জাগ্রত অর্দ্ধ-নিদ্রাতুরের ন্যায় চাহিয়া কি যে ভাবিতেছিল তাহার কোন ঠিকানা ছিল না। পাচক আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে ক্ষুধা নাই বলিয়া তাকে বিদায় করিয়া দিল এবং দেওয়ালে একটা অন্ধকার স্থান হইতে ঘড়িতে এগারটা বাজিয়া তাহার শোবার সময়টা নির্দেশ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও আজ তাহার নড়িবার ইচ্ছাই হইল না, যেমন ছিল, তেমনি নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ তাহার কানে সদর দরজায় করাঘাতের আওয়াজ এবং পরক্ষণে তাহা খোলার শব্দও শুনিতে পাইল। একবার ইচ্ছা করিল ডাকিয়া হেতু জিজ্ঞাসা করে, কারণ পল্লীগ্রামে এত রাত্রে সহজে কেহ কাহারও বাটীতে যায় না, কিন্তু উদ্যমের অভাবে প্রশ্ন করা হইল না।

কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না। মুহূর্ত্ত-কয়েক পরেই দ্বারপ্রান্তে নূতন রেশমের শাড়ির প্রবল খস্‌খস্‌ শব্দের সঙ্গেই কে একজন ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া তাহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িল।

অরুণ শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল জ্যোৎস্নার আলোকে ইহার পরিধানের রাঙা চেলি চক্‌চক্‌ করিতেছে। এ যে কে, তাহা চক্ষের নিমিষে উপলব্ধি করিয়া ভয়ে, বিস্ময়ে তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা সেই মুহূর্ত্তেই একেবারে শুকাইয়া উঠিল। সে যে কি বলিবে, কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

কিন্তু তাহারও সময় রহিল না। একটা ভয়ানক মর্ম্মান্তিক চাপা কান্নায় অকস্মাৎ ঘরের বাতাস, ঘরের আঁধার, ঘরের ম্লান আলোক, ঘরের যাহা কিছু সমস্ত একসঙ্গে একমুহূর্ত্তে যেন চিরিয়া খান্‌ খান্‌ হইয়া গেল।

মিনিট-দুই-তিন হতবুদ্ধির ন্যায় নিঃশব্দে থাকিয়া অরুণ একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার পরিধানের রাঙা চেলির সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার জ্যোৎস্নায় জ্বলিতে লাগিল, সুন্দর ললাটে চন্দ্ররশ্মি পড়িয়া চন্দনের পত্রলেখা দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাহারই ঈষৎ নিম্নে অশ্রুভরা আয়ত চোখ দুটি জ্বল্‌ জ্বল্‌ করিতে লাগিল। নারীর এমন রূপ অরুণ আর কখনো দেখে নাই, সে যেন একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

সন্ধ্যা কহিল, অরুণদা, আমি পিঁড়ি থেকে পালিয়ে এসেচি তোমাকে নিয়ে যেতে। আর আমার লজ্জা নেই, ভয় নেই, মান-অপমানের জ্ঞান নেই—তুমি ছাড়া আজ আর আমার পৃথিবীতে কেউ নেই—তুমি চল।

কোথায় যাব?

যেখান থেকে এইমাত্র একজন উঠে গেল—সেই আসনের উপরে।

অরুণ মনে মনে অত্যন্ত আহত হইল। কাণ্ডটা কি ঘটিয়াছে সে বুঝিল! কিছু একটা কলহের পর বর-পক্ষীয়েরা জোর করিয়া পাত্র তুলিয়া লইয়া গেছে; হিন্দু সমাজে এরূপ দুর্ঘটনা বিরল নহে -তাই সেই অপরের পরিত্যক্ত আসনে অকস্মাৎ তাহার ডাক পড়িয়াছে। যেমন করিয়াই হৌক, আজ সন্ধ্যার বিবাহ হওয়া চাই-ই।

কিন্তু নিজে আঘাত খাইলেও অরুণ প্রতিঘাত করিতে পারিল না, বরঞ্চ সস্নেহ ভর্ৎসনার কণ্ঠে কহিল, ছিঃ—তোমার নিজে আসা উচিত হয়নি সন্ধ্যা। এমন ত প্রায়ই ঘটে—তোমার বাবা কিংবা আর কেউ ত আসতে পারতেন?

বাবা? বাবা ভয়ে কোথায় লুকিয়েচেন! মা পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন, তাকে ধরাধরি করে তুলেচে! আমি সেইসময়ে তোমার কাছে ছুটে এসে পড়েচি। উঃ—এত বড় সর্ব্বনাশ কি পৃথিবীতে আর কারও হয়েচে? আমরা বাঁচব কি করে?

তাহার শেষ কথাটায় অরুণ পুনরায় ঘা খাইল। কহিল, কিন্তু আমাকে দিয়ে

ত তোমাদের কুল রক্ষা হবে না সন্ধ্যা, আমি যে ভারি ছোট বামুন! কিন্তু দেশে আরও অনেক কুলীন আছে তোমার বাবা হয়ত এতক্ষণ সেই সন্ধানেই গেছেন।

সন্ধ্যা কাঁদিয়া বলিল, না, না অরুণদা—বাবা কোথাও যাননি, তিনি ভয়ে পালিয়ে গেছেন। আমাকে আর কেউ নেবে না, কেউ বিয়ে করবে না। কেবল তুমি ভালোবাসো—কেবল তুমিই আমার চিরদিন মান রাখো।

তাহার ভয়ানক উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় অরুণ ক্লেশ বোধ করিল, হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে সন্ধ্যা বাধা দিয়া বলিল, না, আমি উঠব না—যতক্ষণ পারি পায়ের কাছেই পড়ে থাকব। কুল রক্ষা হবে না বলছিলে? কার কুল অরুণদা? আমি ত বামুনের মেয়ে নই—আমি নাপিতের মেয়ে, তাও ভাল মেয়ে নই। আজ আমার ছোঁয়া জল কেউ খাবে না। উঃ! এত বড় শাস্তি আমাকে তুমি কেন দিলে ভগবান! আমি তোমার কি করেছিলাম।

অরুণ চমকাইয়া উঠিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল বুঝি বা সন্ধ্যা প্রকৃতিস্থ নয়। হয়ত এ সমস্তই তাহার উষ্ণ মস্তিষ্কের উদ্ভট বিকৃত কল্পনা। হয়ত-বা এ-সকল কিছুই ঘটে নাই—সে পলাইয়া আসিয়াছে—বাড়িতে তাহাদের এতক্ষণ হুলস্থুল বাধিয়া গিয়াছে। তাহাকে শান্ত করিয়া বাড়ি পাঠাইবার অভিপ্রায়ে সস্নেহ মাথায় হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল; আচ্ছা, চল সন্ধ্যা, তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই।

সন্ধ্যা গড হইয়া প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া বলিল, চল। তুমি যে যাবে সে আমি জানতুম; কিন্তু আমার সমস্ত কথা শুনে তবে চল—নইলে কি জানি তুমিও হয়ত—কি বলেছিলুম তোমাকে একদিন? ছোট বামুন, না? আজ বোধ হয় সেই পাপেই কেবল প্রমাণ হয়ে গেল আমি বামুনের মেয়ে নই। উঃ—আমরা বেঁচে থাকব কি করে অরুণদা?

তাহার মানসিক যাতনার পরিমাণ দেখিয়া অরুণের মন আবার দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠিল, তাহার মনে হইল হয়ত বা যথার্থই কি একটা ঘটিয়াছে—হয়ত-বা সে সত্য ঘটনাই বিবৃত করিতেছে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কে এ কথা প্রমাণ করলে?

কে? গোলোক চাটুয্যে। হাঁ, সেই। কি আমাকে সে বলেছিল জানো? জানো না? আচ্ছা, থাক্ তবে সে কথা। মা আমাকে সম্প্রদান করতে বসেছিলেন, আমার ঠাকুরমা চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। এমনি সময়ে মৃত্যুঞ্জয় ঘটক দু'জন লোক সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হ'লো। একজন তাঁকে ডেকে বললে, তারাদিদি, আমাদের চিনতে পারো? একজন আমার মাকে দেখিয়ে বললে, তুমি ছেলের বিয়ে দিয়ে এই বামুনের মেয়ের জাত মেরেচ—আবার কেন নাতনীর বিয়ে দিয়ে এদের জাত মারচ? তারপরে, বাবাকে আঙুল দেখিয়ে সবাইকে ডেকে বললে, তোমরা সবাই শোন, এই যাকে তোমরা পরম কুলীন প্রিয় মুখুয্যে বলে জানো—সে বামুন নয়, সে হিরু নাপিতের ছেলে।

অরুণ বলিয়া উঠিল, এ সমস্ত তুমি কি বকে যাচ্ছ সন্ধ্যা ?

কিন্তু সন্ধ্যা বোধ করি এ প্রশ্ন শুনিতেই পাইল না—নিজের কথার সূত্র ধরিয়া বলিতে লাগিল, মৃত্যুঞ্জয় ঘটক গঙ্গাজলের ঘটটা ঠাকুরমার সামনে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বলুন সত্যি কিনা ? বলুন ও কার ছেলে ? মুকুন্দ মুখুয্যের, না হীরু নাপিতের ? বলুন ? অরুণদা ? আমার সন্ন্যাসিনী ঠাকুরমা মাথা হেঁট করে রইলেন, কিছুতেই মিথ্যা বলতে পারলেন না। ওগো! এ সত্যি, এ সত্যি, এ ভয়ঙ্কর সত্যি ! সত্যিই আমাদের তোমরা যা বলে জানতে তা আমরা নই। তোমার সন্ধ্যা বামুনের মেয়ে নয় !

অরুণের মনের মধ্যে সংশয়ের আর লেশমাত্র অবকাশ রহিল না, শুধু বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সন্ধ্যা কহিল, একজন তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বললে, সে তাদের গ্রামের লোক। বললে, আট বছর বয়সে ঠাকুরমার বিয়ে হয়, তারপরে চোদ্দ-পনর বছর পরে একজন এসে জামাই বলে, মুকুন্দ মুখুয্যে বলে পরিচয় দিয়ে বাড়ি ঢোকে। পাঁচ টাকা আর একখানা কাপড় নিয়ে সে দুদিন বাস করে চলে যায়।—ওঃ—ভগবান।

অরুণ তেমনি নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া রহিল।

সন্ধ্যা কহিল, কি বলছিলাম অরুণদা ? হাঁ, হাঁ—মনে পড়েচে। তারপর থেকে লোকটা প্রায়ই আসত। ঠাকুরমা বড় সুন্দরী ছিলেন—আর সে টাকা নিত না। তারপরে একদিন যখন সে হঠাৎ ধরা পড়ে গেল, তখন বাবা জন্মেছেন। উঃ—আমি মা হলে গলা টিপে মেরে ফেলতাম, বড় হতে দিতাম না।—কি বলছিলাম ?

অরুণ অস্ফুট স্বরে বলিল, লোকটা ধরা পড়ে গেল।

সন্ধ্যা বলিল, হাঁ হাঁ, তাই। ধরা পড়ে গেল। তখন সে কি কথা স্বীকার করলে জানো ? বললে, এ কুকাজ সে নিজের ইচ্ছেয় করেনি, তার মনিব মুকুন্দ মুখুয্যের আদেশেই করেচে। একে বুড়োমানুষ, তাতে পাঁচ-সাত বছর থেকে বাতে পঙ্গু, তাই অপরিচিত স্ত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ভার তার উপরে দিয়ে বলেছিলেন, হিরু, তুই বামুনের পরিচয় মুখস্থ কর্, একটা পৈতে তৈরি করে রাখ্, এখন থেকে যা-কিছু রোজগার করে আনবি তার অর্দ্ধেক ভাগ পাবি।

অরুণ চমকিয়া বলিল, এ কাজ সে আরও করেছিল নাকি ?

সন্ধ্যা কহিল, হাঁ, আরও দশ-বারো জায়গা থেকে সে এমনি করে প্রভুর জন্যে রোজগার করে নিয়ে যেত। সে আরও কি বলেছিল জানো ? বলেছিল, এ কাজ নূতনও নয়, আর তার মনিবই কেবল একলা করে না—এমন অনেক ব্রাহ্মণই

দূরাঞ্চলে বখরার কারবারে অপরের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

অরুণ ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, খুব সম্ভব সত্যি! নইলে ব্রাহ্মণকুলে গোলোকের মত কসাই বা জন্মায় কি করে। অথচ, এরাই সমস্ত হিন্দুসমাজের মাথায় বসে আছে। তারপরে?

তারপর ঠাকুরমা আমার বাবাকে নিয়ে কাশী চলে গেলেন। সেই অবধি তিনি সন্ন্যাসিনী—সেই অবধি তিনি কোথাও মুখ দেখান না।

সন্ধ্যা পুনশ্চ কহিল, হিরু নাকি জিজ্ঞেসা করেছিল, ঠাকুরমশাই, পরকালে কি জবাব দেব? তার মনিব বলেছিলেন, সে পাপ আমার - আমি তার জবাব দেব? হিরু জিজ্ঞাসা করেছিল, তাদের গতিই বা কি হবে ঠাকুর?

ঠাকুরমশাই হেসে বলেছিলেন, তারা আমার স্ত্রী, তোর নয়। তোর এত দরদ কিসের? যাদের চোখে দেখিনি, চোখে দেখব না, তাদের গতি কি হবে না-হবে সে চিন্তা আমারই বা কি, তোরই বা কি! আমাদের চিন্তা টাকা রোজগার। অরুণদা, তাই সেদিন আমার ঠাকুরমা তোমার কথায় কেঁদে বলেছিলেন, সন্ধ্যা, জাতে কে ছোট, কে বড়, সে কেবল ভগবান জানেন—মানুষ যেন কাউকে কখনো হীন বলে ঘৃণা না করে—কিন্তু তখন ত ভাবিনি তার মানে আজ এমন করে বুঝতে হবে। কিন্তু রাত যে বেশী হয়ে যাচ্চে—আমাকে নিয়ে তোমাকে কখনো দুঃখ পেতে হবে না অরুণদা, তোমার মহত্ত্ব, তোমার ত্যাগ আমি চিরজীবনে ভুলব না। বলিয়া সে নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল।

অরুণ অনিশ্চিত-কণ্ঠে সঙ্কোচের সহিত বলিল, কিন্তু এখন ত তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারিনে সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা চকিত হইয়া কহিল, কেন? তুমি সঙ্গে না গেলে আমি দাঁড়াব কোথায়? আমি বাঁচব কি করে?

এই আকুল প্রশ্নের জবাবটা অরুণ হঠাৎ খুঁজিয়া পাইল না; তারপরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিল, আজ আমাকে ক্ষমা কর সন্ধ্যা— আমাকে একটু ভাবতে দাও।

ভাবতে! এই বলিয়া সন্ধ্যা অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে অরুণের প্রতি চাহিয়া বোধ করি বা অন্ধকারে যতদূর দেখা যায় তাহার মুখখানাই দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তারপরে একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আচ্ছা ভাবো। একটু নয়, বোধ হয়, ভাববার সময় আজীবন পাবে। এতদিন আমিও ভেবেচি—দিনরাত ভেবেচি। যখন নিজের কাছে তোমাকে খুব ছোট করে দেখতে আমার বাধেনি, তখন এই কথাই ভেবেচি। আজ আবার তোমাদের ভাববার সময় এলো। আচ্ছা, চললুম, বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার অঙ্গের সুদীর্ঘ অঞ্চল খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে যথাস্থানে স্থাপিত করিতে

গিয়া এতক্ষণে তাহার নিজের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, ভগবান! এই রাঙা চেলি, এই গায়ের গহনা, এই আমার কপালের কনে-চন্দন— এসব পরবার সময়ে এ-কথা কে ভেবেছিল! বলিতে গিয়া তাহার কণ্ঠ ভাঙিয়া আসিল, সেই ভাঙা গলায় বলিল, আমি বিদায় হ'লাম অরুণদা—বলিয়া আর একবার প্রণাম করিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল।

অরুণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু দৃষ্টির বাহিরে সন্ধ্যা অন্তর্হিত হইতেই হঠাৎ যেন তাহার চমক ভাঙিয়া গেল—ব্যগ্র-আকুলকণ্ঠে চাকরটাকে বার বার ডাক দিয়া বলিতে লাগিল, শিবু, যা যা, সঙ্গে যা! বলিতে বলিতে সে নিজেই ছুটিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

১৩

বাঁ হাতে প্রদীপ লইয়া মুখুয্যে কি কয়েকটি বস্তু বাক্স হইতে বাছিয়া বাছিয়া এক টুকরা কাপড়ে রাখিতেছিলেন, হঠাৎ পিছনে ডাক শুনিল, বাবা?

কাজটা প্রিয় গোপনেই করিতেছিলেন, শশব্যস্তে হাতের প্রদীপটা রাখিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সাড়া দিলেন, কে, সন্ধ্যা? এই যে মা, যাই চল, আর দেরী হবে না—

সন্ধ্যা কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিল, কি করছিলে বাবা?

প্রিয় থতমত খাইয়া বলিলেন, আমি? কই না—কিছুই ত নয় মা!

সেই বস্ত্রখণ্ডটা দেখাইয়া সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিল, ওতে কি বাবা? কি রাখছিলে?

ধরা পড়িয়া প্রিয় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিলেন; কতকটা মিনতির স্বরে কহিলেন, গোটা-কতক—বেশী নয় মা, রেমিডি সঙ্গে নিচ্ছিলাম—আর ঐ মেটিরিয়া-মেডিকাখানা—বড়টা নয়, ছোটটা—ছিঁড়ে-খুঁড়েও গেছে—অচেনা জায়গা—যা হোক একটু প্র্যাক্‌টিস্ করতে হবে ত? তাই ভাবলাম—

মা কি তোমাকে এটুকুও দিতে চায় না বাবা?

প্রিয় অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িয়া কি যে জানাইলেন, ঠিক বুঝা গেল না।

তুমি কোথায় প্র্যাক্‌টিস্ করবে বাবা?

বৃন্দাবনে। সেখানে কত যাত্রী যায়-আসে—তাদের ওষুধ দিলে কি মাসে চার-পাঁচ টাকাও পাব না সন্ধ্যে? তা হলেই ত আমার বেশ চলে যাবে!

খুব পাবে বাবা, তুমি আরও ঢের বেশী পাবে। সেখানে ত তুমি কাউকে জানো না? পরশু শেষরাত্রে ঠাকুরমা যখন কাশী চলে গেলেন, তুমি কেন তাঁর সঙ্গে গেলে না বাবা?

মার সঙ্গে? কাশীতে? না মা, আর আমি কাউকে জড়াতে চাইনে। আমার জন্যে তোমরা অনেক দুঃখ পেলে, আর আমি কাউকে দুঃখ দেব না। যতদিন বাঁচব ঐ অচেনা জায়গায় একলাই থাকব।

সন্ধ্যা পিতার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া তাঁহার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, কিন্তু আমি তোমাকে একলা থাকতে দেব না বাবা, আমি যে তোমার সঙ্গে যাব!

প্রিয় ধীরে ধীরে নিজের হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কন্যার মাথার উপর রাখিয়া হাসিয়া কহিলেন, দূর পাগলি, সে কি কখনো হয়? আমার সঙ্গে কোথায় যাবি মা—তোমার মায়ের কাছে তুমি থাকো, সেও অনেক দুঃখ পেলে, আর আমার নাম করে যারা ওষুধ চাইতে আসবে তাদের ওষুধ দিয়ো। আর ছাখ্ সন্ধ্যা, আমার বইগুলো যদি তোর মা দেয় ত বিপিনটাকে দিয়ে দিস। সে-বেচারা গরীব, বই কিনতে পারে না বলেই কিছু শিখতে পারে না।

সন্ধ্যা মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাবই। এই দেখ না আমার পরণের কাপড় দুটি আমার গামছায় বেঁধে নিয়েচি। এই বলিয়া সে অঞ্চলের ভিতর হইতে একটি ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া দেখাইল।

প্রিয় কোনদিনই বেশী প্রতিবাদ করিতে পারেন না, তিনি রাজী হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, চল, কিন্তু তোর মা যে বড্ড দুঃখ পাবে সন্ধ্যা।

কাল সর্ব্বসমক্ষে, সমাজের ষোল আনার সম্মুখে পিতার উৎকট দুর্গতি সে চোখে দেখিয়াছে। জগদ্ধাত্রীর নিজের বাড়ি বলিয়াই এতটা সম্ভব হইতে পারিয়াছে—এ অপমান সন্ধ্যার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছে; কিন্তু প্রত্যুত্তরে তাহার কোন উল্লেখ করিল না, শুধু বার বার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, না বাবা; আমি কিছুতেই থাকব না, আমি যাবই। আমি সঙ্গে না থাকলে কে তোমাকে দেখবে? কে তোমাকে রেঁধে দেবে?

এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাবার ঔষধগুলি ও বইখানি বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তাহার হাত ধরিয়া কহিল, চল বাবা, আমরা এইবেলা বেরিয়ে পড়ি, নইলে বারোটার ট্রেন হয়ত ধরতে পারা যাবে না।

মায়ের রুদ্ধ ঘরের চৌকাঠের উপর মাথা ঠেকাইয়া সন্ধ্যা প্রণাম করিয়া কহিল, মা, আমরা চললুম। কেবল দু'খানি পরণের কাপড় ছাড়া আর তোমার আমি কিছু নিইনি। বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু ভিতর হইতে কোন সাড়া আসিল না। তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, মা, লাঞ্ছনা আর ঘৃণার সমস্ত কালি মুখে মেখেই আমরা বিদায় নিলাম, তোমাদের সমাজে এর বিচার হবে না—কিন্তু যাদের মহাপাতকের বোঝা নিয়ে আজ আমাদের যেতে হ'লো তাদের বিচার করবার জন্যেও

অন্ততঃ একজনই আছেন, সে কিন্তু একদিন টের পাবে।

ঘরের অভ্যন্তর তেমনি নিস্তব্ধ, দ্বার তেমনি অবরুদ্ধ রহিল; সন্ধ্যা পিতার পিছনে পিছনে বাটীর বাহির হইয়া আসিল। কে একজন অদূরে গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল, সে কাছে আসিতেই প্রিয় জ্যোৎস্নার আলোকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, কে, অরুণ নাকি?

অরুণ কহিল, আজ্ঞে হাঁ! আজ আপনি বারোটার গাড়িতে যাবেন শুনে দেখা করতে এলাম।

প্রিয় কহিলেন, হাঁ। আর এই দেখ না মুস্কিল, মেয়েটা কিছুতেই ছাড়লে না, সঙ্গ নিলে। আমি কোথায় যাই, কোথায় থাকি—দেখ দিকি এর পাগলামি!

অরুণ অবাক্ হইয়া কহিল, সন্ধ্যা, তুমিও যাবে।

সন্ধ্যা শুধু কেবল বলিল, হাঁ।

অরুণ একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া একান্ত সঙ্কোচের সহিত কহিল, সেদিন রাত্রে আমি কিছুতেই মন স্থির করতে পারিনি, কিন্তু আজ নিশ্চয় করেচি, তোমার কথাতেই রাজী হব সন্ধ্যা।

প্রিয় বুঝিতে না পারিয়া শুধু চাহিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা শান্তকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, সেদিন আমিও বড় উতলা হয়ে পড়েছিলাম অরুণদা, কিন্তু আজ আমারও মন স্থির হয়েছে। মেয়েমানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ আছে কি না, আমি সেইটে জানতেই বাবার সঙ্গে যাচ্চি। কিন্তু আর ত আমাদের সময় নেই অরুণদা—পারো ত আমাদের ক্ষমা ক'রো। এই বলিয়া সে পিতার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইয়া পড়িল। অরুণ সঙ্গে সঙ্গে যাইবার উদ্যোগ করিতেই সন্ধ্যা ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, না অরুণদা, আমাদের সঙ্গে আসতে পাবে না, তুমি বাড়ি যাও।

অরুণ কহিল, সন্ধ্যা, এই দুঃখের সময় তোমার মাকে ছেড়ে চললে?

সন্ধ্যা কহিল, কি করব অরুণদা, এতদিন বাপ-মা দু'জনকেই ভোগ করবার সৌভাগ্য ছিল, কিন্তু আজ একজনকে ছাড়তেই হবে। তবু মায়ের বোধ হয় একটা উপায় আছে। কাল অনেকেই ত তামাসা দেখতে এসেছিলেন, কেউ কেউ বলছিলেন নাকি একটা প্রায়শ্চিত্ত আছে। থাকে ভালই। তখন দেখবার লোকের তাঁর অভাব হবে না, কিন্তু আমি ছাড়া আমার বাবাকে সামলাবার যে আর কেউ নেই সংসারে! কিন্তু আর দাঁড়িয়ো না বাবা, চল।

এই বলিয়া তাহারা পুনশ্চ অগ্রসর হইয়া গেল। অরুণ সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একটুখানি পথ আসিয়া দেখিতে পাইল জনকয়েক লোক লুচি, মাছের তরকারি ও বিবিধ মিষ্টান্নের ভূয়সী প্রশংসায় সমস্ত রাস্তাটা মুখরিত করিয়া পান চিবাইতে

চিবাইতে ঘরে চলিয়াছে। তাহাদের আনন্দ ও পরিতৃপ্তি ধরে না। জ্যোৎস্নার আলোকে পাছে ইহারা চিনিয়া ফেলে এই ভয়ে সন্ধ্যা পিতার হাত ধরিয়া পথের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল এবং তাহারা চলিয়া গেলে আবার পথ চলিতে লাগিল।

মোড় ফিরিয়াই ইহাদের ভুরিভোজনের হেতু বুঝা গেল। পার্শ্বের আমবাগানের ভিতর দিয়া গোলোক চাটুয্যেমহাশয়ের বাটী হইতে প্রচুর আলোক এবং প্রচুরতর কলরব আসিতেছে। লুচি আনো, তরকারি এই দিকে, দই কে দিচ্চে, মিষ্টি কই-- প্রভৃতি বহুকণ্ঠ—নিঃসৃত শব্দে সমস্ত স্থানটা জমজম করিতেছে।

প্রিয় কহিলেন, গোলোক চাটুয্যেমশায়ের আজ বৌভাত কিনা। কাজকর্ম্মে চাটুয্যেমশাই খাওয়ায় ভাল। শুনলাম পাঁচখানা গ্রাম বলা হয়েছে—বামুন-শূদ্দুর কেউ বাদ পড়েনি।

সন্ধ্যা অবাক হইয়া কহিল, কার বৌভাত বাবা? গোলোক ঠাকুর্দ্দার!

প্রিয় কহিলেন, হাঁ, প্রাণকৃষ্ণের মেয়েটাকে পরশু বিয়ে করলেন কিনা!

সন্ধ্যার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল, হরিমতী? তার বৌভাত?

প্রিয় কহিলেন, হাঁ হাঁ, হরিমতীই নাম বটে। গরীব বামুন বেঁচে গেল—মেয়েটা বড় হয়ে—কি রে?

কিছু না বাবা, চল, আমরা এখান থেকে একটু তাড়াতাড়ি যাই। এই বলিয়া সন্ধ্যা পিতার হাত ধরিয়া তাঁহাকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া রেল-স্টেশনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

* * * *

পিতাকে লইয়া সে যখন স্টেশনে আসিয়া পৌছিল তখন গাড়ির প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বিলম্ব আছে। পল্লীগ্রামের ছোট স্টেশনে, বিশেষতঃ রাত্রি বলিয়া, লোক কেহ ছিল না, শুধু প্ল্যাটফর্ম্মের একধারে একটা করবীবৃক্ষের অন্ধকার ছায়ায় কে একটি স্ত্রীলোক বসিয়াছিল, সে ইহাদের দেখিবামাত্রই ব্যস্ত হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিল।

প্রিয় সরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু সন্ধ্যার তীক্ষ্ণ চক্ষুকে সে একেবারে ফাঁকি দিতে পারিল না। সন্ধ্যা মিনিটখানেক নিঃশব্দে লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, জ্ঞানদাদিদি, তুমি যে এখানে? একলা যে?

সন্ধ্যা ঠিক চিনিয়াছিল, জ্ঞানদা মুহূর্ত্তে দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সন্ধ্যার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে নিজের দুর্ভাগ্যেই অভিভূত ছিল, ইতিমধ্যে তাহারই পাশের বাড়িতে আর একজন হতভাগিনীর ভাগ্য যে কোন্ অতলে তলাইতেছিল তাহার কিছুই জানিত না, কিন্তু প্রিয় একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা কহিল, তুমি কোথায় যাবে জ্ঞানোদিদি ?

জ্ঞানদার রুদ্ধকণ্ঠ দিয়া শব্দ বাহির হইল না, সে কেবল মাথা নাড়িয়া জানাইল, গন্তব্যস্থল যে কোথায় তাহা সে জানে না।

ইহার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা কহিল না। কিন্তু গাড়ির সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, টিকিট কিনিতে হইবে, তাই প্রিয় অনেক চেষ্টায় স্বর বাহির করিয়া কহিলেন, তুমি কোথায় যাবে জ্ঞানদা ? তোমার কি টিকিট কেনা হয়েছে ?

জ্ঞানদা তেমনি মাথা নাড়িয়া বলিল, না। তাহার পরে অশ্রুবিকৃত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাবেন ?

প্রিয় বলিলেন, বৃন্দাবনে।

সন্ধ্যাও কি সঙ্গে যাবে ?

প্রিয় কহিলেন, হাঁ।

জ্ঞানদা অঞ্চলের গ্রন্থি খুলিয়া কতকগুলি টাকা প্রিয়র কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল, টিকিটের দাম কত আমি জানিনে, কিন্তু এই পঞ্চাশটি টাকা আমার আছে—আমাকেও একখানি বৃন্দাবনের টিকিট কিনে দিন? কেবল এইটুকু আমাকে সঙ্গে নিন, তার বেশী আর আমি পৃথিবীতে কারও কাছে কিছু চাইব না।

প্রিয় ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন, আচ্ছা, চল আমাদেরই সঙ্গে।

———

নিষ্কৃতি

নিষ্কৃতি

১

ভবানীপুরের চাটুয্যেরা একান্নবর্ত্তী পরিবার। দুই সহোদর গিরীশ ও হরিশ এবং খুড়তুতো ছোট ভাই রমেশ। পূর্ব্বে ইহাদের পৈতৃক বাটী ও বিষয়-সম্পত্তি রূপনারায়ণ নদের তীরে হাওড়া জেলার ছোট-বিষ্ণুপুর গ্রামে ছিল। তখন গিরীশের পিতা ভবানী চাটুয্যের অবস্থাও ভাল ছিল। কিন্তু, হঠাৎ একসময়ে রূপনারায়ণ এমনি প্রচণ্ড ক্ষুধায় ভবানীর জমি-জায়গা, পুকুর-বাগান গিলিতে শুরু করিলেন যে, বছর পাঁচ-ছয়ের মধ্যে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না। অবশেষে, সাতপুরুষের বাস্তভিটাটি পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিয়া এই ব্রাহ্মণকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করিয়া নিজের ত্রিসীমানা হইতে দূর করিয়া দিলেন। ভবানী সপরিবারে পলাইয়া আসিয়া ভবানীপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে-সব অনেকদিনের কথা। তাহার পর গিরীশ ও হরিশ উভয়েই উকীল হইয়াছেন, বিস্তর বিষয়-আশায় অর্জ্জন করিয়াছেন, বাটী প্রস্তুত করিয়াছেন—এক কথায়, যাহা গিয়াছিল তাহার চতুর্গুণ ফিরিয়া আনিয়াছেন। এখন বড় ভাই গিরীশের বাৎসরিক আয় প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা, হরিশও পাঁচ-ছয় হাজার টাকা উপায় করেন, শুধু করিতে পারে নাই রমেশ। তবে একেবারে যে কিছুই পারে নাই তাহা নহে। বার দুই-তিন সে আইন ফেল করিতে পারিয়াছিল এবং সম্প্রতি কি একটা ব্যবসায়ে বড়দার হাজার তিন-চার টাকা লোকসান করিয়া এইবার ঘরে বসিয়া খবরের কাগজের সাহায্যে দেশ-উদ্ধারে রত হইয়াছিল।

কিন্তু, এতদিনের এক সংসার এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। তাহার কারণ, মেজবৌ ও ছোটবৌয়ে কিছুতেই আর বনিবনাও হয় না। হরিশ এতকাল কলিকাতায় থাকিতেন না, সপরিবারে মফঃস্বলে থাকিয়া প্র্যাক্‌টিস্‌ করিতেন। তখন মাঝে মাঝে দু-দশ দিনের বাড়ি আসা-যাওয়ার অল্প সময়টুকু এই দুটি নারীর বিশেষ সদ্ভাবে না কাটিলেও কলহ-বিবাদের এরূপ প্রচুর অবসর ছিল না। প্রায় মাসখানেক হইল হরিশ সদরে ফিরিয়া আসিয়া ওকালতি করিতেছেন এবং বাড়ি হইতে সুখশান্তিও পলাইবার উপক্রম করিয়াছে। তবে এবার আসিয়া পর্য্যন্ত দুই জায়ের মন-কষাকষি ব্যাপার এখনও উঁচু পর্দ্দায় উঠে নাই, তাহার কারণ ছোটবৌ এতদিন এখানে ছিল না। রমেশের স্ত্রী শৈলজা তাহার একমাত্র পুত্র পটল ও সপত্নী-পুত্র কানাইলালকে বড়জার হাতে রাখিয়া মরণাপন্ন বাপকে দেখিতে কৃষ্ণনগরে গিয়াছিল। বাপ আরোগ্য হইয়াছেন, সেও দিন-পাঁচ-ছয় ফিরিয়া আসিয়াছে।

বাড়িতে শাশুড়ী এখনও বাঁচিয়া আছেন বটে, কিন্তু বড়বধূ সিদ্ধেশ্বরীই যথার্থ গৃহিণী। তাঁহার প্রকৃতিটা বুঝা যাইত না, এইজন্যই বোধ করি পাড়ায় তাঁহার অখ্যাতি-সুখ্যাতি দুইই একটু অতিমাত্রায় ছিল।

সিদ্ধেশ্বরীর দরিদ্র পিতামাতা এখনও বাঁচিয়া ছিলেন। গত পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া তাঁহারা অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়া এবার পূজার সময় মেয়েকে বাড়ি লইয়া গিয়াছিলেন! সিদ্ধেশ্বরী সংসার ফেলিয়া বেশীদিন সেখানে থাকিতে পারিলেন না, মাসখানেক পরেই ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু কাটোয়ার ম্যালোরিয়া সঙ্গে করিয়া আনিলেন। অথচ, বাড়ি আসিয়া অত্যাচার বন্ধ করিলেন না। তেমনিই প্রাতঃস্নান চলিতে লাগিল এবং কিছুতেই কুইনিন সেবন করিতে সম্মত হইলেন না। অতএব ভুগিতেও লাগিলেন। দুই-চারিদিন যায় জ্বরে পড়েন, আবার উঠেন, আবার পড়েন। ফলে, দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন—এমন সময় শৈল বাপের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়াকড়ি করিয়া দিল। ছেলেবেলা হইতে চিরকাল সে বড়বধূর কাছেই আছে, এজন্য সে যত জোর করিতে পারিত, মেজবৌ কিম্বা আর কেহ তাহা পারিত না। আরও একটা কারণ ছিল। মনে মনে সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে ভারী ভয় করিতেন। শৈল অত্যন্ত রাগী মানুষ এবং এমনি কঠোর উপবাস করিতে পারিত যে, একবার শুরু করিলে কোন উপায়েই তাহাকে জলস্পর্শ করানো যাইত না এইটাই সিদ্ধেশ্বরীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকণ্ঠার হেতু ছিল।

শৈলর মাসীর বাড়ি পটলডাঙ্গায়। এবার কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া অবধি তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে পারে নাই। আজ একাদশী, শাশুড়ীর রান্নার কাজ নাই—তাই সকালেই সিদ্ধেশ্বরীর মেজ ছেলে হরিচরণের উপর মাকে ঔষধ খাওয়াইবার ভার দিয়া সে পটলডাঙ্গায় গিয়াছিল।

শীতকাল। ঘণ্টা-দুই হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। কাল প্রভাত হইতে সিদ্ধেশ্বরীর ভালো করিয়া জ্বর ছাড়ে নাই। আজ এই সময়টায় তিনি লেপ মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া নির্জ্জীবের মত তাঁহার অতি-প্রশস্ত শয্যার একাংশে শুইয়া ছিলেন। এবং এই শয্যার উপরেই তিন-চারটি ছেলেমেয়ে চেঁচামেচি করিয়া খেলা করিতেছিল। নীচে কানাইলাল প্রদীপের আলোকের সম্মুখে বসিয়া ভূগোল মুখস্থ করিতেছিল—অর্থাৎ বই খুলিয়া হাঁ করিয়া হুড়োহুড়ি দেখিতেছিল। ওধারে শয্যার উপর হরিচরণ শিয়রে আলো জ্বালিয়া চিত হইয়া নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িতেছিল। বোধ করি পাশের পড়া তৈরি করিতেছিল, কারণ এত গণ্ডগোলেও তাহার লেশমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল

না। যে শিশুর দলটি এতক্ষণ চেঁচামেচি করিয়া বিছানার উপর খেলিতেছিল ইহারা সকলেই মেজকর্ত্তা হরিশের সন্তান।

বিপিন সহসা সরিয়া আসিয়া সিদ্ধেশ্বরীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, আজ আমার ডানদিকে শোবার পালা, না বড়মা ?

কিন্তু বড়মা জবাব দিবার পূর্ব্বেই নীচে হইতে কানাই ডাক দিয়া বলিল, না বিপিন, তুমি না। বড়মার ডানদিকে আমি শোব যে।

বিপিন প্রতিবাদ করিল, তুমি কাল শুয়েছিলে যে মেজদা ?

কাল শুয়েছিলুম ? আচ্ছা, আচ্ছা, আজ তবে বাঁদিকে।

যেই বলা, অমনি পটলের ক্ষুদ্র মস্তক লেপের ভিতর হইতে উঁচু হইয়া উঠিল, এতক্ষণ প্রাণপণে চুপ করিয়া জ্যাঠাইমার বাঁদিক ঘেঁষিয়া পড়িয়াছিল। বেদখল হইবার সম্ভাবনায় অমন হুড়ো-মুড়িতে পর্য্যন্ত যোগ দিতে ভরসা করে নাই। সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, আমি এতক্ষণ চুপ করে শুয়ে আছি যে!

কানাই অগ্রজের অধিকার লইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল, পটল! বড়ভায়ের সঙ্গে তর্ক ক'রো না বলচি! মাকে বলে দেব।

পটল বেচারা অত্যন্ত বেগতিক দেখিয়া এবার জ্যাঠাইমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া নালিশ করিল, বড়মা, আমি কখন থেকে শুয়ে আছি যে!

কানাই ছোটভাইয়ের স্পর্দ্ধায় চোখ পাকাইয়া 'পটল' বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিয়াই থামিয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে ঘরের বাহিরের বারান্দার একপ্রান্ত হইতে শৈলজার কণ্ঠস্বর আসিল, ওরে বাপরে! দিদির ঘরে কি ডাকাত পড়েচে ?

সঙ্গে সঙ্গে কি পরিবর্ত্তন! ও-বিছানায় হরিচরণ পাঠ্য পুস্তকটা ধাঁ করিয়া বালিশের তলায় গুঁজিয়া দিয়া এবার বোধ করি একখানা অপাঠ্য পুস্তক খুলিয়া বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল—চোখে তাহার জ্বলন্ত মনোযোগ। কানাই বাঁদিক ডানদিকের সমস্যা আপাততঃ নিষ্পত্তি না করিয়াই চীৎকার জুড়িয়া দিল—'যে বিস্তীর্ণ জলরাশি—', আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য ওই শিশুর দলটি। ভোজবাজির মত কোথায় তাহারা যে এক মুহূর্ত্তে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না। শৈলজা কলিকাতা হইতে এইমাত্র ফিরিয়া বড়জার জন্য একবাটি গরম দুধ হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন কানাইলালের 'মহাসমুদ্রের গভীর কল্লোল' ব্যতীত ঘর সম্পূর্ণ স্তব্ধ। ওদিকে হরিচরণ এমন পড়াই পড়িতে লাগিল যে, তাহার পিঠের উপর দিয়া হাতী চলিয়া গেলেও ভ্রূক্ষেপ করিত না। কারণ ইতিপূর্ব্বে সে 'আনন্দমঠ' পড়িতেছিল। তাহার ভবানন্দ জীবানন্দ ছোটখুড়ীমার আকস্মিক শুভাগমনে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, তাহার হাতের কসরতটা তিনি দেখিতে পাইয়াছেন

কি না এবং তাহাই ঠিক অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত বুকের মধ্যে টিপটিপ করিতে লাগিল।

শৈলজা কানাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, ওরে ওই 'বিস্তীর্ণ জলরাশি' এতক্ষণ হচ্ছিল কি?

কানাই মুখ তুলিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত কণ্ঠে চিঁ চিঁ করিয়া বলিল, আমি নয় মা, বিপিন আর পটল।

কারণ ইহারাই তাহার বাঁদিক ডানদিকের মোকদ্দমায় প্রধান শত্রু। সে অসঙ্কোচে এই দুটি নিরপরাধীকে বিমাতার হস্তে অর্পণ করিল।

শৈলজা বলিল, কাউকে ত দেখচিনে, এরা সব পালাল কোথা দিয়ে!

এবারে কানাই বিপুল উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত বাড়াইয়া বিছানা দেখাইয়া বলিল, কেউ পালায়নি মা, সব ঐ লেপের মধ্যে ঢুকেচে।

তাহার কথা ও মুখচোখের চেহারা দেখিয়া শৈলজা হাসিয়া উঠিল। দূর হইতে সে ইহার গলাটাই বেশী শুনিতে পাইয়াছিল। এবার বড়জাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, দিদি, খেয়ে ফেললে যে তোমাকে! হাত তোমার না ওঠে, একবার ধমকাতেও কি পার না? ওরে ওই সব ছেলেরা—বেরো—চল্ আমার সঙ্গে।

সিদ্ধেশ্বরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন, এখন মৃদুকণ্ঠে ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিলেন, ওরা নিজের মনে খেলা কচ্চে, আমাকে বা খেয়ে ফেলবে কেন, আর তোর সঙ্গেই বা যাবে কেন? না না, আমার সামনে কাউকে তোর মার-ধোর করতে হবে না। যা তুই এখান থেকে—লেপের ভিতর ছেলেরা হাঁপিয়ে উঠচে।

শৈলজা একটুখানি হাসিয়া বলিল, আমি কি শুধুই মার-ধোর করি দিদি?

বড্ড করিস্ শৈল! ছোট বোনের মত তিনি নাম ধরিয়া ডাকিতেন। বলিলেন, তোকে দেখলে ওদের মুখ যেন কালিবর্ণ হয়ে যায়—আচ্ছা যা না বাপু তুই সুমুখ থেকে—ওরা বেরুক!

আমি ওদের নিয়ে যাব। অমন করে দিবারাত্রি জ্বালাতন করলে তোমার অসুখ সারবে না। পটল সবচেয়ে শান্ত, সে শুধু তার বড়মার কাছে শুতে পাবে, আর সবাইকে আজ থেকে আমার কাছে শুতে হবে, বলিয়া শৈলজা জজ-সাহেবের মত রায় দিয়া বড়জায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি এখন ওঠো—দুধ খাও—হাঁ রে হরি, সাড়ে ছ'টার সময় তোর মাকে ওষুধ দিয়েছিলি ত?

প্রশ্ন শুনিয়া হরিচরণের মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল। সে সন্তানদিগের সঙ্গে এতক্ষণ বনেজঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, দেশ উদ্ধার করিতেছিল, তুচ্ছ ঔষধ-পথ্যের কথা তাহার মনেও ছিল না। তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী রুষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলেন, ওষুধ-টষুধ আর আমি খেতে পারব না শৈল।

তোমাকে বলিনি দিদি, তুমি চুপ কর, বলিয়া হরিচরণের বিছানার অত্যন্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, তোকে জিজ্ঞেস কচ্চি, ওষুধ দিয়েছিলি ?

তিনি ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বেই হরিচরণ জড়সড় হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিল, ভীতকণ্ঠে বলিল, মা খেতে চান না যে !

শৈলজা ধমক দিয়া উঠিল, ফের কথা কাটে ! তুই দিয়েছিলি কি না, তাই বল ?

খুড়ীর কঠোর শাসন হইতে ছেলেকে উদ্ধার করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বরী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, কেন তুই এত রাত্তিরে হাঙ্গামা করতে এলি বল্ ত শৈল ! ওরে ও হরিচরণ, দিয়ে যা শীগ্‌গির কি ওষুধ-টষুধ আমাকে দিবি।

হরিচরণ একটু সাহস পাইয়া ব্যস্তভাবে শয্যার অপর প্রান্তে নামিয়া পড়িল এবং দেরাজের উপর হইতে একটা শিশি ও ছোট গেলাস হাতে করিয়া জননীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ছিপি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই শৈলজা সেইখান হইতে বলিল, গেলাসে ওষুধ ঢেলে দিলেই হ'লো, না রে হরি ? জল চাইনে, মুখে দেবার কিছু চাইনে, না ? এ ব্যাগারঠ্যালা কাজ তোমাদের আমি বা'র কচ্চি।

ঔষধের শিশিটা হাতে করিতে পাইয়া হরিচরণের হঠাৎ ভরসা হইয়াছিল, বোধ করি ফাঁড়াটা আজিকার মত কাটিয়া গেল। কিন্তু এই 'মুখে দিবার কিছু'র প্রশ্নে তাহা উবিয়া গেল। সে নিরুপায়ের মত এদিকে-ওদিকে চাহিয়া করুণকণ্ঠে বলিল, কোথাও কিছু নেই যে খুড়ীমা।

না আনলে কোথাও কিছু উড়ে আসবে রে ?

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া বলিলেন, ও কোথায় কি পাবে যে দেবে ? এসব কি পুরুষমানুষের কাজ ? শৈলর যত শাসন এই ছেলেদের ওপরে। নীলাকে বলে যেতে পারিস্‌নি ? সে মুখপোড়া মেয়ে তুই আসা পর্য্যন্ত এ-ঘর একবার মাড়ায় না—একবার চেয়ে দেখে না, মা মরচে কি বেঁচে আছে।

সে কি ছিল দিদি, সে আমার সঙ্গে পটলডাঙায় গিয়েছিল যে।

কেন গেল ? কোন্ হিসেবে তুই তাকে নিয়ে গেলি ? দে, হরিচরণ, তুই ওষুধ ঢেলে দে—আমি অমনি খাব, বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী অনুপস্থিত কন্যার উপর সমস্ত দোষটা চাপাইয়া দিয়া ঔষধের জন্য হাত বাড়াইলেন।

একটু থাম্ হরি, আমি আনচি, বলিয়া শৈল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

২

হরিশের স্ত্রী নয়নতারা বিদেশে থাকিয়া বেশ একটু সাহেবিয়ানা শিখিয়াছিল। ছেলেদের সে বিলাতী পোষাক ছাড়া বাহির হইতে দিত না। আজ সকালে সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিকে বসিয়াছিলেন, কন্যা নীলাম্বরী ঔষধের তোড়জোড় সুমুখে লইয়া বসিয়াছিল, এমন সময় নয়নতারা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, দিদি, দরজি অতুলের কোট তৈরি করে এনেচে, কুড়িটা টাকা দিতে হবে যে।

সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, জামার দাম কুড়ি টাকা!

নয়নতারা একটু হাসিয়া বলিল, এ আর বেশী কি দিদি। আমার অতুলের এক একটি সুট তৈরী করতে ষাট-সত্তোর টাকা লেগে গেছে।

'সুট' কথাটা সিদ্ধেশ্বরী বুঝিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। নয়নতারা বুঝাইয়া বলিল, কোট, প্যাণ্ট, নেকটাই—এইসব আমরা সুট বলি।

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষুব্ধভাবে মেয়েকে বলিলেন, নীলা, তোর খুড়ীমাকে ডেকে দে, টাকা বা'র করে দিয়ে যাক।

নয়নতারা বলিল, চাবিটা দাও—আমি বা'র করে নিচ্চি।

নীলা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সেই বলিল, মা কোথা পাবেন, লোহার সিন্দুকের চাবি বরাবর খুড়ীমার কাছে থাকে, বলিয়া চলিয়া গেল।

কথা শুনিয়া নয়নতারার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল! কহিল, ছোটবৌ এতদিন ছিল না, তাই বুঝি দিনকতক সিন্দুকের চাবি তোমার কাছে ছিল দিদি।

সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক করিতে শুরু করিয়াছিলেন, জবাব দিলেন না।

মিনিট-দশেক পরে টাকা বাহির করিয়া দিতে শৈলজা যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিল তখন অতুলের নূতন কোট লইয়া রীতিমত আলোচনা শুরু হইয়া গিয়াছে। অতুল কোটটা গায়ে দিয়া ইহার কাট-ছাঁট প্রভৃতি বুঝাইয়া দিতেছে এবং তাহার মা ও হরিচরণ মুগ্ধচক্ষে চাহিয়া ফ্যাসান সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করিতেছে।

অতুল বলিল, ছোটখুড়ীমা, তুমি দেখ ত কেমন তৈরী করেচে?

শৈল সংক্ষেপে 'বেশ' বলিয়া সিন্দুক খুলিয়া কুড়িটা টাকা গনিয়া তাহার হাতে দিল।

নয়নতারা উপস্থিত সকলকে শুনাইয়া নিজের ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তোর তোরঙ্গভরা পোষাক, তবু তোর আর কিছুতেই হয় না।

ছেলে অধীরভাবে জবাব দিল, কতবার বলব মা তোমাকে? আজকালকার ফ্যাসান এইরকম। কাট-ছাঁট অন্ততঃ একটাও এরকমের না থাকলে লোকে হাসবে

যে! বলিয়া টাকা লইয়া বাহিরে যাইতেছিল, হঠাৎ থামিয়া বলিল, আমাদের হরিদা যা গায়ে দিয়ে বাইরে যায়, দেখে আমারই লজ্জা করে! এখানে ঝুলে আছে, ওখানে কুঁচকে আছে,—ছি ছি, কি বিশ্রীই দেখায়! তারপর হাসিয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিল, ঠিক যেন একটা পাশবালিশ হেঁটে যাচ্ছে!

ছেলের ভঙ্গী দেখিয়া নয়নতারা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। নীলা মুখ ফিরাইয়া হাসি চাপিতে লাগিল।

হরিচরণ করুণচক্ষে ছোটখুড়ির মুখপানে চাহিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

সিদ্ধেশ্বরী নামেমাত্র আহ্নিক করিতেছিল, ছেলের মুখ দেখিয়া ব্যথা পাইলেন। রাগ করিয়া বলিলেন, সত্যিই ত! ওদের প্রাণে কি সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই শৈল? দে না, বাছাদের সব দুটো করে জামা-টামা তৈরী করিয়ে।

অতুল মুরুব্বির মত হাত নাড়িয়া বলিল, আমাকে টাকা দাও জ্যাঠাইমা, আমার দরজিকে দিয়ে দস্তুরমত তৈরী করিয়ে দেব—বাবা, আমাকে ফাঁকি দেবার জো নেই।

নয়নতারা পুত্রের হুঁসিয়ারি সম্বন্ধে কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই শৈল গম্ভীর দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, তোমাকে জ্যাঠামো করতে হবে না বাবা, তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে। ওদের জামা তৈরী করবার লোক আছে। বলিয়া আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া পিঠে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

নয়নতারা সক্রোধে বলিল, দিদি, ছোটবৌর কথা শুনলে? কেন, কি অন্যায় কথাটা অতুল বলেচে শুনি?

সিদ্ধেশ্বরী জবাব দিলেন না। বোধ করি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন, তাই শুনিতে পাইলেন না! কিন্তু শৈল শুনিতে পাইল। সে দু'পা পিছাইয়া আসিয়া মেজজায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ছোটবৌর কথা দিদি অনেক শুনেচে—তুমিই শোননি। অতুল ছোটভাই হয়ে হরিকে যেমন করে ভ্যাঙালে, আর তুমি খিল্‌খিল্ করে হাসলে—ও আমার পেটের ছেলে হলে আজ ওকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতুম। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

ঘরসুদ্ধ সবাই স্তব্ধ হইয়া রহিল। খানিক পরে নয়নতারা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বড়জাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, দিদি, আজ আমার অতুলের জন্মবার, আর ছোটবৌ যা মুখে এল তাই বলে তাকে গাল দিয়ে গেল।

সিদ্ধেশ্বরী দুই জায়ের কলহের সূচনায় নিঃশব্দে সভয়ে ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলেন।

নয়নতারা জবাব না পাইয়া পুনরায় কহিল, তুমি নিজে কিছু না করে দিলে আমাদেরই যা হোক একটা উপায় করে নিতে হবে।

তথাপি সিদ্ধেশ্বরী কথা কহিলেন না। তখন নয়নতারা ছেলেকে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু মিনিট-দশেক পরে সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক সারিয়া গাত্রোত্থান করিতেই মেজবৌ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, কবাটের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র।

সিদ্ধেশ্বরী সভয়ে শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মেজবৌ?

নয়নতারা কহিল, সেই কথাই জানতে এসেচি। আমি কারুর খাইনে পরিনে দিদি যে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ বুজে ঝাঁটা খাবো।

সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বিনীতভাবে বলিলেন, ঝাঁটা মারবে কেন মেজবৌ, ওর ঐরকম কথা। তা ছাড়া তোমাকে ত বলেনি, শুধু—

শুধু অতুলকে জ্যান্ত পুঁত্‌তে চেয়েছিল। আর আমি খিল্‌খিল্‌ করে হাসি! শাক দিয়ে মাছ আর ঢেকো না দিদি—আবার ঝাঁটা কি করে মারে? ধরে মারেনি বলে বুঝি তোমার মন ওঠেনি?

সিদ্ধেশ্বরী অবাক্ হইয়া গেলেন। আস্তে আস্তে বলিলেন, ও কি কথা মেজবৌ? আমি কি তাকে শিখিয়ে দিয়েচি?

মেজবৌ চাবির ব্যাপার হইতেই অন্তরে জ্বলিয়া মরিতেছিল, উদ্ধতভাবে জবাব দিল, সে তুমিই জান। কেউ কারো মন জানতে যায় না দিদি, চোখে দেখে কানে শুনেই বলতে হয়! আমরা নূতন লোক, তোমার সংসারে এসে পড়ে যদি আপদ-বালাই হয়ে থাকি, বেশ ত, তুমি নিজে বললেই ত ভাল হয়, আর একজনকে লেলিয়ে দেওয়া কেন?

এ অভিযোগের উত্তর সিদ্ধেশ্বরীর মুখে যোগাইল না, তিনি বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিলেন।

মেজবৌ অধিকতর কঠোরস্বরে কহিল, আমরাও ঘাস খাইনে দিদি, সব বুঝি। কিন্তু এমন করে না তাড়িয়ে দুটো মিষ্টি কথায় বিদেয় করলেই ত দেখতে শুনতে ভাল হয়, আমরাও স-মানে চলে যাই। উঃ—উনি শুনলে একেবারে আকাশ থেকে পড়বেন। যাকে তাকে বলে বেড়ান, আমাদের বৌঠাকরুণ মানুষ নয়—সাক্ষাৎ ঠাকুরদেবতা।

সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিয়া ফেলিলেন। রুদ্ধস্বরে বলিলেন, এমন অপবাদ আমার শত্রুরেও দিতে পারে না মেজবৌ! এসব কথা ঠাকুরপোকে শোনানোর চেয়ে আমার মরণ ভাল। তোমরা এসেচ বলে আমার কত আহ্লাদ— আমার কানাই পটলকে আনো, আমি তাদের মাথায় হাত দিয়ে—

কথাটা শেষ হইল না। শৈল একবাটি দুধ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আহ্নিক হয়েছে? একটু দুধ খাও দিদি।

সিদ্ধেশ্বরী কান্না ভুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, বেরো আমার সুমুখ থেকে— দূর হয়ে যা।

হঠাৎ শৈল থতমত খাইয়া চাহিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, তোর যা মুখে আসবে তাই লোককে বলবি কেন?

কাকে কি বলেচি?

সিদ্ধেশ্বরী এ প্রশ্ন কানেও তুলিলেন না, তেমনি চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন, আমাকে বলে তোর বুক বেড়ে গেছে—কে তোর কথার ধার ধারে না? সবাইকে তুই দিদি পেয়েচিস্? দূর হ আমার সুমুখ থেকে!

শৈল সহজভাবে বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, দুধ খেয়ে নাও, আমি যাচ্ছি। এ বাটিটায় আমার দরকার!

তাহার নিরুদ্বিগ্ন কথা শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন, খাবো না, কিচ্ছু খাবো না, তুই যা। হয় তুই বাড়ি থেকে বেরো, না হয় আমি বেরোই—দুটোর একটা না করে আমি জলস্পর্শ করব না।

শৈল তেমনি সহজ গলায় বলিল, আমি এই সেদিন এসেচি দিদি, এখন যেতে পারব না। তার চেয়ে বরং তুমিই গিয়ে আর দিনকতক কাটোয়ায় থাক গে—কাছেই গঙ্গা—অমনি বা'র করে নিয়ে গেলেই হবে। আচ্ছা মেজদি, কি তুচ্ছ কথা নিয়ে সকালবেলা তোলপাড় ক'চ্চ বল ত? জ্বরে দিদি আধমরা হয়ে রয়েচে, ওকে কেন বিঁধচ? আমি যদি দোষ করে থাকি আমাকে বললেই ত হয়—কি হয়েচ বল?

সিদ্ধেশ্বরী চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিলেন, আজ অতুলের জন্মদিন, কেন তুই বাছাকে অমন কথা বললি?

শৈল হাসিয়া উঠিল, ওঃ, এই! কিছু ভয় করো না মেজদি—তোমার মত আমিও ত মা। আমার হরিচরণ, কানু, পটল যেমন, অতুলও তেমনি। মায়ের কথায় গাল লাগে না মেজদি; আচ্ছা, আমি তাকে ডেকে আশীর্ব্বাদ করচি—নাও দিদি, তুমি খেয়ে নাও, আমি কড়া চড়িয়ে এসেচি।

সিদ্ধেশ্বরীর মুখে কান্নার সঙ্গে হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, আচ্ছা, তোর মেজদির কাছেও ঘাট মান, তুই তাকেও মন্দ বলেচিস্।

আচ্ছা, মানচি, বলিয়া শৈল তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া হাত দিয়া নয়নতারার পা ছুঁইয়া কহিল, যদি অন্যায় করে থাকি মেজদি, মাপ কর—আমি ঘাট মানচি।

নয়নতারা হাত বাড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরীর বুকের ভারী বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্নেহে, আনন্দে গলিয়া গিয়া নয়নতারার মত ছোটজায়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া মেজজাকে সম্বোধন করিয়া

বলিলেন, এ পাগলীর কথায় কোনদিন রাগ ক'রো না মেঝবৌ। এই আমাকেই দেখ না—ওকে বকি-ঝকি কত কত গাল-মন্দ করি; কিন্তু একদণ্ড দেখতে না পেলে বুকের ভেতর কি যেন আঁচড়াতে থাকে—এত দুধ ত খেতে পারব না দিদি?

পারবে, খাও!

সিদ্ধেশ্বরী আর তর্ক না করিয়া জোর করিয়া সমস্ত খাইয়া ফেলিয়া বলিলেন, এক্ষণি বাছাকে ডেকে আশীর্ব্বাদ করিস্ শৈল।

এক্ষণি করচি, বলিয়া শৈল হাসিয়া খালি বাটিটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

৩

অতুল এমন অপ্রস্তুত জীবনে হয় নাই। শৈশব হইতে আদর-যত্নে লালিত-পালিত; বাপ-মা কোনদিন তাহার ইচ্ছা ও অভিরুচির বিরুদ্ধে কথা কহিতেন না। আজ সকলের সম্মুখে এত বড় অপমান তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া আগুন জ্বালাইয়া দিল। সে বাহিরে আসিয়া নূতন কোটটা মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া প্যাঁচার মত মুখ করিয়া বসিল।

আজ হরিচরণে সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল অতুলের উপর! কারণ তাহারই ওকালতি করিতে গিয়া সে লাঞ্ছিত হইয়াছে—তাই সেও তাহার পাশে আসিয়া মুখ ভারী করিয়া বসিল। ইচ্ছাটা—তাহাকে সান্ত্বনা দেয়, কিন্তু সময়োপযোগী একটা কথাও খুঁজিয়া না পাইয়া মৌন হইয়া রহিল।

কিন্তু অতুলের আর ত চুপ করিয়া থাকা চলে না। কারণ অপমানটাই এক্ষেত্রে তাহার একমাত্র ক্ষোভের বস্তু নয়, সে বিদেশ হইতে অনেক ফ্যাসান, অনেক কোট প্যান্ট নেকটাই লইয়া ঘরে ফিরিয়াছে, নানা রকমে অনেক উঁচুতে তুলিয়া নিজের আসন বাঁধিয়াছে, আজ ছোটখুড়ীমার একটা তিরস্কারের ধাক্কায় অকস্মাৎ সমস্ত ভাঙিয়া—চুরিয়া একাকার হইয়া যায় দেখিয়া সে উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। হরিদাকে উদ্দেশ করিয়া সরোষে বলিল, আমি কারো কথার ধার ধারিনে বাবা! এ শর্ম্মা অতুলচন্দ্র—রেগে গেলে ওসব ছোটখুড়ী-টুড়ি কাউকে কেয়ার করে না।

হরিচরণ এদিকে-ওদিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে প্রত্যুত্তর করিল, আমিও করিনে—চুপ, কানাই আসচে। পাছে নির্ব্বোধ অতুল উহারই সম্মুখে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বসে এই ভয়ে সে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কানাই দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া মোগল বাদশার নকিবের মত উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া কহিল, মেজদা, সেজদা, মা ডাকচেন—শীগ্‌গির।

হরিচরণ পাংশুমুখে কহিল, আমাকে? আমি কি করেচি? আমাকে কথ্খন নয়—যাও অতুল, ছোটখুড়ীমা ডাকচেন তোমাকে।

কানাই প্রভুত্বের স্বরে কহিল, দু'জনকেই—দু'জনকেই—এক্ষণি অ্যাঁ, সেজদা, তোমার নতুন কোট মাটিতে ফেলে দিলে কে?

প্রত্যুত্তরে সেজদা শুধু মেজদার মুখের পানে চাহিল এবং মেজদা সেজদার মুখের পানে চাহিল। কেহই সাড়া দিল না। কানাই ভূলুণ্ঠিত কোটটা চেয়ারের হাতলে তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

হরিচরণ শুষ্ককণ্ঠে কহিল, আমার আর ভয় কি, আমি ত কিছু বলিনি—তুমিই বলেচ ছোটখুড়ীমাকে কেয়ার কর না।

আমি একা বলিনি, তুমিও বলেচ, এই বলিয়া অতুল সগর্ব্বে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। ভাবটা এই যে, আবশ্যক হইলে সে সত্য কথা প্রকাশ করিয়া দিবে।

হরিচরণের চেহারা আরও খারাপ হইয়া গেল। একে ত ছোটখুড়ামা যে কেন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা জানা নাই, তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানহীন অতুল কি যে বলিয়া ফেলিবে তাহাও আন্দাজ করা শক্ত। একবার ভাবিল, সেও পিছনে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বপ্রকার নালিশের রীতিমত প্রতিবাদ করে। কিন্তু কিছুই তাহার সাধ্যায়ত্ত বলিয়া ভরসা হইল না। এদিকে হাজিরার সময় নিকটতর হইয়া আসিয়াছে—কানাই শমন ধরাইয়া গিয়াছে, এবার নিশ্চয় ওয়ারেণ্ট লইয়া আসিবে। হরিচরণ আত্মরক্ষার উপস্থিত আর কোন সদুপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, সহসা গাড়ুটা হাতে তুলিয়া লইয়া বিশেষ একটা স্থানের উদ্দেশ্যে সবেগে প্রস্থান করিল। ছোটখুড়িমাকে বাড়িসুদ্ধ লোক বাঘের মত ভয় করিত।

অতুল ভিতরে ঢুকিয়া সংবাদ লইয়া জানিল, ছোটখুড়ীমা নিরামিষ রান্নাঘরে আছে। সে বুক ফুলাইয়া দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। কারণ, এ বাটীর অন্যান্য ছেলেদের মত সে এই ছোটখুড়ীমাটিকে চিনিবার অবকাশ পায় নাই। স্ত্রীলোকেও যে ইস্পাতের মত শক্ত হইতে পারে ইহা সে জানিতই না। অথচ, সাধারণ দুর্ব্বলচিত্ত ও মৃদু আত্মীয়-আত্মীয়ার কাছে জন্মাবধি প্রশ্রয় পাইয়া তাহার মা, খুড়ী, জ্যাঠাই প্রভৃতি গুরুজন সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ইহাদের মুখের উপর শুধু কড়া জবাব দিতে পারিলেই কাজ পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাটা খুব জোরে প্রকাশ করিতে পারা চাই। তাহা হইলেই ইহারা সায় দেন, অন্যথায় দেন না। যে ছেলে ইহা না পারে তাহাকে চিরকাল ঠকিয়া মরিতেই হয়। এখানে আসিয়া অবধি সে হরিচরণের বেশভূষার অভাব লক্ষ্য করিয়া এই ফন্দিটা গোপনে তাহাকে শিখাইয়াও দিয়াছিল। অথচ, এইমাত্র নিজের বেলায় কোন ফন্দিই খাটে নাই, ছোটখুড়ীমার তাড়া খাইয়া কড়া জবাব ত ঢের দূরের কথা—কোনপ্রকার জবাবই মুখে যোগায়

নাই—হতবুদ্ধির মত নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিল। তাই এখন ফিরিয়া গিয়া সমস্ত অপমান কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দিবার অভিপ্রায়ে সে অমন মরিয়ার মত রান্নাঘরের দ্বারের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই স্থানটা হইতে শৈলজার মুখের কিয়দংশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, এমন কি মুখ তুলিলেই অতুলকে দেখিতে পাইত; কিন্তু রান্নায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় অতুলের পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল না, মুখ তুলিয়া চাহিল না। কিন্তু অতুল খুড়ীমাকে আজ ভাল করিয়া দেখিল নিমিষমাত্র, তথাপি সে অনুভব করিল এ মুখ তাহার মায়ের নয়, জ্যাঠাইমার নয়—এ মুখের সুমুখে দাঁড়াইয়া নিজের অভিপ্রায় জোর করিয়া ব্যক্ত করিবার মত জোর আর যাহারই থাক, অন্ততঃ তাহার গলায় নাই। তাহার বিস্ফারিত বক্ষ আপনি কুঞ্চিত হইয়া গেল এবং সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এটুকু পর্য্যন্ত সাহস হইল না—কোনরকম সাড়া দিয়াও ছোটখুড়ীমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নীলা কি কাজে এদিকে আসিতেছিল। হঠাৎ সেজদার পায়ের দিকে চাহিয়া সে থমকিয়া জিভ কাটিয়া দাঁড়াইল এবং অলক্ষ্যে থাকিয়া ভীত ব্যাকুল ইঙ্গিতে পুনঃ পুনঃ তাহাকে জানাইতে লাগিল জুতা পায় দিয়া দাঁড়াইবার স্থান ওটা নয়।

ছোটখুড়ীমার আনত-মুখের প্রতি কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া অতুল অন্তরে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। একবার মনে করিল নিঃশব্দে সরিয়া যায়, একবার ভাবিল জুতা-জোড়াটা হাতে তুলিয়া লইয়া উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু ছোটবোনের সুমুখে ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ করিতে তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। এই নিষেধটা সে যথার্থ-ই জানিত না এবং স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক তাহা অমান্যও করে নাই। কিন্তু পিতামাতার কাছে নিরন্তর অবারিত ও অসঙ্গত প্রশ্রয়ে তাহার অভিমান এতই সূক্ষ্ম ও তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, একটা কাজ করিয়া ফেলিয়া শেষে ভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইতে তাহার মাথা কাটা যাইত। ভীত বিবর্ণমুখে সেইখানে দাঁড়াইয়া নিজের সর্ব্বনাশ উপলব্ধি করিয়াও সে অভিমানী দুর্য্যোধনের মত সূচ্যগ্রভূমিও পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

শৈলজা মুখ তুলিল। সস্নেহে মৃদু হাসিয়া বলিল, অতুল এসেছিস্? দাঁড়া বাবা—ও কি রে! জুতো পায়ে? নীচে যা—নীচে যা—

বাড়ির আর কোন ছেলে অনুরূপ অবস্থায় শৈলজার হাতে এত সহজে নিষ্কৃতি পাইলে ছুটিয়া পলাইয়া বাঁচিত, কিন্তু অতুল ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শৈলজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, জুতো পায়ে দিয়ে এখানে আসতে নেই অতুল, নীচে যাও!

অতুল শুষ্কভাবে ক্ষীণস্বরে কহিল, আমি ত চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি—এখানে দোষ কি?

শৈলজা ধমকাইয়া উঠিল, দোষ আছে, যাও।

অতুল তথাপি নড়িল না; সে মানসচক্ষে দেখিতে লাগিল, হরিচরণ, কানাই, বিপিন প্রভৃতি আড়াল হইতে তাহার লাঞ্ছনা উপভোগ করিতেছে। তাই বজ্জাত ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, আমরা চুঁচড়ার বাড়িতে ত জুতো পায়ে দিয়েই রান্নাঘরে যেতুম—এখানে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়ালে কিছু দোষ নেই।

ইহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া শৈলজা দুঃসহ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শুধু তাহার দুই চোখ দিয়া যেন আগুন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল!

ঠিক এইসময়ে হরিচরণের বড়ভাই মণীন্দ্র ডাম্বল ও মুগুর ভাঁজিয়া ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে বাহিরে যাইতেছিল। শৈলজার চোখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে খুড়ীমা?

ক্রোধে শৈলজার মুখ দিয়া স্পষ্ট কথা বাহির হইল না। নীলা দাঁড়াইয়াছিল অতুলের পায়ের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, সেজদা জুতো পায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কিছুতে নাবচে না।

মণীন্দ্র হাঁকিয়া কহিল, এই—নেবে আয়!

অতুল গোঁ-ভরে বলিল, এখানে দাঁড়াতে দোষ কি? ছোটখুড়ী আমাকে দেখতে পারে না বলে শুধু যা যা কচ্চে।

মণীন্দ্র তড়াক করিয়া রকের উপর লাফাইয়া উঠিয়া অতুলের গণ্ডে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া কহিল, 'ছোটখুড়ী' নয়—'ছোটখুড়ীমা'; 'কচ্চে' নয়—'কচ্চেন' বলতে হয়—ইতর কোথাকার!

একে মণীন্দ্র পালোয়ান লোক,. চড়ের ওজনটাও ঠিক রাখিতে পারে নাই, অতুল চোখে অন্ধকার দেখিয়া বসিয়া পড়িল।

মণীন্দ্র ভারী অপ্রতিভ হইয়া গেল। এতটা আঘাত করা সে ইচ্ছাও করে নাই, আবশ্যকও মনে করে নাই। ব্যস্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার হাত দুটা ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিবামাত্রই অতুল ক্রোধোন্মত্ত চিতাবাঘের মত মণীন্দ্রের গায়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া এমন সকল মিথ্যা সম্পর্ক ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, যাহা হিন্দুসমাজে থাকিয়া জ্যাঠতুত-খুড়তুত ভাইয়ের মধ্যে হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। মণি প্রথমটা বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে মেডিক্যাল কলেজের উঁচু ক্লাসে পড়ে এবং বয়সে ছোট ভাইয়ের চেয়ে অনেকটাই বড়। তাহারা বড়ভাইয়ের সুমুখে দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া কথা কহিতে পারে না। এ-বাড়িতে ইহাই সে চিরকাল দেখিয়াছে। কেহ যে এইসমস্ত অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ উচ্চারণ করিতে পারে ইহা তাহার কল্পনারও অগোচর। আর তাহার হিতাহিত জ্ঞান রহিল না—অতুলের ঘাড় ধরিয়া সজোরে তাহাকে সানের উপর নিক্ষেপ করিয়া, লাথি

মারিয়া মারিয়া ঠেলিয়া উপর হইতে প্রাঙ্গণের উপর ফেলিয়া দিল। কানাই, বিপিন, পটল প্রভৃতি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রৈ রৈ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। মণীন্দ্রের মা সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, মেজবধূ নির্জ্জন ঘরে বসিয়া গোটা-দুই সন্দেশ গালে দিয়া জল খাইবার উদ্যোগ করিতেছিল—গোলমাল শুনিয়া বাহিরে আসিয়া একেবারে নীলবর্ণ হইয়া গেল। মুখের সন্দেশ ফেলিয়া দিয়া মড়া-কান্না তুলিয়া কাঁপাইয়া আসিয়া ছেলের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। সমস্তটা মিলিয়া এমনি একটা গণ্ডগোল উঠিল যে, বাহির হইতে কর্ত্তারা কাজকর্ম্ম ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন!

শৈলজা রান্নাঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, মণি, তুই বাইরে যা। বলিয়া পুনরায় নিজের কাজে মন দিল। মণি নিঃশব্দে চলিয়া গেল। তাহার পিতা মেজবৌমার উন্মাদ ভঙ্গী দেখিয়া লজ্জা পাইয়া প্রস্থান করিলেন।

এই মহামারী ব্যাপার কতকটা শান্ত হইয়া গেলে হরিশ ছেলেকে প্রশ্ন করিলেন।

অতুল কাঁদিতে কাঁদিতে ছোটখুড়ীর প্রতি সমস্ত দোষারোপ করিয়া কহিল, ও বড়দাকে মারতে শিখিয়ে দিলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

হরিশ চীৎকার করিয়া বলিলেন, ছোটবৌমা, মণিকে যে তুমি খুন করতে শিখিয়ে দিলে, কেন শুনি?

নীলা রান্নাঘরের ভিতর হইতে ছোটখুড়ীর হইয়া জবাব দিল, সেজদা কথা শোনেননি, আর বড়দাকে গালাগালি দিয়েচেন, তাই।

নয়নতারা ছেলের তরফ হইতে বলিল, তবে আমিও বলি ছোটবৌ— তোমার হুকুমে ওকে মেরে ফেলছিল বলেই প্রাণের দায়ে ও গাল দিয়েচে, নইলে গাল দেবার ছেলে ত আমার অতুল নয়।

নয়ই ত! বলিয়া সায় দিয়া হরিশ আরও ক্রুদ্ধস্বরে জানিতে চাহিলেন—তোর ছোটখুড়ীমাকে জিজ্ঞেস কর্ নীলা, উনি কে যে অতুলকে মারতে হুকুম দেন? কথা যখন ও না শুনছিল, তখন কেন আমাদের কাছে নালিশ না করা হ'লো? আমরা উপস্থিত থাকতে উনি শাসন করতে গেলেন কেন?

নীলা এই তিনটি প্রশ্নের একটারও উত্তর দিল না।

সিদ্ধেশ্বরী এতক্ষণ বারান্দার একধারে অবসন্নের মত চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়িত দেহে এই উত্তেজনা অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছিল। একে ত এ সংসারে তিনি ছেলেপুলে মানুষ করা ছাড়া সহজে কোন বিষয়েই কথা কহিতে চাহিতেন না, কারণ তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, ভগবান এ-বাটীর সম্বন্ধে সুবিচার করেন নাই। তাঁহাকে বড়বধূ এবং গৃহিণী করিয়াও উপযুক্ত বুদ্ধি দেন নাই, অথচ শৈলকে সকলের ছোট এবং ছোটবৌ করিয়াও রাশি-প্রমাণ বুদ্ধি দিয়াছেন। হিসাব

করিতে, চিঠিপত্র লিখিতে, কথাবার্তা কহিতে, রোগে শোকে চারিদিকে নজর রাখিতে, সকলকে শাসন করিতে, রাঁধিতে-বাড়িতে, সাজাইতে-গুছাইতে ইহার জুড়ি নাই। তিনি প্রায়ই বলিতেন, শৈল আমার পুরুষমানুষ হইলে এতদিনে জজ হইত। সেই শৈলকে যখন মেজকর্তা কটূক্তি করিতে লাগিলেন, তখন হঠাৎ বোধ করি, ভগবান তাঁহার মাথার মধ্যে গৃহিণীর কর্ত্তব্যবুদ্ধি গুঁজিয়া দিয়া গেলেন।

সিদ্ধেশ্বরী একটু রুক্ষস্বরে বলিয়া ফেলিলেন, বেশ ত মেজঠাকুরপো, তাই যদি হয়, তবে তুমিই বা আমাদের কাছে নালিশ না করে, নিজে শাসন করচ কেন? মা বেঁচে, আমি বেঁচে—ঝি-বৌকে শাসন করতে হয় আমরা করব! তুমি পুরুষমানুষ, ভাশুর—ও কি কথা বাইরে যাও। লোকে শুনলে বলবে কি!

হরিশ লজ্জা পাইয়া বলিলেন, তুমি সর্বদিকে দৃষ্টি রাখলে ভাবনা কি বৌঠাকরুণ। তা হলে কি একজন আর একজনকে বাড়ীর মধ্যে হত্যা করে ফেলতে পারে? বলিয়া বাইরে যাইবার উপক্রম করিতেই তাঁর স্ত্রী বাধা দিয়া বলিল, বেশ ত, দাঁড়িয়ে দেখই না, উনি ঝি-বৌকে কেমন শাসন করেন।

হরিশ সে কথায় আর জবাব না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

৪

দিন-পাঁচেক পরে সকাল হইতেই মেজগিন্নীদের জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী তাহা লক্ষ্য করিয়া দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মিনিটখানেক নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, আজ এসব কি হচ্চে মেজবৌ?

নয়নতারা উদাসভাবে জবাব দিল, দেখতেই ত পাচ্চ।

তা ত পাচ্চি। কোথায় যাওয়া হবে?

নয়নতারা তেমনিভাবে কহিল, যেখানে হোক।

তবু, কোথায় শুনি?

কি করে জানব দিদি, কোথায়? উনি বাসা ঠিক করতে বেরিয়েছেন, ফিরে না এলে বলতে পারিনে।

তোমার ভাশুর শুনেচেন?

তাঁকে শুনিয়ে কি হবে? যাঁর শোনা দরকার, সেই, ছোটগিন্নী শুনেচেন, আড়ালে দাঁড়িয়ে একবার দেখেও গেছেন।

এটা নয়নতারার মিছে কথা। শৈলজার এই সকালবেলাটায় নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না—সে কিছুই জানিত না।

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, দেখ মেজবৌ, এই ভাশুরের মান-মর্য্যাদা তোমরা বুঝলে না, কিন্তু বাইরের লোককে জিজ্ঞাসা করলে শুনতে পাবে, অনেক জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলেই এমন ভাশুর পাওয়া যায়, নইলে পাওয়া যায় না।

নয়নতারা সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; বলিল, আমরা সে-কথা কি জানিনে দিদি? দুজনে দিবারাত্রি বলাবলি করি, শুধু ভাশুর নয়, অনেক পুণ্যে এমন বড়জা মেলে। তোমার বাড়িতে আমরা ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে চাকরের মত থাকতে পারি, কিন্তু এখানে আর একদণ্ডও বাস করতে পারব না।

আজ নয়নতারার কণ্ঠস্বরে এমন একটু আন্তরিকতার আভাস সিদ্ধেশ্বরীর কানে বাজিল যে, তিনি আর্দ্র হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, এ আমার বাড়ি ত নয় মেজবৌ, বাড়ি তোমাদেরই। কোনমতেই তোমাদের আমি আর কোথাও যেতে দিতে পারব না।

নয়নতারা ঘাড় নাড়িয়া করুণকণ্ঠে কহিল, যদি কখন ভগবান তেমন দিন দেন দিদি, তা হলে তোমার কাছে এসেই আমরা থাকব; কিন্তু এখানে একটা দিনও আর থাকতে ব'লো না দিদি। আমার অতুল হয়েচে সকলের চক্ষুশূল; অনুমতি দাও, তাকে নিয়ে আমরা সরে যাই।

সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, সে কি কথা মেজবৌ? দৈবাৎ একদিন একটা কাণ্ড হয়ে গেছে বলে কি সেই কথা মনে রাখতে আছে? অতুল আমাদের ছেলে—

কথাটা শেষ হওয়া পর্য্যন্তও নয়নতারা ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না; বলিয়া উঠিল—কোন কথা মনে রাখতে পারিনে বলে কত বকুনি খেয়ে মরি দিদি। ঐ যখন হ'লো, তখনই হাউমাউ করে কেঁদে-কেটে মরি, কিন্তু একদণ্ড পরে আমি যে গঙ্গাজল সেই গঙ্গাজল—একটি কথাও আমার স্মরণ থাকে না। আমি ত সমস্তই ভুলে গিয়েছিলুম; কিন্তু রাগ করতে পাবে না দিদি—তুমি যতই বল, আমাদের ছোটবৌ সহজ মেয়ে নয়! বাড়িসুদ্ধ সবাইকে শিখিয়ে দিয়েচে, সেই থেকে কেউ আমার অতুলের সঙ্গে কথাটি কয় না। বাছা মুখ চুন করে বেড়ায় দেখেই ত জিজ্ঞেসা করে শুনতে পেলুম। না দিদি, এখানে আমাদের থাকা চলবে না। এক বাড়িতে থেকে ছেলে আমার অমন মন গুমরে গুমরে বেড়ালে ব্যামোতে পড়বে। তার চেয়ে অন্য কোন স্থানে চলে যাওয়াই মঙ্গল। তারও হাড় জুড়োয়, আমিও দুটো নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। বলিয়া ছেলের দুঃখে নয়নতারার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, তাহা সিদ্ধেশ্বরীকেও গলাইয়া দিল। কোন ছেলের কোন দুঃখ সহিবার ক্ষমতাই তাঁহার ছিল না। আঁচল দিয়া মেজবৌর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া রহিলেন। নিঃশব্দে এত বড়ো কঠিন শাস্তি দিবার এত সহজ কৌশল যে সংসারে থাকিতে পারে

তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারিতেন না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাছা রে! বাড়িতে কেউ কি অতুলের সঙ্গে কথা কয় না মেজবৌ?

নয়নতারাও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বসিল, জিজ্ঞেস করেই দেখ না দিদি।

হরিচরণকে সেইখানে ডাকাইয়া আনিয়া সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন।

হরিচরণ তেজের সহিত তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, ও ছোটলোকটার সঙ্গে কে কথা কইবে, মা? বড়দাকে যা মুখে আসে তাই বলে, ছোটখুড়ীমাকে গালাগালি দেয়।

সিদ্ধেশ্বরী হঠাৎ প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। একটু পরে কহিলেন, যা হয়ে গেছে তার আর উপায় কি হরি; যাও, ডেকে কথা কও গে।

হরিচরণ মাথা নাড়িয়া বলিল, ওর কথা বলবার ভাবনা নেই মা! পাড়ার আস্তাবলে অনেক গাড়োয়ান আছে সেইখানে যাক, ঢের বন্ধুবান্ধব জুটে যাবে।

নয়নতারা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, তোর মুখও ত নেহাৎ কম নয় হরি; তুই এমন কথা আমাদের বলিস্! আচ্ছা, সেই ভাল! আমরা গাড়োয়ানদের সঙ্গেই মেলামেশা করতে যাব। ওঠো দিদি, জিনিসপত্রগুলো চাকরটা বেঁধে-ছেঁদে নিক।

হরিচরণ মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, অতুল সকলের সুমুখে দাঁড়িয়ে কান মলবে, নাকখত দেবে, তবে আমরা কথা ক'ব। তা নইলে ছোটখুড়ীমা—না, মা, সে আমরা কেউ পারবো না। বলিয়াই আর কোন তর্কবিতর্কের অপেক্ষা না করিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মেজবৌ মৃদুকণ্ঠে কহিল, ছোটবউ একবার যদি ছেলেদের ডেকে বলে দেয়, তা হলে সমস্ত গোলই মিটে যায়!

সিদ্ধেশ্বরী ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা যায়।

মেজবৌ কহিল, তবেই দেখ দিদি। এইসব ছেলেরা বড় হয়ে তোমাকে মানবে, না ভালবাসবে? বলা যায় না ভবিষ্যতের কথা—নিজের ছেলেমেয়েরা তোমার পর হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমার অতুল-টতুলকে তোমরা যে যাই বল, তাদের মা-অন্ত প্রাণ। আমি বললে সাধ্যি কি তার এমন করে ঘাড় নেড়ে তেজ করে বেরিয়ে যায়। এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু ভাল নয় দিদি।

সিদ্ধেশ্বরী এত কথায় বোধ করি মন দিতে পারেন নাই; নিরীহভাবে জবাব দিলেন, তা বটে। এ-বাড়ির মণি থেকে পটল পর্য্যন্ত সবাই ঐ শৈলর বশে। সে যা বলবে যা করবে, তাই হবে—কেউ আমাকে মানেও না।

এটা কি ভাল?

সিদ্ধেশ্বরী মুখ তুলিয়া বলিলেন, কোন্‌টা? ওরে ও নীলা, তোর খুড়ীমাকে একবার ডেকে দে ত মা।

নীলা কি কাজে এইদিকে আসিতেছিল, ফিরিয়া গেল। নয়নতারা আর কথা কহিল না, সিদ্ধেশ্বরীও উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

শৈলজা ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, জিনিসপত্র বাঁধা হয়েচে—এরা তবে চলে যাক ?

শৈল কিছুই জানিত না, একটু ভীত হইয়া কহিল, কেন ?

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, তা বইকি—কি পাষাণ প্রাণ তোর শৈল! তোর হুকুমে কেউ অতুলের সঙ্গে খেলা করে না, কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত কয় না—কি করে বাছার দিন কাটে, শুনি ? আর নিজের ছেলের দিবারাত্রি শুকনো মুখ দেখে বাপ-মাই বা কেমন করে এখানে বাস করে ? তুই এদের তা হলে এ-বাড়িতে রাখতে চাস্‌নে বল্‌ ?

নয়নতারা চিমটি কাটিয়া কহিল, তা হলে হয়ত সবদিকেই ছোটবৌর ভাল হয়।

শৈলজা এ-কথা কানে তুলিল না। সিদ্ধেশ্বরীকে কহিল, অমন ছেলের সঙ্গে আমি বাড়ির কোনও ছেলেকেই মিশতে দিতে পারিনে দিদি। ও যে কি মন্দ হয়ে গেছে, তা মুখে বলা যায় না।

নয়নতারা আর সহ্য করিতে পারিল না। ক্রুদ্ধ সর্পিণীর মত মাথা তুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, হতভাগী, মায়ের মুখের সামনে তুই অমন করে ছেলের নিন্দে করিস্‌! দূর হ আমার ঘর থেকে। মুখ যেন তোর খসে যায়।

আমি ইচ্ছে করে কখন তোমার ঘর মাড়াইনি মেজদি। কিন্তু তুমি এমনি করেই ছেলের মাথাটি খেয়ে বসে আছ। বলিয়া শৈল শান্তভাবে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিহ্বলের মত বসিয়া রহিলেন। কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুতেই যেন ভাবিয়া পাইলেন না।

নয়নতারা সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাদের মায়া-মমতা ত্যাগ কর দিদি, আমরা সরে যাই। এঁরা মায়ের পেটের ভাই বলেই তুমি এমন করে আমাদের টেনে বেড়াচ্চ; কিন্তু ছোটবৌর এতটুকু ইচ্ছে নয়—আমরা এ-বাড়িতে থাকি।

সিদ্ধেশ্বরী এ-কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, ও যা বলচে, অতুল কেন তাই করুক না। সেও ত ভাল কাজ করেনি মেজবৌ!

আমি কি বলচি—সে ভাল কাজ করেচে দিদি ? জ্ঞান-বুদ্ধি থাকলে কেউ কি বড় ভাইকে গালাগালি দেয়! আচ্ছা, আমি তার হয়ে তোমাদের সকলের পায়ে নাকখত দিচ্ছি; বলিয়া নয়নতারা মাটিতে সজোরে নাক ঘষিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, তাকে তোমরা মাপ করো দিদি, তার মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। বলিয়া নয়নতারা আর একবার বোধ করি মাটিতে নাক ঘষিতে যাইতেছিল—সিদ্ধেশ্বরী হাত বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলিয়া নিজেও চোখ মুছিলেন।

দুপুরবেলা রান্নাঘরে বসিয়া সিদ্ধেশ্বরী অনেক বলিয়া-কহিয়া, অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াও শৈলকে রাজী করাইতে না পারিয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোর মনের কথা খুলেই বল না শৈল, মেজবৌরা চলে যাক।

প্রত্যুত্তরে শৈল মুখ তুলিয়া একবার চাহিল মাত্র। সে চাহনী সিদ্ধেশ্বরীকে অধিকতর ক্রুদ্ধ করিয়া দিল; বলিলেন, আপনার মার পেটের ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমাদের নিয়ে থাকি, আর লোকে আমাদের মুখে চুনকালি দিক। আমার সংসারে বনিয়ে না চলতে পার, যেখানে সুবিধে হয়, সেইখানে তোমরা চলে যাও—আমি আর পারিনে। ওদের চেয়ে তোমরা ত বাপু আমার বেশী আপনার নও। বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন! বোধ করি, তাহার মনে মনে আশা ছিল, এইবার শৈলজা নরম হইয়া আসিবে। কিন্তু সে যখন একটা কথারও জবাব না দিয়া নিঃশব্দে নিজের মনে হাতা-বেড়ি নাড়িয়া-চাড়িয়া রান্না করিতেই লাগিল, তখন তিনি যথার্থই মহাক্রোধভরে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

দুপুরবেলা বড়কর্ত্তা আহারে বসিলে সিদ্ধেশ্বরী পাখার বাতাস করিতে করিতে দুঃখে অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া সেই কথাই তুলিলেন, কহিলেন, মেজবৌদের আর ত এ-বাড়িতে থাকা পোষায় না দেখছি! আজ সকাল থেকেই তাদের জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি হচ্চে।

গিরীশ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, তা বই কি! এমনি ত ছোটবৌয়ের সঙ্গে এক তিলার্দ্ধ বনে না, তার ওপর ছোটবৌ বাড়িতে সব ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছে—কেউ অতুলের সঙ্গে কথা কয় না। সে বেচারা এই ক'দিনে শুকিয়ে অর্দ্ধেক হয়ে গেছে।

এইসময় শৈলজা দুধের বাটি-হাতে দোর-গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং কাপড়-চোপড় আর একবার ভাল করিয়া সামলাইয়া লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পাতের কাছে বাটি রাখিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে শুনাইয়া বলিলেন, এই যে ছোটবৌ—বলিয়াই লক্ষ্য করিলেন, শৈল নিজের নাম শুনিয়া অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল।

ও-পক্ষের যতই দোষ হোক, অতুল ও তাহার জননীর দুঃখে সিদ্ধেশ্বরীর মাতৃহৃদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। কোনমতে একটা মিটমাট হলেই তিনি বাঁচেন। কিন্তু শৈল কিছুতেই বাগ মানিতেছে না দেখিয়া তাঁহার শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল। তাই আজ তাহাকে শাস্তি দিতে তিনি কোমর বাঁধিয়াছিলেন, বলিলেন, এই যে শৈল এখন থেকেই ভাইয়ে ভাইয়ে অসদ্ভাব করে দিচ্ছে, বড় হলে এরা ত লাঠালাঠি মারামারি করে বেড়াবে—এটা কি ভাল?

কর্ত্তা ভাতের গ্রাস মুখে পুরিয়া বলিলেন, বড় খারাপ।

সিদ্ধেশ্বরী কহিতে লাগিলেন, ওর জন্যেই মণি অতুলকে অমন করে ঠ্যাঙালে। আচ্ছা সেও মেরেচে, ও-ও গাল দিয়েচে—চুকে-বুকে গেল, আবার কেন! আবার কেন ছেলেদের কথা কইতে নিষেধ করে দেওয়া! আজ তুমি মণি হরিকে ডেকে বলে দিয়ো—তারা যেন অতুলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে, নইলে ওরা চলে গেলে যে পাড়ার লোকে আমাদের মুখে চুনকালি দেবে। সত্যিই ত আর ছোটবৌয়ের জন্যে মায়ের পেটের ভাই-ভাজকে তুমি ছাড়তে পারবে না!

তা ত নয়ই, বলিয়া তিনি আহার করিতে লাগিলেন।

আচ্ছা, ছোটঠাকুরপো কি কোনদিন কিছু রোজগার করবার চেষ্টা করবে না? এমনি করেই কি চিরকাল কাটাবে?

স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থিত হইবামাত্রই শৈলজা কানে হাত দিয়া দ্রুতপদে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। কর্ত্তা কি জবাব দিলেন, তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিল না। কান পাতিয়া এইসকল প্রসঙ্গ সে কোনদিনই শুনিত না এবং শুনিতে ইচ্ছাও করিত না। কারণ, তাহার মনে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল, তাহার স্বামীর সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রিয় ভিন্ন আর কিছুই হইবে না! অথচ সত্যকে সে আজীবন ভালবাসিত। তাহা প্রিয়ই হোক বা অপ্রিয়ই হোক বলিতে বা শুনিতে কোনদিনই মুখ ফিরাইত না। কিন্তু স্বামীর সম্বন্ধে কেমন করিয়া যে সে তাহার স্বভাবটিকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল তাহা বলা সুকঠিন।

৫

সিদ্ধেশ্বরী যত বড় ক্রোধের উপরেই স্বামীর কাছে নালিশ করিতে শুরু করুন, শৈলকে দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য হইল—কাজটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়া গেল! স্বামী লইয়া খোঁটা দিলে শৈলর দুঃখ এবং অভিমানের অবধি থাকিত না তাহা তিনি জানিতেন।

স্ত্রীকে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া কর্ত্তা মুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং কহিলেন, আমি বেশ করে ধমকে দেব'খন। বলিয়া আহার সমাধা করিয়া পান চর্ব্বণ করিবার সময়টুকুর মধ্যেই সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

বস্তুতঃ গিরীশের স্বভাবটা অদ্ভুত রকমের ছিল। আদালত-মোকদ্দমা ব্যতীত কিছুই তাহার মনে স্থান পাইত না। বাটীর মধ্যে কি ঘটিতেছে, কে আসিতেছে, কে যাইতেছে, কি খরচ হইতেছে, ছেলেরা কি করিতেছে, কিছুই তিনি তত্ত্ব লইতেন না। টাকা রোজগার করিতেন এবং ভালোমন্দ সব কথাতেই সায় দিয়া, যা হোক একটা মতামত প্রকাশ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন।

সুতরাং 'ধমকে দেব'খন' বলিয়া কর্তা যখন কর্তার কর্তব্য শেষ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, তখন সিদ্ধেশ্বরী কথাও কহিলেন না ; কাহাকে ধমকাইবেন—কেন ধমকাইবেন—জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

নয়নতারা পাশের ঘরে আড়ি পাতিয়া সমস্ত শুনিতেছিল, ভাশুর এবং বড়জায়ের মন্তব্য শুনিয়া পুলকিতচিত্তে প্রস্থান করিল। কিন্তু মিনিটকয়েক পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, অমন করে বসে কেন দিদি, বেলা হ'লো, যা হোক চাট্টি মুখে দেবে চল।

সিদ্ধেশ্বরী উদাসভাবে বলিলেন, বেলা আর কোথায়—এই ত সবে এগারোটা।

এগারোটা কি সোজা বেলা দিদি ? তোমার এই অসুখ শরীরে যে বেলা ন'টার মধ্যেই খাওয়া দরকার।

সিদ্ধেশ্বরীর এখন খাওয়া-দাওয়ার কথাবার্তা কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। বলিলেন, তা হোক মেজবৌ, আমি কোনদিনই এত শীগ্‌গির খাইনে—আমার একটু দেরি আছে।

নয়নতারা ছাড়িল না, কাছে আসিয়া হাত ধরিল। কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ঢালিয়া দিয়া কহিল, এইজন্যেই ত পিত্তি পড়ে দেহের এই আকার। আমার হাতে হেঁসেল থাকলে আমি ন'টা পেরুতে দিই ! তুমি না বাঁচলে কার আর কি দিদি, আমাদেরই সর্ব্বনাশ। নাও চল, যা হোক দুটো তোমাকে খাইয়ে দিয়ে একটু সুস্থির হই।

নয়নতারা এক মাসের অধিককাল এখানে আসিয়াছে এবং বড়জায়ের জন্য প্রত্যহ এই দারুণ অস্থিরতা ভোগ করা সত্বেও কেন যে এতদিন নিজেকে সুস্থির করিবার চেষ্টা করে নাই, সিদ্ধেশ্বরী মনে মনে তাহার কারণ বুঝিলেন। কিন্তু কৈতববাদের এমনি মহিমা, সমস্ত বুঝিয়াও আর্দ্রচিত্তে কহিলেন, তুমি আপনার জন বলেই এ-কথাটি আজ বললে মেজবৌ ; নইলে কে আর আমার আছে বল।

নয়নতারা হাত ধরিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে রান্নাঘরে লইয়া গেল এবং নিজের হাতে ঠাঁই করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া, বামুনঠাকরুণের দ্বারা ভাত-বাড়াইয়া আপনি সম্মুখে ধরিয়া দিল।

নিরামিষ দিকের রান্না শৈলজা রাঁধিত। মেজবৌ নীলাকে ডাকিয়া কহিল, তোর ছোটখুড়ীকে বল্ গে ও-হেঁসেলে কি আছে এনে দিতে।

মিনিটখানেক পরে শৈল আসিয়া তরকারি প্রভৃতি সিদ্ধেশ্বরীর পাতের কাছে রাখিয়া দিয়া নীরবে বাহির হইয়া যাইতেছিল—তিনি মেজজাকে লক্ষ্য করিয়া রোগীর কণ্ঠে চিঁ চিঁ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমরা এইসঙ্গে কেন বসলে না মেজবৌ ?

মেজবৌ কহিল, আমরা ত আর তোমার মত মরতে বসিনি দিদি। তুমি খেয়ে ওঠো, আমি তোমার পাতেই বস্‌ব। শৈলজার প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে কহিল, না দিদি, আমি বেঁচে থাকতে কিন্তু আমাদের ফাঁকি দিয়ে

তোমাকে পালাতে দেব না তা বলে দিচ্চি। একটুখানি চুপ করিয়া, ছোটবৌ কত দূরে আছে দেখিয়া লইয়া কহিল, এরা দু'জনে যেমন সহোদর, আমরাও ত তেমনি দুটি বোন। যেখানে যতদূরেই থাকি না কেন দিদি, আমি যত নাড়ীর টানে তোমার জন্যে কেঁদে মরব, আর কি কেউ তেমন করে কাঁদবে? অপরে করবে নিজের ভালোর জন্যে, কিন্তু আমি করব ভেতর থেকে। তুমি এই যে বললে দিদি, আমি ছাড়া তোমার আর কেউ সত্যিকার আপনার জন নেই—এই কথাটি যেন কোনদিন ভুলে যেও না।

সিদ্ধেশ্বরী বিগলীত-কণ্ঠে কহিলেন, এ কি ভোলবার কথা মেজবৌ? এতদিন যে তোমাকে চিনতে পারিনি তার শাস্তিই ত ভগবান আমাকে দিচ্চেন।

মেজবৌ চোখের জল আঁচলে মুছিয়া কহিল, শাস্তি যা কিছু ভগবান যেন আমাকেই দেন দিদি। সমস্ত দোষ আমার, আমিই তোমাকে চিনিনি। একটুখানি থামিয়া পুনরায় কহিল, আজ যদি বা জানতে পেলুম, আমরা তোমার পায়ের ধুলোর যোগ্য নই, কিন্তু জানাবো সে-কথা কি করে দিদি? তোমার কাছে থেকে তোমার সেবা করব, ভগবান সে দিন ত আমাকে দিলেন না। আমরা হয়েচি যে ছোটবৌর দু'চক্ষের বিষ।

সিদ্ধেশ্বরী উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তা হলে সে যেন তার ছেলেপুলে নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকে। আমি তার সাতগুষ্টিকে দুধে-ভাতে খাওয়াব কি নিজের সর্ব্বনাশ করবার জন্যে? খুড়তুত ভাই, ভাজ, তাদের ছেলেপুলে—এই সম্পর্ক। ঢের খাইয়েচি, ঢের পরিয়েচি—আর না; দাসী-চাকরদের মত মুখ বুজে আমার সংসারে থাকতে পারে থাক, না হয় চলে যাক।

অদূরে চৌকাঠ ধরিয়া শৈল দাঁড়াইয়া ছিল, সিদ্ধেশ্বরী তাহা স্বপ্নেও মনে করেন নাই। হঠাৎ তাঁহার আঁচলের চওড়া লাল পাড়টা প্রদীপ্ত অগ্নিরেখার মত সিদ্ধেশ্বরীর চোখের উপর জ্বলিয়া উঠিতেই তিনি গলা বাড়াইয়া দেখিলেন ঠিক পাশের চৌকাঠ ধরিয়া সে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া এতক্ষণের সমস্ত কথোপকথন শুনিতেছে। চক্ষের পলকে ভয়ে তাঁহার আহারের রুচি চলিয়া গেল এবং মেজবৌকে তাহার সমস্ত আত্মীয়তার সহিত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া তিনি আর কোথাও ছুটিয়া পলাইতে পারিলেই যেন এ-যাত্রা রক্ষা পান—তাঁহার এমনি মনে হইল।

মেজবৌ মহা উদ্বিগ্নস্বরে কহিল, ও কি দিদি, শুধু ভাত নাড়চ—খাচ্চ না যে?

সিদ্ধেশ্বরী রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলিলেন, না।

মেজবৌ কহিল, আমার মাথা খাও দিদি, আর দুটি খাও—

তাহার কথাটা শেষ না হইতেই সিদ্ধেশ্বরী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, কেন মিছে কতকগুলো বকচ মেজবৌ, আমি খাব না—যাও তুমি আমার সুমুখ থেকে, বলিয়া

সহসা ভাতের থালাটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন।

নয়নতারা হাঁ করিয়া কাঠের পুতুলের মত চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। কিন্তু বিহ্বল হইয়া নিজের ক্ষতি করিবার লোক সে নয়। সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া গিয়া যেখানে মুখ ধুইতে বসিয়াছিলেন তথায় গিয়া সে তাঁহার হাত ধরিয়া বিনীত-কণ্ঠে কহিল, না জেনে অন্যায় যদি কিছু বলে থাকি দিদি, আমি মাপ চাইচি। তুমি রোগা শরীরে উপোস করে থাকলে আমি সত্যি বলচি, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

সিদ্ধেশ্বরী নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হইয়াছিলেন। ফিরিয়া গিয়া যা পারিলেন নীরবে আহার করিয়া উঠিয়া গেলেন।

কিন্তু নিজের ঘরে বসিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আজ এত ব্যথা তিনি শৈলকে দিলেন কি করিয়া? এবং ইহার অনিবার্য্য শাস্তিস্বরূপ সে যে এইবার তাহার সেই অতি কঠোর উপবাস শুরু করিয়া দিবে ইহাতেও তাঁহার অণুমাত্র সংশয় রহিল না। সুতরাং দুপুরবেলা নীলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিতে পাইলেন খুড়ীমা ভাত খাইতে বসিয়াছেন, তখন তাঁহার আহ্লাদ কতটুকু হইল বলা যায় না, কিন্তু বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। শৈল তাহার চিরদিনের স্বভাব অতিক্রম করিয়া কি করিয়া যে অকস্মাৎ এমন শান্ত এবং ক্ষমাশীল হইয়া উঠিল তাহা কোনমতেই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

গিরীশ এবং হরিশ দুই ভাই আদালত হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় একত্রে জল খাইতে বসিলেন। সিদ্ধেশ্বরী অদূরে ম্লানমুখে বসিয়া ছিলেন—আজ তাঁহার দেহ-মন কিছুই ভালো ছিল না।

গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়াই গিরীশের সকালের কথা স্মরণ হইল। সব কথা মনে না হোক, রমেশকে বকিতে হবে—তাহা মনে পড়িল। দ্বারের কাছে নীলা দাঁড়াইয়া ছিল—তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, তোর ছোটকাকাকে ডেকে আন্ নীলা।

সিদ্ধেশ্বরী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, তাকে আবার কেন?

কেন? তাকে রীতিমত ধমক দেওয়া দরকার। বসে বসে সে যে একেবারে জানোয়ার হয়ে গেল।

হরিশ ইংরাজী করিয়া বলিলেন, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।

সিদ্ধেশ্বরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, না—না, বৌঠান, তুমি তাকে আর প্রশ্রয় দিয়ো না—সে আর ছেলেমানুষটি নয়।

সিদ্ধেশ্বরী জবাব দিলেন না, রুষ্টমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রমেশ তখন বাটীতেই ছিল—দাদার আহ্বানে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। গিরীশ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, অতুলের সঙ্গে তুই ঝগড়া করেচিস কেন?

রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, ঝগড়া করেচি?

গিরীশ ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, আলবত করেচিস্। বলিয়া গৃহিণীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, বড়গিন্নী বলছিলেন, তুই যা মুখে আসে তাই বলে তাকে গালমন্দ করেচিস্। ও কি আমাকে মিথ্যা কথা বললে?

রমেশ অবাক হইয়া সিদ্ধেশ্বরীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী গর্জ্জিয়া উঠিলেন, তোমার কি ভীমরতি ধরেচে? কখন তোমাকে বললুম, ছোটঠাকুরপো অতুলকে গালমন্দ করেচেন?

হরিশ ভ্রম সংশোধন করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, না—না, ছোটবৌমা।

তখন গিরীশ বলিলেন, ছোটবৌমাই বা কেন গালমন্দ করবেন, শুনি?

সিদ্ধেশ্বরী তেমনি সক্রোধে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, সেই বা কেন অতুলকে গালমন্দ করবে! সেও করেনি। আর যদি করেই থাকে, তাকে বলব আমি। তুমি ছোটঠাকুরপোকে খোঁচা দিচ্চ কেন?

গিরীশ কহিলেন, আচ্ছা, তাই যেন হ'লো, কিন্তু তুই হতভাগা এমনি অপদার্থ যে, খড়ের দালালি করে আমার চার-চার হাজার টাকা উড়িয়ে দিলি, আর দেখ গে যা বাগবাজারের খাঁ'দের। এই খড়ের দালালিতে ক্রোড়পতি হয়ে গেল।

হরিশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, খড়ের দালালি?

রমেশ কহিল, আজ্ঞে না, পাটের।

গিরীশ রাগিয়া বলিলেন, তারা আমার মক্কেল—আমি জানিনে, তুই জানিস্? খড়ের দালালি করেই তারা বড়লোক। বিলাতে জাহাজ জাহাজ খড় পাঠাচ্চে।

হরিশ এবং রমেশ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। গিরীশ তাহাদের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, না হয় পাটই হ'লো। এই পাটের দালালী করে তুই কি দু'শ একশও করে আনতে পারিস্‌নে? তোমাদের আমি ত চিরকালটা বসে বসে খাওয়াতে পারব না! 'যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে।' একবার চার হাজার গেছে—গেছেই। কুছ পরোয়া নেই—আর চার হাজার দাও। না হয়, আরো চার হাজার দাও। তা বলে, আমি খেটে মরব, আর তুমি বসে বসে খাবে?

হরিশ মনে মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, সব কাজ শিখতে হয়; নইলে পাটের দালালি ত করলেই হয় না। বার বার এই টাকা নষ্ট করা ত ঠিক নয়।

গিরীশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন, নয়ই ত। আমি পাটের দালালি-

টালালি বুঝিনে, তোমাকে খড়ের দালালি কাল থেকে শুরু করতে হবে। সকালে আমি ব্যাঙ্কের ওপর আট হাজার টাকার চেক দেব। চার হাজার টাকায় খড় কিনবে, চার হাজার টাকা জমা থাকবে। এটা নষ্ট হ'লে তবে ও-টাকায় হাত দেবে—তার আগে নয়। বুঝলে? আমি তোমাদের বসে বসে খাওয়াতে পারব না—যাও।

রমেশ নীরবে চলিয়া গেলে হরিশ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, এই আট হাজার টাকাই জলে গেল ধরে রাখুন। কি বল বৌঠান?

সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া রহিলেন। জবাব না পাইয়া হরিশ দাদার দিকে চাহিয়া কহিলেন, টাকাটা কি সত্যিই ওকে দেবেন নাকি?

গিরীশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সত্যি কি রকম?

হরিশ বলিলেন, এই সেদিন চার হাজার টাকা জলে দিলে, আবার আট হাজার সেই জলেই ফেলতে দেবেন, এ যেন আমি ভাবতেই পারিনে।

গিরীশ কহিলেন, তা হলে তুমি কি রকম করতে বল?

হরিশ বলিলেন, রমেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের জানে কি দাদা? আট হাজারই দিন, আর আট লাখই দিন, আটটা পয়সাও ফিরিয়ে আনতে পারবে না—আমি বাজি রেখে বলতে পারি। এই টাকাটা উপার্জ্জন করে জমাতে কত সময় লাগে একবার ভেবে দেখুন দেখি!

গিরীশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন, ঠিক ঠিক, ঠিক বলেচ। ওকে টাকা দেওয়া মানেই জলে ফেলা, ঠিক ত। ও কি আবার একটা মানুষ!

হরিশ উৎসাহ পাইয়া কহিতে লাগিলেন, তার চেয়ে বরং একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিয়ে করুক। যার যেমন ক্ষমতা তার তেমনি করা উচিত। এই যে ছেলেদের পড়ার জন্যে আমাকে মাসে ২৫ টাকা মাস্টারকে দিতে হচ্চে, এ কাজটাও ত ওর দ্বারা হতে পারে। সেই টাকাটা সংসারে দিয়েও আমাদের কতক সাহায্য করতে পারে। কি বল বৌঠান?

কিন্তু বৌঠান জবাব দিবার পূর্ব্বেই গিরীশ খুশী হইয়া বলিলেন, ঠিক কথা বলেচ হরিশ। কাঠবিড়াল নিয়ে রামচন্দ্র সাগর বেঁধেছিলেন যে। স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, দেখেচ বড়বৌ, হরিশ ঠিক ধরেচে। আমি বরাবর দেখেচি কিনা ছেলেবেলা থেকেই ওর বিষয়-বুদ্ধিটা ভারী প্রখর। ভবিষ্যৎ ও যত ভেবে দেখতে পারে এমন কেউ নয়। আমি ত আর একটু হলেই এতগুলো টাকা নষ্ট করে ফেলেছিলাম। কাল থেকেই রমেশ ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ করে দিক। খবরের কাগজ নিয়ে সময় নষ্ট করবার দরকার নেই।

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, টাকাটা কি তবে দেবে না নাকি?

নিশ্চয়ই না। তুমি বল কি, আবার নাকি আমি টাকা দিই তাকে ?

তবে এমন কথা বলাই বা কেন ?

হরিশ কহিলেন, বললেই যে দিতে হবে তার কোন মানে নাই বৌঠান। আমিও ত দাদার সহোদর, আমারও ত একটা মতামত নেওয়া চাই। সংসারে টাকা নষ্ট হলে আমারও ত গায়ে লাগে !

সেইটেই তোমার আসল কথা ঠাকুরপো, বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

৬

সিদ্ধেশ্বরীর সেবার ভার নয়নতারা গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সেবা এমনি নিরেট, এমনি ভরাট যে. তাহার কোন এতটুকু ফাঁক দিয়া আর কাহারও কাছে ঘেঁষিবার জো ছিল না। সিদ্ধেশ্বরী এমন সেবা তাঁর এতখানি বয়সে কখনও কাহারও কাছে পান নাই। তবুও কেন যে তাঁহার অশান্ত মন অনুক্ষণ শুধু ছল ধরিয়া কলহ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল এ রহস্য জানিত শুধু অন্তর্যামী। সেদিন সকালে সিদ্ধেশ্বরী ছয়মাসের রোগীর মত টলিয়া টলিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্রান্ত দুর্ব্বলকণ্ঠে, বোধ করি বা সুমুখের দেয়ালটাকেই উপলক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনার জন বটে মেজবৌ, সে না থাকলে আমাকে দেখচি বেঘোরে মরতে হত। এমনি সেবাযত্ন আমার মায়ের পেটের বোন থাকলেও করতে পারত না।

শৈল ঘরের ভিতরে রাঁধিতেছিল, সমস্তই শুনিতে পাইল। এই কয়টা দিন সে বড়জায়ের ঘরেও যায় নাই, তাঁহার সঙ্গে কথাও কহে নাই। এখনও চুপ করিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী পুনরায় শুরু করিলেন, আর অপরকে খাওয়ানো-পরানো শুধু অধর্ম্মের ভোগ—ভস্মে ঘি ঢালা। অসময়ে কোন কাজেই আসে না। আর এই আমার মেজবৌ। মুখের কথাটি খসাতে হয় না, হাঁ হাঁ করে এসে পড়ে। আমি হেঁটে গেলে তার বুকে বাজে। আমার পোড়া কপাল যে, এমন মানুষকেও আমি পরের ভাঙচি শুনে পর মনে করেছিলুম।

শৈলর চুড়ির শব্দ, হাতা-বেড়ি নাড়ার শব্দ সবই তাঁহার কানে আসিতেছে। এত কাছে থাকিয়াও সে যখন এত বড় মিথ্যা অভিযোগের কোন জবাব দিল না, তখন আর তাঁহার অধৈর্য্যের সীমা রহিল না। তাঁর চিঁচিঁ কণ্ঠস্বর একমুহূর্ত্তেই প্রবল

ও সতেজ হইয়া উঠিল ; বলিলেন, মায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেচে তা যে কারুকে দিয়ে একটুখানি পড়িয়ে শুনব, আমার সে জোটি পর্য্যন্ত নেই। পরকে খাওয়ান-পরান আমার কিসের জন্য ?

নীলা ছোটখুড়ীর কাছে বসিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেছিল, সেখান হইতে কহিল, সে চিঠি যে মেজখুড়ীমা তোমাকে দু-তিনবার পড়ে শোনালেন মা ? আবার কবে নতুন চিঠি এল ?

তুই সব কথায় গিন্নীপনা করতে যাসনে নীলা, বলিয়া মেয়েকে একটা ধমক দিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, চিঠি শুনলেই হ'লো। তার জবাব দিতে হবে না ? কেন, তোর ছোটখুড়ী কি মরেচে যে আমি ও-পাড়ার লোক ডেকে এনে চিঠির জবাব লেখাব ?

নীলাও রাগ করিয়া বলিল, চিঠি লেখবার কি আর কেউ নেই মা যে, আজ সংক্রান্তির দিনটায় তুমি খুড়ীমাকে মরিয়ে দিচ্ছ ?

আজ সংক্রান্তি, সে কথাটা সিদ্ধেশ্বরীর মনে ছিল না। তিনি একমুহূর্ত্তেই একেবারে পাংশু হইয়া বলিলেন, তুই যে অবাক্ করলি নীলা—বালাই, ষাট ! মরবার কথা আমি তাকে আবার কখন বললুম লা ? পেটের মেয়ে আমাকে মুখনাড়া দেয় ! কাল যার বিয়ে দিয়ে এনে কোলে-পিঠে মানুষ করলুম সে আমার ছায়া মাড়ায় না ; এত যে রোগে ভুগচি, তবুও ত আমার মরণ হয় না ! আজ থেকে আর যদি একফোঁটা ওষুধ খাই ত আমার অতি বড়—

কান্নায় সিদ্ধেশ্বরীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে নিজের ঘরে গিয়া একেবারে মড়ার মত বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

নয়নতারা পাশের বারান্দায় জানালার আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিল। এখন ধীরে ধীরে সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার পায়ের কাছে গিয়া বসিল। আস্তে আস্তে বলিল, একখানা চিঠির জবাব দেবার জন্য আবার তার খোশামোদ করতে যাওয়া কেন দিদি ? আমাকে হুকুম করলে ত দশখানা জবাব লিখে দিতে পারতুম।

সিদ্ধেশ্বরী কথা কহিলেন না, পাশ ফিরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়া শুইলেন।

নয়নতারা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে এখনি কি সেটা লিখে দিতে হবে দিদি ?

সিদ্ধেশ্বরী হঠাৎ রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, তুমি বড় বকাও মেজবৌ। বলচি যে এখন থাক—তুমি পারবে না। তা না।

নয়নতারা রাগ করিল না। যেখানে কাজ আদায় করিতে হয়, সেখানে তার ক্রোধ অভিমান প্রকাশ পাইত না। সে নীরবে উঠিয়া গেল।

বেলা দুটা-আড়াইটার সময় সিদ্ধেশ্বরী মেয়েকে ডাকিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর খুড়ীমা ভাত খেয়েচে রে ?

নীলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, থাবেন না কেন? রোজ যেমন খান তেমনি খেয়েচেন।

হুঁ, বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া রহিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শৈল চিরকালই অত্যন্ত অভিমানী! সামান্য কারণেই সে খাওয়া বন্ধ করিত এবং তাই লইয়া সিদ্ধেশ্বরীর যন্ত্রণার অবধি ছিল না। হাতে ধরিয়া, খোশামোদ করিয়া, গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া, নানা প্রকারে তাহাকে প্রসন্ন করিতে হইত। অথচ সেই শৈল এবার খাওয়া-পরা সম্বন্ধে এত গঞ্জনাতেও কেন যে বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে না, ইহার কোন কারণই তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না! তাহার এই ব্যবহার তাঁহার কাছে যতই অপরিচিত এবং অস্বাভাবিক ঠেকিতে লাগিল, ততই তিনি অন্তরের মধ্যে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কোনমতে একটা প্রকাণ্ড কলহ হইয়া গেলেই তিনি বাঁচেন—কিন্তু তাহার ধার দিয়া শৈল যায় না। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সে তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া যায়। তাহার আচরণে বাড়ির কেহ কিছুই দেখিতে পায় না, শুধু যিনি দশ বছরের মেয়েটিকে বুক দিয়া মানুষ করিয়া আজ এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন, তিনিই কেবল ভয়ার্ত্তচিত্তে অনুক্ষণ অনুভব করেন শৈলর চারিপাশে একটা নির্ম্মম ঔদাসীন্যের গাঢ় মেঘ প্রতিদিনই পুঞ্জীভূত হইয়া তাহাকে শুধু ঝাপ্সা দুর্নিরীক্ষ্য করিয়াই আনিতেছে।

নীলা কহিল, মা, আমি যাই?

মা জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় শুনি?

নীলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী তখন ক্রোধে উঠিয়া বসিয়া চেঁচাইয়া কহিলেন, কোথায় যেতে হবে শুনি? ছোটখুড়ীর সঙ্গে তোর এত কি লা যে, একদণ্ড আমার কাছে বসতে পারিস না? বসে থাক পোড়ারমুখী চুপ করে এইখানে। কোথাও তোকে যেতে হবে না। বলিয়া নিজেই ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়িয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া রহিলেন।

নয়নতারা মৃদু-পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া সস্নেহে অনুযোগের স্বরে কহিল, ছি মা, বড় হয়েচ, দু'দিন পরে শ্বশুরঘর করতে চলে যাবে, এখন যে ক'দিন পাও বাপ-মায়ের সেবা করে নাও। মায়ের কাছে বসবে, দাঁড়াবে, সঙ্গে সঙ্গে থেকে দুটো ভালো কথা শিখে নেবে; এ সময় কি যার-তার সঙ্গে সারাদিন কাটানো উচিত? যাও, কাছে বসে দু'দণ্ড পায়ে হাত বুলিয়ে দাও, দিদি ঘুমিয়ে পড়ুন। রোগা শরীরে অনেকক্ষণ জেগে আছেন।

নীলা মেজখুড়ীমার প্রতি প্রসন্ন ছিল না। মুখ তুলিয়া উত্তপ্তকণ্ঠে কহিল, বাড়ির মধ্যে যার-তার সঙ্গে আর কার সঙ্গে সারাদিন কাটাই মেজখুড়ীমা? তুমি কি খুড়ীমার কথা বলচ?

তাহার রুষ্ট আরক্ত মুখ লক্ষ্য করিয়া নয়নতারা বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল,

আমি কারো কথা বলিনি নীলা, শুধু বলচি, তোমার রোগা মায়ের সেবা-যত্ন করা উচিত।

সিদ্ধেশ্বরী মুখ না ফিরাইয়া বলিলেন, সেবা-যত্ন করবে! আমি মলেই বরঞ্চ ওরা বাঁচে।

নয়নতারা কহিল, ভাল, ওই না হয় ছেলেমানুষ, জ্ঞানবুদ্ধি নেই, কিন্তু ছোটবো ত ছেলেমানুষ নয়। তার ত বলা উচিত, যা নীলা, দু'মিনিট গিয়ে তোর মায়ের কাছে বোস্! না সে নিজে একবার আসবে, না মেয়েটাকে আসতে দেবে।

নীলা কি একটা জবাব দিতে গিয়া মুখ ভারী করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, তোমাকে সত্যি বলচি মেজবৌ, আমার এমন ইচ্ছে করে না যে শৈলর আর মুখ দেখি। আমার যেন সে দুটি চক্ষের বিষ হয়ে গেছে।

নয়নতারা কহিল, অমন কথা ব'লো না দিদি। হাজার হোক, সে সকলের ছোট। তুমি রাগ করলে তাদের আর দাঁড়াবার জায়গা নেই, এ-কথাটা ত মনে রাখতে হবে। ভাল কথা। এ মাসে উনি পাঁচশ টাকা পেয়েছিলেন, তার খুচরো ক'টাকা নিজের হাতে রেখে বাকী টাকা তোমাকে দিতে দিলেন; এই নাও দিদি, বলিয়া নয়নতারা আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া পাঁচখানা নোট বাহির করিয়া দিল।

উদাসমুখে সিদ্ধেশ্বরী হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া বলিলেন, নীলা, যা তোর ছোট-খুড়ীমাকে ডেকে আন্, লোহার সিন্দুকে তুলে রাখুক।

নয়নতারার মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল। এই টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা উপলক্ষ করিয়া সে কল্পনায় যে সকল উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আগাগোড়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। শুধু যে সিদ্ধেশ্বরীর মুখে আনন্দের রেখাটি মাত্র ফুটিল না, তাহা নয়, এই টাকাটা তুলিবার জন্য অবশেষে এই ছোটবৌকেই কিনা ডাক পড়িল—সিন্দুকের চাবি এখনও তাহারই হাতে! বস্তুতঃ এই টাকাটা দেওয়া সম্বন্ধে একটুখানি গোপন ইতিহাস ছিল। হরিশের দিবার ইচ্ছা ছিল না, শুধু নয়নতারা মস্ত একটা জটিল সাংসারিক চাল চালিবার জন্যই স্বামীকে নিরন্তর খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া ইহা বাহির করিয়া আনিয়াছিল। এখন সিদ্ধেশ্বরীর এই নিস্পৃহ আচরণে এতগুলো টাকা ত জলে গেলই, উপরন্তু রোষে ক্ষোভে তাহার নিজের মাথাটা নিজের হাতে ভাঙিয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল।

শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল। ছয়দিনের পরে সে বড়জায়ের মুখের পানে চাহিয়া সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল, দিদি কি আমাকে ডাকছিলে?

শৈলর মুখের মাত্র দুটি কথার প্রশ্নই সিদ্ধেশ্বরীর কানের মধ্যে যেন অজস্র মধু ঢালিয়া দিল। তিনি চক্ষের পলকে বিগলিত চিত্তে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন

হ্যাঁ দিদি, ডাকছিলুম বইকি! অনেকগুলো টাকা বাইরে রয়েছে, তাই নীলাকে বললুম, যা মা তোর খুড়ীমাকে একবার ডেকে আন্, টাকাগুলো তুলে ফেলুক। এই নাও। বলিয়া তিনি শৈলর প্রসারিত ডান হাতের উপর নোট কয়খানি ধরিয়া দিলেন।

আজ আর তাঁহার এমন ইচ্ছা হইল না যে, বলেন, এ কথন কাহার কাছে পাওয়া।

শৈল আঁচলে বাঁধা চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিয়া ধীরে-সুস্থে টাকা তুলিতে লাগিল, চাহিয়া চাহিয়া নয়নতারার অসহ্য হইয়া উঠিল। তথাপি ভিতরের চাঞ্চল্য কোনমতে দমন করিয়া, একটুখানি শুষ্কহাসি হাসিয়া কহিল, তাই তোমার দেওর কাল আমাকে বললেন, দিদি, জাঠতুত-খুড়তুত ভাই ত নয়, মায়ের পেটের বড় ভাই। তাঁর খাব না, পরব না ত আর যাব কোথায়? তবু মাসে মাসে এমনি পাঁচশ-ছ'শ টাকা করেও যদি দাদাকে সাহায্য করতে পারি ত অনেক উপকার।

সিদ্ধেশ্বরীর হাসিমুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি উত্তর না দিয়া শৈলর পানে চাহিয়া রহিলেন। নয়নতারা বোধ করি তাঁহার গাম্ভীর্য্যের হেতু অনুমান করিতে পারিল না। কহিল, শ্রীরামচন্দ্র কাঠবিড়াল নিয়ে সাগর বেঁধেছিলেন। তাই তিনি যখন তখন বলেন, বড়বৌঠান মুখ ফুটে যেন কারো কাছে কিছু চান না; কিন্তু তাই বলে কি নিজেদের বিবেচনা থাকবে না? যার যেমন শক্তি, কাজ করে তাঁকে সাহায্য করা ত চাই। নইলে বসে বসে শুধু গুষ্টিবর্গ মিলে খাবো, বেড়াবো, আর, ঘুমোবো, তা করলে কি চলে? তোমারও ত হরি-মণির জন্যে কিছু সংস্থান করে যাওয়া চাই! আমাদের জন্যে সর্ব্বস্ব উড়িয়ে দিলে ত তোমার চলবে না। ঠিক কিনা, সত্যি করে বল দিদি?

সিদ্ধেশ্বরী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, তা সত্যি বইকি!

শৈল সিন্দুক বন্ধ করিয়া সুমুখে আসিয়া সেই চাবিটা তাহার রিং হইতে খুলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিলেন, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া তীক্ষ্ণ ধীরভাবে কহিলেন, এটা কি হ'লো ছোটবৌ?

শৈল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ক'দিন ধরেই ভেবে দেখছিলুম দিদি, ও চাবি আমার কাছে রাখা আর ঠিক নয়। অভাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়, আমার অভাব চারিদিকে—মতিভ্রম হতে কতক্ষণ, কি বল মেজদি?

নয়নতারা কহিল, আমি ত তোমার কোন কথাতেই নেই ছোটবৌ, আমাকে মিছে কেন জড়াও?

সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, মতিভ্রমটা এতদিন হয়নি কেন, শুনতে পাই কি?

শৈল কহিল, একটা জিনিস হয়নি বলে যে কখনো হবে না, তার মানে নেই। এমনি ত তোমাদের শুধু আমরা খাচ্ছি, পরচি। না পারি পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে,

না পারি গতর দিয়ে সাহায্য করতে। কিন্তু তাই বলে কি চিরকাল করা ভালো?

সিদ্ধেশ্বরী রুদ্ধ রোষে মুখ রাঙা করিয়া কহিলেন, এত ভাল করে থেকে হলি না? এত ভাল-মন্দর বিচার এতদিন তোদের ছিল কোথায়?

শৈল অবিচলিত স্বরে বলিল, কেন রাগ করে শরীর খারাপ করচ দিদি? তোমারও আর আমাদের নিয়ে ভাল লাগচে না, আমার নিজেরও ভাল লাগচে না।

ক্রোধে সিদ্ধেশ্বরীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

নয়নতারা তাঁহার হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দিদির না হয় ভাল না লাগতে পারে, সে কথা মানি, কিন্তু তোমার ভাল লাগচে না কেন ছোটবৌ?

শৈল ইহার জবাব না দিয়াই বাহির হইয়া যাইতেছিল, সিদ্ধেশ্বরী চেঁচাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, বলে যা পোড়ারমুখী, কবে তুই বিদেয় হবি—আমি হরিরনোট দেব! আমার সোনার সংসার ঝগড়া বিবাদে একেবারে পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে দিলি! মেজবৌ কি মিছে বলে যে, কোমরের জোর না থাকলে মানুষের এত তেজ হয় না? কত টাকা আমার তুই চুরি করেচিস্, তার হিসেব দিয়ে যা।

শৈল ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ-চোখ অগ্নিকাণ্ডের মত মুহূর্ত্তকালের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী ছিন্ন-শাখার ন্যায় শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, হতভাগীকে আমি এতটুকু এনে মানুষ করেছিলুম মেজবৌ; সে আমাকে এমনি করে অপমান করে গেল। কর্ত্তারা বাড়ি আসুন, ওকে আমি উঠোনের মাঝখানে যদি না আজ জ্যান্ত পুঁতি ত আমার নাম সিদ্ধেশ্বরী নয়।

৭

সিদ্ধেশ্বরীর স্বভাবে একটা মারাত্মক দোষ ছিল—তাঁহার বিশ্বাসের মেরুদণ্ড ছিল না। আজিকার দৃঢ়নির্ভরতা কাল সামান্য কারণেই হয়ত শিথিল হইতে পারিত। শৈলকে তিনি চিরদিন একান্ত বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু দিন-কয়েকের মধ্যেই নয়নতারা যখন অন্যরূপ বুঝাইয়া দিল, তখন তাঁর সন্দেহ হইতে লাগিল, মূল যে কোথায় তাহাও অনুমান করা তাঁহার কঠিন হইল না। তথাপি সে স্বামী-পুত্র লইয়া এই শহর অঞ্চলে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া কোনমতেই থাকিতে সাহস করিবে না ইহাও তিনি জানিতেন।

রাত্রে বড়কর্ত্তা তাঁহার বাহিরের ঘরে বসিয়া, চোখে চশমা আঁটিয়া গ্যাসের আলোকে নিবিষ্টচিত্তে জরুরী মোকদ্দমার দলিলপত্র দেখিতেছিলেন, সিদ্ধেশ্বরী ঘরে

ঢুকিয়া একেবারেই কাজের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, তোমার কাজকর্ম্ম করে লাভটা কি, আমাকে বলতে পার? কেবল শূয়ারের পাল খাওয়াবার জন্তেই কি দিবারাত্র খেটে মরবে?

গিরীশের খাওয়ার কথাটাই বোধ করি শুধু কানে গিয়াছিল। মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, না, আর দেরি নেই। এইটুকু দেখে নিয়েই চল খেতে যাচ্চি।

সিদ্ধেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, খাওয়ার কথা তোমাকে কে বলচে! আমি বলচি, ছোটবৌয়া যে বেশ গুছিয়ে নিয়ে এবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্চেন। এতদিন যে তাদের এত করলে, সব মিছে হয়ে গেল, সে খবর শুনেচ কি?

গিরীশ কতকটা সচেতন হইয়া বলিলেন, হু, শুনেচি বইকি। ছোটবৌমাকে বেশ করে গুছিয়ে নিতে বল! সঙ্গে কে কে গেল—মণিকে—মোকদ্দমার কাগজাদির মধ্যে অসমাপ্ত কথাটা এইভাবেই থামিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে চেঁচাইয়া উঠিলেন, আমার একটা কথাও কি তোমার কানে তুলতে নেই? আমি কি বলচি, আর তুমি কি জবাব দিচ্চ! ছোটবৌয়া যে বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে।

ধমক খাইয়া গিরীশ চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাচ্চেন?

সিদ্ধেশ্বরী তেমনি উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলেন, কোথায় যাচ্ছে তার আমি কি জানি?

গিরীশ কহিলেন, ঠিকানাটা লিখে নাও না?

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষোভে অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, পোড়া কপাল! আমি নিতে যাব তাদের ঠিকানা লিখে! আমার এমন পোড়া অদৃষ্ট না হবে ত তোমার হাতে পড়ব কেন? বাপ-মা আমাকে হাত-পা বেঁধে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলে না কেন? বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাপ-মা যে তাঁহাকে অপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন, আজ তেত্রিশ বৎসরের পর সেই দুর্ঘটনা আবিষ্কার করিয়া তাঁহার মনস্তাপের অবধি রহিল না। কহিলেন, আজ যদি তুমি দু'চক্ষু বোজো, আমি না হয় কারো বাড়ি দাসীবৃত্তি করে খাবো, সে আমাকে করতেই হবে তা বেশ জানি—আমার মণি-হরি যে কোথায় দাঁড়াবে, তার—, বলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর ক্রন্দন এতক্ষণে মুক্তিলাভ করিয়া একেবারে দুই চক্ষু ভাসাইয়া দিল।

জরুরী মোকদ্দমার দলিল-দস্তাবেজ গিরীশের মগজ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। স্ত্রীর আকস্মিক ও অত্যুগ্র ক্রন্দনে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তিনি ক্রুদ্ধ, গম্ভীরকণ্ঠে ডাক দিলেন, হরে?

হরি পাশের ঘরে পড়িতেছিল। শশব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল।

গিরীশ প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া বলিলেন, ফের্ যদি তুই ঝগড়া করবি ত ঘোড়ার

চাবুক তোর পিঠে ভাঙব। হারামজাদার লেখাপড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, কেবল দিনরাত খেলা আর ঝগড়া! মণি কই?

পিতার কাছে বকুনি খাওয়াটা ছেলেরা জানিতই না। হরি হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, জানিনে।

জান না? তোদের বজ্জাতি আমি টের পাইনে, বটে? আমার সবদিকে চোখ আছে, তা জানিস্? কে তোদের পড়ায়? ডাক্ তাকে?

হরি অব্যক্তকণ্ঠে বলিল, আমাদের থার্ড মাস্টার বীরেনবাবু সকালে পড়িয়ে যান।

গিরীশ প্রশ্ন করিলেন, কেন সকালে? রাত্রে পড়ায় না কেন, শুনি? আমি চাইনে এমন মাস্টার, কাল থেকে অন্য লোক পড়াবে। যা, মন দিয়ে পড়্ গে যা, হারামজাদা বজ্জাত।

হরি শুষ্ক ম্লানমুখে মায়ের মুখের দিকে একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

গিরীশ স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, দেখেচ, আজকালকার মাস্টারগুলোর স্বভাব? কেবল টাকা নেবে, আর ফাঁকি দেবে। রমেশকে বলে দিয়ো, কালই যেন এই পরাণবাবুকে জবাব দিয়ে অন্য মাস্টার রেখে দেয়। মনে করেচে, আমার চোখে ধুলো দিয়ে সে এড়িয়ে যাবে।

সিদ্ধেশ্বরী কোন কথা কহিলেন না। স্বামীর মুখের প্রতি শুধু একটা রোষ-কষায়িত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন এবং গিরীশ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সুচারুরূপে সমাপন করিয়াছেন মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহার কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

টাকা জিনিসটা সংসারে যে আবশ্যকীয় বস্তু, এ খবর সিদ্ধেশ্বরীর যে জানা ছিল না তাহা নয়, কিন্তু সেদিকে এতদিন তাঁহার খেয়াল ছিল না। কিন্তু লোভ একটা সংক্রামক ব্যাধি। নয়নতারার ছোঁয়াচ লাগিয়া সিদ্ধেশ্বরীরও দেহ-মনে এই ব্যাধি ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল।

আজই খাওয়া-দাওয়ার পর শৈল এ-বাটী হইতে বিদায় লইবে, এইরূপ একটা জনশ্রুতিতে সিদ্ধেশ্বরীর বুক ফাটিয়া একটা সুদীর্ঘ ক্রন্দন বাহির হইবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছিল। তিনি সেইটা কোনমতে নিবারণ করিয়া জ্বরের ভান করিয়া বিছানাতেই পড়িয়াছিলেন, নয়নতারা আসিয়া নিকটে বসিল। গায়ে হাত দিয়া জ্বরের উত্তাপ অনুভব করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিল এবং ডাক্তার ডাকা উচিত কিনা জিজ্ঞাসা করিল।

সিদ্ধেশ্বরী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, না।

নয়নতারা বিরক্তির কারণ অনুভব করিয়া ঠিক ওষুধ দিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তাই আমি ভাবছিলুম দিদি, লোকে কি করে হাতে এত টাকা করে। আমাদের পাড়ায় যদুবাবু, গোপালবাবু, হারাণ সরকার কেউ ত আমার বট্‌ঠাকুরের অর্দ্ধেক রোজগার করে না, তবু তাদের কারও লাখ টাকার কম ব্যাঙ্কে জমা নেই। তাদের পরিবারের হাতেও দশ-বিশ হাজারের কম নেই।

সিদ্ধেশ্বরী ঈষৎ আকৃষ্ট হইয়া কহিলেন, কি করে জানলে মেজবৌ?

নয়নতারা কহিল, ইনি যে ব্যাঙ্কের সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁরা সব এঁর বন্ধু কিনা। কাল গোপালবাবুর স্ত্রী আমার কথায় অবিশ্বাস করে বললে, এ কি একটা কথা মেজবৌ যে, তোমার দিদির হাতে টাকা নেই? যেমন করে হোক—

সিদ্ধেশ্বরী জ্বর ভুলিয়া উঠিয়া বসিয়া নয়নতারার সম্মুখে চাবির গোছাটা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, বাক্স পেঁটরা তুমি নিজের হাতে খুলে দেখ না মেজবৌ, সংসার-খরচের টাকা ছাড়া কোথাও যদি লুকোনো একটা পয়সা দেখতে পাও। যা করবে ছোটবৌ। আমার কি একটা কথা বলবার জো ছিল! এমন সোয়ামীর হাতে পড়েছিলুম মেজবৌ, যে কখনো একটা পয়সার মুখ দেখতে পেলুম না। তেমনি শাস্তিও হয়েচে। এখন সে সর্ব্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে—কি করবে তার? কিন্তু আমার হাতে টাকা থাকলে সে টাকা ঘরেই থাকত, না এমনি করে জলে যেত তা বল দেখি মেজবৌ?

মেজবৌ মাথা নাড়িয়া কহিল, সে সত্যি কথা দিদি!

সিদ্ধেশ্বরীর মন শৈলর বিরুদ্ধে আবার শক্ত হইয়া উঠিল। এতদিন যে তিনি নিজেই শৈলকে মানুষ করিয়া নিজের সিন্দুকের চাবি তাহার হাতে দিয়া, আপনি ছোট হইয়া সংসারের মধ্যে তাহাকে বড় করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন সে কথাটা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। বলিলেন, একটা লোক রোজগারী, আর এত বড় সংসার তাঁর মাথায়, তাঁরই বা দোষ দিই কি করে বল দেখি!

নয়নতারা সায় দিয়া বলিল, সে ত সবাই দেখতে পাচ্ছে দিদি!

একটু চুপ করিয়া নয়নতারা মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, আমাদের গাঁয়ের নন্দ মিত্তির একজন ডাকসাইটে কেরানী। ছোটভাইকে মানুষ করতে, লেখাপড়া শিখাতে, তার ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে নিজের হাতে আর কানা-কড়িটি রাখলে না। বড়বৌ বলতে গেলে ধমকে জবাব দিত।

সিদ্ধেশ্বরী কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিলেন, ঠিক আমার দশা আর কি।

নয়নতারা কহিল, তা বইকি। বড়বৌকে নন্দ মিত্তির ধমকে বলত, তোমার ভাবনা কি? তোমার নরেন রইল। তাকে যেমন মানুষ করে উকিল করে দিলুম,

বুড়ো বয়সে সেও আমাদের তেমনি দেখবে। মনে ভেবো, সে তোমার দেওর নয়, সন্তান। কিন্তু এমনি কলিকাল দিদি, সেই নন্দ মিত্তিরের চোখে ছানি পড়ে যখন চাকরিটি গেল, তখন নরেন উকিল—সহোদর ভাই হয়ে দাদাকে টাকা ধার দিয়ে সুদে-আসলে পৈতৃক বাড়িটার অংশ পর্য্যন্ত নীলামে ডেকে নিলে। এখন নন্দ মিত্তির ভিক্ষে করে খায়, আর কাঁদে, স্ত্রীর কথা না শুনেই এখন এই অবস্থা। তবু ত খুড়তুত-জাঠতুত নয়, মায়ের পেটের ভাই।

সিদ্ধেশ্বরী মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন, বল কি মেজবৌ!

নয়নতারা বলিল, মিছে নয় দিদি, এ-কথা দেশশুদ্ধ লোক জানে।

সিদ্ধেশ্বরী আর কথা কহিলেন না। তৎপূর্ব্বে তাঁহার এক একবার মনে হইতেছিল শৈলকে ডাকিয়া নিষেধ করেন, এবং কি করিলে যে তাহাদের যাওয়ার বিঘ্ন ঘটিতে পারে, মনে মনে ইহাও নানারূপ আলোচনা করিতেছিলেন; কিন্তু নন্দ মিত্তিরের দুরবস্থার ইতিহাসে তাঁহার অন্তঃকরণ একেবারে বিকল হইয়া গেল। শৈলকে বাধা দিবার আর চেষ্টামাত্র রহিল না।

গিরীশ তখন আদালতের জন্য প্রস্তুত হইতে উঠি উঠি করিতেছিলেন; রমেশ আসিয়া কহিল, আমি দেশের বাড়িতে গিয়েই থাকব মনে করচি।

কেন?

রমেশ কহিল, কেউ বাস না করলে বাড়ি-ঘর-দোরও ভেঙে-চুরে যায়, আর জমি-জায়গা পুকুরগুলোও খারাপ হয়ে যায়। আমারও এখানে কোন কাজ নেই। তাই বলচি।

বেশ কথা। বেশ কথা। বলিয়া গিরীশ খুশী হইয়া সম্মতি দিলেন।

ছোট ভাইয়ের প্রার্থনার ভিতর যে কত গৃহবিচ্ছেদ, কতখানি মনোমালিন্য প্রচ্ছন্ন ছিল, সে সংবাদ ভদ্রলোক কিছুই জানিতেন না। তিনি আদালতে বাহির হইয়া যাইবার পরেই শৈল বড়জায়ের ঘরের চৌকাঠের নিকট হইতে তাঁহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিল এবং সামান্য একটি তোরঙ্গমাত্র সঙ্গে লইয়া দুই ছেলের হাত ধরিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল!

সিদ্ধেশ্বরী বিছানার ওপর কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিলেন এবং নয়নতারা নিজের দোতলার ঘরের জানালা খুলিয়া দেখিতে লাগিল।

গোটা-দুই প্রকাণ্ড খাট জুড়িয়া সিদ্ধেশ্বরীর বিছানা ছিল। এত বড় শয্যাতেও কিন্তু তাঁহাকে স্থানাভাবে সঙ্কুচিত হইয়া সারারাত্রি কষ্টে কাটাইতে হইত। এ লইয়া তিনি রাগারাগি করিতেও ছাড়িতেন না, আবার বাড়ির কোন ছেলেকে একটা রাত্রিও তিনি কাছ-ছাড়া করিতে পারিতেন না। সমস্ত রাত্রি তাঁহাকে সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত, অনেকবার উঠিতে হইত, কোনদিনই সুস্থ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিতেন না; অথচ শৈল কিংবা আর কেহ যে এইসকল উৎপাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবে এ অধিকারও কাহাকেও দিতেন না। তাঁহার এত বড় অসুখের সময়ও জ্যাঠাইমার বিছানা ছাড়া কোন ছেলেরই কোথাও ঘুমাইবার স্থান ছিল না। কানাইয়ের শোয়া খারাপ, তাহার জন্য একটা স্থান চাই; ক্ষুদে প্রায়ই একটা অপরাধ করিয়া ফেলিত, তাহার জন্য অয়েলক্লথের ব্যবস্থা, বিপিন চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিত, তাহার আর একপ্রকার বন্দোবস্ত, পটলের আড়াই প্রহরের সময় ক্ষুধা বোধ হইত, শিয়রের কাছে সে আয়োজন রাখিতে হইত, খেঁদীর বুকের উপর কানাই পা তুলিয়া দিয়াছে কিনা, পটলের নাকটা বিপিনের হাঁটুর তলায় চাপা পড়িয়াছে কিনা, এই সব দেখিতে দেখিতে আর বকিতে বকিতেই সিদ্ধেশ্বরীর রাত্রি পোহাইত।

আজ শোবার সময় বিছানায় এতখানি জায়গা যে খালি পড়িয়া থাকিবে, শৈলর যাবার সময় সিদ্ধেশ্বরীর সে হুঁস ছিল না। নয়নতারা শতকোটি মাথার দিব্যি দিবার পর তিনি রাত্রে নীচে হইতে খাইয়া ঘরে আসিতেছিলেন, হঠাৎ শৈলর ঘরের দিকে চোখ পড়ায় কে যেন তাঁহার বুকে মুগুর দিয়া মারিল। ঘরে আলো নাই, দরজা দুইটা খোলা—সিদ্ধেশ্বরী মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শয্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, অল্প একটুখানি স্থানের মধ্যে বিপিন এবং ক্ষুদে ঘুমাইতেছে—বাকি বিছানাটা তপ্ত মরুর মত শূন্য খাঁ খাঁ করিতেছে। নিজের অপরিসর স্থানটুকুতে তিনি নীরবে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন; কিন্তু সেই দুটি নিমীলিত চোখের কোণ বাহিয়া তখন তপ্ত-অশ্রুতে তাঁহার মাথার বালিশ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। বাটীর ছেলেদের খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। এ বিষয়ে আপনাকে ছাড়া তিনি আর কাহাকেও একবিন্দু বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার বদ্ধ সংস্কার ছিল, নিজে উপস্থিত না থাকিলেই ছেলেরা নানা প্রকার ফাঁক দিয়া কম খায় এবং এ ফাঁকি তিনি ছাড়া আর কাহারও সাধ্য নাই যে ধরে। দৈবাৎ কোনগতিকে কোন ছেলের খাওয়া চোখে দেখিতে না পাইলে তাহাকে জেরা করিয়া, তাহার পেটে হাত দিয়া অনুভব করিয়া, নানা

রকমে সিদ্ধেশ্বরী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন—সে কিছুতেই তাহার ন্যায্য আহার করে নাই এবং এই অন্যায়টুকু সংশোধন করিতে হতভাগ্য ছেলেটাকে তখনই তাঁহার চোখের উপর দাঁড়াইয়া একবাটি দুধ খাইতে হইত। শৈল ছেলেদের হইয়া মাঝে মাঝে লড়াই করিত; জবরদস্তি খাওয়ানোর অপকারিতা লইয়া তর্ক করিত; কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীকে আন্তরিক ক্রুদ্ধ করিয়া তোলা ভিন্ন তাহাতে আর কোন ফল হইত না। সিদ্ধেশ্বরী যখনই যে ছেলেটার পানে চাহিতেন, তখনই দেখিতেন সে রোগা হইয়া যাইতেছে। এই লইয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা, অশান্তির অবধি ছিল না।

আজ বিছানায় শুইয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, দেশের বাটীর বহুবিধ বিশৃঙ্খলার মধ্যে হয়ত কানাইয়ের খাইয়া পেট ভরে নাই এবং পটল নিশ্চয়ই না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, হয়ত তাহাকে তুলিয়া খাওয়ানো হইবে না, হয়ত সে সারারাত্রি ক্ষুধায় ছটফট করিবে; কল্পনায় যতই এই সকল দুর্ঘটনা তিনি দেখিতে লাগিলেন, ততই রাগে দুঃখে বেদনায় তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল। পাশের ঘরে গিরীশ অকাতরে ঘুমাইতেছিলেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি অনেক রাত্রে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গায়ে হাত দিয়া ঘুম ভাঙাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, মানলুম যেন, পটলকে শৈল নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু কানাই ত আর তার পেটের ছেলে নয়—তার ওপর তার জোর কি?

গিরীশ ঘুমের ঝোঁকে জবাব দিলেন, কিছু না।

সিদ্ধেশ্বরী আশান্বিত হইয়া শয্যাংশে বসিয়া বলিলেন, তা হলে আমরা নালিশ করে দিলে যে তার শাস্তি হয়ে যেতে পারে। পারে কি না, ঠিক বলো।

গিরীশ অসংশয়ে বলিলেন, নিশ্চয় শাস্তি হবে।

সিদ্ধেশ্বরী আশায় আনন্দে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, সে যেন হ'লো; কিন্তু ধরো পটল। তাকে ত আমিই মানুষ করেচি। হাকিমকে যদি বুঝিয়ে বলা যায়, সে আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না, চাই কি ভেবে ভেবে তার শক্ত অসুখ হ'তে পারে, তা হলে হাকিম কি রায় দেবে না যে, সে তার জ্যাঠাইমার কাছে থাকুক? বেশ! অমনি তোমার নাক ডাকচে—আমার কথা বুঝি তবে শোননি। বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর পায়ের উপর সজোরে নাড়া দিলেন।

গিরীশ জাগিয়া উঠিলেন, নিশ্চয় না।

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া বলিলেন, কেন নয়? মা বলেই যে ছেলেকে মেরে ফেলবে মহারাণীর কিছু এমন হুকুম নেই। কালই যদি মেজঠাকুরপোকে দিয়ে উকিলের চিঠি দিই, কি হয় তা হলে? বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী উত্তরের আশায়

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া প্রত্যুত্তরে স্বামীর নাসিকাধ্বনি শুনিয়া রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

সারারাত্রি তাঁহার লেশমাত্র ঘুম আসিল না। কখন সকাল হইবে, কখন হরিশকে দিয়া উকিলের চিঠি পাঠাইয়া ছেলের দাবী করিবেন, চিঠি পাইয়া তাহারা কিরূপ ভীত ও অনুতপ্ত হইয়া কানাইকে রাখিয়া যাইবে, এই সমস্ত আশা ও আকাশ-কুসুমের কল্পনা তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি সজাগ করিয়া রাখিল।

প্রভাত হইতে না হইতে তিনি হরিশের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিয়া বলিলেন, মেজঠাকুরপো, উঠেচ?

হরিশ ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, দেরি করলে চলবে না, এখ্‌খুনি ছোটঠাকুরপোদের নামে উকিলের চিঠি লিখে, দরোয়ান পাঠাতে হবে। তুমি বেশ করে একখানা চিঠি লিখে বলে দাও যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জবাব না পেলে নালিশ করা হবে।

হরিশকে এ-বিষয়ে উত্তেজিত করা বাহুল্য। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া, গলা খাটো করিয়া প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপারটা কি বল দেখি বড়বৌ? বসো, বসো—কি কি নিয়ে গেছে? দাবীটা একটু বেশী করে দেওয়া চাই। বুঝলে না?

সিদ্ধেশ্বরী খাটের উপর আসন গ্রহণ করিয়া, চক্ষু প্রসারিত করিয়া তাঁহার দাবীটা বিবৃত করিলেন।

বিবরণ শুনিয়া হরিশের হর্ষোজ্জ্বল মুখ কালি হইয়া গেল। কহিলেন, তুমি কি ক্ষেপেচ বড়বৌঠান? আমি বলি, বুঝি আর কিছু। তাদের ছেলে তারা নিয়ে গেছে, তুমি করবে কি?

সিদ্ধেশ্বরী বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, তোমার দাদা যে বললেন, নালিশ করলে তাদের সাজা হয়ে যাবে।

হরিশ কহিলেন, দাদা এমন কথা বলতেই পারেন না। তোমাকে তামাসা করেচেন।

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া কহিলেন, এতটা বয়স হ'লো তামাসা কাকে বলে বুঝিনে ঠাকুরপো? তোমার মনোগত ইচ্ছে নয় যে, ছেলে দুটোকে কাছে আনি। তাই কেন স্পষ্ট করে বল না?

হরিশ লজ্জিত হইয়া তখন বহু প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, এ দাবী আদালত গ্রাহ্য করবে না। তার চেয়ে বরং আর কোন দাবী-দাওয়া উত্থাপন করিয়া জব্দ করা যাইতে পারে। আমাদের উচিত এখন তাই করা।

সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, তোমার উচিত তোমার থাক ঠাকুরপো; আমার তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেচে, এখন মিথ্যে দাবী-দাওয়া

করতে পারব না। পরকালে আমার হয়ে ত আর তুমি জবাব দিতে যাবে না! তুমি না লেখো, আমি মণিকে পাঠিয়ে নগেনবাবুর কাছ থেকে লিখিয়ে আনি গে। বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

পরদিন সকালবেলায় কি একটা কাজে বাজার-খরচের হিসাব লইয়া সিদ্ধেশ্বরী বাড়ির সরকার গণেশ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বচসা করিতেছিলেন। সে বেচারা নানাপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল যে, বারো গণ্ডা টাকার উপর আরও দু'টাকা খরচ হওয়াতেই পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। গৃহিণী এ কর্ম্মে নূতন ব্রতী। তাঁহার নূতন ধারণা—তাঁহাকে নির্ব্বোধ পাইয়া সবাই টাকা চুরি করে। অতএব চক্রবর্ত্তীও যে চুরি করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তর্ক করিতেছিলেন, পঞ্চাশ টাকা যে এক আঁজলা টাকা গণেশ! আমি লেখাপড়া জানিনে বলেই কি তুমি বুঝিয়ে দেবে যে, বারো গণ্ডার ওপর মোটে দুটি টাকা বেশী খরচ হয়েচে বলে এই পঞ্চাশটে টাকা সব খরচ হয়ে গেছে—আর কিছু নেই? আমি কি এতই বোকা!

গণেশ ব্যাকুল হইয়া বলিল, মা, দিদিকে ডেকে না হয়—

নীলাকে ডেকে হিসেব বুঝতে হবে? সে আমার চেয়ে বেশি বুঝবে? না গণেশ, ওসব ভাল কথা নয়। শৈল নেই বলেই যে তোমার যা ইচ্ছে তাই করে হিসেব দেবে সে হবে না বলচি। না সে যাবে, না আমাকে এত ঝঞ্চাট পোয়াতে হবে। পোড়ারমুখীকে দশ বছরের মেয়ে বৌ করে ঘরে আনলুম, বুকে করে মানুষ করে এত বড় করলুম, এখন তেজ করে বাড়ির দু'-দুটো ছেলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তা যাক। আমিও খবর রাখচি। কানাই-পটলের কোনদিন এতটুকু অসুখ শুনতে পেলে দেখব, কেমন করে সে ছেলে রাখে? তা এখন যাও—দুপুরবেলা মনে করে বলে যেয়ো, এতগুলো টাকা কোথায় কি করলে। বলিয়া গণেশকে বিদায় দিলেন।

সে বেচারা হতবুদ্ধি হইয়া বাইরে চলিয়া গেল।

মেজবৌ আসিয়া কহিল, দিদি, বলতে পারিনে কিন্তু আমিও সংসার চালিয়েচি, টাকাকড়ি হিসাব-পত্র সব রেখেচি। ছোটবৌ নেই বলে যে এত ঝঞ্চাট তুমি সহ্য করবে, আর আমি বসে বসে দেখব, ভাল নয়। আমার কাছে কারো চালাকি করে হিসেবে গোল করবার জো নেই।

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, সে ত ভাল কথা মেজবৌ। আমার এই রোগা শরীরে এত হাঙ্গামা ভাল লাগে! শৈল ছিল—যেখানকার যত টাকা তার হিসেব করা, খরচ করা, ব্যাঙ্কে পাঠানো সমস্তই তার কাজ। এসব কি আর আমাকে দিয়ে হয়?

বেশ ত, এখন থেকে তুমিই বয়ো মেজবৌ। বলিয়া সিন্দুকের চাবিটা কিন্তু নিজের আঁচলেই বাঁধিয়া ফেলিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। নয়নতারা সহস্র কৌশল উদ্ভাবন করিয়াও লোহার সিন্দুকের চাবিটা আর নিজের আঁচলে বাঁধিতে সমর্থ হইল না। নয়নতারা অত্যন্ত কৌশলী এবং চতুর, অনেকখানি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিতে পারিত। কিন্তু এই একটা তাহার বড় রকমের গোড়ায়-গলদ হইয়া গিয়াছিল যে, স্বার্থের জন্য নিরীহ লোকের মনে সংশয়ের বীজ বপন করিলে যথাকালে তাহার ফলভোগ হইতে নিজেকেও দূরে রাখা যায় না। সে শত্রুপক্ষকেও যেমন সন্দেহ করিতে শিখে, মিত্রপক্ষের উপরও তেমনি বিশ্বাস হারায়। সুতরাং সিদ্ধেশ্বরী যে মুহূর্তে ছোটবৌয়ের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন, মেজবৌকেও ঠিক সেই মুহূর্তেই অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছেন।

৯

কোন একটা অভাব লইয়া—তা সে যত গুরুতরই হোক, মানুষ অনন্তকাল শোক করিতে পারে না। সিদ্ধেশ্বরীর কাছে তাঁহার শয্যার শূন্যতা ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। শৈলর ঘরের দিকটা তিনি মাড়াইতেই পারিতেন না, এখন সে বারান্দা স্বচ্ছন্দে পার হইয়া যান—মনেও পড়ে না। কানাই-পটলের সংবাদ তিনি বিবিধ উপায়ে সংগ্রহ করিবার জন্য অহরহ উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, এখন সে উৎকণ্ঠার অর্দ্ধেক তিরোহিত হইয়া গেল। এইরূপে সুখে-দুঃখে এক বৎসর ঘুরিয়া গেল।

সেদিন হঠাৎ সিদ্ধেশ্বরীর কানে গেল যে, দেশের বিষয় লইয়া আজ ছয় মাস ধরিয়া ছোট দেবরের সহিত তাঁহাদের মামলা চলিতেছে। মোকদ্দমা চালাইতেছে হরিশ নিজে। দেওয়ানি ত চলিতেছেই, গোটা-দুই ফৌজদারী ইতিমধ্যে হইয়া গেছে। খবর শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরী ভয়ে ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন।

স্বামীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার মত সংবাদ জানার সুবিধা হইবে না জানিয়া তিনি সন্ধ্যার সময় হরিশের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, বল কি ঠাকুরপো, ছোটঠাকুরপো করেচে তোমার দাদার সঙ্গে মামলা?

হরিশ উচ্চ অঙ্গের একটুখানি হাস্য করিয়া কহিলেন, তাই ত হচ্চে বৌঠান!

সিদ্ধেশ্বরী মুখ পাংশুবর্ণ করিয়া বলিলেন, আমার যে বিশ্বাস হয় না মেজঠাকুরপো। এখনো যে চন্দ্র-সূয্যি উঠছে।

নয়নতারা খাটের একধারে বসিয়া খোঁদিকে ঘুম পড়াইতেছিল, মৃদুস্বরে কহিল, সে ত উঠচেই দিদি। আর এই ছোটদেওরকেই তোমরা হাজার হাজার টাকা ব্যবসা করতে দিতে। সে-সব ত তখন যায়নি, যাচ্চে এখন।

সিদ্ধেশ্বরী দুঃসহ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মোকদ্দমা কেন?

হরিশ বলিলেন, কেন। দেখলুম, মোকদ্দমা না করে উপায় নেই। দেশের বিষয়ই বিষয়। দেখলুম, আমরা গেলে আমাদের মণি হরি বিপিন খুদে এক কাঠা জমি-জায়গা ত পাবেই না—দেশের বাড়িতে ঢুকতে পর্য্যন্ত পাবে না। ধর না বড়বৌ, দেশে যা কিছু আছে, সে-ই সমস্ত দখল করে বসে গেছে। খাজনাপত্র আদায় করচে খাচ্চে-দাচ্চে—একটা পয়সা পর্য্যন্ত দেবার নাম করে না। বিষয় যা-কিছু তা ত দাদাই করেচেন অথচ দাদার চিঠির একটা জবাব পর্য্যন্ত দিলে না—এমনি নেমকহারাম রমেশ। আমিও বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে তবে ছাড়ব এই আমার প্রতিজ্ঞা।

সিদ্ধেশ্বরী আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তারাই বা ছেলেপুলে নিয়ে যাবে কোথায়?

হরিশ বলিলেন, সে খবরে আমাদের ত দরকার নেই বড়বৌ।

সিদ্ধেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দাদা কি বললেন?

হরিশ বলিলেন, দাদা যদি তেমন হতেন, তা হলে ত ভাবনা ছিল না বড়বৌ। যখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, রমেশ তাঁর খেয়ে-পরে, তাঁর টাকায় তাঁরই বিষয়ে নিয়ে গোলযোগ বাধিয়েচে, তখনই তিনি মত দিলেন। ফৌজদারীতে রমেশ ত দাদাকেই জড়িয়ে তোলবার চেষ্টায় ছিল। অনেক কষ্টে আমাকে সেটা ফাঁসাতে হয়েচে।

নয়নতারা ফিসফিস করিয়া বলিল, আচ্ছা, ছোটঠাকুরপোই যেন দোষী, কিন্তু আমি কেবল ভাবি দিদি, ছোটবৌ কি করে এতে মত দিলে? আমরা আর সবাই দুষ্টু বজ্জাত হতে পারি, কিন্তু সে তার বট্‌ঠাকুরকে ত চেনে। তাঁকে জেলে দিয়ে সে কি সুখ পেত?

সিদ্ধেশ্বরীর আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিল। তিনি আর একটি কথাও না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তথা হইতে আসিয়া সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরীশ যথারীতি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মুখ তুলিয়া স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিতেই তাঁহার অস্বাভাবিক

পাণ্ডুরতা আজ তাঁহারও চোখে পড়িল। হাতের কাগজখানা রাখিয়া দিয়া বলিলেন, আজ কখন জ্বর এল?

সিদ্ধেশ্বরী অভিমানভরে কহিলেন, তবু ভালো, জিজ্ঞাসা করলে।

গিরীশ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, বিলক্ষণ। জিজ্ঞেসা করিনি ত কি? পরশুও ত মণিকে ডেকে বললুম, তোর মাকে ওষুধ-টষুধ দিস্? তা আজকালকার ছেলেগুলো হয়েচে সব এমনি যে, বাপ-মাকে পর্য্যন্ত মানে না।

সিদ্ধেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, বুড়ো বয়সে মিথ্যে কথাগুলো আর ব'লো না। পনের দিন হয়ে গেল, মণি তার পিসীর ওখানে এলাহাবাদে গেছে, আর তুমি তাকে পরশু জিজ্ঞাসা করলে! কখনো যা করোনি, তা কি আজ করবে? তা নয়, আমি সেজন্তে আসিনি। আমি এসেচি জানতে, ব্যাপারটা কি? ছোটঠাকুরপোর সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা কিসের?

গিরীশ মহা খাপ্পা হইয়া উঠিলেন, সেটা একটা চোর! চোর! একেবারে লক্ষীছাড়া হয়ে গেছে; বিষয়-পত্র সব নষ্ট করে ফেললে। সেটাকে দূর করে না দিলে দেখচি আর ভদ্রস্থ নেই--সমস্ত ছারখার ধ্বংস করে দিলে।

সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা তা যেন দিলে, কিন্তু মামলা-মোকদ্দমা ত শুধু শুধু হয় না, টাকা খরচ করা ত চাই? ছোটঠাকুরপো টাকা পাচ্ছে কোথায়?

ইতিমধ্যে হরিশ নামিয়া আসিয়া ছেলেদের পড়িবার ঘরে যাইতেছিলেন, দাদার উচ্চকণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিলেন। তিনি জবাব দিলেন—টাকার কথা ত এইমাত্র মেজবৌ বলে দিলেন বড়বৌঠান। পাটের দালালির নাম করে দাদার কাছ থেকে হাজার-চারেক নিয়েছিল, সেটা ত হাতে আছেই; তা ছাড়া, ছোটবৌমার হাতেই এতদিন টাকাকড়ি সমস্ত ছিল—বুঝেই দেখ না।

গিরীশ পুনরায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে, কিছু কি আর রেখেচে হে হরিশ। সেটা একেবারে বেহেড লক্ষীছাড়া হয়ে গেছে। শুক্রবার দিন কোর্টে এসে বলে, বাড়ি-ঘর-দোর মেরামত করতে হবে, পাঁচশ' টাকা চাই।

হরিশ অবাক্ হইয়া গেলেন, বলেন কি? সাহস ত কম নয়।

গিরীশ কহিলেন, সাহস বলে সাহস। একেবারে লম্বা ফর্দ্দ—এখানটা সারাতে হবে, ওখানটা গাঁথতে হবে, এটা না বদলালে নয়, ওটা না করলেই চলে না। শুধু কি তাই। সংসারের অনটন—শীতের কাপড় চোপড় কিনতে হবে—ধান কিনে, আলু কিনে রাখতে হবে—এমনি হাজারো খরচ দেখিয়ে আরও তিনশ টাকার দরকার।

হরিশ অসহ্য ক্রোধ কোনমতে সংবরণ করিয়া শুধু কহিলেন, নির্লজ্জ! তার পরে?

গিরীশ বলিলেন, ঠিক তাই। হতভাগার একেবারে লজ্জাসরম নেই—একেবারে নেই। এই আটশ' টাকা নিয়ে তবে ছাড়লে?

নিয়ে গেল ? আপনি দিলেন ?

গিরীশ বলিলেন, না হলে কি ছাড়ে ? নিয়ে তবে উঠল যে !

হরিশের সমস্ত মুখখানা প্রথমটা অগ্নিবর্ণ হইয়া পরক্ষণেই ছাইয়ের মত হইয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, তা হলে মামলা-মোকদ্দমা করে আর লাভ কি দাদা ?

গিরীশ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, কিছু না, কিছু না। নিজের সংসার যে চালিয়ে নেবে হতভাগার সেটুকু ক্ষমতাও নেই—এমনি অপদার্থ হয়ে গেছে। শুনি, বৈঠকখানায় দিব্যি আড্ডা বসিয়ে দিনরাত তাস-পাশা চলচে, আর খাচ্চেন—ব্যাস্। মানুষ যেমন শিব-স্থাপনা করে, আমাদেরও হয়েচে তাই—বুঝলে না হরিশ ! বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই মাতিয়া উঠিয়া হো হো রবে হাসিয়া ঘর ভরিয়া দিলেন।

হরিশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন। দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিতে বলিতে গেলেন, আচ্ছা, আমি একাই দেখচি।

মাঘ মাসের বাইশে মোকদ্দমার দিন ছিল। বিশে গিরীশের এক জ্ঞাতি-কন্যার বিবাহে কন্যার পিতা আসিয়া গিরীশকে চাপিয়া ধরিলেন, দাদা, তুমি উপস্থিত থেকে আমার মেয়ের বিবাহ দাও, এই আমার বড় সাধ। তোমাকে একটি দিনের জন্যেও অন্ততঃ দেশে যেতে হবে।

'না' শব্দটা গিরীশের মুখ দিয়া বাহির হইবার জো ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া বলিলেন, যাব বইকি ভায়া, নিশ্চয় যাব।

কন্যার পিতা নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এই 'নিশ্চয়' কথাটার বাস্তবিক অর্থ যথাকালে যে কি হইবে, তাহা সবচেয়ে বেশী জানিতেন সিদ্ধেশ্বরী। সুতরাং প্রতিশ্রুতির বিবরণ যদিচ স্বামী বিস্মৃত হইয়াছিলেন স্ত্রী হন নাই।

বিশে সকালে গিরীশ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিলেন, বল কি ? আজ যে আমার সেই জয়পুরের মোক—

না, সে হবে না। তোমাকে যেতেই হবে। উকিল হয়ে পর্য্যন্তই ত মিছে কথা বলে আসচ—আজ একটা কথাও রাখো। পরকালের ভয় কি তোমার এতটুকু হয় না ?

গিরীশ কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, পরকাল ? তা বটে—কিন্তু—কিন্তু—

না, কিছুতে হবে না, তোমাকে যেতেই হবে। যাও।

অতএব গিরীশকে দেশে যাইতে হইল।

যাইবার সময় সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, ছেলে দুটোকে,—বলিয়াই হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে, বলিয়া গিরীশ বাহির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি হবে, তাহা স্বামী-স্ত্রীর কেহই বুঝিলেন না। নয়নতারা গা টিপিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে অন্তরালে ডাকিয়া কহিল, ও-বাড়িতে কিছু খেতে-টেতে বট্‌ঠাকুরকে মানা করে দিলেন না কেন?

সিদ্ধেশ্বরী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

নয়নতারা মুখখানা বিকৃত-গম্ভীর করিয়া বলিল, বলা যায় কি দিদি!

সিদ্ধেশ্বরীর চোখ দিয়া তখনও জল পড়িতেছিল। আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া একটু খানি চুপ করিয়া বলিলেন, সে তুমি পার মেজবৌ। শৈলর গলা কেটে ফেললেও সে তা পারবে না। বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

মোকদ্দমার তদ্‌বির করিতে দুই-একদিন পূর্ব্বে জেলায় যাইবার জন্য রমেশ ঘরের মধ্যে প্রস্তুত হইতেছিল। শৈল সেখানে ছিল না। সে ঠাকুর-ঘরের মধ্যে দেহ হইতে তাহার সর্ব্বশেষ অলঙ্কারখানি খুলিয়া ফেলিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া গলবস্ত্র, যুক্তকরে মনে মনে বলিতেছিল, ঠাকুর, আর ত কিছু নাই; এইবার যেমন করিয়া হোক আমাকে নিষ্কৃতি দাও। আমার ছেলেরা না খাইয়া মরিতেছে, আমার স্বামী দুশ্চিন্তায় কঙ্কালসার হইতেছেন—

ওরে কেনো—ওরে পটলি—

শৈল চমকিয়া উঠিল—এ যে তাহার ভাশুরের কণ্ঠস্বর! জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, তিনিই বটে। পাকা চুল, কাঁচা-পাকা গোঁফ, সেই শান্ত স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি। চিরকালটি যেমন দেখিয়া আসিয়াছে, ঠিক তাই। কোন অঙ্গে এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কানাই পড়া ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রণাম করিল, পটল খেলা ছাড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইল। তাহাকে তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন!

রমেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিল।

গিরীশ কহিলেন, এমন সময় কোথায় যাওয়া হবে?

রমেশ কুণ্ঠিত অস্পষ্টস্বরে বলিল, জেলায়—

গিরীশ চক্ষের পলকে বারুদের মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন—হতভাগা, লক্ষীছাড়া, তুমি আমার খাবে-পরবে আর আমারই সঙ্গে মামলা করবে? তোমাকে এক সিকি পয়সার বিষয়-আশয় দেব না—দূর হও আমার বাড়ি থেকে; এখ্‌খুনি দূর হও—এক মিনিট দেরি নয়—এক কাপড়ে বেরিয়ে যাও—

রমেশ কথা কহিল না, মুখ তুলিল না, যেমন ছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল। দাদাকে সে যেমন ভক্তি-মান্য করিত, তেমনি চিনিত। এইসব তিরস্কারের অন্তঃসার-শূন্যতা সম্পূর্ণ অনুভব করিয়া সে তখনকার মত মুখ বুজিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন শৈল আসিয়া দূর হইতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল।

গিরীশ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, এস, এস, মা এস। সে স্বরে উত্তাপ নাই, জ্বালা নাই—বাহির হইতে প্রবেশ করিয়া কোন লোকের সাধ্য নাই যে, বলে এই মানুষটাই মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে ওরূপভাবে চীৎকার করিতেছিল।

গিরীশের নজরে কোনদিন কিছু পড়ে না; কিন্তু আজ কেমন করিয়া জানি না তাঁহার দৃষ্টিশক্তি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য লাভ করিল। শৈলর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তোমার গায়ে গয়না দেখচিনে কেন ছোটবৌমা?

শৈল অধোমুখে স্থির হইয়া রহিল।

গিরীশের কণ্ঠস্বর পুনরায় এক এক পর্দ্দা চড়িতে লাগিল—ঐ হতভাগা শূয়ার বেচে খেয়েচে। গয়না কার? আমার? ওকে আমি জেলে দেব তবে ছাড়ব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাইশে মোকদ্দমার দিন অপরাহ্ণ-বেলায় হরিশ মুখ কালি করিয়া হুগলীর আদালত হইতে বাটী ফিরিয়া আসিলেন এবং ধড়াচূড়া না ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

নয়নতারা কাঁদ কাঁদ হইয়া সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল; খবর পাইয়া সিদ্ধেশ্বরী ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু হরিশ সেই যে পাশ ফিরিয়া নীরব হইয়া রহিলেন, কেহই তাঁহার মুখ হইতে একটা জবাবও বাহির করিতে পারিল না।

মোকদ্দমায় যে হার হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই—দুই জায়ে নিরন্তর বুঝাইতে লাগিলেন—মোকদ্দমায় হার-জিত আছেই—তা ছাড়া এখনও হাইকোর্ট আছে, বিলাতে আপীল করা আছে—এরই মধ্যে এমন করিয়া ভাঙিয়া পড়িবার কিছুমাত্র হেতু নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই দুটি স্ত্রীলোকের যে আশা-ভরসা ছিল, নিজে উকিল হইয়াও হরিশের তাহার কণামাত্রও দেখা গেল না।

সিদ্ধেশ্বরী আর সহ্য করিতে না পারিয়া হরিশের হাত ধরিয়া বলিলেন, মেজ-ঠাকুরপো, আমি বলচি, তোমাদের হার হবে না। যত টাকা লাগে আমি দেব, তুমি হাইকোর্ট কর। আমি আশীর্ব্বাদ করচি তুমি জিতবেই!

এতক্ষণে হরিশ মুখ ফিরাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বৌঠান, সে হবার জো নেই—সব শেষ হয়ে গেছে। হাইকোর্টই বল, আর বিলাতই বল—কোথাও কোন

রাস্তা নেই। বিষয় সমস্তই দাদার নামে খরিদ ছিল। বিয়ে দিতে গিয়ে তিনি সর্বস্ব ছোটবৌমার নামে দানপত্র করে দিয়ে এসেছেন। রেজিষ্ট্রি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। দেশের দিকে মুখ ফেরাবার পথ নেই।

দুই জায়ে মুখোমুখি হইয়া পাথরের মূর্তির মত বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার পর গিরীশ আদালত হইতে ফিরিয়া আসিলে যে কাণ্ড ঘটিল তাহা বর্ণনাতীত! কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদ বলিয়া লাঞ্ছনা করিতে কেহ আর বাকী রাখিল না!

গিরীশ কিন্তু সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত বুঝাইতে লাগিলেন যে এ-ছাড়া আর কোন রাস্তাই ছিল না। হতভাগা, নচ্ছার, বোম্বেটে, ছোটবৌমার গয়নাগুলো বেচিয়া খাইয়াছে; আর একটু হইলেই বাড়ির ইটকাঠ পর্য্যন্ত বেচিয়া খাইত—দেশের বাড়ির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইত। তিনি সকল দিক বিশেষ বিবেচনা করিয়াই ভরাডুবি হইতে চাটুয্যে-বংশকে নিষ্কৃতি দিয়া আসিয়াছেন।

শুধু সিদ্ধেশ্বরী একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন, ভালোমন্দ কোন কথাই এতক্ষণ বলেন নাই। সবাই চলিয়া গেলে তিনি উঠিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন! চোখ-দুটিতে জল তখনও টলটল করিতেছিল। দুই পায়ের উপর মাথা পাতিয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আজ তুমি আমাকে মাপ কর। তোমাকে যার যা মুখে এলো—বলে গাল দিয়ে গেল বটে, কিন্তু তুমি যে তাদের সবাইয়ের চেয়ে কত বড়, সে-কথা আজ যেমন বুঝেচি এমন কোনদিন নয়।

গিরীশ মহা খুশী হইয়া মাথা নাড়িয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, দেখলে বড়বৌ, আমার সবদিকে নজর থাকে কিনা! রমেশ কালকের ছোঁড়া, সে আমার চোখে ধুলো দিয়ে আমার এত কষ্টের বিষয় নষ্ট করে দেবে! এমনি কায়দা বেঁধে দিয়ে এলুম যে, আর সেখানে বাছাধনের চালাকিটি চলবে না। বলিয়া কি জানি নিজের কোন্ হাসির কথায় নিজেই হো হো শব্দে হাসিয়া ঘর দ্বার পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

বিজয়া

বিজয়া

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র-পরিচয়

—পুরুষ—

রাসবিহারী	... ...	মৃত বনমালীর বন্ধু ও বিজয়ার অভিভাবক
বিলাসবিহারী	... ...	রাসবিহারীর পুত্র
নরেন	... ...	বনমালী ও রাসবিহারীর বন্ধু মৃত জগদীশের পুত্র
দয়াল	... ...	বিজয়ার মন্দিরের আচার্য্য
পূর্ণ গাঙ্গুলী	... ...	নরেনের মাতুল
কালীপদ	... ...	বিজয়ার ভৃত্য
পরেশ	... ...	ঐ বালক-ভৃত্য
কানাই সিং	... ...	ঐ দরোয়ান

গ্রামবাসিগণ, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ, কর্ম্মচারিগণ ইত্যাদি

—স্ত্রী—

বিজয়া	... ...	বনমালীর কন্যা
নলিনী	... ...	দয়ালের ভাগিনেয়ী
পরেশের মা	... ...	বিজয়ার দাসী

দয়ালের স্ত্রী, নিমন্ত্রিতা মহিলাগণ, গ্রামবাসিনীগণ ইত্যাদি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিজয়া। জগদীশ মুখুয্যে কি সত্যিই ছাদ থেকে পড়ে মারা গিয়েছিলেন ?

বিলাস। তাতে সন্দেহ আছে নাকি ? মদমত্ত অবস্থায় উড়তে গিয়েছিলেন।

বিজয়া। কি দুঃখের ব্যাপার !

বিলাস। দুঃখের কেন ? অপঘাত-মৃত্যু ওর হবে না তো হবে কার ? জগদীশ-বাবু শুধু আপনার স্বর্গীয় পিতা বনমালীবাবুরই সহপাঠী বন্ধু নয়, আমার বাবারও ছেলেবেলায় বন্ধু। কিন্তু বাবা তার মুখও দেখতেন না। টাকা ধার করতে দু'বার এসেছিল—বাবা চাকর দিয়ে বা'র করে দিয়েছিলেন। বাবা সর্ব্বদাই বলেন, এইসব অসচ্চরিত্র লোকগুলোকে প্রশ্রয় দিলে মঙ্গলময় ভগবানের কাছে অপরাধ করা হয়।

বিজয়া। এ কথা সত্যি।

বিলাস। বন্ধুই হ'ন আর যেই হ'ন। দুর্ব্বলতাবশতঃ কোনমতেই সমাজের চরম আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। জগদীশের সমস্ত সম্পত্তি এখন ন্যায়তঃ আমাদের। তার ছেলে পিতৃঋণ শোধ করতে পারে, ভাল, না পারে আমাদের এই দণ্ডেই সমস্ত হাতে নেওয়া উচিত। বস্তুতঃ ছেড়ে দেবার আমাদের অধিকার নেই। কারণ, এই টাকায় আমরা অনেক সৎকার্য্য করতে পারি, সমাজের কোন ছেলেকে বিলেত পর্য্যন্ত পাঠাতে পারি—ধর্ম্মপ্রচারে ব্যয় করতে পারি—কত কি করতে পারি—কেন তা না করব বলুন ? আপনার সম্মতি পেলেই বাবা সব ঠিক করে ফেলবেন

[বিজয়া একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল]

বিলাস। না না, আপনাকে ইতস্ততঃ করতে আমি কিছুতেই দেব না। দ্বিধা দুর্ব্বলতা পাপ, শুধু পাপ কেন মহাপাপ। আমি মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, আপনার নাম করে—যা কোথাও নেই, কোথাও হয়নি—আমি তাই করব। এই পাড়াগাঁয়ের মধ্যে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে, দেশের হতভাগ্য মূর্খ লোকগুলোকে ধর্ম্মশিক্ষা দেব। আপনি একবার ভেবে দেখুন দেখি, এদের অজ্ঞতার জ্বালায় বিপন্ন হয়ে আপনার পিতৃদেব দেশ ছেড়েছিলেন কিনা ? তাঁর কন্যা হয়ে আপনার কি উচিত নয় এই নোব্‌ল প্রতিশোধ নিয়ে তাদের এই চরম উপকার করা। বলুন, আপনিই এ-কথার উত্তর দিন। [বিজয়া নিরুত্তর] সমস্ত দেশের মধ্যে একটা কত

বড় নাম, কত বড় সাড়া পড়ে যাবে ভাবুন দেখি? সর্ব্বসাধারণকে স্বীকার করতেই হবে—সে ভার আমার—যে, আমাদের সমাজে মানুষ আছে, হৃদয় আছে, স্বার্থত্যাগ আছে। যাকে তারা নির্য্যাতন করে দেশছাড়া করেছিল, সেই মহাত্মার মহীয়সী কন্যা, শুধু তাদের জন্যই এই বিপুল স্বার্থত্যাগ করেছেন। সমস্ত ভারতময় কি moral effect হবে ভাবুন দেখি?

বিজয়া। তা বটে, কিন্তু মনে হয় বাবার ঠিক এই ইচ্ছা ছিল না। জগদীশবাবুকে তিনি চিরদিন মনে মনে ভালবাসতেন।

বিলাস। এমন হতেই পারে না। সেই দুষ্ক্রিয়াসক্ত মাতালটাকে তিনি ভালবাসতেন এ বিশ্বাস আমি করতে পারি না।

বিজয়া। বাবার সঙ্গে এ নিয়ে আমিও তর্ক করেছি। তার কাছেই শুনেছি, তিনি, আপনার বাবা ও জগদীশবাবু এই তিনজনে—শুধু সতীর্থ নয়, পরস্পরের পরম বন্ধু ছিলেন। জগদীশবাবুই ছিলেন সবার চেয়ে মেধাবী ছাত্র, কিন্তু যেমন দুর্ব্বল, তেমনি দরিদ্র। বড় হয়ে বাবা ও আপনার বাবা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করলেন, কিন্তু জগদীশবাবু পারলেন না। গ্রামের মধ্যে নির্য্যাতন শুরু হ'ল। আপনার বাবা অত্যাচার সয়ে গ্রামেই রইলেন, কিন্তু বাবা পারলেন না, সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির ভার আপনার বাবার উপর দিয়ে, মাকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন, আর জগদীশবাবু স্ত্রী নিয়ে ওকালতি করতে পশ্চিমে চলে গেলেন।

বিলাস। এসব আমিও জানি।

বিজয়া। জানবার কথাই তো। পশ্চিমে তিনি বড় উকিল হয়েছিলেন। কোন দোষই ছিল না, শুধু স্ত্রী মারা যাবার পর থেকেই তাঁর দুর্গতি শুরু হ'ল?

বিলাস। অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

বিজয়া। তা বটে, কিন্তু এর অনেক পরে আমার নিজের মা মারা গেলে বাবা একদিন কথায় কথায় হঠাৎ বলেছিলেন, কেন যে জগদীশ মদ ধরেছিল সে যেন বুঝতে পারি বিজয়া।

বিলাস। বলেন কি? তাঁর মুখে মদ খাবার justification?

বিজয়া। আপনি কি যে বলেন বিলাসবাবু! Justificanion নয়—বাল্যবন্ধুর ব্যথার পরিমাণটাই বাবা ইঙ্গিত করেছিলেন। সম্ভ্রম গেল, স্বাস্থ্য গেল, উপার্জ্জন গেল, সমস্ত নষ্ট করে তিনি দেশে ফিরে এলেন।

বিলাস। বড় কীর্ত্তিই করেছিলেন!

বিজয়া। সব গেল, শুধু গেল না, বোধ হয় আমার বাবার বন্ধুস্নেহ। তাই যখনই জগদীশবাবু টাকা চেয়েছেন তিনি না বলতে পারেননি।

বিলাস। তা হলে ঋণ না দিয়ে দান করলেই তো পারতেন।

বিজয়া। তা জানিনে বিলাসবাবু। হয়ত দান করে বন্ধুর শেষ আত্মসম্মানবোধটুকু বাবা নিঃশেষ করতে চাননি।

বিলাস। দেখুন, এসব আপনার কবিত্বের কথা, নইলে ঋণ ছেড়ে দেবার উপদেশ তিনি আপনাকেও দিয়ে যেতে পারতেন। কিসের জন্য তা করেননি?

বিজয়া। তা জানিনে। কোন আদেশ দিয়েই তিনি আমাকে আবদ্ধ করে যাননি। বরঞ্চ, কথা উঠলে বাবা এই কথা বলতেন, মা, তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি দিয়েই তোমার কর্ত্তব্য নিরূপণ ক'রো। আমার ইচ্ছের শাসনে তোমাকে আমি বেঁধে রেখে যাব না। কিন্তু পিতৃঋণের দায়ে পুত্রকে গৃহহীন করার সঙ্কল্প বোধ হয় তাঁর ছিল না। তাঁর ছেলের নাম শুনেছি নরেন্দ্র। তিনি কোথায় আছেন জানেন?

বিলাস। জানি। মাতাল বাপের শ্রাদ্ধ শেষ করে সে নাকি বাড়িতেই আছে। পিতৃঋণ যে শোধ করে না সে কুপুত্র। তাকে দয়া করা অপরাধ।

বিজয়া। আপনার সঙ্গে বোধ হয় তাঁর আলাপ আছে?

বিলাস। আলাপ! ছিঃ—আপনি আমায় কি মনে করেন বলুন তো? আমি তো ভাবতেই পারিনে যে, জগদীশ মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে আমি আলাপ করেছি। তবে সেদিন রাস্তায় হঠাৎ পাগলের মত একটা নতুন লোক দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিলুম—শুনলাম সেই নাকি নরেন মুখুয্যে।

বিজয়া। পাগলের মত? কিন্তু শুনেছি নাকি ডাক্তার?

বিলাস। ডাক্তার! আমি বিশ্বাস করিনে। যেমন আকৃতি তেমনি প্রকৃতি; একটা অপদার্থ লোফার!

বিজয়া। আচ্ছা বিলাসবাবু, জগদীশবাবুর বাড়িটা যদি সত্যিই আমরা দখল করে নিই, গ্রামের মধ্যে কি একটা বিশ্রী গোলমাল উঠবে না?

বিলাস। একেবারে না। আপনি পাঁচ-সাতখানা গ্রামের মধ্যে একজনও পাবেন না, এই মাতালটার ওপর যার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল। আহা বলে এমন লোক এ অঞ্চলে নেই। তাও যদি না হ'ত আমি বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত সে চিন্তা আপনার মনে আনা উচিত নয়।

[ভৃত্য আসিয়া চা দিয়া গেল। ক্ষণেক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল]

কালীপদ (ভৃত্য)। একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

বিজয়া। এইখানে নিয়ে এস।

[ভৃত্যের প্রস্থান]

বিজয়া। আর পারিনে। লোকের আসা-যাওয়ার আর বিরাম নেই। এর চেয়ে বরং কলকাতায় ছিলুম ভাল।

[নরেনের প্রবেশ]

নরেন। আমার মামা পূর্ণ গাঙ্গুলীমশাই আপনার প্রতিবেশী—ওই পাশের বাড়িটা তাঁর। আমি শুনে অবাক্ হয়ে গেছি যে, তাঁর পিতৃপিতামহ-কালের দুর্গাপূজা নাকি আপনি এবার বন্ধ করে দিতে চান? একি সত্যি? [এই বলিয়া একটা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল।]

বিলাস। আপনি তাই মামার হয়ে ঝগড়া করতে এসেছেন নাকি? কিন্তু কার সঙ্গে কথা কচ্ছেন ভুলে যাবেন না।

নরেন। না সে আমি ভুলিনি, আর ঝগড়া করতেও আমি আসিনি। বরঞ্চ, কথাটা বিশ্বাস হয়নি বলেই জেনে যেতে এসেছি।

বিলাস। বিশ্বাস না হবার কারণ?

নরেন। কেমন করে হবে? নিরর্থক নিজের প্রতিবেশীর ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করবেন, এ বিশ্বাস না হওয়াই স্বাভাবিক।

বিলাস। আপনার কাছে নিরর্থক বোধ হলেই যে কারো কাছে তার অর্থ থাকবে না, কিংবা আপনি ধর্ম্ম বললেই যে অপরে তা শিরোধার্য্য করে নেবে এর কোনো হেতু নেই। পুতুল-পূজো আমাদের কাছে ধর্ম্ম নয় এবং তার নিষেধ করাটাও আমরা অন্যায় মনে করিনে।

নরেন। (বিজয়ার প্রতি) আপনিও কি তাই বলেন?

বিজয়া। আমি? আমার কাছে কি আপনি বিরুদ্ধ মন্তব্য শোনবার আশা করে এসেছেন?

বিলাস। কিন্তু উনি ত বিদেশী লোক। খুব সম্ভব আমাদের কিছুই জানেন না।

নরেন। (বিজয়ার প্রতি) আমি বিদেশী না হলেও গ্রামের লোক নয়, সে-কথা ঠিক। তবুও আমি সত্যিই আপনার কাছে এ আশা করিনি। পুতুল-পূজো কথাটা আপনার মুখ থেকে বার না হলেও সাকার নিরাকারের পুরোনো ঝগড়া আমি এখানে তুলব না। আপনারা যে অন্য সমাজের তাও আমি জানি, কিন্তু এ তো সে-কথা নয়। গ্রামের মধ্যে মাত্র এই একটি পূজো। সমস্ত লোক সারা বৎসর এই তিনটি দিনের আশায় পথ চেয়ে আছে। আপনার প্রজারা আপনার ছেলেমেয়ের মত। আপনার আসার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের আনন্দ-উৎসব শতগুণে বেড়ে যাবে এই আশাই তো সকলে করে। কিন্তু তা না হয়ে এত বড় দুঃখ, এত বড় নিরানন্দ, আপনার দুঃখী প্রজাদের মাথায় নিজে তুলে দেবেন এ বিশ্বাস করা কি সহজ? আমি তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি।

বিলাস। আপনি অনেক কথাই বলেছেন। সাকার-নিরাকারের তর্ক আপনার সঙ্গে করব এত অপর্য্যাপ্ত সময় আমাদের হাতে নেই! তা সে চুলোয় যাক। আপনার

মামা একটা কেন, একশোটা পুতুল গড়িয়ে বসে পূজো করতে পারেন তাতে কোন আপত্তি নেই, শুধু কতকগুলো ঢাক, ঢোল, কাঁসি অহোরাত্র ওঁর কানের কাছে পিটে ওঁকে অসুস্থ করে তোলাতেই আমাদের আপত্তি।

নরেন। অহোরাত্র তো বাজে না। তা সকল উৎসবেই একটু হৈ-চৈ গণ্ডগোল হয়। অসুবিধে কিছু না হয় হ'লই। আপনারা মায়ের জাত, এদের আনন্দের অত্যাচার আপনি সইবেন না তো কে সইবে?

বিলাস। আপনি তো কাজ আদায়ের ফন্দিতে মা ও ছেলের উপমা দিলেন, শুনতেও মন্দ লাগল না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনার মামার কানের কাছে মহরমের বাজনা শুরু করে দিলে, তাঁর সেটা ভাল বোধ হ'ত কি? তা সে যাই হোক, বকাবকি করবার সময় নেই আমাদের। বাবা যে হুকুম দিয়েছেন তাই হবে।

নরেন। আপনার বাবা কে, আর তাঁর নিষেধ করবার কি অধিকার তা আমার জানা নেই। কিন্তু আপনি মহরমের যে অদ্ভুত উপমা দিলেন, কিন্তু এটা রসোনচৌকি না হয়ে কাড়ানাকাড়ার বাদ্য হলে কি করতেন শুনি, এ তো শুধু নিরীহ স্বজাতির প্রতি অত্যাচার বৈ তো নয়!

বিলাস। বাবার সম্বন্ধে তুমি সাবধান হয়ে কথা কও বলে দিচ্ছি, নইলে এখুনি অন্য উপায়ে শিখিয়ে দেব তিনি কে, এবং তাঁর নিষেধ করার কি অধিকার।

নরেন। (বিলাসকে উপেক্ষা করিয়া বিজয়ার প্রতি) আমার মামা বড়লোক নন। তাঁর পূজার আয়োজন সামান্যই। তবুও এইটেই একমাত্র আপনার দরিদ্র প্রজাদের সমস্ত বছরের আনন্দোৎসব। হয়ত আপনার কিছু অসুবিধে হবে, কিন্তু তাদের মুখ চেয়ে কি আপনি এইটুকু সহ্য করতে পারবেন না?

বিলাস। (টেবিলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) না, পারবেন না, একশোবার পারবেন না। কতকগুলো মূর্খ লোকের পাগলামি সহ্য করার জন্য কেউ জমিদারী করে না। তোমার আর কিছু বলবার না থাকে তুমি যাও, মিথ্যে আমাদের সময় নষ্ট ক'রো না।

বিজয়া। (বিলাসের প্রতি) আপনার বাবা আমাকে মেয়ের মত ভালবাসেন বলেই এঁদের পূজো নিষেধ করেছেন, কিন্তু আমি বলি হ'লোই বা তিন-চারদিন একটু গোলমাল।

বিলাস। ওঃ—সে অসহ্য গোলমাল! আপনি জানেন না বলেই—

বিজয়া। জানি বইকি। তা হোক গে গোলমাল—তিন দিন বই তো নয়। আর আপনি আমার অসুবিধের কথা ভাবছেন, কিন্তু কলকাতা হলে কি করতেন বলুন তো? সেখানে অষ্টপ্রহর কেউ কানের কাছে তোপ দাগতে থাকলেও তো চুপ করে সইতে হ'তো? (নরেনের প্রতি) আপনার মামাকে জানাবেন, তিনি প্রতি

বৎসর যেমন করেন, এবারেও তেমনি করুন, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। আপনি তবে এখন আসুন, নমস্কার।

নরেন। ধন্যবাদ—নমস্কার। [উভয়কে নমস্কার করিয়া প্রস্থান]

বিজয়া। আমাদের কথাটাই তো শেষ হতে পেল না। তা হলে তালুকটা নেওয়াই কি আপনার বাবার মত ?

বিলাস। হুঁ।

বিজয়া। কিন্তু এর মধ্যে কোনরকম গোলমাল নেই তো ?

বিলাস। না।

বিজয়া। আজ কি তিনি ওবেলা এদিকে আসবেন ?

বিলাস। বলতে পারি না।

বিজয়া। আপনি রাগ করলেন নাকি ?

বিলাস। রাগ না করলেও পিতার অপমানে পুত্রের ক্ষুণ্ণ হওয়া বোধ করি অসঙ্গত নয়।

বিজয়া। কিন্তু এতে তাঁর অপমান হয়েছে, এ ভুল ধারণা আপনার কোত্থেকে জন্মালো ? তিনি স্নেহবশে মনে করছেন আমার কষ্ট হবে। কিন্তু কষ্ট হবে না এইটাই শুধু ভদ্রলোককে জানিয়ে দিলুম। এতে মান-অপমানের তো কিছুই নেই বিলাসবাবু।

বিলাস। ওটা কথাই নয়। বেশ, আপনার স্টেটের দায়িত্ব নিজে নিতে চান নিন। কিন্তু এর পরে বাবাকে আমার সাবধান করে দিতে হবে। নইলে পুত্রের কর্ত্তব্যে আমার ত্রুটি হবে।

বিজয়া। এই সামান্য বিষয়টাকে আপনি এমন করে নিয়ে এরকম গুরুতর করে তুলবেন এ আমি মনেও করিনি। ভাল, আমার বোঝবার ভুলে যদি অন্যায়ই হয়ে গিয়ে থাকে আমি অপরাধ স্বীকার করছি। ভবিষ্যতে আর হবে না।

বিলাস। তা হলে পূর্ণ গাঙ্গুলীকে জানিয়ে পাঠান যে, রাসবিহারীবাবু যে হুকুম দিয়েছেন তা অন্যথা করা আপনার সাধ্য নয়।

বিজয়া। সেটা কি ঢের বেশী অন্যায় হবে না ? আচ্ছা আমি নিজেই চিঠি লিখে আপনার বাবার অনুমতি নিচ্ছি।

বিলাস। এখন অনুমতি নেওয়া না-নেওয়া দুই-ই সমান। আপনি যদি বাবাকে সমস্ত দেশের কাছে উপহাসের পাত্র করে তুলতে চান, আমাকেও তা হলে অত্যন্ত অপ্রিয় কর্ত্তব্য পালন করতে হবে।

বিজয়া। (আত্মসংযম করিয়া) এই অপ্রিয় কর্ত্তব্যটা কি শুনি ?

বিলাস। আপনার জমিদারী শাসনের মধ্যে তিনি যেন আর হাত না দেন।

বিজয়া। আপনার নিষেধ তিনি শুনবেন মনে করেন?

বিলাস। অন্ততঃ সেই চেষ্টাই আমাকে করতে হবে।

বিজয়া। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) বেশ! আপনি যা পারেন করবেন, কিন্তু অপরের ধর্ম্মে-কর্ম্মে আমি বাধা দিতে পারব না।

বিলাস। আপনার বাবা কিন্তু এ-কথা বলতে সাহস পেতেন না।

বিজয়া। (ঈষৎ রুক্ষস্বরে) বাবার কথা আপনার চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি বিলাসবাবু। কিন্তু সে নিয়ে তর্ক করে ফল নেই—আমার স্নানের বেলা হ'লো, আমি উঠলুম। (গমনোদ্যত)

বিলাস। মেয়েমানুষ জাতটা এমনই নেমকহারাম।

[বিজয়া পা বাড়াইয়াছিল। বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পলকমাত্র বিলাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে চলিয়া গেল। এমনি সময় বৃদ্ধ রাসবিহারী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেই পুত্র বিলাসবিহারী লাফাইয়া উঠিল]

বিলাস। বাবা, শুনেছ এইমাত্র কি ব্যাপার ঘটলো? পূর্ণ গাঙ্গুলী এবারও ঢাক ঢোল কাঁসি বাজিয়ে দুর্গাপূজা করবে, বারণ করা চলবে না। এইমাত্র তার কে একজন ভাগ্নে এসেছিল প্রতিবাদ করতে, বিজয়া তাকে হুকুম দিলেন পূজো হোক।

রাসবিহারী। তা তুমি অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলে কেন?

বিলাস। হব না? তোমার হুকুমের বিরুদ্ধে হুকুম দেবে বিজয়া? এবং আমার আপত্তি করা সত্ত্বেও?

রাস। কিন্তু এই নিয়ে তার সঙ্গে রাগারাগি করলে নাকি?

বিলাস। কিন্তু উপায় কি? আত্মসম্মান বজায় রাখতে—

রাস। দেখ বাপু, তোমার এই আত্মসম্মানবোধটা দিন কতক খাটো কর, নইলে আমি তো আর পেরে উঠিনে। বিয়েটা হয়ে যাক, বিষয়টা হাতে আসুক, তখন ইচ্ছে মত আত্মসম্মান বাড়িয়ে দিও, আমি নিষেধ করব না।

[বিজয়ার প্রবেশ]

রাস। এই যে মা বিজয়া।

বিজয়া। আপনাকে আসতে দেখে আমি ফিরে এলুম কাকাবাবু। শুনে হয়ত আপনি রাগ করবেন, কিন্তু মোট তিনদিন বই তো নয়, হোক গে গোলমাল—আমি অনায়াসে সইতে পারব; কিন্তু গাঙ্গুলীমশায়ের দুর্গাপূজায় বাধা দিয়ে কাজ নেই। আমি অনুমতি দিয়েছি।

রাস। সেই কথাই বিলাস আমাকে বোঝাচ্ছিল। বুড়োমানুষ, শুনে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম যে ভবিষ্যতে এরকম পুনর্ব্বার ঘটলে তো চলবে না। তখন আত্মসম্মান বজায় রাখতে তোমার বিষয় থেকে নিজেকে তফাৎ করতেই হবে।' কিন্তু

বিলাসের কথায় রেগে গেছ মা, বুঝেচি, অজ্ঞান ওরা করুক পুজো। বরং পরের জন্যে দুঃখ সওয়াটাই মহত্ব। আশ্চর্য্য প্রকৃতি এই বিলাসের। ওর বাক্য ও কর্ম্মের দৃঢ়তা দেখলে হঠাৎ বোঝা যায় না যে হৃদয় ওর এত কোমল। তা সে যাক, কিন্তু জগদীশের দরুণ বাড়িটা যখন তুমি সমাজকেই দান করলে মা, তখন আর বিলম্ব না করে এই ছুটির মধ্যেই এর সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে। কি বল?

বিজয়া। আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই হবে। টাকা পরিশোধের মেয়াদ তো তাদের শেষ হয়ে গেছে?

রাস। অনেকদিন। সর্ত্ত ছিল, আট বৎসর, কিন্তু এটা নয় বৎসর চলছে।

বিজয়া। শুনতে পাই তাঁর ছেলে নাকি এখানে আছেন। তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে আর কিছুদিনের সময় দিলে হয় না? যদি কোন উপায় করতে পারেন?

রাস। (মাথা নাড়িতে নাড়িতে) পারবে না—পারবে না—পারলে—

বিলাস। পারলেই বা আমরা দেব কেন? টাকা নেবার সময় তো মাতালটার হুঁস ছিল না কি সর্ত্ত করেছি? এ শোধ দেব কি করে?

বিজয়া। (বিলাসের প্রতি মাত্র একবার দৃষ্টিপাত করিল; রাসবিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া শান্ত-দৃঢ়কণ্ঠে কহিল) তিনি বাবার বন্ধু ছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে সসম্মানে কথা কইতে বাবা আমাকে আদেশ করে গেছেন।

বিলাস। (সগর্জ্জনে) হাজার আদেশ করলেও সে যে একটা—

রাস। আহা চুপ কর না বিলাস। পাপের প্রতি তোমার আন্তরিক ঘৃণা যেন না পাপীর ওপর গিয়ে পড়ে। এইখানেই যে আত্মসংযমের সবচেয়ে প্রয়োজন বাবা।

বিলাস। না বাবা, এইসব বাজে Sentiment আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে, তা সে কেউ রাগই করুক আর যাই করুক। আমি সত্য কথা কইতে ভয় পাইনে, সত্য কাজ করতে পিছিয়ে দাঁড়াইনে।

রাস। তা বটে, তা বটে। তোমাকেই বা দোষ দেব কি? আমাদের বংশের এই স্বভাবটা যে বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত আমারই গেল না। অন্যায় অধর্ম্ম দেখলেই যেন জ্বলে উঠি। বুঝলে না মা বিজয়া, আমি আর তোমার বাবা এই জন্যেই সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করতে ভয় পাইনি। জগদীশ্বর তুমিই সত্য। (এই বলিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া উদ্দেশে নমস্কার করিলেন)

রাস। কিন্তু দেখো মা, আমি যাই হই তবু তৃতীয় ব্যক্তি। তোমাদের উভয়ের মতভেদের মধ্যে আমার কথা কওয়া উচিত নয়। কারণ, কিসে তোমাদের ভাল, সে আজ নয় কাল তোমরাই স্থির করে নিতে পারবে। এ বুড়োর মতামতের আবশ্যক হবে না। কিন্তু কথা যদি বলতেই হয় তো বলতেই হবে যে, এক্ষেত্রে তোমারই ভুল হচ্চে। জমিদারী চালাবার কাজে আমাকেও বিলাসের কাছে হার মানতে হয়,

এ আমি বহুবার দেখেছি। আচ্ছা তুমিই বল দেখি কার গরজ বেশী? আমাদের না জগদীশের ছেলের? ঋণ পরিশোধের সাধ্যই যদি থাকত, একবার নিজে এসে কি চেষ্টা করে দেখত না? সে তো জানে তুমি এসেছ? এখন আমরাই যদি উপযাচক হয়ে ডাকিয়ে পাঠাই, সে নিশ্চয়ই একটা বড়রকমের সময় নেবে। তাতে ফল শুধু এই হবে যে, দেনাও শোধ হবে না, আর তোমাদের সমাজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পও চিরদিনের মত ডুবে যাবে। বেশ করে ভেবে দেখ দিকি মা, এই কি ঠিক নয়? আর তার অগোচরেও তো কিছু হতে পারবে না। তখন নিজে যদি সে সময় চায় তখন না হয় বিবেচনা করে দেখা যাবে। কি বল মা?

বিজয়া। (অপ্রসন্ন-মুখে) আচ্ছা। কাকাবাবু, আমার বড় দেরি হয়ে গেল, এখন কি যেতে পারি?

রাস। যাও মা যাও, আমিও চললাম।

[বিজয়ার প্রস্থান]

বিলাস। (সক্রোধে) সে যদি দশ বছরের সময় চায় তো বিবেচনা করতে হবে নাকি?

রাস। (ক্রুদ্ধ চাপাকণ্ঠে) হবে না তো কি সমস্ত খোয়াতে হবে? মন্দির-প্রতিষ্ঠা! দেখ বিলাস, এই মেয়েটির বয়স বেশী নয়, কিন্তু সে বেশ জানে যে সেই তার বাপের সমস্ত সম্পত্তির মালিক, আর কেউ নয়। মন্দির-স্থাপনা না হলেও চলবে, কিন্তু আমার কথাটা ভুললে চলবে না।

[প্রস্থান]

[কালীপদর প্রবেশ]

কালী। মা জিজ্ঞাসা করলেন আপনাকে কি আর চা পাঠিয়ে দেবেন?

বিলাস। না।

কালী। সরবৎ কিংবা—

বিলাস। না দরকার নেই।

কালী। ফল কিংবা কিছু মিষ্টি?

বিলাস। আঃ দরকার নেই বলছি না? তাকে বলে দিও আমি বাড়ি চললুম।

[প্রস্থান]

কালী। বলতে হবে না, তিনি গেলেই জানতে পারবেন।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্যপথ

[পূর্ণ গাঙ্গুলী ও দুই-তিনজন গ্রামবাসীর প্রবেশ]

১ম ব্রাহ্মণ। হাঁ পূর্ণখুড়ো, শুনচি নাকি পূজো করবার হুকুম পাওয়া গেছে?

পূর্ণ। হাঁ বাবা, জগদম্বা মুখ তুলে চেয়েছেন। জমিদার-বাড়ি থেকে হুকুম পাওয়া গেছে, পূজোয় তাঁর আপত্তি নেই।

১ম ব্রাহ্মণ। শুনে পর্য্যন্ত দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না খুড়ো। সবাই ভাবছিল তোমাদের এতকালের পুজোটা বুঝি এবার বন্ধ হয়ে যায়। হুকুম দিলেন কে?

পূর্ণ। জমিদারকন্যা স্বয়ং। এসব ব্যাপারে তিনি নিজে কিছুই জানতেন না। আমাদের নরেন গিয়ে বলতেই আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, সে কি কথা! আপনার মামাকে জানাবেন তিনি যথারীতি মায়ের পূজো করুন, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। এই সমস্তই ওই দু-ব্যাটা বজ্জাত বাপ-ব্যাটার কারসাজি! আমার ওপর ওদের জাতক্রোধ।

১ম ব্রাহ্মণ। মেয়েটি তো তা হলে ভাল?

২য় ব্রাহ্মণ। হুঁঃ ভাল! ম্লেচ্ছ, বিধর্ম্মী, বলি খোঁজ রেখেচ কিছু?

পূর্ণ। হোক ম্লেচ্ছ। বাবা, তবুও রায়বংশের মেয়ে—হরি রায়ের নাতনী। শুনলুম, ঐ বিলেস ছোঁড়াটা অনেক চেষ্টা করেছিল বন্ধ করতে, কিন্তু তিনি কোন কথায় কান দেননি। স্পষ্ট বলে দিলেন, হাজার অসুবিধে হলেও আমি পরের ধর্ম্ম-কর্ম্মে হাত দিতে পারব না! এ কি সহজ কথা!

১ম ব্রাহ্মণ। বল কি খুড়ো? প্রথম যেদিন জুতো-মোজা পরে ফেটিং চড়ে ও দেশেতে এলো লোক ত ভয়ে মরে। গুজব রটে গেল এরই সঙ্গে হবে নাকি বিলাস-বাবুর বিয়ে, তাই এসেছে দেশে। সবাই ভাবলে একা রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব দোসর—আর কাউকে বাঁচতে হবে না, দেড়েল ব্যাটা এবার গ্রামসুদ্ধ সবাইকে ধরে ধরে ফাঁসি দেবে। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা দেখলে যেন মনে ভরসা হয়। না খুড়ো?

পূর্ণ। হাঁ বাবা, হয়। আমি বলছি তোমরা পরে দেখো, এই মেয়েটির দয়াধর্ম্ম আছে। কাউকে সহজে দুঃখ দেবে না।

২য় ব্রাহ্মণ। বাজে—বাজে—সব বাজে কথা। আরে বিধর্ম্মী যে! শাস্তরে বলেছে ম্লেচ্ছ; তার আবার দয়া! তার আবার ধর্ম্ম!

১ম ব্রাহ্মণ। তা বটে, শাস্তর-বাক্য সহজে মিথ্যে হয় না সত্যি, কিন্তু খুড়োর

পুজোটি তো মা-লক্ষ্মী নিজের জোরে চালিয়ে দিলেন! বাপ-ব্যাটায় হাজার চেষ্টা করেও তো বন্ধ করতে পারলে না।

২য় ব্রাহ্মণ। (মাথা নাড়িয়া) কিন্তু তোমরা পরে দেখো ঐ জুতো-মোজা-পরা ম্লেচ্ছ মেয়ে গাঁ জালিয়ে খাক্ করে ছাড়বে। আমি চেয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

পূর্ণ। কি জানি বাবা, আমাদের নরেন তো সাহস দিয়ে বললে, ভয় নেই, উনি কাউকে কষ্ট দেবেন না। মহামায়া কপালে যা লিখেছেন তা হবেই। কিন্তু এইটি দেখো বাবা, তোমরা সকলে মিলে যেন আমার কাজটি উদ্ধার করে দিতে পার।

২য় ব্রাহ্মণ। দোবো খুড়ো, দোবো, আমরা সবাই মিলে তোমার কাজে গিয়ে লাগব—কোনদিকে তোমার চাইতে হবে না।

১ম ব্রাহ্মণ। মায়ের পুজোটি তালয় তালয় চুকে যাক, কিন্তু বাবা তোমাকেও আমাদের একটু সাহায্য করতে হবে! তোমাকে আর নরেনকে সঙ্গে নিয়ে সময় বুঝে একদিন আমরা দল বেঁধে গিয়ে পড়ব। বলব—মা, গ্রাম্যদেবতা সিদ্ধেশ্বরীর পুকুরটি আপনি খালাস করে দিন। বুড়ো ব্যাটা ভয় দেখিয়ে জোর করে খাস করে নিলে, কিন্তু বছর অন্তরে যে একশো টাকার মাছ বিক্রি হয় তার কটা টাকা সরকারী তবিলে জমা পড়ে একবার খোঁজ করে দেখুন। আমি খবর রাখি বাবা, যে, এই ছ'-সাত বছর একটা পয়সাও জমা পড়েনি। তখন দেখব বুড়ো তার কি কৈফিয়ত দেয়।

২য় ব্রাহ্মণ। বুড়ো তখন বলবে, ও-কথা মিথ্যে। মাছ বিক্রি হয় না।

১ম ব্রাহ্মণ। তাই বলুক একবার। গরিটীর ঝোড়ো জেলেকে আমি চিনি, তার পুরুতের সঙ্গে আমার খুব ভাব। তাকে দিয়ে প্রমাণ করিয়ে দেব আমাদের কথা মিথ্যে নয়। ঐ ঝোড়ো জেলেই বুড়োর হাতে একশ' টাকা জমা দিয়ে বছর-বছর কলকাতায় মাছ চালান দেয়।

পূর্ণ। আমায় কিন্তু টেনো না বাবা, ঘরের পাশে ঘর, গরীব মানুষ—আমি তা হলে মারা যাব।

১ম ব্রাহ্মণ। কিন্তু তোমার ভাগ্‌নে নরেন্দ্র কখনো ভয় পাবে না বলতে পারি। তাকে পাঠাব, সঙ্গে থাকব আমরা। দিঘ্‌ড়ার এত লোকের সে এত কাজ করে, আর আমাদের এই উপকারটি করে দেবে না ভাবো? নিশ্চয় দেবে।

২য় ব্রাহ্মণ। তা হলে অমনি আমার বড় জামাইয়ের বাবলার মাঠের খবরটাও তাকে শুনিয়ে দিও না ভাই—কম নয় সাড়ে তিন বিঘে জায়গা। জামাই মারা গেল, দেখবার-শোনবার কেউ নেই, মেয়েটি আমার কাছে এসে পড়ল, তিন-চার বছরের খাজনা বাকী পড়ে গেল, তারপর কবে যে ক্রোক দিলে, কবে যে নিলেম হ'লো, তা কেউ জানলে না। তারপর যখন জানা গেল তখন কত গিয়ে ধরাধরি করলুম, কিন্তু এত বড় বজ্জাত—কিছুতেই ছাড়লে না।

পূর্ণ। বাবুর বাড়ির উত্তর দিকের সেই নতুন কলমের বাগানটা নয়?

২য় ব্রাহ্মণ। হাঁ বাবা সেইটে। এখন হয়েছে বুড়োর সখের আমবাগান।

পূর্ণ। কিন্তু নীলেম-খরিদ জায়গা, এ তো আর কেউ ছেড়ে দিতে পারবে না বাবা।

২য় ব্রাহ্মণ। না পারুক, সে আশা আমি করিনে, কিন্তু বুড়ো ব্যাটা দুদিন বাদে শ্বশুর হবে কিনা—তাই বলি সময় থাকতে শ্বশুরের গুণাগুণ মা-লক্ষ্মী একটু শুনে রাখুন।

১ম ব্রাহ্মণ। জগদীশ মুখুয্যের বাড়িটাও নাকি বুড়ো দখল করে নিতে চায়।

পূর্ণ। কানাঘুষা তাই তো শুনছি বাবা।

২য় ব্রাহ্মণ। এমন কেউ থাকে বুড়ো বজ্জাতের দাড়িটা চড়চড় করে একটানে ছিঁড়ে নিতে পারে তবে গায়ের জ্বালা মেটে।

পূর্ণ। থাক থাক্ বাবা, পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওসব কথায় কাজ নেই। কে কোথায় শুনতে পাবে, কে কোথায় বলে দেবে, তা হলে আর রক্ষে থাকবে না।

২য় ব্রাহ্মণ। না খুড়ো, শুনবে আর কে? এই তো আমরা তিনজন। থাক গে ওসব কথা, বেলা হ'লো। চল ঘরে যাওয়া যাক।

পূর্ণ। তাই চল বাবা। সুধীর, সন্ধ্যার পর আমার ওখানে একবার এসো। আর সময় নেই—তোমাদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে হবে।

১ম ব্রাহ্মণ। সন্ধ্যার পরেই যাব খুড়ো। চল, এখন বাড়ি যাওয়া যাক।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

সরস্বতী নদী-তীর

[শরৎ অন্তে শীর্ণ সঙ্কীর্ণ সরস্বতী নদী। এ-তটে বিস্তীর্ণ মাঠ, ও-তটে লতাগুল্ম-পরিব্যাপ্ত ঘন বন। বনান্তরালে দিঘ্ড়া গ্রাম। নদীর উভয় তীর ক্ষুদ্র বাঁশের সেতু দিয়া সংযুক্ত। একটা পায়ে-হাঁটা সঙ্কীর্ণ পথ বনের মধ্য দিয়া দিঘ্ড়া গ্রামে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এই সকলের অন্তরালে নরেনের বৃহৎ অট্টালিকার কিছু কিছু দেখা যায় মাত্র। নদীর তীরে বসিয়া নরেন ছিপে মাছ ধরিতেছিল। বিজয়া ও কানাই সিং প্রবেশ করিল।]

বিজয়া। এই নদীর পারে দিঘ্ড়া, না কানাই সিং?

কানাই। হাঁ মা-জী।

বিজয়া। এই গাঁয়েই জগদীশবাবুর বাড়ি না?

কানাই। হাঁ মা-জী, বহুৎ বড়া বাড়ি।

বিজয়া। এই পুল পেরিয়ে বুঝি ঐ গাঁয়ে যেতে হয়?

[বিজয়া পুলের কাছে অগ্রসর হইতে নরেন্দ্র তাহাকে দেখিয়া]

নরেন। এই যে—নমস্কার! বিকেলবেলা একটুখানি বেড়াবার পক্ষে নদীর ধারটি মন্দ জায়গা নয় বটে, কিন্তু এসময় ম্যালেরিয়ার ভয়ও তো বড় কম নয়। এ বুঝি আপনাকে কেউ সাবধান করে দেয়নি?

বিজয়া। না, কিন্তু ম্যালেরিয়া তো লোক চিনে ধরে না। আমি তো বরং না জেনে এসেছি, আপনি যে জেনেশুনে জলের ধারে বসে আছেন? কৈ দেখি কি মাছ ধরলেন?

নরেন। (পুলের অপর প্রান্ত হইতে) পুঁটি মাছ। কিন্তু দু'ঘণ্টায় মাত্র দুটি পেয়েছি, মজুরি পোষায়নি। সময়টা তো কোনমতে কাটাতে হবে!

বিজয়া। কিন্তু মামার পুজোবাড়িতে এসে তাঁকে সাহায্য না করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন যে বড়ো? গুটি-দুই পুঁটি মাছ দিয়ে তো তাঁর সাহায্য হবে না!

নরেন। (হাসিয়া) না, কিন্তু প্রথমতঃ, মামার বাড়িতে আমি আসিনি, দ্বিতীয়তঃ তাকে সাহায্য করার বহু লোক আছে। আমার প্রয়োজন নেই।

বিজয়া। মামার বাড়ি আসেননি? এখানে তবে আছেন কোথায়?

নরেন। বাড়ি আমার ঐ দিঘ্‌ড়া গ্রামে। এই বাঁশের সাঁকো দিয়ে যেতে হয়।

বিজয়া। দিঘ্‌ড়ায়? তা হলে নরেনবাবুকে আপনি চেনেন? তিনি কি রকম লোক বলতে পারেন?

নরেন। ও—নরেন। তার বাড়িটা তো আপনি দেনার দায়ে কিনে নিয়েছেন? এখন তার সম্বন্ধে অনুসন্ধানে আর ফল কি? যে উদ্দেশ্যে নিলেন সে কথাও এ অঞ্চলের সবাই শুনেছে।

বিজয়া। একেবারে নেওয়া হয়ে গেছে এই বুঝি এদিকে রাষ্ট্র হয়েছে?

নরেন। হবারই কথা। জগদীশবাবুর সর্ব্বস্ব আপনার বাবার কাছে বিক্রি-কবলায় বাঁধা ছিলো, তাঁর ছেলের সাধ্য নেই তত টাকা শোধ করে। মেয়াদও শেষ হয়েছে—এ খবর সবাই জানে কি না।

বিজয়া। আপনি নিজেই যখন গ্রামের লোক তখন খবর জানেন বইকি। আচ্ছা, শুনেছি নরেনবাবু বিলেত থেকে ভাল করেই ডাক্তারি পাশ করে এসেছেন। কোন ভাল জায়গায় practice আরম্ভ করে আরও কিছুদিন সময় নিয়ে কি বাপের ঋণ শোধ করতে পারেন না?

নরেন। সম্ভব নয়। শুনেছি practice করাই নাকি তার সঙ্কল্প নয়।

বিজয়া। তবে তাঁর সঙ্কল্পটাই বা কি? এত খরচ-পত্র করে বিলেতে গিয়ে কষ্ট করে ডাক্তারি শেখবার ফলটাই বা কি হতে পারে? একেবারে অপদার্থ।

নরেন। অপদার্থ! (হাসিয়া) ঠিক ধরেছেন। এইটেই বোধ হয় তার আসল রোগ। তবে শুনতে পাই নাকি সে নিজে চিকিৎসা করার চেয়ে এমন একটা কিছু বার করে যেতে চায়, যাতে বহু লোকের উপকার হবে। খবর পাই এ নিয়ে সে পরিশ্রমও খুব করে।

বিজয়া। সত্যি হলে তো এ খুব বড় কথা। কিন্তু বাড়ি-ঘর গেলে কি করে এসব করবেন? তখন তো রোজগার করা চাই। আচ্ছা, আপনি তো নিশ্চয়ই বলতে পারেন, বিলেত যাবার জন্যে এখানকার লোক তাঁকে একঘরে করে রেখেছে কিনা।

নরেন। সে তো নিশ্চয়ই। আমার মামা পূর্ণবাবু তারও একপ্রকার আত্মীয়, তবুও পূজোর দিন বাড়িতে ডাকতে সাহস করেননি। কিন্তু তাতে তার ক্ষতি হয়নি। নিজের কাজকর্ম নিয়ে থাকে, সময় পেলে ছবি আঁকে। বাড়ি থেকে বড় বারই হয় না।

কানাই। মা-জী সন্ঝা হয়ে আসলে, বাড়ি ফিরতে রাত হবে।

নরেন। হাঁ, কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে এলো।

বিজয়া। তা হলে বাড়িটা গেলে কোনও আত্মীয়-কুটুম্বের ঘরেও তাঁর আশ্রয় পাবার ভরসা নেই বলুন?

নরেন। একেবারেই না।

বিজয়া। (মুহূর্ত্তকাল নীরবে থাকিয়া) তিনি যে কারও কাছেই যেতে চান না—নইলে এই মাসের শেষেই তো তাঁকে বাড়ি ছেড়ে দেবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে—আর কেউ হলে অন্ততঃ আমার সঙ্গেও একবার দেখা করবার চেষ্টা করতেন।

নরেন। হয়ত তার দরকার নেই, নয়, ভাবে লাভ কি? আপনি তো সত্যিই তাকে বাড়িতে থাকতে দিতে পারেন না।

বিজয়া। চিরকাল না পারলেও আর কিছুকাল থাকতে দেওয়া তো যায়। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় আছে। কি বলেন, সত্যি না?

নরেন। কিন্তু এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে যে!

বিজয়া। আসুক।

নরেন। আসুক? অর্থাৎ, দেশের প্রতি আপনার সত্যিকার টান আছে।

বিজয়া। (গম্ভীর হইয়া) তার মানে?

নরেন। মানে এই যে সন্ধ্যাবেলায় এখানে দাঁড়িয়ে থেকে দেশের ম্যালেরিয়াটা

পর্য্যন্ত না নিলে আপনার চলছে না।

বিজয়া। (হাসিয়া) ওঃ, এই কথা। কিন্তু দেশ তো আপনারও। ওটা আপনার নেওয়া হয়ে গেছে বোধ হয়? কিন্তু মুখ দেখে তা মনে হয় না।

নরেন। ডাক্তারদের একটু সবুর করে নিতে হয়।

বিজয়া। আপনিও কি ডাক্তার নাকি?

নরেন। হাঁ ডাক্তার বটে, কিন্তু খুব ছোট ডাক্তার।

বিজয়া। তা হলে আপনি শুধু প্রতিবেশী নন—তাঁর বন্ধু। তাঁর সম্বন্ধে যে-সব কথা আমি বলেছি হয়ত গিয়ে তাঁকেই গল্পই করবেন—না?

নরেন। (হাসিয়া) কি গল্প করব, বলেছেন একটা অপদার্থ হতভাগা লোক, এই তো? আপনার চিন্তা নেই, এ অত্যন্ত পুরোনো কথা, এ তাকে সবাই বলে। নতুন ক'রে বলবার দরকার নেই। তবে, বললে হয়ত সে কোনদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারে।

বিজয়া। আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁর লাভ কি? কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে তো ঠিক ও-রকম কথা আপনাকে আমি বলিনি।

নরেন। না বলে থাকলেও বলা উচিত ছিল।

বিজয়া। উচিত ছিল? কেন?

নরেন। ঋণের দায়ে যার বাস করবার গৃহ, যার সর্ব্বস্ব বিক্রি হয়ে যায়, তাকে সবাই হতভাগ্য বলে। আমরাও বলি। সুমুখে না পারলেও আড়ালে বলতে বাধা কি?

বিজয়া। (হাসিয়া) আপনি তো তাঁর চমৎকার বন্ধু!

নরেন। (ঘাড় নাড়িয়া) হ্যাঁ, অভেদ্য বললেও চলে। এমন কি তার হয়ে আমি নিজে গিয়েই আপনাকে ধরতুম, যদি না জানতুম সৎ উদ্দেশ্যেই তার বাড়িখানি আপনি গ্রহণ করছেন।

বিজয়া। আচ্ছা, আপনার বন্ধুকে একবার রাসবিহারীবাবুর কাছে যেতে বলতে পারেন না?

নরেন। কিন্তু তাঁর কাছে কেন?

বিজয়া। তিনি বাবার বিষয়-সম্পত্তি দেখেন কিনা।

নরেন। সে আমি জানি। কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে লাভ নেই। সন্ধ্যা হয়—আসি তবে,—নমস্কার।

[নরেন পুল পার হইয়া বনের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।
বিজয়া সেইদিকেই চাহিয়া রহিল।]

কানাই। এ বাবুটি কে মা-জী?

বিজয়া। (চমকিয়া আপন মনে কহিল) কে তা তো জানিনে। ঐ যাঁদের

বাড়িতে পুজো হচ্ছে তাঁদের ভাগ্নে।

[রাসবিহারীর প্রবেশ]

রাস। তোমাকে খুঁজছিলাম মা। খবর পেলুম তুমি নদীর দিকে একটু বেড়াতে এসেছ। ভাল কথা—তাকে আমরা নোটিশ দিয়েছি, আবার আমরা যদি রদ করতে যাই, আর পাঁচজন প্রজার কাছে সেটা কি রকম দেখাবে ভেবে দেখ দিকি!

বিজয়া। একখানা চিঠি লিখে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিন না। আমার নিশ্চয়ই বোধ হচ্ছে তিনি শুধু অপমানের ভয়েই এখানে আসতে সাহস করেন না।

রাস। (বিদ্রূপের ভাবে) মহা মানী লোক দেখছি। তাই অপমানটা ঘাড়ে নিয়ে আমাদেরই উপযাচক হয়ে তাঁকে থাকবার জন্যে চিঠি লিখতে হবে?

বিজয়া। (কাতর হইয়া) তাতে দোষ নেই কাকাবাবু—অযাচিত দয়া করার মধ্যে লজ্জা নেই।

রাস। (ঈষৎ হাসিয়া) মা, তোমার জিনিস তুমি দান করবে, আমি বাদ সাধব কেন? আমি শুধু এইটুকুই দেখাতে চেয়েছিলুম যে, বিলাস যা করতে চেয়েছিল তা স্বার্থের জন্যেও নয়, রাগের জন্যেও নয়—শুধু কর্ত্তব্য বলেই করতে চেয়েছিল। একদিন আমার বিষয় তোমার বাবার বিষয় সব এক হয়েই তোমাদের দু'জনের হাতে পড়বে। সেদিন বুদ্ধি দেবার জন্য এ বুড়োটাকে খুঁজে পাবে না মা।

[বিলাসের প্রবেশ—পরনে বিলাতী পোষাক, হাতে একটা
ছোট ব্যাগ, অত্যন্ত ব্যস্তভাবে]

বিলাস। এই যে তোমরা। বাবা, এখনো বাড়ি যাবার সময় পাইনি, কলকাতা থেকে ফিরেই শুনলুম তোমরা এসেছ নদীর তীরে বেড়াতে। বেড়ানো! বিরাট কার্য্যভার মাথায় নিয়ে কি করে যে মানুষ আলস্যে সময় কাটাতে পারে আমি তাই শুধু ভাবি। বাবা, একরকম সমস্ত কাজই প্রায় শেষ করে এলুম। কাদের আহ্বান করতে হবে, কাদের ওপর সেদিনের ভার দিতে হবে, কি কি করতে হবে,—সমস্ত।

রাস। সমস্ত? বল কি? এর মধ্যে করলে কি করে?

বিলাস। হ্যাঁ, সমস্ত! আমার কি আর নাওয়া-খাওয়া ছিল! বিজয়া, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ এই ক'টা দিন আমি রাগ করে আসিনি। যদিও রাগ আমি করিনি, কিন্তু করলেও সেটা কিছুমাত্র অন্যায় হ'তো না!

রাস। কানাই সিং, চলো ত বাবা একটু এগিয়ে দু'পা ঘুরে আসি গে। অনেকদিন নদীর এদিকটায় আসতে পারিনি।

কানাই সিং। চলিয়ে হুজুর।

[রাসবিহারী ও কানাই সিং-এর প্রস্থান]

বিলাস। তুমি স্বচ্ছন্দে চুপ করে থাকতে পার, কিন্তু আমি পারিনে। আমার দায়িত্ববোধ আছে। একটা বিরাট কার্য্যভার ঘাড়ে নিয়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারিনে। আমাদের মন্দির-প্রতিষ্ঠা এই বড়দিনের ছুটিতেই হবে। সমস্ত স্থির হয়ে গেল। এমন কি নিমন্ত্রণ করা পর্য্যন্ত বাকী রেখে আসিনি। উঃ—কাল সকাল থেকে কি ঘোরাটাই আমাকে ঘুরতে হয়েছে! যাক, ওদিকের সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কারা কারা আসবেন তাও নোট করে এনেছি, পড়ে দ্যাখো। অনেককেই চিনতে পারবে।

[সে ব্যাগ খুলিয়া হাতড়াইয়া কাগজখানা বাহির করিয়া ধরিল। বিজয়া গ্রহণ করিল বটে কিন্তু তার মুখ দেখিয়া মনে হইল বিতৃষ্ণার সীমা নাই।]

বিলাস। ব্যাপার কি? এমন চুপচাপ যে?

বিজয়া। আমি ভাবছি, আপনি যে তাঁদের নিমন্ত্রণ করে এলেন এখন তাঁদের কি বলা যায়?

বিলাস। তার মানে?

বিজয়া। মন্দির-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমি এখনও কিছু স্থির করে উঠতে পারিনি।

বিলাস। (সতীব্র বিস্ময়ে ও ততোধিক ক্রোধে বিলাসের মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। কিন্তু কণ্ঠস্বর তাহার পক্ষে যতটা সম্ভব সংযত করিয়া কহিল) তার মানে কি? তুমি কি ভেবেছ আসছে ছুটির মধ্যে না করতে পারলে আর কখনো করা যাবে? তারা তো কেউ তোমার—ইয়ে নন যে তোমার যখন সুবিধে হবে তখনই তাঁরা ছুটে এসে হাজির হবেন। মন স্থির হয়নি তার অর্থ কি শুনি?

বিজয়া। (মৃদুকণ্ঠে) এখানে ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার কোন সার্থকতা নেই। সে হবে না।

বিলাস। (কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া) আমি জানতে চাই তুমি যথার্থই ব্রাহ্ম-মহিলা কিনা!

বিজয়া। (তাহার মুখের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া) আপনি বাড়ি থেকে শান্ত হয়ে ফিরে না এলে আপনার সঙ্গে আলোচনা হতে পারবে না। এ-কথা এখন থাক।

বিলাস। আমরা তোমার সংস্রব পরিত্যাগ করতে পারি জানো?

বিজয়া। সে আলোচনা আমি কাকাবাবুর সঙ্গে করব, আপনার সঙ্গে নয়।

বিলাস। আমরা তোমার সংস্পর্শ ত্যাগ করলে কি হয় জানো?

বিজয়া। না, কিন্তু আপনার দায়িত্ববোধ যখন এত বেশী তখন আমার অনিচ্ছায় যাঁদের নিমন্ত্রণ করে অপদস্থ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁদের ভার

নিজেই বহন করুন। আমাকে অংশ নিতে অনুরোধ করবেন না।

বিলাস। আমি কাজের লোক, কাজই ভালবাসি, খেলা ভালবাসিনে তা মনে রেখো বিজয়া।

বিজয়া। (শান্তস্বরে) আচ্ছা আমি ভুলবো না।

বিলাস। (প্রায় চীৎকার করিয়া) হাঁ—যাতে না ভোলো সে আমি দেখব।

[বিজয়া কোন কথা না বলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল]

বিলাস। আচ্ছা, এত বড় বাড়ি তবে কি কাজে লাগবে শুনি? এ তো আর শুধু শুধু ফেলে রাখা যেতে পারবে না?

বিজয়া। (মুখ তুলিয়া দৃঢ়ভাবে) কিন্তু এ বাড়ি যে নিতেই হবে সে তো এখনও স্থির হয়নি।

বিলাস। (রাগিয়া সজোরে মাটিতে পা ঠুকিয়া) হয়েছে, একশোবার স্থির হয়েছে। আমি সমাজের মান্য ব্যক্তিদের আহ্বান করে এনে অপমান করতে পারব না। এ বাড়ি আমাদের চাই-ই, এ আমি করে তবে ছাড়ব। এই তোমাকে আমি জানিয়ে দিলুম।

[রাসবিহারী ফিরিয়া আসিলেন]

বিলাস। শুনছো বাবা, বিজয়া বলছেন, এ এখন হবে না—এ অপমান—

রাস। হবে না? কি হবে না? কে বলছে হবে না?

বিলাস। (আঙুল দিয়া দেখাইয়া) উনি বলছেন মন্দির-প্রতিষ্ঠা এখন হতে পারবে না।

রাস। বিজয়া বলছেন হবে না? বল কি? আচ্ছা স্থির হও বাবা, স্থির হও। কোন অবস্থাতেই উতলা হতে নেই। আগে শুনি সব। নিমন্ত্রণ হয়ে গেছে? হয়েছে। বেশ, সে তো আর প্রত্যাহার করা যায় না—অসম্ভব। এদিকে দিনও বেশী নেই, করতে হলে এর মধ্যেই সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করা চাই। এতে তো সন্দেহ নেই মা!

বিজয়া। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে না গেলে তো কিছুতেই হতে পারে না কাকাবাবু!

রাস। কার স্বেচ্ছায় বাড়ি ছাড়ার কথা বলছ মা, জগদীশের ছেলের? সে তো বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে—শোননি?

[বিজয়া বিলাসের দিক হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল! নিজেকে সংযত করিয়া]

বিজয়া। না শুনিনি। কিন্তু তাঁর জিনিসপত্র কি হ'লো? সমস্ত নিয়ে গেছেন?

বিলাস। (হাসির ভঙ্গীতে) শুনেচি থাকবার মধ্যে ছিল নাকি একটা ভাঙা খাট—তার ওপরই বোধ করি তার শয়ন চলত। আমি সেটা বাইরের গাছতলায় টেনে ফেলে দেবার হুকুম দিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলুম। আজ স্টেশনে নেবেই দরোয়ানের মুখে খবর পেলুম সেগুলো নেবার জন্যে আজ সকালে নাকি সে আবার এসেছে। যা কিছু তার আছে নিয়ে যাক, আমার কোন আপত্তি নেই।

রাস। তোমার দোষ বিলাস। মানুষ যেমন অপরাধীই হোক, ভগবান তাকে যত দণ্ডই দিন, তার দুঃখে আমাদের দুঃখিত হওয়া, সমবেদনা প্রকাশ করা উচিত। আমি বলছিনে যে অন্তরে তুমি তার জন্যে কষ্ট পাও না, কিন্তু বাইরেও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বললে না কেন? দেখতুম—যদি কিছু—

বিলাস। তার সঙ্গে দেখা করে নিমন্ত্রণ করা ছাড়া আমার ত আর কাজ ছিল না বাবা! তুমি কি যে বল তার ঠিক নেই। তা ছাড়া আমার পৌঁছুবার আগেই তো ডাক্তার সাহেব তাঁর তোরঙ্গ-প্যাটরা যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে সরে পড়েছেন। বিলাতের ডাক্তার! একটা অপদার্থ humbug কোথাকার!

রাস। না বিলাস, তোমার এরকম কথাবার্ত্তা আমি মার্জ্জনা করতে পারিনে। নিজের ব্যবহারে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত—অনুতাপ করা উচিত।

বিলাস। কি জন্যে শুনি? পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, পরের ক্লেশ নিবারণ করার শিক্ষা আমার আছে, কিন্তু যে দাম্ভিক বাড়ি বয়ে অপমান করে যায়—তাকে আমি মাপ করিনে। এত ভণ্ডামি আমার নেই।

রাস। কে আবার তোমাকে বাড়ি বয়ে অপমান করে গেল? কার কথা তুমি বলছ?

বিলাস। জগদীশবাবুর সুপুত্র নরেনবাবুর কথাই বলচি বাবা। তিনি একদিন ওঁর ঘরে বসেই আমাকে অপমান করে গিয়েছিলেন। তখন তাকে চিনতুম না তাই—(বিজয়াকে দেখাইয়া) নইলে ওঁকেও অপমান করে যেতে সে বাকী রাখেনি। তোমরা জান সে-কথা? (বিজয়ার প্রতি) পূর্ণবাবুর ভাগ্‌নে বলে নিজের পরিচয় দিয়ে যে তোমাকে পর্য্যন্ত সেদিন অপমান করে গিয়েছিল সে কে? তখন যে তাকে ভারী প্রশ্রয় দিলে! সে-ই নরেন। তখন নিজের যথার্থ পরিচয় দিতে যদি সে পারত—তবেই বলতে পারতুম সে পুরুষমানুষ। ভণ্ড কোথাকার!

বিজয়া। তিনিই নরেনবাবু! দরোয়ান পাঠিয়ে তাঁকেই বাড়ি থেকে বা'র করে দিয়েছেন? আমারই নাম করে? আমারই দেনার দায়ে?

[ক্রোধে ও ক্ষোভে সে যেন ছুটিয়া চলিয়া গেল।)

রাস। (হতবুদ্ধিভাবে) এ আবার কি?

বিলাস। আমি তার কি জানি!

রাস। যদি জানো না তো অত কথা দম্ভ করে বলতেই বা গেলে কেন? গোড়া থেকে শুনছ জগদীশের ছেলের ওপর ও জোর-জবরদস্তি চায় না, তবুও—

বিলাস। অত ভণ্ডামি আমি পারিনে। আমি সোজা পথে চলতে ভালবাসি।

রাস। তাই বেসো। সোজা পথ ওই একদিন তোমাকে আশা মিটিয়ে দেখিয়ে দেবে'খন। সোজা পথ! সোজা পথ!

[বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিজয়ার বসিবার ঘর

[বিজয়া বাহিরে কাহার প্রতি যেন একদৃষ্টে চাহিয়াছিল—পরে উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া তাহাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিতে একটি বালক প্রবেশ করিল—খালি গা, কোঁচড়ে মুড়ি তখনও চিবানো শেষ হয় নাই।]

পরেশ। ডাকছিলেন কেন মা ঠাকরুন?

বিজয়া। কি করছিলি রে?

পরেশ। মুড়ি খাচ্ছিনু।

বিজয়া। এ কাপড়খানা তোকে কে কিনে দিলে পরেশ? নতুন দেখছি যে!

পরেশ। হুঁ নতুন। মা কিনে দিয়েছে।

বিজয়া। এই কাপড় কিনে দিয়েছে! ছি ছি, কি বিশ্রী পাড় রে! (নিজের শাড়ির চওড়া সুন্দর পাড়খানি দেখাইয়া) এমনধারা পাড় নইলে কি তোকে মানায়?

পরেশ। (ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া) মা কিচ্ছু কিনতে জানে না। তোমাকে কে কিনে দিলে?

বিজয়া। আমি আপনি কিনেছি।

পরেশ। আপনি? দামটা কত পড়ল শুনি?

বিজয়া। তোর তাতে কি রে? কিন্তু ত্থাখ, আমি তোকে এমনি একখানা কাপড় কিনে দিই যদি তুই—

পরেশ। কখন কিনে দেবে?

বিজয়া। কিনে দিই যদি তুই একটা কথা শুনিস্। কিন্তু তোর মা কি আর কেউ যেন না জানতে পারে।

পরেশ। মা জানবে ক্যাম্‌নে? তুমি বলো না—আমি এক্ষুনি শুনব।

বিজয়া। তুই দিঘ্‌ড়া চিনিস্?

পরেশ। ওই তো হোথা। গুটিপোকা খুঁজতে কতদিন তো দিঘ্‌ড়ে যাই।

বিজয়া। ওখানে সবচেয়ে কাদের বড়ো বাড়ি তুই জানিস্?

পরেশ। হিঁ—বামুনদের গো! সেই যে আর বছর রস খেয়ে যে ছাত থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তেনাদের। এই যেন হেথায় গোবিন্দর মুড়ি-বাতাসার দোকান, আর ওই হোতা তেনাদের কোটা। গোবিন্দ কি বলে জানো মা-ঠাকরুণ! বলে সব মাগ্যি গোণ্ডা—আধ পয়সায় আর আড়াই-গোণ্ডা বাতাসা মিলবে না, এখন মোটে দুগোণ্ডা! কিন্তু তুমি যদি একসঙ্গে গোটা পয়সার আনতে দাও তো আমি পাঁচ-গোণ্ডা আনতে পারি।

বিজয়া। তুই দু'পয়সার বাতাসা কিনে আনতে পারিস্?

পরেশ। হিঁ, এ হাতে এক পয়সার পাঁচ-গোণ্ডা গুনে নিয়ে বলব—দোকানী, এ হাতে আর পাঁচ-গোণ্ডা গুনে দাও। দিলে বলব—মা-ঠান বলে দে'ছে দুটো ফাউ দিতে—না? তবে পয়সা দুটো দেব—না?

বিজয়া। (হাসিয়া) হাঁ, তবে পয়সা দুটো হাতে দিবি। আর অমনি দোকানীকে জিজ্ঞেস করবি—ওই যে বড়ো বাড়িতে নরেনবাবু থাকত—সে কোথায় গেছে? ফিরে পারবি তো?

পরেশ। (মাথা নাড়িয়া) আচ্ছা পয়সা দুটো দাও না তুমি—আমি ছুটে গিয়ে নিয়ে আসি।

বিজয়া। (তাহার হাতে পয়সা দিয়া) বাতাসা হাতে পেয়ে ভুলে যাবিনে তো?

পরেশ। নাঃ—[বলিয়াই দৌড় দিল। বিজয়া ফিরিয়া আসিয়া একটা চৌকিতে বসিতেই পরেশের মা প্রবেশ করিল]

পরেশের মা। পরেশকে বুঝি কোথাও পাঠালে দিদিমণি? উদ্ধ্মুখে ছুটেছে। ডাকলুম সাড়া দিলে না।

বিজয়া। (হাসিয়া) ও—পরেশ ছুটেছে বুঝি? তবে নিশ্চয় দিঘ্‌ড়ায় বাতাসা কিনতে দৌড়েছে। হঠাৎ আমার কাছে দুটো পয়সা পেলে কিনা।

পরেশের মা। কিন্তু বাতাসা তো কাছেই মেলে—সেখানে কেন?

বিজয়া। কি জানি সেখানে কে এক গোবিন্দ দোকানী আছে সে নাকি একটু বেশী দেয়।

পরেশের মা। বইগুলো যে গুছিয়ে তোলবার কথা ছিল—তুলবে না?

বিজয়া। এখন থাক গে পরেশের মা!

পরেশের মা। একটা কথা তোমায় বলতে চাই দিদিমণি, ভয়ে বলতে পারিনে।

বিজয়া। কেন, তোমার ভয়টা কিসের? কি কথা?

পরেশের মা। কালীপদ বলছিল সে তো আর টিকতে পারে না। ছোটবাবু তাকে দু'চোখে দেখতে পারেন না। যখন তখন ধমকানি। ও ছিল কর্তাবাবুর খানসামা—অভ্যেস ছিল কলকাতায় থাকার। কাল নাকি ছোটবাবু তাকে হুকুম দিয়েছেন তার এখানে কাজ কম, উড়ে মালীর সঙ্গে বাগানে খাটতে হবে। নইলে জবাব দেওয়া হবে! বয়স হয়েছে, পারবে কেন বাগানে গিয়ে কোদাল পাড়তে দিদি!

বিজয়া। (দৃঢ়কণ্ঠে) না, তাকে কোদাল পাড়তে হবে না। ছোটবাবুকে আমি বলে দেবো!

পরেশের মা। আমাদের যদু ঘোষ গোমস্তা মশাই বলছিল যে—

বিজয়া। এখন থাক পরেশের মা। আমার একখানি দরকারী চিঠি লিখবার আছে, পরে শুনব। এখন তুমি যাও।

পরেশের মা! আচ্ছা যাচ্ছি দিদিমণি!

[পরেশের মা চলিয়া গেলে বিজয়া জানলার কাছে গিয়া বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিল কিন্তু পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া একটা চিঠির কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিতে বসিল। কালীপদ দ্বারের কাছে মুখ বাড়াইয়া ডাকিল—]

কালীপদ। মা!

বিজয়া। (মুখ তুলিয়া) পরেশের মাকে তো বলতে বলে দিয়েছি কালীপদ, বাগানে গিয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে না।

কালী। কিন্তু ছোটবাবু—

বিজয়া। সে তাঁকে আমি বলে দেব, তোমার ভয় নেই। আচ্ছা যাও এখন।

কালী। যে কাপড়গুলো রোদে দেওয়া হয়েছে সে যে—

বিজয়া। এখন থাক কালীপদ। এই দরকারী চিঠিটা শেষ না করে আমি উঠতে পারবো না!

[কালীপদ প্রস্থান করিলে বিজয়া উঠিয়া আর একবার জানালাটা খুলিয়া আসিয়া বসিল। চিঠির কাগজটা ঠেলিয়া দিয়া খবরের কাগজ টানিয়া লইল। ভাবে বোধ হয় অতিশয় চঞ্চল, কিছুতেই মন দিতে পারে না।]

যদু। (নেপথ্য হইতে ডাকিল) মা!

বিজয়া। কে?

যদু। (দরজার নিকট হইতে) আমি যদু। একবার আসতে পারি কি?

বিজয়া। না যদুবাবু, এখন আমার সময় নেই। আপনি আর কোন সময় আসবেন।

যদু। আচ্ছা মা!

[প্রস্থান]

[বিজয়া কাগজ পড়িতেছিল। অন্য ধার দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে পরেশ প্রবেশ করিল। বিজয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল]

বিজয়া। দোকানী কি বললে পরেশ?

পরেশ। (বস্ত্রাঞ্চলে লুকানো বাতাসার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) বাতাসা তো? পয়সায় ছ'গোণ্ডা করে।

বিজয়া। আরে না, না,—সে নরেনবাবুর কথা কি বললে বল্ না?

পরেশ। (মাথা নাড়িয়া) জানিনে। দোকানী পয়সায় ছ'গোণ্ডার কথা কাউকে বলতে মানা করে দেছে। বলে কি জান মা-ঠাকরুণ—

বিজয়া। তুই নরেনবাবুর কথা কি জেনে এলি তাই বল্ না?

পরেশ। সে হোতা নেই—কোথায় চলে গেছে। গোবিন্দ বলে কি জানো মা-ঠান? বলে বারো গোণ্ডার—

বিজয়া। (রুক্ষস্বরে নিয়ে যা তো বারো গণ্ডা বাতাসা আমার সুমুখ থেকে

[বিজয়া জানালার কাছে সরিয়া দাঁড়াইল।]

পরেশ। (ঠোঙা দুইটা হাতে করিয়া) এর বেশী যে দেয় না মা-ঠান্!

বিজয়া। (একটু পরে মুখ ফিরাইয়া কহিল) পরেশ, ওগুলো তুই খেগে যা।

[বলিয়া পুনরায় জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল।]

পরেশ। (সভয়ে) সব খাবো?

বিজয়া। (মুখ না ফিরাইয়া) হাঁ, সব খেগে যা। ওতে আমার কাজ নেই।

পরেশ। এর বেশী দিলে না যে মা-ঠান! কত তারে বলনু।

বিজয়া। না দিক্‌গে। আমি রাগ করিনি পরেশ, বাতাসা তুই নিয়ে যা—খেগে।

পরেশ। সব একলা খাব? (একটু চুপ করিয়া) কানা ভট্‌চায্যিমশায়ের কাছে গিয়ে জেনে আসব মা-ঠান?

বিজয়া। কে কানা ভট্‌চায্যিমশাই রে? কি জেনে আসবি?

পরেশ। জেনে আসব কোথায় গেছে নরেন্দরবাবু?

[মুখ ফিরাইতেই দেখিল নরেন ঘরে প্রবেশ করিতেছে, তাহার হাতে একটা চামড়ার বাক্স। নীচে সেটা রাখিয়া দিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।]

বিজয়া। (লজ্জিত হইয়া) যা যা, আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই। তুই যা।

পরেশ। (ক্ষুণ্ণ-স্বরে) কানা ভট্‌চায্যিমশাই তেনাদের পাশের বাড়িতেই থাকে কিনা। গোবিন্দ দোকানী বললে, নরেন্দরবাবুর খবর তিনিই জানে।

বিজয়া। (শুষ্ক হাসিয়া) আসুন বসুন। (পরেশের প্রতি) তুই এখন যা না পরেশ। ভারী তো কথা—তার আবার—সে আর একদিন তখন জেনে আসিস্ না হয়। এখন যা—

[পরেশ কিছু না বুঝিয়া চলিয়া গেল।]

নরেন। আপনি নরেনবাবুর খবর জানতে চান? তিনি কোথায় আছেন, এই?

বিজয়া। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) হাঁ, তা সে একদিন জানলেই হবে।

নরেন। কেন? কোন দরকার আছে?

বিজয়া। দরকার ছাড়া কি কেউ কারো খবর রাখতে চায় না?

নরেন। কেউ কি করে না করে সে ছেড়ে দিন। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো তার সমস্ত সম্বন্ধ চুকে গেছে। আবার কেন তার সন্ধান নিচ্ছেন? ঋণ কি সব শোধ হয়নি? (বিজয়া নীরব রহিল।) যদি আরও কিছু দেনা বার হয়ে থাকে, তা হলেও আমি যতদূর জানি, তার এমন কিছু আর নেই যা থেকে সেই বাকী টাকা শোধ হতে পারে। এখন আর তার খোঁজ করা বৃথা।

বিজয়া। কে আপনাকে বললে, আমি দেনার জন্যেই তাঁর সন্ধান করছি?

নরেন। তাছাড়া আর যে কি হতে পারে, আমি তো ভাবতে পারিনে। তিনিও আপনাকে চেনেন না, আপনিও তাঁকে চেনেন না।

বিজয়া। তিনিও আমাকে চেনেন। আমিও তাঁকে চিনি।

নরেন। তিনি আপনাকে চেনেন একথা সত্যি, কিন্তু আপনি তাঁকে চেনেন না।

বিজয়া। কে বললে আমি তাঁকে চিনি না?

নরেন। আমি জানি। ধরুন, আমিই যদি বলি আমার নাম নরেন, তাতেও তো আপনি না বলতে পারবেন না।

বিজয়া। না বলতে সত্যিই পারব না, এবং আপনাকেও বলব এই সত্যি কথাটা আপনারও অনেক পূর্বেই আমাকে বলা উচিত ছিল। (নরেন মলিনমুখে নীরব হইয়া রহিল)। অন্য পরিচয়ে নিজের আলোচনা শোনা, আর লুকিয়ে আড়ি পেতে শোনা, দুটোই কি আপনার সমান বলে মনে হয় না নরেনবাবু? আমার তো হয়। তবে কিনা আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের, আর আপনারা হিন্দু, এই যা প্রভেদ।

নরেন। (একটুখানি মৌন থাকিয়া) আপনার সঙ্গে অনেক রকম আলোচনার মধ্যে নিজের আলোচনাও ছিল বটে, কিন্তু তাতে মন্দ অভিপ্রায় কিছুই ছিল না। শেষ

দিনটায় পরিচয় দেব মনেও করেছিলাম, কিন্তু কি জানি, কেন হয়ে উঠল না, কিন্তু এতে তো আপনার কোন ক্ষতি হয়নি !

বিজয়া। ক্ষতি একজনের তো কত রকমেই হতে পারে নরেনবাবু! আর যদি হয়ে থাকে সে হয়েই গেছে। আপনি এখন আর তার উপায় করতে পারবেন না। সে থাক, কিন্তু এখন যদি সত্যিই আপনার নিজের সম্বন্ধে কোন কথা জানতে চাই তা হলে কি—

নরেন। রাগ করব? না—না—না!

[প্রশান্ত নির্মল হাস্যে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল]

বিজয়া। আপনি এখন আছেন কোথায়?

নরেন। গ্রামান্তরে আমার দূর-সম্পর্কের এক পিসী এখনো বেঁচে আছেন, তাঁর বাড়িতেই গিয়েছি।

বিজয়া। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে যে সামাজিক গোলযোগ আছে তা কি সে গ্রামের লোকেরা জানে না?

নরেন। জানে বইকি।

বিজয়া। তবে?

নরেন। (একটুখানি ভাবিয়া) তাঁদের যে ঘরটায় আছি সেটাকে ঠিক বাড়ির মধ্যে বলা যায় না। আর আমার অবস্থা শুনেও বোধ করি সামান্য কিছুদিনের জন্যে তাঁর ছেলেরাও আপত্তি করেনি। তবে বেশীদিন বাড়িতে থেকে তাঁদের বিব্রত করা চলবে না সে ঠিক। (একটু চুপ করিয়া) আচ্ছা সত্যি কথা বলুন তো, কেন এসব খোঁজ নিচ্ছিলেন? বাবার কি আরও কিছু দেনা বেরিয়েছে? (বিজয়া চেষ্টা করিয়াও কোন কথা কহিতে পারিল না।) পিতৃঋণ কে না শোধ করতে চায়? কিন্তু সত্যি বলছি আপনাকে স্বনামে বেনামে এমন কিছু আমার নেই যা বেচে টাকা দিতে পারি। শুধু এই microscope-টা আছে। এটা কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি, যদি কোথাও বেচে অন্যত্র যাবার খরচ যোগাড় করতে পারি। পিসীমার অবস্থাও খুব খারাপ—এমন কি খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত—(বিজয়া মুখ ফিরাইয়া আর একদিকে চাহিয়া রহিল) তবে যদি দয়া করে কিছু সময় দেন, তাহলে বাবার দেনা যতই হোক —আমি নিজের নামে লিখে দিয়ে যেতে পারি। ভবিষ্যতে শোধ দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করব। আপনি রাসবিহারীবাবুকে একটু বললেই তিনি এ-বিষয়ে এখন আর আমাকে পীড়াপীড়ি করবেন না।

বিজয়া। বেলা প্রায় তিনটা বাজে, আপনার খাওয়া হয়েছে?

নরেন। হাঁ, হয়েছে একরকম। কলকাতা যাব বলেই বেরিয়েছি কিনা; পথে ভাবলুম একবার দেখা করে যাই। তাই হঠাৎ এসে পড়লুম।

বিজয়া। কিন্তু, আপনার মুখ দেখে মনে হয় যেন খাওয়া এখনও হয়নি!

নরেন। (সহাস্যে) গরীব-দুঃখীদের মুখের চেহারাই এইরকম—খাওয়ার ছবিটা সহজে ফুটতে চায় না। আপনাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ ঐখানে।

বিজয়া। তা জানি। আপনার microscope-এর দাম কত?

নরেন। কিনতে আমার পাঁচশো টাকার বেশী লেগেছিল, এখন আড়াইশো টাকা—দুশো টাকা পেলেও আমি দিই—একেবারে নতুন আছে বললেও হয়।

বিজয়া। এত কমে দেবেন? আপনার কি এর সব কাজ শেষ হয়ে গেছে?

নরেন। কাজ? কিছুই হয়নি।

বিজয়া। আমার নিজের একটা অনেকদিন থেকে কেনবার সখ আছে—কিন্তু হয়ে ওঠেনি। আর কিনেই বা কি হবে? কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছি; এখানে শিখবোই বা কি করে?

নরেন। আমি সমস্ত শিখিয়ে দিয়ে যাব। দেখবেন? (বিজয়ার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই microscopeটা বাহির করিয়া একটি ছোট টিপয়ের উপর রাখিয়া যন্ত্রটা দেখিবার মত করিয়া লইল) আপনি ঐ চেয়ারটায় বসুন। আমি এক্ষুনি সমস্ত দেখিয়ে দিচ্ছি। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রটির সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, তারা ভাবতে পারে না কতবড় বিস্ময় এই ছোট্ট জিনিসটার ভিতর লুকানো আছে। এই slide-টা ভারী স্পষ্ট। জীবজগতের কতবড় বিস্ময়ই না এইটুকুর মধ্যে রয়েছে। এই দেখুন—(বিজয়া যন্ত্রটায় চোখ রাখিয়া দেখিতে লাগিল) কেমন দেখতে পাচ্ছেন তো?

বিজয়া। হাঁ পাচ্ছি। ঝাপ্সা ধোঁয়ায় সব একাকার দেখাচ্ছে।

নরেন। ধোঁয়া? দাঁড়ান—দাঁড়ান—বোধ হয়—(কলকব্জা কিছু কিছু ঘুরাইয়া নিজে দেখিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া) এইবার দেখুন। ঐ যে ছোট একটুখানি—কেমন আর তো ঝাপ্সা নেই।

বিজয়া। না। এবার ঝাপ্সার বদলে ধোঁয়া খুব গাঢ় হয়েছে।

নরেন। গাঢ় হয়েছে? তা কি করে হবে?

বিজয়া। (মুখ তুলিয়া) সে আমি কি করে জানব? ধোঁয়া দেখলে কি আগুন দেখছি বলব?

নরেন। তাই কি আমি বলছি? এই স্ক্রুটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের চোখের মত করে নিন না? এতে শক্তটা আছে কোন্খানে?

[বিজয়া কলে চোখ পাতিয়া হাত দিয়া স্ক্রু ঘুরাইতেছিল—নরেন ব্যস্ত হইয়া]

নরেন। আহা-হা করেন কি? কত ঘুরাচ্ছেন,—এ কি চরকা? দাঁড়ান

আমি ঠিক করে দিই। এইবার দেখুন, (বিজয়া পুনরায় দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল) কেমন, পেলেন দেখতে ?

বিজয়া। না।

নরেন। না কেন ? বেশ তো দেখা যাচ্ছে—পেলেন দেখতে ?

বিজয়া। না।

নরেন। আপনার পেয়েও কাজ নেই। এমন মোটা বুদ্ধি আমি জন্মে দেখিনি।

বিজয়া। মোটা বুদ্ধি আমার, না আপনি দেখাতে জানেন না ?

নরেন। (অনুতপ্ত-কণ্ঠে) আর কি করে দেখাব বলুন ? আপনার বুদ্ধি কিছু আর সত্যিই মোটা নয়, কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে আপনি মন দিচ্ছেন না। আমি বকে মরছি, আর আপনি মিছামিছি ওটাতে চোখ রেখে মুখ নীচু করে হাসছেন।

বিজয়া। কে বললে আমি হাসছি ?

নরেন। আমি বলছি।

বিজয়া। আপনার ভুল।

নরেন। আমার ভুল! আচ্ছা বেশ। যন্ত্রটা তো আর ভুল নয়, তবে কেন দেখতে পেলেন না ?

বিজয়া। যন্ত্রটা আপনার খারাপ।

নরেন। (বিস্ময়ে) খারাপ! আপনি জানেন এরকম powerful microscope এখানে বেশী লোকের নেই ? এমন বড় এবং স্পষ্ট দেখাতে—

[বলিয়া স্বচক্ষে একবার যাচাই করিয়া লইবার অতি ব্যাগ্রতায় ঝুঁকিতে গিয়া দু জনের মাথা ঠুকিয়া গেল]

বিজয়া। উঃ। (মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) মাথা ঠুকে দিলে কি হয় জানেন ? শিঙ বেরোয়।

নরেন। শিঙ বেরুলে আপনার মাথা থেকেই বেরুনো উচিত।

বিজয়া। তা বইকি! এই পুরোনো ভাঙা microscope কে ভাল বলিনি বলে—আমার মাথাটা শিঙ বেরুবার মত মাথা।

নরেন। (শুষ্ক হাসি হাসিয়া) আপনাকে সত্যি বলছি এটা ভাঙা নয়। আমার কিছু নেই বলেই আপনার সন্দেহ হচ্ছে, আমি ঠকিয়ে নেবার চেষ্টা করছি, কিন্তু আপনি পরে দেখবেন।

বিজয়া। পরে দেখে আর কি করব বলুন ? তখন আপনাকে আমি পাব কোথায় ?

নরেন। (তিক্তস্বরে) তবে কেন বললেন আপনি নেবেন ? কেন এতক্ষণ

মিথ্যে কষ্ট দিলেন? আমার কলকাতা যাওয়া আজ আর হ'লো না।

বিজয়া। (গম্ভীরভাবে) আপনিই বা কেন না বললেন এটা ভাঙা!

নরেন। (মহা বিরক্ত হইয়া) একশোবার বলছি ভাঙা নয়, তবু বলবেন ভাঙা? (ক্রোধ সংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) আচ্ছা তাই ভালো! আমি আর তর্ক করতে চাইনে। এটা ভাঙাই বটে। কিন্তু সবাই আপনার মত অন্ধ নয়। আচ্ছা চললুম।

[যন্ত্রটা বাক্সের মধ্যে পুরিবার উপক্রম করিল।]

বিজয়া। (গম্ভীরভাবে) এখুনি যাবেন কি করে? আপনাকে যে খেয়ে যেতে হবে।

নরেন। না, তার দরকার নেই।

বিজয়া। কে বললে নেই?

নরেন। কে বললে? আপনি মনে মনে হাসছেন? আমাকে কি উপহাস করছেন?

বিজয়া। আপনাকে কিন্তু নিশ্চয় খেয়ে যেতে হবে। একটু বসুন আমি এখুনি আসছি।

[বিজয়া বাহির হইয়া গেল। নরেন microscopeটা বাক্সের মধ্যে পুরিয়া টিপয় হইতে নামাইয়া রাখিল। বিজয়া স্বহস্তে খাবারের থালা এবং কালীপদর হাতে চায়ের সরঞ্জাম দিয়া ফিরিয়া আসিল।]

এর মধ্যেই ওটা বন্ধ করে ফেলেছেন? আপনার রাগ ত কম নয়!

নরেন। (উদাসকণ্ঠে) আপনি নেবেন না তাতে রাগ কিসের? শুধু খানিকক্ষণ বকে মরলুম এই যা।

বিজয়া। (থালাটা টেবিলের ওপর রাখিয়া) তা হতে পারে। কিন্তু যেটুকু বকেছেন, সেটুকু নিছক নিজের জন্যে। একটা ভাঙা জিনিস গচিয়ে দেবার মতলবে। আচ্ছা, খেতে বসুন, আমি চা তৈরী করে দিই। [নরেন সোজা বসিয়া রহিল] আচ্ছা। আমিই না হয় নেব, আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে না। আপনি খেতে আরম্ভ করুন।

নরেন। আপনাকে দয়া করতে তো আমি অনুরোধ করিনি।

বিজয়া। সেদিন কিন্তু করেছিলেন; যেদিন মামার হয়ে পুজোর সুপারিশ করতে এসেছিলেন।

নরেন। সে পরের জন্য, নিজের জন্য নয়। এ অভ্যাস আমার নেই।

বিজয়া। তা সে যাই হোক, ওটা কিন্তু আর আপনার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না। এখানেই থাকবে। এবার খেতে বসুন।

নরেন। এ-কথার মানে?

বিজয়া। মানে একটা কিছু আছে বইকি।

নরেন। (ক্রুদ্ধ হইয়া) সেইটে কি তাই আমি আপনার কাছে শুনতে চাইছি। আপনি কি ওটি আটকে রাখতে চান? এও কি বাবা আপনার কাছে বাঁধা রেখে-ছিলেন? আপনি তো দেখছি তা হলে আমাকেও আটকাতে পারেন, বলতে পারেন বাবা আমাকেও আপনার কাছে বাঁধা দিয়ে গেছেন?

বিজয়া। (আরক্তমুখে ঘাড় ফিরাইয়া) কালীপদ, তুই দাঁড়িয়ে কি করছিস্। পান নিয়ে আয়। (কালীপদ চায়ের সরঞ্জাম টেবিলে রাখিয়া চলিয়া গেল।) নিন, ঝগড়া করবেন না—এবার খেয়ে নিন।

[নরেন নিঃশব্দে গম্ভীরমুখে আহার করতে লাগিল।]

নরেন। শুনুন।

বিজয়া। শুনব পরে। আগে পেট ভরে খান।

নরেন। অনেক তো খেলুম।

বিজয়া। আরও অনেক যে পড়ে রইল।

নরেন। তা বলে আমি কি করব? আমি পারব না।

বিজয়া। তা জানি, আপনার কোন কিছু পারবারই শক্তি নেই। আচ্ছা, microscope দেখতে শিখে আমার কি লাভ হবে?

নরেন। (সবিস্ময়ে) দেখতে শিখে কি লাভ হবে?

বিজয়া। হাঁ, তাই তো। এ শেখায় লাভ যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন আমি খুশী হয়ে ওটা কিনব, তা যতই কেননা ভাঙা হোক।

নরেন। কিনতে হবে না আপনাকে।

বিজয়া। বেশ তো বুঝিয়েই দিন না।

নরেন। দেখুন, আপনাকে দেখাতে চেয়েছিলুম—জীবাণুর গঠন। খালি চোখে ওদের দেখা যায় না—যেন অস্তিত্বই নেই! ওদের ধরা যায় শুধু ঐ যন্ত্রটার মধ্য দিয়ে। সৃষ্টি ও প্রলয়ের মত বড় শক্তি নিয়ে যে ওরা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়ে আছে—ওদের সেই জীবন-ইতিহাস—কিন্তু আপনি তো কিছু শুনছেন না।

বিজয়া। শুনছি বইকি।

নরেন। কি শুনলেন, বলুন তো?

বিজয়া। বাঃ, একদিনেই নাকি শুনে শেখা যায়? আপনিই বুঝি একদিনে শিখেছিলেন।

নরেন। (হো হো করিয়া হাসিয়া) কিন্তু আপনার যে একশো বছরেও হবে না? তা ছাড়া এসব আপনাকে শেখাবেই বা কে?

বিজয়া। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) কেন, আপনি! নইলে এই ভাঙা কলটা

আমি ছাড়া আর কে নেবে।

নরেন। আপনার নিয়েও কাজ নেই, আমি শেখাতেও পারব না।

বিজয়া। পারতেই হবে আপনাকে। জিনিস বিক্রী করে যাবেন আপনি, আর শেখাতে আসবে আর একজন? না হয় তো আর এক কাজ করুন। শুনছি আপনি ভাল ছবি আঁকতে পারেন। তাই আমাকে শিখিয়ে দিন। এ তো শিখতে পারব।

নরেন। (উত্তেজিত হইয়া) তাও না। যে-বিষয়ে মানুষের নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান থাকে না—তাতেই যখন মন দিতে পারলেন না—মন দেবেন ছবি আঁকতে? কিছুতেই না।

বিজয়া। তা হলে ছবি আঁকতেও পারব না?

নরেন। না। আপনি যে কিছুই মন দিয়ে শোনেন না।

বিজয়া। (ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের সহিত) কিছুই না শিখতে পারলে কিন্তু সত্যিই মাথায় শিঙ বেরোবে।

নরেন। (উচ্চহাস্য করিয়া) সেই হবে আপনার উচিত শাস্তি।

বিজয়া। (মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিয়া) তা বই কি! আপনার শেখাবার ক্ষমতা নেই তাই বলুন না। কিন্তু চাকরেরা কি করছে? আলো দেয় না কেন? একটু বসুন, আমি আলো দিতে বলে আসি।

[বিজয়া দ্রুতপদে উঠিয়া দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া অকস্মাৎ যেন ভূত দেখিয়া পিছাইয়া আসিল। পিতা-পুত্র রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী প্রবেশ করিয়া হাতের কাছে দু'খানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিলেন। বিলাসের মুখের উপর যেন এক ছোপ কালি মাখানো, এমন বিশ্রী চেহারা। বিজয়া আপনাকে সংবরণ করিয়া]

বিজয়া। আপনি কখন এলেন কাকাবাবু!

রাস। (শুষ্কহাস্যে) প্রায় আধঘণ্টা হ'লো এসে ঐ সামনের বারান্দায় বসে। কিন্তু তুমি কথাবার্ত্তায় বড় ব্যস্ত বলে আর ডাকলাম না। ঐ বুঝি সেই জগদীশের ছেলে? কি চায় ও?

বিজয়া। (মৃদুস্বরে) একটা microscope বিক্রী করে উনি চলে যেতে চান। তাই দেখাচ্ছিলেন।

বিলাস। (গর্জ্জন করিয়া) Microscope! ঠকাবার জায়গা পেলে না বুঝি!

[নরেন ধীরে ধীরে অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল।]

রাস। আহা, ও-কথা বলো কেন? তার উদ্দেশ্য তো আমরা জানিনে। ভালও তো হতে পারে। অবশ্য জোর করে কিছুই বলা যায় না—সেও ঠিক। তা সে যাই হোক গে, ওতে আমাদের আবশ্যক কি? দূরবীণ হলেও না হয় কখনো

কালে-ভদ্রে দুরে-টুরে দেখতে কাজে লাগতে পারে।

[আলো হাতে করিয়া কালীপদ প্রবেশ করিল।]

রাস। কালীপদ, সেই বাবুটি বোধ করি ওদিকে কোথাও বসে অপেক্ষা করছে, তাকে বলে দাওগে—ঐ যন্ত্রটা আমরা কিনতে পারব না—আমাদের দরকার নেই। এসে নিয়ে চলে যাক।

বিজয়া। (ভয়ে ভয়ে) তাঁকে বলেছি আমি নেব।

রাস। (আশ্চর্য্য হইয়া) নেবে? কেন, ওতে প্রয়োজন কি?

[বিজয়া নীরব]

রাস। উনি দাম কত চান?

বিজয়া। দুশো টাকা।

রাস। দুশো? দুশো টাকা চায়? বিলাস তো তা হলে নেহাৎ—কি বল বিলাস? কলেজে তোমাদের F. A. class-এ Chemistryতে এসব অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছ, দুশো টাকা microscope-এর দাম? এ তো কেউ কখনো শোনেনি। কালীপদ, যা ওকে নিয়ে যেতে বলে আয়। এসব ফন্দি এখানে খাটবে না।

বিজয়া। কালীপদ, তুমি তোমার কাজে যাও। তাঁকে যা বলবার আমি নিজেই বলব। [কালীপদর প্রস্থান]

বিলাস। (শ্লেষ করিয়া) কেন বাবা মিথ্যে অপমান হতে গেলে? ওঁর হয়ত এখনো কিছু দেখিয়ে নিতে বাকী আছে। (রাসবিহারী নীরব) আমরাও অনেক রকম microscope দেখেছি বাবা, কিন্তু হো হো করে হাসবার বিষয় কোনটার মধ্যে পাইনি।

[বিজয়া তাহার দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া রাসবিহারীকে]

বিজয়া। আমার সঙ্গে কি আপনার কোন বিশেষ কথা আছে কাকাবাবু?

রাস। (অলক্ষ্যে পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করিয়া ধীরভাবে) কথা আছে বইকি মা। কিন্তু কিনবে বলে কি ওকে সত্যিই কথা দিয়ে ফেলেছ? সে যদি হয়ে থাকে তো নিতেই হবে। দাম ওর যাই হোক তবু নিতে হবে। সংসারে ঠকা-জেতাটাই বড় কথা নয় বিজয়া, সত্যটাই বড়। সত্যভ্রষ্ট হতে তো তোমাকে আমি বলতে পারব না।

বিলাস। তাই বলে ঠকিয়ে নিয়ে যাবে?

রাস। যাক। নিক ও ঠকিয়ে। জগদীশের ছেলের কাছে এর বেশী প্রত্যাশা ক'রো না বিলাস। কালীপদ গিয়ে বলে আসুক, কাল এসে যেন কাছারি থেকে টাকাটা নিয়ে যায়।

বিজয়া। যা বলবার আমিই তাঁকে বলব। আর কারো বলার আবশ্যক নেই কাকাবাবু।

রাস। বেশ বেশ, তাই ব'লো মা। বলে দিও ওর কোন ভয় নেই, দুশো টাকাই যেন নিয়ে যায়।

বিজয়া। রাত হয়ে যাচ্ছে, ওঁকে অনেকদূর যেতে হবে। কাল কি আপনার সঙ্গে কথা হতে পারে না কাকাবাবু?

রাস। বেশ ত মা, কালই হবে। (প্রস্থানোদ্যত—সহসা ফিরিয়া) কিন্তু শুনেছ বোধ হয় তোমার মন্দিরের ভাবী আচার্য্য দয়ালবাবু আজ সকালেই এসে পড়েছেন—মন্দির-গৃহেই আছেন—আবার কাল সকালে আমাদের সমাজের মান্য ব্যক্তি যাঁরা—যাঁদের সসম্মানে আমরা আমন্ত্রণ করেছি—তাঁরা আসবেন। তোমাদের উভয়কে তাঁদের কাছে আমি পরিচিত করিয়ে দেব। আর ক'টা দিনই বা বাঁচবো মা!

বিজয়া। (সবিস্ময়ে) তাঁরা সব কালই আসবেন? কই আমি তো কিছুই শুনিনি!

রাস। (সবিস্ময়ে) শোনোনি? তা হলে তাড়াতাড়িতে বলতে বোধ হয় ভুলে গেছি মা। বুড়ো বয়সের দোষই এই!

বিজয়া। কিন্তু বড়দিনের ছুটির তো এখনো অনেক বিলম্ব কাকাবাবু।

রাস। বিলম্ব বলেই ভাবলাম শুভকর্ম্মে দেরি আর করব না। বাড়িটা তো তাঁর মন্দিরের জন্যে মনে মনে তোমরা উৎসর্গই করেছ, শুধু অনুষ্ঠানই বাকী। যত শীঘ্র পারা যায় কর্ত্তব্য সমাপন করাই উচিত। তাঁরাও যখন আসতে রাজী হলেন তখন পুণ্যকার্য্য ফেলে রাখতে মন চাইলে না। বল দিকি মা, এ কি ভাল করিনি?

বিজয়া। নরেনবাবুর বড় রাত হয়ে যাচ্ছে কাকাবাবু।

রাস। ও হাঁ। বেশ, ওকে ডেকে পাঠিয়ে তাই বলে দাও, দুশো টাকাই দেওয়া হবে।

বিলাস। টাকা কি খোলামকুচি? একজনের খেয়াল চরিতার্থ করতে দুশো টাকা নষ্ট করতে হবে? তুমি তাতেই রাজী হচ্ছো?

রাস। বিলাস, ক্ষুন্ন হ'য়ো না বাবা। তোমাদের অনেক আছে—যাক দুশো। নিয়ে যাক ও দুশো টাকা। মা বিজয়া আমার দয়াময়ী, দুঃখীকে সামান্য ক'টা টাকা যদি সাহায্য করতেই চান। বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আর নয় বাবা, অন্ধকার হয়ে আসছে, চল। কাল সকালে অনেক কাজ, অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে। চল যাই। আসি মা বিজয়া।

[রাসবিহারী নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বিলাস বিজয়ার প্রতি একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পিতার অনুসরণ করিল।]

বিজয়া। (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া) কালীপদ?

[নেপথ্যে 'যাই মা' বলিয়া কালীপদ প্রবেশ করিল]

কালীপদ, নরেনবাবু বোধ হয় বাইরে কোথাও বসে আছেন। তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো। ।

[কালীপদ মাথা নাড়িয়া প্রস্থান করিল।]

নরেন। (প্রবেশ করিয়া) এটা আমি সঙ্গে নিয়েই যাচ্ছি। কিন্তু আজকের দিনটা আপনার বড় খারাপ গেল। অনেক অপ্রিয় কথা আমি নিজেও আপনাকে বলেছি। ওঁরাও বলে গেলেন। কি জানি কার মুখ দেখে আজ আপনার প্রভাত হয়েছিল!

বিজয়া। তার মুখ দেখেই যেন আমার প্রতিদিন ঘুম ভাঙ্গে নরেনবাবু। বাইরে দাঁড়িয়ে আপনি সমস্ত কথা নিজেই শুনতে পেয়েছেন বলেই বলছি যে, আপনার সম্বন্ধে তাঁরা যেসব অসম্মানের কথা বলে গেলেন সে তাঁদের অনধিকারচর্চা। কাল আমি তাঁদের সে-কথা বুঝিয়ে দেব।

নরেন। তার আবশ্যক কি? এসব জিনিসের ধারণা নেই বলেই তাঁদের আমার উপর সন্দেহ জন্মেছে—নইলে আমাকে অপমান করায় তাঁদের লাভ নেই কিছু। কিন্তু রাত হয়ে যাচ্ছে আমি যাই এবার।

বিজয়া। কাল কি পরশু একবার আসতে পারবেন না?

নরেন। কাল কি পরশু? কিন্তু তার তো আর সময় হবে না। কাল আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। সেখানে দু'-তিন দিন থেকেই এটা বিক্রী করে আমি চলে যাব। আর বোধকরি দেখা হবে না।

[বিজয়ার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, সে না পারিল মুখ তুলিতে,
না পারিল কথা কহিতে।]

(একটু হাসিয়া) আপনি নিজে এত হাসাতে পারেন, আর আপনারই এত সামান্য কথায় রাগ হয়! আমি বরঞ্চ একবার রেগে উঠে আপনাকে মোটা বুদ্ধি প্রভৃতি কত কি বলে ফেলেছি কিন্তু তাতে তো রাগ করেননি; বরঞ্চ মুখ টিপে হাসছিলেন দেখে আমার আরও রাগ হচ্ছিল। কিন্তু দেখা যদি আর আমাদের নাও হয়, আপনাকে আমার সর্ব্বদা মনে পড়বে!

[বিজয়া মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিতে গিয়া নরেনের চোখে পড়িয়া গেল,
সে ক্ষণকাল সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিয়া]

একি! আপনি কাঁদছেন যে! না না, এটা নিতে পারলেন না বলে কোনো দুঃখ করবেন না। কলকাতায় আমি সত্যই বেচতে পারব, আপনি ভাববেন না।

[এই বলিয়া সে বাক্সটি ধীরে ধীরে হাতে তুলিয়া লইল।]

বিজয়া। না, আমি দেব না, ওটা আমার। রেখে দিন।

[কান্না চাপিতে না পারিয়া টেবিলের উপর মাইক্রস্কোপটির উপর মুখ
গু জিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। নরেন হতবুদ্ধিভাবে
একটু দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্যপথ

[আমন্ত্রিত পুরুষ ও মহিলারা বিজয়ার গৃহ কৃষ্ণপুর গ্রামের অভিমুখে ধীরে ধীরে গল্প করিতে করিতে চলিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চে সকলেই একত্রে প্রবেশ করিবে না, দুইজনে প্রবেশ করিয়া বাহির হইয়া গেলে আবার দুই-তিনজন প্রবেশ করিবে।]

১ম। দয়ালবাবুই আচার্য্য হবেন, একি স্থির হয়েছে ?

২য়। হাঁ স্থির বইকি। তিনি কালই এসে পৌঁচেছেন শুনতে পেলাম।

১ম। কিন্তু তাঁর উপাসনা তো শুনেছি তেমন হৃদয়গ্রাহী নয়। ঢাকার যোগেশ-বাবুর পিতৃশ্রাদ্ধে সান্ধ্য উপাসনাটা তাই আমাকেই করতে হলো। শরীর অসুস্থ, সর্দ্দিতে গলা ভাঙা, বার বার অস্বীকার করলাম, কিন্তু কেহ ছাড়লেন না। কিন্তু করুণাময়ের কি অপার করুণা! এই দীনহীনের উপাসনা শুনে সেদিন উপস্থিত সকলকেই ঘন ঘন অশ্রুপাত করতে হ'লো। মহিলাদের তো কথাই নেই। ভাবাবেগে তাঁরা প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

২য়। তাতে সন্দেহ কি! আপনার উপাসনাটা যে এক স্বর্গীয় বস্তু!

১ম। কিন্তু ত্রিশ টাকার কমে তো দয়ালবাবুর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হতে পারে না।

২য়। ত্রিশ টাকা কি বলছেন প্রভাতবাবু? বনমালীবাবুর এস্টেটে তাঁকে সামান্য কি একটু কাজও করতে হবে, শুনেছি সত্তর টাকা করে দেওয়া হবে। বাড়িভাড়া তো লাগবেই না।

১ম। বলেন কি? সত্তর টাকা! ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন।

২য়। তা ছাড়া বনমালীবাবুর মেয়েটি শুনেছি যেমন সুশীলা তেমনি দয়াবতী। প্রসন্ন হলে একশো টাকা হওয়াও বিচিত্র নয়।

১ম। এক—শো! পল্লীগ্রামে তো কোন খরচই নেই! এক শো! ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন। বড় সুসংবাদ। একটু দ্রুত চলুন। তাঁর প্রাতকালীন উপাসনায় যেন যোগ দিতে পারি। [প্রস্থান]

[৩য়, ৪র্থ ও ৫ম ভদ্রব্যক্তির প্রবেশ; সঙ্গে দুইজন মহিলা।]

৩য়। এ বিবাহ যদি ঘটে বনমালীবাবুর কন্যা ভাগ্যবতী এ-কথা বলতেই হবে। বিলাসবিহারী অতি সুপাত্র। যেমন বলবান, তেমনি উদ্যমশীল। যেমন ভগবদ্ভক্তি, তেমন স্বধর্ম্মনিষ্ঠা। সমাজের উদীয়মান স্তম্ভস্বরূপ বললেও অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক কালের শিথিল-বিশ্বাস ভ্রষ্টচারী বহু যুবকের তিনি দৃষ্টান্তস্থল।

৪র্থ। বনমালীবাবুর সম্পত্তি কি বেশ বড় ?

৩য়। বড়! অগাধ। যেমন জমিদারী তেমনি নগদ টাকা। একমাত্র কন্যার জন্যে বনমালী প্রভূত ঐশ্বর্য্য রেখে গেছেন। বিলাসের হাতে তা বহুগুণিত হবে আমি বললেম।

৫ম। কিন্তু শুনেছি যুবকটি একটু রূঢ়ভাষী।

৩য়। রূঢ়ভাষী নয়, স্পষ্টভাষী। সত্যের আদর তিনি জানেন। (১ম মহিলাটিকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া) আমার স্ত্রীর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে বনমালীর কন্যা বিজয়াকে দিয়ে তিনি একশো টাকা সাহায্য করিয়েছিলেন। তাদের পুরস্কার বিতরণের জন্যে আরও একশো টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

১ম মহিলা। আহা, পথের মধ্যে ওসব কেন ?

৪র্থ। তা হলে বালিকা বিদ্যালয়ের দিকে তো তাঁদের বেশ ঝোঁক আছে ?

৩য়। ঝোঁক ? মুক্তহস্ত।

৪র্থ। মুক্তহস্ত ? বেশ বেশ, মঙ্গলময় মঙ্গল-বিধান করুন।

[প্রস্থান]

[৬ষ্ঠ ও ৭ম ব্যক্তিদ্বয়ের প্রবেশ]

৬ষ্ঠ। না, আর দূর নেই, আমরা এসে পড়েছি। হাঁ, স্বর্গীয় বনমালীবাবুর সম্পত্তির সমস্ত ভার তাঁর বাল্যবন্ধু রাসবিহারীবাবুর 'পরেই। শুধু এখন নয় বরাবরই এই ব্যবস্থা। বনমালীবাবু সেই যে দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসেছিলেন আর তো কখনো ফিরে যাননি।

৭ম। তাঁর কন্যার সঙ্গে রাসবিহারীবাবুর পুত্রের বিবাহ স্থির হয়ে গেছে ?

৬ষ্ঠ। স্থির বইকি। সম্বন্ধ কন্যার পিতা নিজেই করে যান, হঠাৎ মৃত্যু না হলে বিবাহ তিনিই দিয়ে যেতেন।

৭ম। এ বিবাহ কি গ্রামেই হবে ?

৬ষ্ঠ। এই কথাই তো রাসবিহারীবাবু সেদিন নিজেই বললেন। শুধু তাই নয়, বিয়ের পর ছেলে-বৌ দেশেই বাস করবে, শহরে নানা প্রলোভনের মধ্যে তাদের পাঠাবেন না এই তার সংকল্প। অন্ততঃ, যত দিন বেঁচে আছেন। বিশেষতঃ এত বড় সম্পত্তি দূর থেকে দেখা শোনা যায় না, নষ্ট হবার ভয় থাকে। নিজের জীবিতকালেই সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ছেলেকে শিখিয়ে দিয়ে যাবেন।

৭ম। অতিশয় সৎ বিবেচনা। বিবাহ হবে কবে ?

৬ষ্ঠ। ইচ্ছা যত শীঘ্র সম্ভব। মন্দির-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কথাবার্ত্তা বোধ করি আপনাদের সম্মুখেই পাকা হয়ে যাবে। এ বড় সুখের বিবাহ অবিনাশবাবু।

বর-বধূর পরে ভগবান তাঁর শুভহস্ত প্রসারিত করুন আমরা এই প্রার্থনা করি। চলুন, এই বাগানটার শেষেই বনমালীবাবুর বাড়ি।

৭ম। আপনি কি পূর্ব্বে এখানে এসেছিলেন?

৬ষ্ঠ। (সহাস্যে) বহুবার। রাসবিহারীবাবু আমার অনেককালের বন্ধু। তিনি পত্রে জানিয়েছেন, নতুন মন্দির-গৃহটি আছে নদীর ওপারে—একটু দূরে। আমাদের থাকার জায়গাও সেইখানেই নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, কিন্তু বিজয়ার ইচ্ছে আজ সকালেই একটি ছোট অনুষ্ঠান তাঁর গৃহেই সম্পন্ন হয় এবং পরে সে বাড়িতে যাই।

৭ম। উত্তম প্রস্তাব। চলুন, আমাদের হয়ত বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

বিজয়ার বাড়ির নীচের হল-ঘর

[বেলা পূর্ব্বাহ্ণ। বিজয়ার অট্টালিকার নীচের বড় ঘরটি ফুল-লতা-পাতা দিয়া কিছু কিছু সাজানো হইয়াছে, মাঝখানে দাঁড়াইয়া রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী এই সকল পরীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় সদ্যসমাগত অতিথিগণ একে একে প্রবেশ করিলেন।]

রাসবিহারী। (বদ্ধাঞ্জলিপূর্ব্বক) স্বাগতম্! স্বাগতম্! আজ শুধু এই গৃহ নয়, আজ আমাদের সমস্ত গ্রামখানি আপনাদের চরণধূলিতে চরিতার্থ হ'লো। আর আমি ধন্য। আপনারা আসন গ্রহণ করুন।

১ম। আমরাও তেমনি ধন্য হয়েছি রাসবিহারীবাবু, এমন পুণ্যকর্ম্মে আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিতে পারা জীবনের সৌভাগ্য।

রাস। পথে কোন ক্লেশ হয়নি তো?

সকলে। না না, কিছুমাত্র না। কোন ক্লেশ হয়নি।

রাস। হবার কথাও নয় যে। এ যে তাঁর সেবা-কর্ম্ম নিয়েই আপনাদের আগমন —মানবজাতির পরম কল্যাণের জন্যই তো আজ সকলে সমবেত হয়েছি।

১ম ব্যক্তি। ওঁ স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি!

রাস। স্বর্গগত বনমালীর কন্যা বিজয়া এবং তাঁর ভাবী জামাতা বিলাসবিহারী—এ মঙ্গল অনুষ্ঠান তাঁদেরই। আমি কেউ নয়,—কিছুই নয়। শুধু চোখে দেখে পুণ্য সঞ্চয় করে যাব এই আমার একমাত্র বাসনা। বাবা বিলাস, মা বিজয়া বুঝি এখনও খবর পাননি। কালীপদকে ডেকে বলে দাও পূজনীয় অতিথিরা এসে পৌচেছেন।

বিলাস। কিন্তু খবর পাওয়া তাঁর উচিত ছিল।

[বিলাসের প্রস্থান]

২য় ব্যক্তি। শুনেছি দয়ালবাবু ইতিপূর্ব্বেই এসেচেন, কই তাঁকে তো —

রাস। দুর্ভাগ্যক্রমে এসেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আজ ভাল আছেন। তিনি এলেন বলে।

১ম ব্যক্তি। আচার্য্যের কাজ তো?

রাস। হাঁ, তিনিই সম্পাদন করবেন স্থির হয়েছে—এই যে নাম করতেই তিনি—আসুন, আসুন, দয়ালবাবু আসুন। দেহটা সুস্থ হয়েছে?

[দয়ালচন্দ্রের প্রবেশ ও সকলের অভিবাদন।]

শরীর দুর্ব্বল, নিজে গিয়ে সংবাদ নিতে পারিনি, কিন্তু ওঁর কাছে (উর্দ্ধমুখে চাহিয়া) নিরন্তর প্রার্থনা করছি আপনি শীঘ্র নিরাময় হন, শুভকর্ম্মে যেন বিঘ্ন না ঘটে।

[ইহার পরে কিয়ৎকাল ধরিয়া সকলের কুশল-প্রশ্নাদি ও প্রীতিসম্ভাষণ চলিল। সকলে পুনরায় উপবেশন করিলেন]

রাস। আমার আবাল্যসুহৃদ বনমালী আজ স্বর্গগত। ভগবান তাঁকে অসময়ে আহ্বান করে নিলেন—তার মঙ্গল ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার নালিশ নেই, কিন্তু তিনি যে আমাকে কি করে রেখে গেছেন আমার বাইরে দেখে সে আপনারা অনুমান করতে পারবেন না। আমাদের উভয়ের সাক্ষাতের ক্ষণটি যে প্রতিদিন নিকটবর্ত্তী হয়ে আসছে সে আভাস আমি প্রতিমুহূর্ত্তেই পাই। তবুও সেই পরমব্রহ্মপদে এই প্রার্থনা, আমার সেই দিনটিকে যেন তিনি আরও সন্নিকটবর্ত্তী করে দেন।

[রাসবিহারী জামার হাতায় চোখটা মুছিয়া আত্মসমাহিতভাবে রহিলেন। উপস্থিত অভ্যাগতরাও তদ্রূপ করিলেন। আবার কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া] বনমালী আমাদের মধ্যে আজ নেই—তিনি চলে গেছেন; কিন্তু আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই, ওই তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করছেন।

[সকলেই চোখ বুজিলেন। এই সময় বিজয়া ও বিলাস প্রবেশ করিল। বিজয়ার মুখের উপর বিষাদ ও বেদনার চিহ্ন ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়]

ওই তাঁর একমাত্র কন্যা বিজয়া, পিতার সর্ব্বগুণের অধিকারিণী। আর ঐ আমার পুত্র বিলাসবিহারী, কর্ত্তব্যে কঠোর, সত্যে নির্ভীক। এরা বাইরে এখনো আলাদা

হলেও অন্তরে—হাঁ আরও একটি শুভদিন আসন্ন হয়ে আসছে, যেদিন আবার আপনাদের পদধূলির কল্যাণে এঁদের সম্মিলিত জীবন ধন্য হবে।

দয়াল। (অস্ফুটস্বরে) ওঁ স্বস্তি !

রাস। মা বিজয়া, ইনিই তোমাদের মন্দিরের ভাবী আচার্য্য দয়ালচন্দ্র, এঁকে নমস্কার কর। আর এঁরা তোমাদের সম্মানিত পূজনীয় অতিথিগণ, এঁরা বহু ক্লেশ স্বীকার করে তোমাদের পুণ্যকার্য্যে যোগ দিতে এসেছেন, এঁদের সকলকে নমস্কার কর।

[বিজয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। বৃদ্ধ দয়াল বিজয়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। হাত ধরিয়া বলিলেন]

দয়াল। এসো মা, এসো। মুখখানি দেখলেই মনে হয় যেন মা আমার কতকালের চেনা।

[এই বলিয়া টানিয়া পাশে বসাইলেন—অনেকে মুখ টিপিয়া হাসিল।]

রাস। দয়ালবাবু, আমার সহোদরের অধিক স্বর্গীয় বনমালীর এই শুভকর্ম—একমাত্র কন্যার বিবাহ—চোখে দেখে যাবার বড় সাধ ছিল, শুধু আমার অপরাধেই তা পূর্ণ হতে পারেনি। (কিছুকাল নীরব থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু এবার আমার চৈতন্য হয়েছে, তাই নিজের শরীরের দিকে চেয়ে এই আগামী অগ্রাণের বেশী আর বিলম্ব করবার সাহস হয় না। কি জানি আমিও না পাছে চোখে দেখে যেতে পারি।

দয়াল। (অস্ফুটস্বরে) ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি !

রাস। (বিজয়ার প্রতি) মা, তোমার বাবা, তোমার জননী সাধ্বী সতী বহু পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করেছেন, নইলে এ-কাজ আজ আমার তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হ'তো না। লজ্জা করো না মা, বল আজ এইখানেই আমাদের এই পূজনীয় অতিথিগণকে আগামী অগ্রাণ মাসেই আবার একবার পদধূলি দানের আমন্ত্রণ করে রাখি।

বিজয়া। (অব্যক্ত-কণ্ঠে) বাবার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই কি—(কথা বাধিয়া গেল)।

রাস। ওহো ঠিক তো মা, ঠিক তো ! এ যে আমার স্মরণ ছিল না। কিন্তু তুমি আমার মা কিনা, তাই এ বুড়ো ছেলের ভুল ধরিয়ে দিলে। (বিজয়া আঁচলে চোখ মুছিল) তাই হবে। কিন্তু তারও তো আর বিলম্ব নেই। (সকলের দিকে চাহিয়া) বেশ, আগামী বৈশাখেই শুভকর্ম সম্পন্ন হবে। আপনাদের কাছে এই আমাদের পাকা কথা রইল। বিলাসবিহারী, বাবা বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে, এদের ও-বাড়িতে যাবার ব্যবস্থা করে দাও। আসুন আপনারা।

[বিজয়া ব্যতীত সকলেই প্রস্থান করিলেন, দয়াল ক্ষণকাল পরেই ফিরিয়া আসিলেন।]

দয়াল। মা বিজয়া!

বিজয়া। (চমকিত হইয়া নিজেকে সংবরণ করিয়া) আসুন!

দয়াল। এঁরা সবাই দিঘ্‌ড়ার বাড়িতে চলে গেলেন। বিলাসবাবু তাঁদের ব্যবস্থা করে দিয়ে তাঁর অফিসঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আমাকেও সঙ্গে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু যেতে আমার ইচ্ছে হ'লো না—ভাবলুম এই অবসরে মা বিজয়ার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে নিই। (এই বলিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন) দাঁড়িয়ে কেন মা, তুমিও ব'সো।

বিজয়া। (সম্মুখের আসনে উপবেশন করিয়া শঙ্কিতকণ্ঠে কহিল) আপনি গেলেন না কেন? আপনার তো বেলা হয়ে যাবে!

দয়াল। তা যাক। একটু বেলাতে আর আমার ক্ষতি হবে না। তোমার মত অল্প বয়সে ধর্ম্মের প্রতি এমন নিষ্ঠা আমি দেখিনি। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমাদের মহৎ উদ্দেশ্য দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি করুক। কিন্তু মা, তোমার মুখ দেখে মনে হ'লো যেন তোমার আজ সুখ নেই। কেমন না?

বিজয়া। কি করে জানলেন?

দয়াল। (মৃদু হাসিয়া) তার কারণ আমি যে বুড়ো হয়েছি মা। ছেলেমেয়ে অসুখী থাকলে বুড়োরা টের পায়।

বিজয়া। কিন্তু সকলেই তো টের পায় না দয়ালবাবু?

দয়াল। তা জানিনে মা। কিন্তু আমার তো তাই মনে হ'লো। এর জন্যেই চলে যেতে পারলুম না। ফিরে এলুম।

বিজয়া। ভালই করেছেন দয়ালবাবু।

দয়াল। কিন্তু একটা বিষয়ে সাবধান করে দিই। বুড়োরা বকতে বড় ভালবাসে —ইচ্ছে করে তোমার কাছে বসে খুব খানিকটা বকে নিই, কিন্তু ভয় হয় পাছে বিরক্ত করে তুলি।

বিজয়া। না- না, বিরক্ত হব কেন? আপনার যা ইচ্ছে হয় বলুন না—শুনতে আমার ভালই লাগছে।

দয়াল। কিন্তু তাই বলে বুড়োদের অত প্রশ্রয়ও দিয়ো না মা। থামাতে পারবে না। আরও একটি হেতু আছে। আমার একটি মেয়ে হয়ে অল্প বয়সেই মারা যায়—বেঁচে থাকলে সে তোমার বয়সই পেতো। তোমাকে দেখে পর্য্যন্ত কেবল আমার তাকেই আজ মনে পড়ছে।

বিজয়া। আপনার বুঝি আর মেয়ে নেই?

দয়াল। মেয়েও নেই, ছেলেও নেই, শুধু বুড়ো-বুড়ী বেঁচে আছি। একটি

ভাগ্নীকে মানুষ করেছিলুম, তার নাম নলিনী। কলেজের ছুটি হয়েছে বলে সেও আমার সঙ্গে এসেছে। একটু অসুস্থ, নইলে—

[সহসা বিলাস প্রবেশ করিল।]

বিলাস। (বিজয়ার প্রতি কঠিনভাবে) তাঁরা চলে গেলেন, তুমি একটা খোঁজ পর্য্যন্ত নিলে না? একে বলে কর্ত্তব্যে অবহেলা। এ আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। (দয়ালের প্রতি ততোধিক কঠোরভাবে) আপনাকে বলেছিলুম ওঁদের সঙ্গে যেতে। না গিয়ে এখানে বসে গল্প করছেন কেন?

দয়াল। (অপ্রতিভভাবে) মা'র সঙ্গে দু'টো কথা কইবার জন্যে—আচ্ছা, আমি তা হলে যাই এখন।

বিজয়া। না, আপনি বসুন। বেলা হয়ে গেছে, এইখানে খেয়ে তবে যেতে পাবেন। (বিলাসের প্রতি) উনি সঙ্গে গেলে তাঁদের কি বেশী সুবিধে হ'তো?

বিলাস। তাঁদের দেখাশুনা করতে পারতেন।

বিজয়া। সে ওঁর কাজ নয়। তাঁদের মত দয়ালবাবুও আমার অতিথি।

বিলাস। না, ওঁকে অতিথি বলা চলে না। এখন উনি এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত। ওঁকে মাইনে দিতে হবে।

বিজয়া। (ক্রোধে মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু শান্ত-কঠিনকণ্ঠে কহিল) দয়ালবাবু আমাদের মন্দিরের আচার্য্য। ওঁর সে সম্মান ভুলে যাওয়া অত্যন্ত ক্ষোভের ব্যাপার বিলাসবাবু।

বিলাস। (কটুকণ্ঠে) সে সম্মানবোধ আমার আছে, তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। কিন্তু দয়ালবাবু শুধু আচার্য্যই নন, ওঁর অন্য কাজও আছে। সে স্বীকার করেই উনি এসেছেন।

দয়াল। (ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) মা, আমার অপরাধ হয়ে গেছে, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

বিজয়া। না, আপনি বসুন, আপনাকে খেয়ে যেতে হবে। আর মাইনে তো উনি দেন না, দিই আমি। আমার সঙ্গে দু'দণ্ড গল্প করাটাকে আমি যদি অকাজ না মনে করি, তবে বুঝতে হবে আপনার কর্ত্তব্যে ত্রুটি হয়নি ; বিলাসবাবুর কর্ত্তব্যের ধারণা যাই কেননা হোক।

বিলাস। না, কর্ত্তব্যের ধারণা আমাদের এক নয়, এবং তোমাকে বলতে আমি বাধ্য যে তোমার ধারণা ভুল।

বিজয়া। তা হলে সেই ভুল ধারণাটাই আমার এখানে চলবে বিলাসবাবু।

বিলাস। তোমার ভুলটাকেই আমায় স্বীকার করে নিতে হবে নাকি?

বিজয়া। স্বীকার করে নিতে তো আমি বলিনি, আমি বলছি সেইটেই এখানে চলবে।

বিলাস। তুমি জানো এতে আমার অসম্মান হয়।

বিজয়া। (অল্প হাসিয়া) সম্মানটা কি কেবল একলা আপনার দিকেই থাকবে নাকি ?

দয়াল। (ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) মা, এখন আমি যাই, দেখি গে তাঁদের কোন অসুবিধা হচ্ছে নাকি ?

বিজয়া। না, সে হবে না। আমাদের গল্প এখনও শেষ হয়নি। আপনি বসুন। (একটু উচ্চকণ্ঠে) কালীপদ ?

কালীপদ। (দ্বারের কাছে মুখ বাড়াইয়া সাড়া দিল) কি মা ?

বিজয়া। পরেশের মাকে বলো গে দয়ালবাবু এখানে খাবেন। আমার শোবার ঘরের বারান্দায় তাঁর ঠাঁই করে দিতে বলে দাও। চলুন দয়ালবাবু, আমরা ওপরে গিয়ে বসি গে।

[বিজয়া ও তাহার পিছনে দয়ালবাবু সভয়-মন্থরপদে প্রস্থান করিলেন। বিলাস সেইদিকে ক্ষণকাল আরক্তনেত্রে চাহিয়া বাহির হইয়া গেল।]

চতুর্থ দৃশ্য

বাটীর একাংশের ঢাকা বারান্দা

[নরেন প্রবেশ করিল। পরনে সাহেবী পোষাক, টুপী খুলিয়া সেটা বগলে চাপিয়া হাতের লাঠিটা একধারে ঠেস দিয়া রাখিল।]

নরেন। (এদিকে-ওদিকে চাহিয়া) উঃ—কোথাও এক ফোঁটা হাওয়া নেই। আর এই বিজাতীয় পোষাকে যেন আরও ব্যাকুল করে তুলেছে। এদিকে কি কেউ নেই নাকি ? এই যে কালীপদ—

[কালীপদ প্রবেশ করিল]

নরেন। কালীপদ, তোমার মা-ঠাকরুণকে একটা খবর দিতে পার ?

কালীপদ। দিতে হবে না, মা নিজেই নেমে আসছেন। ভেতরে গিয়ে বসবেন না বাবু ?

নরেন। না বাপু, ঘরে ঢুকে আর দম আটকাতে চাইনে, এখান থেকেই কাজ সেরে পালাব। বারোটার ট্রেনেই ফিরতে হবে।

কালীপদ। হাঁ বাবু আজ আর বড় গরম, কোথাও বাতাস নেই। তবে এখানেই একটা চেয়ার এনে দিই বসুন।

[কালীপদ চেয়ার আনিয়া দিল, নরেন বসিয়া টুপিটা পায়ের কাছে রাখিয়া মুখ তুলিয়া কহিল]

নরেন। আর সুমুখের ঐ জানালাটা একবার খুলে দাও, নিশ্বেস ফেলে বাঁচি।

কালীপদ। ওটা খোলা যায় না। এখন মিস্ত্রী কোথায় পাব বাবু?

নরেন। মিস্ত্রী কি হে? দোর-জানালা কি তোমরা মিস্ত্রী দিয়ে খোলাও, আর রাত্তিরে পেরেক ঠুকে বন্ধ করো?

কালীপদ। আজ্ঞে না, কেবল এইটেই কিছুতেই খোলা যায় না। মা ক'দিন ধরে মিস্ত্রী ডাকতে বলেছিলেন।

নরেন। এমন কথা তো শুনিনি। কই দেখি, (নিকটে গিয়া টানিয়া খুলিয়া ফেলিল) একটুখানি চেপে বসেছিল। তোমার মা-ঠাকরুণকে একবার ডাক।

কালীপদ। এই যে আসছেন।

[বিজয়া প্রবেশ করিতেই নরেন সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া চাহিল]

নরেন। নমস্কার। বাঃ—কি চমৎকার দেখাচ্ছে আপনাকে। যে কেউ ছবি আঁকতে জানে—আপনাকে দেখে তারই লোভ হবে।

বিজয়া। কালীপদ, আমাকে বসবার একটা জায়গা এনে দাও। আর বল গে বাবুর জন্যে চা করতে, এখনও চা খাওয়া হয়নি বোধ হয়?

নরেন। না, কলকাতা থেকে সকালেই বেরিয়ে পড়েছিলুম। স্টেশন থেকে সোজা আসছি!

[কালীপদ চলিয়া গেল]

বিজয়া। আপনাকে কি আমার ছবি আঁকবার বায়না নিতে ডেকেছি যে আমাকে ওরকম অপদস্থ করলেন?

নরেন। অপদস্থ করলুম কোথায়?

বিজয়া। চাকরদের সামনে কি ঐরকম বলে? কাণ্ডজ্ঞান কি একেবারে নেই?

নরেন। (লজ্জিতমুখে) হাঁ, তা বটে। দোষ হয়ে গেচে সত্যি।

বিজয়া। আর যেন কখনো না হয়।

[কালীপদ চেয়ার লইয়া প্রবেশ করিল]

কালীপদ। বলে এলুম মা। অমনি কিছু খাবার করতেও বলে আসব?

বিজয়া। হাঁ, বলগে। (জানালায় প্রতি চোখ পড়ায়) এই যে তবু একটা কথা শুনেছিস্ কালীপদ। কাকে দিয়ে জানালাটা খোলালি।

কালীপদ। (ইঙ্গিতে দেখাইয়া) উনি খুলে দিলেন।

[এই বলিয়া সে বাহিরে গিয়া একটা ছোট টিপয় আনিয়া নরেনের পাশে রাখিয়া চলিয়া গেল।]

বিজয়া। আপনি! কি করে খুললেন?

নরেন। হাত দিয়ে টেনে।

বিজয়া। শুধু হাতে টেনে খুলেছেন? অথচ ওরা সবাই বলে মিস্ত্রী ছাড়া খুলবে না। আপনার হাতটা কি লোহার নাকি?

নরেন। (সহাস্যে) হাঁ, আমার আঙুলগুলো একটু শক্ত।

বিজয়া। (হাসি চাপিয়া) আপনার মাথাটাই কি কম শক্ত! ঢুঁ মারলে যে-কোন লোকের মাথাটা ফেটে যায়।

নরেন। (উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল ; তারপরে পকেট হইতে নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া) এই নিন আপনার দুশো টাকা। দিন, আমার সেই ভাঙা যন্ত্রটা। (একটু হাসিয়া) আমি জোচ্চোর, ঠক, আরও কত কি গালাগালি ওই ক'টা টাকার জন্যে আমাকে বলে পাঠিয়েছিলেন। নিন আপনার টাকা,—দিন আমার জিনিস।

বিজয়া। ঠক, জোচ্চোর কাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলুম?

নরেন। যাকে দিয়ে টাকা পাঠিয়েছিলেন সেই তো ওসব বলেছিল।

বিজয়া। তাকে দিয়ে আর কি বলে পাঠিয়েছিলুম মনে আছে?

নরেন। না, আমার মনে নেই। কিন্তু সেটা আনতে বলে দিন, আমি দুপুরের ট্রেনেই কলকাতা ফিরে যাব! ভালো কথা, আমি কলকাতাতেই একটা চাকরি পেয়ে গেছি। বেশী দূরে আর যেতে হয়নি।

বিজয়া। (মুখ উজ্জ্বল করিয়া) আপনার ভাগ্য ভালো। টাকা কি তারাই দিলে?

নরেন। হাঁ, কিন্তু microscope-টা আমার আনতে বলে দিন! আমার বেশী সময় নেই।

বিজয়া। কিন্তু এই সর্ত কি আপনার সঙ্গে হয়েছিল যে, দয়া করে আপনি টাকা এনেছেন বলেই তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিতে হবে?

নরেন। (সলজ্জে) না, না—তা ঠিক নয়। তবে কিনা ওটা তো আপনার কাজে লাগবে না, তাই ভেবেছিলুম টাকা দিলেই আপনি ফিরিয়ে দিতে রাজী হবেন!

বিজয়া। না, আমি রাজী নই। যাচাই করে দেখিয়েছি ওটা অনায়াসে চারশো টাকায় বিক্রী করতে পারি। দুশো টাকায় দেব কেন?

নরেন। (সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া) বেশ, তাই করুন গে। আমার দরকার নই। যে দুশো টাকায় দু'দিন পরেই চারশো টাকা চায় তাকে আমি কিছুই বলতে চাইনে।

[বিজয়া মুখ নীচু করিয়া অতি কষ্টে হাসি দমন করিল।]

নরেন। আপনি যে একটি 'সাইলক' তা জানলে আসতুম না।

বিজয়া। সাইলক? কিন্তু দেনার দায়ে যখন আপনার বাড়িঘর, আপনার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করে নিয়েছিলুম, তখন কি ভাবেননি আমি সাইলক?

নরেন। না, ভাবিনি, কেননা তাতে আপনার হাত ছিল না। সে কাজ আপনার বাবা এবং আমার বাবা দু'জনে করে গিয়েছিলেন। আমরা কেউ তার জন্মে অপরাধী নই। আচ্ছা আমি চললুম।

বিজয়া। যাবেন কি রকম? আপনার জন্ম চা করতে গেছে না?

নরেন। চা খেতে আমি আসিনি।

বিজয়া। কিন্তু যেজন্মে এসেছিলেন সে তো আর সত্যিই হতে পারে না। চারশো টাকার জিনিস আপনাকে দুশো টাকায় দেবে কে? আপনার লজ্জাবোধ করা উচিত।

নরেন। আমার লজ্জাবোধ করা উচিত? উঃ—আচ্ছা মানুষ তো আপনি!

বিজয়া। হাঁ, চিনে রাখুন। ভবিষ্যতে আর কখনো ঠকাবার চেষ্টা করবেন না।

নরেন। ঠকানো আমার পেশা নয়।

বিজয়া। তবে কি পেশা? ডাক্তারি? হাত দেখতে জানেন? (এই বলিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল)

নরেন। আমি কি আপনার উপহাসের পাত্র? টাকা আপনার ঢের থাকতে পারে—কিন্তু সে জোরে ও-অধিকার জন্মায় না তা জানবেন। আপনি একটু হিসেব করে কথা কইবেন।

[নরেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাতে লাঠি তুলিয়া লইল।]

বিজয়া। নইলে কি বলুন না? আপনার গায়ে জোর আছে এবং হাতে লাঠি আছে এই তো?

নরেন। (লাঠিটা ফেলিয়া হতাশভাবে বসিয়া) ছি ছি—আপনি মুখে যা আসে তাই বলেন। আপনার সঙ্গে আর পারি না।

বিজয়া। এ-কথা মনে থাকে যেন। কিন্তু আপনার জন্মেই যখন আমার দেরি হয়ে গেল, বেরোনো হ'লো না—তখন আপনারও চলে যাওয়া হবে না। কিন্তু আপনি নিশ্চয় হাত দেখতে জানেন?

নরেন। জানি। কিন্তু কার হাত দেখতে হবে? আপনার?

বিজয়া। (সহসা নিজের হাত বাড়াইয়া দিয়া) দেখুন তো আমার জ্বর হয়েছে কিনা।

নরেন। (হাত ধরিয়া) সত্যিই তো আপনার জ্বর! ব্যাপার কি?

বিজয়া। কাল রাত্তিরে একটু জ্বর হয়েছিল। কিন্তু ও কিছুই নয়। আমার জন্তে বলিনে, কিন্তু সেই পরেশ ছেলেটাকে তো আপনি জানেন—তিনদিন থেকে তার খুব জ্বর। এখানে ভাল ডাক্তার নেই। কালীপদ।

[কালীপদর প্রবেশ]

পরেশের মাকে বল্ তো পরেশকে এখানে নিয়ে আসুক।

নরেন। না, আনবার দরকার নেই। কালীপদ, চল তো পরেশ কোথায় শুয়ে আছে আমাকে নিয়ে যাবে।

কালীপদ। চলুন।

[নরেন ও কালীপদ প্রস্থান করিলে নলিনী প্রবেশ করিল]

নলিনী। নমস্কার! আমার নাম নলিনী। দয়ালবাবু আমার মামা হন।

বিজয়া। ও আপনি? বসুন, সেদিন মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন আপনি অসুস্থ ছিলেন, তাই পরিচয় করার জন্তে আপনাকে আর বিরক্ত করিনি। তারপরেই শুনলুম আপনি চলে গেছেন আপনার মামীমা পীড়িত বলে। কিন্তু মনে হচ্ছে কোথায় যেন এর আগে আপনাকে দেখেছি,—আচ্ছা আপনি কি বেথুনে পড়তেন?

নলিনী। হাঁ; কিন্তু আমার তো মনে পড়ছে না।

বিজয়া। না পড়লেও দোষ নেই, কেবলি কামাই করতুম, শেষে সব সাব্‌জেক্টে ফেল করে পড়া ছেড়ে দিলুম, আই. এ. দেওয়া আর হ'লো না—আপনি এবার B. Sc. দিচ্ছেন শুনলুম।

নলিনী। হাঁ, আমার মনে পড়েছে। আপনি একটা মস্ত গাড়ি করে কলেজে আসতেন।

বিজয়া। চোখে পড়বার মত তো আর কিছু নেই, তাই গাড়ি দিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতুম। ওটা মার্জ্জনা করা উচিত।

নলিনী। ও-কথা বলবেন না। দৃষ্টি পড়ার মত আপনারও যদি কিছু না থাকে তবে জগতের অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু Dr. Mukherjee গেলেন কোথায়?

বিজয়া। গেছেন রোগী দেখতে, এলেন বলে। কিন্তু তিনি এসেছেন আপনি জানলেন কেমন করে মিস্ দাস?

[নরেন প্রবেশ করিল।]

নলিনী। এই যে Dr. Mukherjee, (বিজয়ার প্রতি) আমরা এক গাড়িতেই যে কলকাতা থেকে এলুম। স্টেশনে এসে দেখি Dr. Mukherjee দাঁড়িয়ে—সেদিন

রাত্রে মন্দিরে ওঁর সঙ্গে দৈবাৎ আলাপ। কি কয়েকটা তাঁর জিনিস পড়েছিল তাই নিতে এসেছিলেন। আজ আবার হাওড়া স্টেশনেও দৈবাৎ ওঁর দেখা পেয়ে গেলুম। উনিও বললেন, থাকবার জো নেই, এই বারোটার গাড়িতেই ফিরতে হবে। আমারও তাই—ফিরতেই হবে কলকাতায়।

বিজয়া। (সহাস্যে) আপনাদের শুধু দৈবাৎ আলাপ এবং দৈবাৎ এক গাড়িতে আসাই নয়, আবার দৈবাৎ এক গাড়িতেই ফিরতে হবে। এমন দৈবাতের সমাবেশ এক সঙ্গে সংসারে দেখা যায় না।

নরেন। এর মানে?

বিজয়া। (নলিনীর প্রতি) এর মানে দেবেন তো ওঁকে গাড়িতে বুঝিয়ে, মিস্ দাস।

নলিনী। (নরেনকে) আপনার এখানকার কাজ সারা হ'লো?

বিজয়া। না, সারতে পারেননি। গৃহস্থ এখানে সজাগ ছিল। কিন্তু তার বদলে একটি রোগী পেয়েছেন—ভরাডুবির মুষ্টিলাভ।

নরেন। (রাগিয়া) আপনার যত ইচ্ছে আমাকে উপহাস করুন, কিন্তু সজাগ গৃহস্থকেও একদিন ঠকতে হয় জেনে রাখবেন। আপনাকে চারশো টাকাই এনে দেব, কিন্তু এ অন্যায় একদিন আপনাকে বিঁধবে। কিন্তু আর না—দেরি হয়ে যাচ্ছে মিস্ দাস, চলুন, এবার আমরা যাই।

বিজয়া। পরেশকে কেমন দেখলেন বললেন না?

নরেন। বিশেষ ভাল না। ওর খুব বেশী জ্বর, পিঠে গলায় বেদনা, এদিকে বসন্ত হচ্ছে, মনে হয় পরেশের বসন্ত হতে পারে।

বিজয়া। (সভয়ে) বসন্ত হবে কেন?

নরেন। হবে কেন সে অনেক কথা। কিন্তু ওর লক্ষণ দেখলে ওই মনে হয়। যাই হোক ওর মাকে একটু সাবধান হতে বলবেন, আমি কাল কিংবা পরশু টাকা নিয়ে আসব, অবশ্য যদি পাই। তখন ওকে দেখে যাব।

বিজয়া। (ব্যাকুল বিবর্ণমুখে) নইলে আসবেন না? আমারও নিশ্চয় বসন্ত হবে নরেনবাবু। কাল রাত্তিরে আমারও খুব জ্বর—আমারও গায়ে ভয়ানক ব্যথা।

নরেন। (হাসিয়া) ব্যথা ভয়ানক নয়। ভয়ানক হয়েছে সে আপনার ভয়। বেশ তো জ্বরই যদি একটু হয়ে থাকে তাতেই বা কি? এদিকে বসন্ত দেখা দিয়েছে বলেই যে গ্রামসুদ্ধ সকলেরই হবে তার মানে নেই।

বিজয়া। হলেই বা আমার কে আছে? আমাকে দেখবে কে?

নরেন। দেখবার লোক অনেক পাবেন সে ভাবনা নেই, কিন্তু কিছু হবে না আপনার।

বিজয়া। না হলেই ভালো, কিন্তু সত্যিই আমি বড় অসুস্থ। তবু সকালে উঠে সব জোর করে ঝেড়ে ফেলে একটু বাইরে যাচ্ছিলুম।

নরেন। না, আজ কোথাও যাওয়া চলবে না, চুপ করে শুয়ে থাকুন গে। কাল আবার আসব।

বিজয়া। টাকা না পেলেও আসবেন তো?

নরেন। না পেলেও আসবো।

বিজয়া। ভুলে যাবেন না?

নরেন। না। আমি অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক হলেও আপনার অসুখের কথাটা ভুলব না নিশ্চয়।

[কালীপদ প্রবেশ করিল।]

কালীপদ। মা, খাবার দেওয়া হয়েছে।

বিজয়া। (নলিনীকে দেখাইয়া) এঁরও দেওয়া হয়েছে?

কালীপদ। হাঁ মা, দু'জনেরই।

বিজয়া। আমি দেখি গে কি দিলে। আর যদি কখনো সময় না পাই আজ কাছে বসে আপনাদের দু'জনের আমি খাওয়া দেখব।

নলিনী। মিস্ রায়, একি বলছেন? ভয় কিসের?

বিজয়া। কি জানি আজ আমার কেবলি ভয় করছে। মনে হচ্ছে অসুখ আমার খুব বেশী বেড়ে উঠবে। নরেনবাবু, আজকের দিনটা থাকুন না আপনি?

নরেন। বেশ, আমি রাত্রের ট্রেনেই যাব, কিন্তু আমার কথা শুনতে হবে। নড়াচড়া করতে পাবেন না, এখুনি গিয়ে শুয়ে পড়া চাই।

বিজয়া। না, সে আমি শুনব না। আপনাদের খাওয়া আজ আমি দেখবই। তারপরে গিয়ে শোবো।

[প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে কালীপদ চলিয়া গেল।]

নলিনী। কি ব্যাকুল মিনতি? ডক্টর মুখার্জ্জি, আমি যাব, কিন্তু আপনি আজ থাকুন। যাবেন না।

নরেন। এবেলা আছি। মামার বাড়ি থেকে যাবার আগে সন্ধ্যাবেলায় আর একবার এসে দেখে যাব। জ্বরটা বেশী, ভয় হয় ভোগাবে।

নলিনী। ভোগাবে? তবে তো বড় মুস্কিল!

নরেন। তাই তো মনে হচ্ছে।

নলিনী। চমৎকার মেয়েটি! আপনার প্রতি ওর কি বিশ্বাস! মনে হয় না যে এ আপনাকে ঘরছাড়া করতে পারে।

নরেন। (হাসিয়া) পেরেছে তো দেখা গেল। বড়লোকের মেয়ে, গরীবের

কথা বড় ভাবে না। বাড়ি তো গেলই, শেষ সম্বল microscope-টি যখন দায়ে পড়ে বেচতে হ'লো তখন সিকি দামে দুশো টাকা মাত্র দিয়ে স্বচ্ছন্দে কিনে নিলেন—সঙ্গে উপরি বকশিস দিলেন ঠক জোচ্চোর প্রভৃতি বিশেষণ। আজ সেইটিই যখন দুশো টাকা দিয়ে ফিরিয়ে নিতে চাইলুম, অনায়াসে বললেন অত কমে হবে না—যাচাই করিয়ে দেখেছেন দাম চারশো টাকার কম নয়—সুতরাং আর দুশো চাই। দয়া-মায়া আছে তা মানতেই হবে।

নলিনী। বিশ্বাস হয় না ডক্টর মুখার্জি—কোথায় হয়ত মস্ত ভুল আছে।

নরেন। ভুল আছে? না, কোথাও নেই মিস্ নলিনী—সমস্ত জলের মত পরিষ্কার।

নলিনী। (মাথা নাড়িয়া) এমন কিন্তু হতেই পারে না ডক্টর মুখার্জি। মেয়েরা এত বড় মিনতি তাকে করতেই পারে না—এমন করে তার পানে যে তারা চাইতেই পারে না।

নরেন। তা হবে। মেয়েদের কথা আপনিই ভাল জানেন, কিন্তু আমি যেটুকু জানতে পেলুম তা ভারী কঠোর, ভারী কঠিন।

[কালীপদ প্রবেশ করিল।]

কালীপদ। চলুন। মা ডেকে পাঠালেন, আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে।

নরেন। চল যাই।

[সকলের প্রস্থান]

[দয়াল ও রাসবিহারীর কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ।]

রাস। হাঁ, এই মন্দির-প্রতিষ্ঠা নিয়ে, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে, বিলাস যে এতটা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল তা কেউ বুঝতে পারেনি। সেদিন তার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে বললুম, বিলাস, হয়েছে কি? এমন করছ কেন? ও বললে, বাবা, আজ আমি অন্যায় করেছি—দয়ালবাবুকে কঠিন কথা বলেছি। বিজয়াকেও বলেছি—সেও আমাকে বলেছে—কিন্তু সেজন্যে নয়, দয়ালবাবুকে আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি, হয়ত রাগ করে তিনি আর আমাদের আচার্য্যের কাজ করবেন না। এই বলে তার দু'চোখ বেয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। আমি বললুম, ভয় নেই বাবা, অপরাধ যদি হয়েই থাকে তবে এই অনুতাপের অশ্রুতেই সমস্ত ধুয়ে গেল। (এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল মুদ্রিতনেত্রে অধোমুখে থাকিয়া) আর তাই তো হ'লো দয়ালবাবু, আপনার উদারতার কথা বুঝতে পেরে বিলাস আজ আমায় বললে, বাবা, সেদিন তুমি সত্যিই বলেছিলে দয়ালবাবুর সমস্ত চিত্ত ভগবৎপ্রেমে পরিপূর্ণ, হৃদয় করুণায় মমতায় বিশ্বাসে ভরা, সেখানে আমাদের মত ছেলেমানুষের কথা প্রবেশ করতে পারে না।

দয়াল। সেদিনের কথা আমি সত্যিই কিছু মনে রাখিনি, আপনি বলবেন বিলাসবাবুকে।

রাস। বাবু নয়। বাবু নয়। আপনার কাছে শুধু সে বিলাস—বিলাসবিহারী। কে যায় ওখানে? কালীপদ?

[কালীপদ প্রবেশ করিল]

রাস। মা বিজয়া এখন কি তাঁর লাইব্রেরী-ঘরে!

কালীপদ। না, তিনি শোবার ঘরে শুয়ে পড়েছেন—তাঁর জ্বর।

রাস। জ্বর? জ্বর বললে কে?

কালীপদ। ডাক্তারবাবু।

রাস।। কে ডাক্তারবাবু?

কালীপদ। নরেনবাবু এসেছিলেন, তিনি হাত দেখে বললেন জ্বর—বললেন চুপ করে শুয়ে থাকতে।

রাস। নরেন? সে কি জন্যে এসেছিল। কখন এসেছিল? কালীপদ, মাকে একবার খবর দাও যে আমি একবার দেখতে যাব।

দয়াল। আমিও যে মাকে একবার দেখতে চাই কালীপদ। জ্বর শুনে যে বড় ভাবনা হ'লো।

কালীপদ। কিন্তু মা আমাকে বারণ করে দিয়েছেন তিনি নিজে না ডাকলে কেউ যেন না তাঁকে ডাকে। আমি গেলে হয়ত রাগ করবেন।

রাস। রাগ করবে? সে কি কথা? জ্বর যে! সমস্ত ভার, সমস্ত দায়িত্ব যে আমার মাথায়! বিলাসকে কেউ ছুটে গিয়ে খবর দিয়ে আসুক। আজ তারও শরীর ভাল নয়, বাড়িতেই আছে। কিন্তু সে বললে কি হবে—শীগ্‌গির এসে একটা ব্যবস্থা করুক। সহরে গাড়ি পাঠিয়ে আমাদের অকিঞ্চনবাবুকে একটা কল্‌ দিক। না হয় কলকাতায়—আমাদের প্রেমাঙ্কুর ডাক্তার—চলুন চলুন, দয়ালবাবু, যাই আমরা, সময় যেন না নষ্ট হয়।

দয়াল। ব্যস্ত হবেন না রাসবিহারীবাবু, জগদীশ্বরের কৃপায় ভয় কিছু নেই। নরেন নিজে যখন দেখে গেছে—ভাবনার বিষয় হলে সে নিশ্চয়ই আপনাকে একটা সংবাদ দিতে বলে দিত।

রাস। নরেন দেখে গেছে? কি জানে সেটা?

[বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। পিছনে পিছনে গেলেন দয়াল এবং কালীপদ।]

পঞ্চম দৃশ্য

বিজয়ার শয়ন-কক্ষ

[অসুস্থ বিজয়া বিছানায় শুইয়া, অনতিদূরে উপবিষ্ট পিতা-পুত্র রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী। ঘরে অন্য আসন নাই, রোগীর প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই নিকটে রক্ষিত, ব্যস্ত পদক্ষেপে নরেন প্রবেশ করিল—তাহার মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন।]

নরেন। কি ব্যাপার? কালীপদর মুখে শুনলাম জ্বর নাকি একটু বেড়েছে। তা হোক—কেমন আছেন এখন?

বিলাস। আপনি সকালে এসে নাকি ওঁকে বসন্তের ভয় দেখিয়ে গেছেন?

বিজয়া। (ক্ষীণস্বরে দুই বাহু বাড়াইয়া) বসুন। [নরেন অগত্যা বিছানার একাংশে বসিল] কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? কেন এত দেরি ক'রে এলেন? আমি যে সমস্তক্ষণ শুধু আপনার পথ চেয়ে ছিলুম। (বিলাসের মুখের অবস্থা ভীষণ হইয়া উঠিল। নরেনের হাতখানা বুকের উপর টানিয়া লইয়া) কিন্তু আমি ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও যাবেন না বলুন। আপনি চলে গেলে হয়ত আমি বাঁচব না। (নরেন হতবুদ্ধি হইয়া, মুখ তুলিতেই দুই জোড়া ভীষণ চক্ষুর সহিত তাহার চোখাচোখি হইল—কালীপদ একবার পর্দ্দার ফাঁক হইতে উঁকি মারিতেই বিলাস গর্জ্জিয়া উঠিল।)

বিলাস। এই শূয়ার, এই জানোয়ার—একটা চেয়ার আন্।

[কালীপদ ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল।]

রাসবিহারী। (গম্ভীরস্বরে) ও-ঘর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এস কালীপদ। বাবুকে বসতে দাও (নরেন উঠিয়া পড়িল। শান্তকণ্ঠে বিলাসের প্রতি) রোগা মানুষের ঘর—অমন hasty হ'য়ো না বিলাস। Temper lose করা কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে শোভা পায় না।

[কালীপদ চেয়ার লইয়া প্রবেশ করিল।]

বিলাস। মানুষ এতে temper lose করে না তো করে কিসে শুনি? হারাম-জাদা চাকর, বলা নেই, কওয়া নেই, এমন একটা অসভ্য লোককে ঘরে এনে ঢোকালে, যে ভদ্রমহিলার সম্মান পর্য্যন্ত রাখতে জানে না।

[বিজয়ার জ্বরের ঘোরটা হঠাৎ ঘুচিয়া গেল। নরেনের হাত ছাড়িয়া সে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।]

রাস। আমি সবই বুঝি বিলাস, এ-ক্ষেত্রে তোমার রাগ হওয়া যে অস্বাভাবিক নয়—বরঞ্চ খুবই স্বাভাবিক তাও মানি, কিন্তু এটা তোমার ভাবা উচিত ছিল যে, সবাই ইচ্ছা করে অপরাধ করে না। সকলেই যদি ভদ্র রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার

জানত—তা হলে ভাবনা ছিল কি? সেইজন্য রাগ না করে শান্তভাবে মানুষের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দিতে হয়।

বিলাস। না বাবা! এরকম impertinence সহ্য হয় না। তা ছাড়া আবার এ-বাড়ির চাকরগুলো হয়েছে যেমন হতভাগা—তেমনি বজ্জাত। কালই আমি ব্যাটাদের সব দূর করে তবে ছাড়ব।

রাস। এর মন খারাপ হয়ে থাকলে যে কি বলে তার ঠিকানা নেই। আর ছেলেকেই বা দোষ দেব কি, আমি বুড়োমানুষ, আমি পর্য্যন্ত অসুখ শুনে কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম। বাড়িতেই হ'লো একজনের বসন্ত—তার উপর উনি ভয় দেখিয়ে গেলেন।

নরেন। না, আমি কোনরকম ভয় দেখিয়ে যাইনি।

বিলাস। আলবত ভয় দেখিয়ে গেছেন। কালীপদ তার সাক্ষী আছে।

নরেন। কালীপদ ভুল শুনেছে।

[বিলাস ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে এমন সময়]

রাস। আঃ কর কি বিলাস! উনি যখন অস্বীকার করছেন তখন কি কালী-পদকে বিশ্বাস করতে হবে? নিশ্চয়ই ওঁর কথা সত্যি।

বিলাস। তুমি বুঝছ না বাবা—(বিলাস বাধা দিতে চাহিল।)

রাস। এই সামান্য অসুখেই মাথা হারিয়ো না বিলাস। স্থির হও। মঙ্গলময় জগদীশ্বর যে শুধু আমাদের পরীক্ষা করার জন্যই বিপদ পাঠিয়ে দেন, বিপদে পড়লে তোমরা সকলের আগে এই কথাটাই কেন ভুলে যাও—আমি তো ভেবে পাইনে। (একটু স্থির থাকিয়া) আর তাই যদি একটা ভুল অসুখের কথা বলেই থাকেন, তাতেই বা কি? কত পাস-করা ভাল ভাল বিচক্ষণ ডাক্তারেরও যে ভ্রম হয়, ইনি তো ছেলেমানুষ। যাক (নরেনের প্রতি) জ্বর তো তা হলে অতি সামান্যই আপনি বলছেন। চিন্তা করার কোনই কারণ নেই—এই তো আপনার মত।

নরেন। আমার মতামতে কি আসে-যায় রাসবিহারীবাবু? আমার ওপর তো নির্ভর করছেন না। বরং তার চেয়ে কোন ভাল পাস-করা বিচক্ষণ ডাক্তার দেখিয়ে তাঁর অভিমত নিন।

বিলাস। (চেঁচাইয়া উঠিয়া) তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ, মনে করে কথা ক'য়ো বলে দিচ্ছি। এ-ঘর না হয়ে, আর কোথাও হলে তোমার বিদ্রূপ করা—

[বিজয়া মুখ ফিরাইয়া ব্যথিত স্বরে]

বিজয়া। আমি যতদিন বাঁচব নরেনবাবু, আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। কিন্তু এঁরা যখন অন্য ডাক্তার দিয়ে আমার চিকিৎসা করা স্থির করেছেন, তখন আর আপনি অনর্থক অপমান সইবেন না।

[পুনরায় মুখ ফিরাইয়া শুইল]

রাস। (ব্যস্ত হইয়া) বিলক্ষণ, যাঁকে তুমি ডেকে পাঠিয়েছ তাঁকে অপমান করে কার সাধ্য মা? (ক্ষণকাল পরে) এ-কথাও সত্যি বিলাস। এই অসংযত ব্যবহারের জন্য তোমার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। মানি, সমস্তই মানি যে মা বিজয়ার অসুখের গুরুত্ব কল্পনা করেই তোমার মানসিক চঞ্চলতা শতগুণে বেড়ে গেছে, তবু— স্থির তো তোমাকে হতেই হবে। সমস্ত ভালোমন্দ সমস্ত দায়িত্ব তো শুধু তোমারই মাথায় বাবা! মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় যে গুরুভার একদিন তোমাকেই শুধু বহন করতে হবে—এ তো শুধু তারই পরীক্ষার সূচনা—(নরেন নিঃশব্দে লাঠি ও ছোট ব্যাগটি তুলিয়া লইল) নরেনবাবু, আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আলোচনা করবার আছে—চলুন।

[রাসবিহারী নরেনকে লইয়া রঙ্গমঞ্চের সম্মুখের দিকে আসিতেই মধ্যের পর্দা পড়িয়া রোগীর কক্ষটিকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া দিল। উভয়ে মুখোমুখী দুইখানি চৌকিতে উপবেশন করিল।]

রাস। পাঁচজনের সামনে তোমায় বাবুই বলি, আর যাই বলি, বাবা, এটা কিন্তু ভুলতে পারিনে, তুমি আমাদের সেই জগদীশের ছেলে। নইলে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলুম এ-কথা তোমার মুখের সামনে বলে তোমাকে ক্লেশ দিতুম না।

নরেন। যা সত্য তাই বলেছেন—এতে দুঃখ করবার কিছু নেই।

রাস। না না, ও-কথা ব'লো না নরেন। কঠোর কথা মনে বাজে বইকি! যে শোনে তার তো বাজেই, যে বলে তারও বড় কম বাজে না বাবা। জগদীশ্বর! কিন্তু তুমি বাবা, বিলাসের মনের অবস্থা বুঝে মনের মধ্যে কোনও ক্ষোভ রাখতে পারবে না। আর একটা অনুরোধ আমার এই রইল, এদের বিবাহ তো সামনের বৈশাখেই হবে, যদি কলকাতাতেই থাকো বাবা, শুভকর্মে যোগ দিতে হবে। না বললে চলবে না।

নরেন। আচ্ছা। কিন্তু—

রাস। না, কোন কিন্তু নয় বাবা, সে আমি শুনব না। ভালো কথা, কলকাতাতেই কি এখন থাকা হবে? একটু সুবিধে-টুবিধে—

নরেন। আজ্ঞে হাঁ। একটা বিলিতী ওষুধের দোকানে সামান্য একটা কাজ পেয়েছি।

রাস। বেশ, বেশ, ওষুধের দোকানে কাঁচা পয়সা। টিকে থাকতে পারলে আখেরে গুছিয়ে নিতে পারবে নরেন।

নরেন। আজ্ঞে।

রাস। তা হলে মাইনেটা কি রকম?

নরেন। পরে কিছু বেশী দিতে পারে। এখন চারশো টাকা মাত্র দেয়।

রাস। (বিবর্ণমুখে চোখ কপালে তুলিয়া) চারশো! আহা বেশ—বেশ! শুনে বড় সুখী হলুম।

নরেন। সেই পরেশ ছেলেটি কেমন আছে বলতে পারেন?

রাস। তাকে একটু আগেই তাদের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে!

নরেন। গ্রামটা কি দূরে?

রাস। তা জানিনে বাবা।

নরেন। (ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া) তা হলে আর উপায় কি। সে-কথা যাক, কিন্তু আমার হয়ে বিলাসবাবুকে আপনি একটা কথা জানাবেন। বলবেন—প্রবল জ্বরে মানুষের আবেগ নিতান্ত সামান্য কারণে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে। বিজয়ার সম্বন্ধে ডাক্তারের মুখের এই কথাটা তিনি যেন অবিশ্বাস না করেন।

রাস। অবিশ্বাস করবে কি নরেন, এ কি আমরা জানিনে? বাপ হয়ে এ-কথা বলতে আমার মুখে বাধে, কিন্তু তুমি আপনার জন বলেই বলি, দু'জনের কি গভীর ভালবাসার চিহ্নই যে মাঝে মাঝে আমার চোখে পড়ে সে প্রকাশ করবার আমার ভাষা নেই। মনে হয় ভগবান যেন সঙ্কল্প করেই পরস্পরের জন্যে এদের সৃজন করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁকে প্রণাম করি, আর ভাবি সার্থক এদের মিলন, সার্থক এদের জীবন।

নরেন। এই বৈশাখেই বুঝি এঁদের বিবাহ হবে?

রাস। হাঁ নরেন। সেদিন কিন্তু তোমাকে আসতে হবে, উপস্থিত থেকে নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করতে হবে। তাড়াতাড়ি করার আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু সকলেই পুনঃ পুনঃ বলছেন অন্তরে আত্মা যাঁদের এমন করে এক হয়েছে বাইরে তাদের পৃথক্ করে রাখা অপরাধ। আমি বললুম, তাই হোক। তোমাদের সকলের ইচ্ছেই আমার ভগবানের ইচ্ছে। এই বৈশাখেই এক হয়ে এরা সংসার-সমুদ্রে জীবন-তরণী ভাসাক। জগদীশ্বর! আমার দিন শেষ হয়েছে, কিন্তু তুমি এদের দেখো—তোমার চরণেই এদের সমর্পণ করলুম। (যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া হেঁট হইয়া তিনি প্রণাম করিলেন।) কিন্তু তোমার যে রাত হয়ে যাচ্ছে বাবা, আজই কি কলকাতায় ফিরে না গেলেই নয়?

নরেন। না, আমাকে যেতেই হবে। সাড়ে আটটার ট্রেনেই যাব।

রাস। জিদ করতে পারিনে নরেন, নতুন চাকরি, কামাই হওয়া ভাল নয়—মনিব রাগ করতে পারে। আজকের দিনটাও তো তোমার বৃথায় নষ্ট হ'লো। কিন্তু কিজন্য আজ এসেছিলে বাবা, জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

নরেন। দিনটা নষ্ট হ'লো সত্যি, কিন্তু সকালে এসেছিলুম এই আশা করে যদি

টাকাটা দিয়ে সেই মাইক্রস্‌কোপটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

রাস। টাকাটা দিয়ে? বেশ তো, বেশ তো—নিয়ে গেলে না কেন?

নরেন। বিজয়া দিলেন না। বললেন, তার দাম চারশো টাকা—এর এক পয়সা কম হবে না।

রাস। সে কি কথা নরেন? দুশো টাকার বদলে চারশো টাকা। বিশেষতঃ তাতে যখন তোমার এত দরকার অথচ তাঁর কোন প্রয়োজন নেই।

নরেন। ভেবেছি তাঁকে চারশো টাকা দিয়েই আমি নিয়ে যাব।

রাস। না, সে কোনমতেই হতে পারে না। এত বড় অধর্ম আমি সইতে পারব না। ও আমার ভাবী পুত্রবধূ, এ অন্যায় যে আমাকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করবে নরেন। (ক্ষণকাল অধোমুখে নিঃশব্দে থাকিয়া) একটা কথা আমি বার বার ভেবে দেখেচি। তোমার সঙ্গে ওর কথাবার্ত্তায়, বাইরের আচরণে আমি দোষ দেখতে পাইনে, কিন্তু অন্তরে কেন তোমার প্রতি এত ক্রোধ! কেবল যে তোমার ঐ বাড়িটার ব্যাপারেই দেখতে পেলাম তাই নয়, এই microscope-টার ব্যাপারে ঢের বেশী চোখে পড়ল! ওটা নিতে আমার নিজেরই আপত্তি ছিল শুধু যে দরকার নেই বলেই তা নয়,—ওতে তোমার নিজেরই অনেক বেশী প্রয়োজন বলে। কিন্তু যখনি টের পেলাম তোমার টাকার প্রয়োজন, যখনি কানে এল তোমাকে কথা দেওয়া হয়েছে, তখনি সঙ্কল্প আমার স্থির হয়ে গেল। ভাবলাম, দাম ওর যাই হোক কিন্তু টাকা দিতেই হবে, কিছুতে অন্যথা করা চলবে না। মনে মনে বললাম, বিজয়া যখন ইচ্ছে, যতদিনে ইচ্ছে আমাকে টাকা শোধ দিন, কিন্তু আমি বিলম্ব করতে পারব না। তাই তোমাকে দুশো টাকা সকালেই পাঠিয়ে দিলাম। এ যে আমার কর্ত্তব্য। সত্যরক্ষা আমাকে যে করতেই হবে।

নরেন। সামান্য দুশো টাকা দেবারও বুঝি ওঁর ইচ্ছে ছিল না? বিশ্বাস ছিল ঠকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি?

রাস। (জিভ কাটিয়া) না না না। কিন্তু সে বিচারে আর তো প্রয়োজন নেই নরেন। কিন্তু তাই বলে এ কি অসঙ্গত প্রস্তাব! এ কি অন্যায়! দুশোর বদলে চারশো! না বাবা, এ তাঁকে আমি কোনমতে করতে দেব না, তুমি দুশো টাকা দিয়েই তোমার জিনিস ফিরিয়ে নিয়ে যেও।

নরেন। না রাসবিহারীবাবু, আমার হয়ে আপনি তাঁকে অনুরোধ করবেন না। তিনি ভাল হলে জানাবেন তাঁকে চারশো টাকাই এনে দেব—তাঁর এতটুকু অনুগ্রহ আমি গ্রহণ করব না। বিলাসবাবুকে বলবেন তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন—এত কথা আমি কিছুই জানতুম না। কিন্তু আর না—আমার গাড়ির সময় হয়ে আসছে, আমি চললুম। [প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিজয়ার বসিবার ঘর

[বিজয়া সুস্থ হইয়াছে, তবে শরীর এখনও দুর্ব্বল। কালীপদর প্রবেশ]

কালী। (অশ্রুবিকৃতস্বরে) মা, এতদিন তোমার অসুখের জন্যেই বলতে পারিনি, কিন্তু এখন আর না বললেই নয়। ছোটবাবু আমাকে জবাব দিয়েছেন।

বিজয়া। কেন ?

কালী। কর্ত্তাবাবু স্বর্গে গেছেন—তাঁর কাছে কখনো মন্দ শুনিনি, কিন্তু ছোটবাবু আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না—দিনরাত গালাগালি করেন। কোন দোষ করিনে তবু—(চোখ মুছিয়া ফেলিয়া) সেদিন কেন তাঁকে জানাইনি, কেন নরেনবাবুকে তোমার ঘরে ডেকে এনেছিলুম, তাই জবাব দিয়েছেন।

বিজয়া। (কঠিনস্বরে) তিনি কোথায় ?

কালী। কাছারি-ঘরে বসে কাগজ দেখছেন।

বিজয়া। হুঁ। আচ্ছা দরকার নেই—এখন তুই কাজ করগে যা।

[কালীপদর প্রস্থান]

[দয়াল প্রবেশ করিলেন]

দয়াল। তোমার কাছে আসছিলাম মা।

বিজয়া। আসুন দয়ালবাবু, আপনার স্ত্রী ভাল আছেন তো ?

দয়াল। আজ ভাল আছেন। নরেনবাবুকে চিঠি লিখতে, কাল বিকেলে এসে তিনি ওষুধ দিয়ে গেছেন। কি অদ্ভুত চিকিৎসা মা, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পীড়া যেন বারো আনা আরোগ্য হয়ে গেছে।

বিজয়া। ভাল হবে না, আপনাদের সকলের বিশ্বাস ওঁর উপর ?

দয়াল। সে কথা সত্যি। কিন্তু বিশ্বাস তো শুধু শুধু হয় না মা! আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি কিনা, মনে হয় ঘরে পা দিলে সমস্ত ভাল হয়ে যাবে।

বিজয়া। তা হবে!

দয়াল। একটা কথা বলব মা—রাগ করতে পাবে না কিন্তু। তিনি ছেলেমানুষ সত্যি, কিন্তু যে-সব নামজাদা বিজ্ঞ চিকিৎসকের দল তোমার মিথ্যে চিকিৎসা করে টাকা আর সময় নষ্ট করলে, তাদের চেয়ে তিনি ঢের বেশী বিজ্ঞ—এ আমি শপথ করে বলতে পারি। আর একটা কথা মা, নরেনবাবু শুধু ওঁরই চিকিৎসা করে যাননি—আরও একজনের ব্যবস্থা করে গেছেন। (টেবিলের উপর এক টুকরা কাগজ

মেলিয়া) তোমাকে কিন্তু উপেক্ষা করতে দেব না, ওষুধটা একবার পরীক্ষা করে দেখতেই হবে বলে দিচ্ছি।

বিজয়া। কিন্তু এ যে অন্ধকারে ঢিল ফেলা দয়ালবাবু—রোগী না দেখে prescription লেখা।

দয়াল। ইস্, তাই বুঝি! কাল যখন তুমি তোমাদের বাগানের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়েছিলে—তখন ঠিক তোমার সুমুখের পথ দিয়েই যে তিনি হেঁটে গেছেন। তোমাকে ভাল করেই দেখে গেছেন—বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলে বলেই—

বিজয়া। তাঁর কি পরনে সাহেবী পোষাক ছিল?

দায়াল। ঠিক তাই। দূর থেকে দেখলে ভুল হয়, বাঙালী বলে হঠাৎ চেনাই যায় না।

বিজয়া। (হাসিয়া) ওটা আপনার অত্যুক্তি দয়ালবাবু স্নেহের বাড়াবাড়ি।

দয়াল। স্নেহ করি—খুবই করি সত্যি। তবু কথাটা আমার বাড়াবাড়ি নয় মা। অত বড় পণ্ডিত লোক, কিন্তু কথাগুলি যেমন মিষ্টি তেমনি শিশুর মত সরল। কিছুতে যেতে দিতে ইচ্ছে করে না, মনে হয়ে আরও কিছুক্ষণ ধরে রেখে দিই।

বিজয়া। ধরে রেখে দেন না কেন?

দয়াল। (হাসিয়া) সে কি হয় মা, তাঁর কত কাজ, কত পরিশ্রম তাঁকে করতে হয়। তবু গরীব বলে আমাদের ওপর কত দয়া। স্ত্রী রুগ্ন, তাঁকে দেখতে প্রায় ওকে আসতে হয়।

[বিলাস প্রবেশ করিল]

বিলাস। (বিজয়ার প্রতি) কেমন আছ আজ?

বিজয়া। ভালো আছি।

বিলাস। ভালো তো তেমন দেখায় না। (দয়ালের প্রতি) আপনি এখানে করছেন কি?

দয়াল। মাকে একবার দেখতে এলাম।

বিলাস। (টেবিলের উপর prescription-টার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় হাতে তুলিয়া লইয়া) prescription দেখছি যে। কার? (পরীক্ষা করিয়া) নরেনের নাম দেখছি যে! স্বয়ং ডাক্তারসাহেবের! কিন্তু এটা এল কি করে? [বিজয়া ও দয়াল উভয়েই নীরব]

বিলাস। শুনি না এল কি করে? ডাকে নাকি? হুঁ। ডাক্তার তো নরেন ডাক্তার? তাই বুঝি এঁদের ওষুধ খাওয়া হয় না; শিশির ওষুধ শিশিতেই পচে, তারপর ফেলে দেওয়া হয়? তা না হয় হ'লো—কিন্তু এই কলির ধন্বন্তরিটি কাগজখানি পাঠালেন কি করে? কার মারফতে? কথাটা আমার শোনা দরকার।

(দয়ালের প্রতি) আপনি এতক্ষণ খুব lecture দিচ্ছিলেন—সিঁড়ি থেকেই গলা শোনা যাচ্ছিল—বলি আপনি কিছু জানেন? একেবারে যে ভিজে বেড়ালটি হয়ে গেলেন। বলি জানেন কিছু?

দয়াল। আজ্ঞে হাঁ।

বিলাস। ওঃ—তাই বটে! কোথায় পেলেন সেটাকে?

দয়াল। আজ্ঞে তিনি আমার স্ত্রীকে দেখতে আসেন কিনা—আর বেশ সুন্দর চিকিৎসা করেন—তাই আমি বলেছিলুম, মা বিজয়ার জন্য যদি একটা—

বিলাস। তাই বুঝি এই ব্যবস্থাপত্র? আপনি দাঁড়িয়েছেন মুরুব্বি? হুঁ। (এক মুহূর্ত পরে) আপনাকে গেল বছরের হিসাবটা সারতে বলেছিলুম—সেটা সারা হয়েছে?

দয়াল। আজ্ঞে, দু'দিনের মধ্যেই সেরে ফেলব?

বিলাস। হয়নি কেন?

দয়াল। বাড়িতে ভারী বিপদ যাচ্ছিল—নিজ হাতে রাঁধতে হ'তো—আসতেই পারিনি।

বিলাস। (বিদ্রূপ করিয়া) আসতেই পারিনি! তবে আর কি—আমাকে রাজা করেছেন! আমি তখনই বাবাকে বলেছিলুম—এসব বুড়ো-হাবড়া নিয়ে আমার কাজ চলবে না। এদের আমি চাইনে।

বিজয়া। (অনুচ্চ কঠিনস্বরে) দয়ালবাবুকে এখানে কে এনেছে জানেন? আপনার বাবা ন'ন—এনেছি আমি।

বিলাস। যেই আনুক, আমার জানবার দরকার নেই। আমি কাজ চাই—কাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ।

বিজয়া। যাঁর বাড়িতে বিপদ, তিনি কি করে কাজ করতে আসবেন?

বিলাস। অমন সবাই বিপদের দোহাই পাড়ে, কিন্তু সে শুনতে গেলে আমার চলে না। আমি দরকারী কাজ সেরে রাখতে হুকুম দিয়েছিলুম, হয়নি কেন, সেই কৈফিয়ত চাই।

বিজয়া। দয়ালবাবু, আপনি তা হলে এখন আসুন! নমস্কার!

[দয়ালের প্রস্থান]

দয়ালবাবু গেছেন, এখন বলুন কি বলছিলেন?

বিলাস। বলছিলুম, আমি দরকারী কাজ সেরে রাখার হুকুম দিয়েছিলুম, হয়নি কেন তার কৈফিয়ত চাই; বিপদের খবর জানতে চাইনে।

বিজয়া। দেখুন বিলাসবাবু; জগতে সবাই মিথ্যাবাদী নয়। সবাই মিথ্যা বিপদের দোহাই দেয় না, অন্ততঃ মন্দিরের আচার্য্য দেন না। সে যাক, কিন্তু

আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আমি, যখন জানেন দরকারী কাজ হওয়া চাই-ই, তখন নিজে কেন সেরে রাখেননি? আপনি কেন চারদিন কাজ কামাই করলেন? কি বিপদ আপনার হয়েছিল শুনি?

বিলাস। (হতবুদ্ধি হইয়া) আমি নিজে খাতা সেরে রাখব! আমি কামাই করলুম কেন!

বিজয়া। হাঁ, আমি জানতে চাই। মাসে মাসে দুশো টাকা মাইনে আপনি নেন। সে টাকা তো আমি শুধু শুধু আপনাকে দিইনে,—কাজ করবার জন্যই দিই।

বিলাস। আমি চাকর; আমি তোমার আমলা?

বিজয়া। কাজ করবার জন্য যাকে মাইনে দিতে হয়, তাকে ও ছাড়া আর কি বলে? আপনার অসংখ্য অত্যাচার আমি নিঃশব্দে সয়ে এসেছি। কিন্তু যত সহ্য করেছি অন্যায়-উপদ্রব ততই বেড়ে গেছে। যান, নীচে যান। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ছাড়া আজ থেকে আপনার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। যে নিয়মে আমার অপর কর্ম্মচারীরা কাজ করে, ঠিক সেই নিয়মে কাজ পারেন করবেন, নইলে আপনাকে আমি জবাব দিলুম, আমার কাছারিতে আর ঢোকবার চেষ্টা করবেন না।

বিলাস। লাফাইয়া উঠিয়া—দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী কম্পিত করিতে করিতে) তোমার এত দুঃসাহস?

বিজয়া। দুঃসাহস আমার নয়, আপনার। আমার এস্টেটেই চাকরি করবেন, আর আমার উপরেই জুলুম করবেন! আমাকে 'তুমি' বলবার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে? আমার চাকরকে আমারই বাড়িতে জবাব দেবার—আমার অতিথিকে আমারই চোখের সামনে অপমান করবার--এসকল স্পর্দ্ধা আপনার কোথা থেকে জন্মাল?

বিলাস। (ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া) অতিথির বাপের পুণ্য যে সেদিন তার একটা হাত ভেঙে দিইনি। নচ্ছার বদমাইশ, জোচ্চোর, লোফার কোথাকার! আর কখনো যদি তার দেখা পাই—

[চীৎকার-শব্দে ভীত হইয়া কানাই সিং প্রভৃতি দরজায় আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল--বিজয়া লজ্জিত হইয়া কণ্ঠস্বর সংযত এবং স্বাভাবিক করিয়া লইল।]

বিজয়া। আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি, সেটা আপনারই কত বড় সৌভাগ্য যে, তাঁর গায়ে হাত দেবার অতিসাহস আপনার হয়নি। তিনি উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক। সেদিন তাঁর গায়ে হাত দিলেও হয়ত তিনি একজন পীড়িত স্ত্রীলোকের ঘরের মধ্যে বিবাদ না করে সহ্য করেই চলে যেতেন। কিন্তু এই উপদেশটা আমার ভুলবেন না যে, ভবিষ্যতে তাঁর গায়ে হাত দেবার ইচ্ছা যদি আপনার থাকে তো পিছন

থেকে দেবেন, সুমুখে এসে দেবার দুঃসাহস করবেন না। কিন্তু অনেক চেঁচামেচি হয়ে গেচে—আর না। নীচে থেকে চাকর-বাকর, দরোয়ান পর্য্যন্ত ভয় পেয়ে উপরে উঠে এসেছে—যান, নীচে যান!

[বিলাস ক্রোধে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। তাহার অনলবর্ষী দৃষ্টি বিজয়ার গমন-পথের দিকে দৃঢ়-নিবদ্ধ রহিল। ব্যস্ত হইয়া রাসবিহারী প্রবেশ করিলেন।]

রাস। ব্যাপার কি বিলাস? এত চেঁচামেচি কিসের? বিজয়া কোথায়?

বিলাস। জানো বাবা, বিজয়া আমায় বললে আমি তার মাইনের চাকর। অন্য চাকরের মত মনিবের মন যুগিয়ে না চললে আমাকে ডিসমিস করবে।

রাস। কেন? হঠাৎ এ-কথা কেন? কি বলেছিলে তাকে?

বিলাস। বলব আবার কি? কালীপদকে জবাব দিয়েছিলুম—এই হ'লো প্রথম অপরাধ।

রাস। বল কি? তা এত শীঘ্র তাকে জবাব দিতেই বা গেলে কেন? এই সেদিন নরেনকে খামোকা অপমান করলে—জানো তো তার প্রতি বিজয়ার—

বিলাস। ওই তো হচ্ছে আসল যোগ। সেই জোচ্চোর লোকারটার জন্তেই তো এত কাণ্ড। জানো বাবা, বিজয়া বলে কিনা, চাকর হয়ে আমি তার অতিথিকে—সেই নরেনটাকে অপমান করি কোন্ সাহসে—

রাস। অ্যাঁ, আর কি বললে? নাঃ, আমি যতই গুছিয়ে-গাছিয়ে আনি—তুমি কি ততই একটা না একটা বিভ্রাট বাধিয়ে তুলবে!

বিলাস। বিভ্রাট কিসের? ঐ ব্যাটা কালীপদকে তাড়াব না তো কি তাকে বাড়িতে রাখতে হবে? বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ সেই একটা অসভ্য জানোয়ারকে নিয়ে এসে বিজয়ার বিছানার ওপরই বসালে—আর ঐ বুড়ো দয়ালটাও জুটেছে তেমনি!

রাস। আবার তাঁকেও কিছু বলেছ নাকি? সর্ব্বনাশ বাধালে দেখছি!

বিলাস। বলব না। একশোবার বলব। নরেন ডাক্তারের ওপর তাঁর বড় টান। সেটাকে দিলাম সেদিন ঘর থেকে বা'র করে—আর উনি কিনা লুকিয়ে এসেছেন তারই দালালি করতে, একটা **prescription** পর্য্যন্ত এনে হাজির—বিজয়ার চিকিৎসা হবে। এদিকে স্ত্রীর অসুখের ছুতো করে বুড়ো চারদিন ডুব মেরে রইল, একবার কাছারিতে পর্য্যন্ত এল না; **worthless, old fool!**

[রাসবিহারী ক্রোধে ও ক্ষোভে নির্ব্বাক স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিলেন।]

বিলাস। বিজয়া আজ তোমাকে পর্য্যন্ত অপমান করতে ছাড়বে না।

রাস। তাতে তোমার কি?

বিলাস। আমার কি? আমার মুখের উপর বলবে দয়ালবাবুকে রাসবিহারী-

বাবু আনেননি, এনেছি আমি। বললে, দয়াল কাজ করুন না করুন তাকে কেউ কিছু বলতে পারবে না! ও আমাকে বলে আমলা! বলে, যে নিয়মে আমার অপর কর্ম্মচারীরা কাজ করে সেই নিয়মে কাজ করুন, নইলে চলে যান!

রাস। সে তো শুধু তোমাকে চলে যেতে বলেছে, আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমায় গলায় ধাক্কা মেরে বা'র করে দিই!

বিলাস। অ্যাঁ!

রাস। ছোট জাত তো আর মিছে কথা নয়! হাজার হোক সেই চাষার ছেলে তো! বামুন-কায়েতের ছেলে হলে ভদ্রতাও শিখতিস্, নিজের ভালমন্দও বুঝতিস্, হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞানও জন্মাত। যাও, এখন মাঠে মাঠে হাল-গরু নিয়ে কুলকর্ম্ম করে বেড়াও গে? উঠতে-বসতে তোকে পাখীপড়া করে শেখালাম যে, ভালোয় ভালোয় কাজটা একবার হয়ে যাক, তারপর যা ইচ্ছে হয় করিস, তোর সবুর সইল না, তুই গেলি তাকে ঘাঁটাতে! সে হলো রায়বংশের মেয়ে। ভাকসাইটে হরি রায়ের নাতনী। তুই হাত বাড়িয়ে গেছিস তার নাকে দড়ি পরাতে—মুখ্যু কোথাকার! মান-ইজ্জত সব গেল, এত বড় জমিদারীর আশা-ভরসা গেল, মাসে মাসে দু-দুশো টাকা মাইনে বলে আদায় হচ্ছিল সে গেল—যাও এখন চাষার ছেলে লাঙল ধর গে। আবার আমার কাছে এসেছেন—চোখ রাঙিয়ে তার নামে নালিশ করতে! দূর হ'—তোর আর মুখদর্শন করব না।

[বলিয়া রাসবিহারী নিজেই দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন, পিছনে পিছনে বিলাসও বিহ্বলের ন্যায় ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। ধীরে ধীরে বিজয়া প্রবেশ করিয়া টেবিলে মাথা নত করিয়া বসিল। দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। এ কি কাণ্ড করে বসলে মা! আর তাও আমার মত একটা হতভাগ্যের জন্যে! আমি যে লজ্জায়, সঙ্কোচে, অনুতাপে মরে যাচ্ছি।

বিজয়া। (মুখ তুলিয়া চোখ মুছিয়া) আপনি কি বাড়ি চলে যাননি?

দয়াল। যেতে পারলাম না মা। পা থরথর করে কাঁপতে লাগল, বারান্দার ওধারে একটা টুলের ওপর বসে পড়লাম। অনেক কথাই কানে এল।

বিজয়া। না এলেই ভাল হ'তো, কিন্তু আমি অন্যায় কিছু করিনি; আপনাকে অপমান করার তাঁর কোন অধিকার ছিল না।

দয়াল। ছিল বইকি মা। যে কাজ আমার করা উচিত ছিল করিনি, একটা চিঠি লিখে তাঁর কাছে ছুটি পর্য্যন্ত নিইনি—এসব কি আমার অপরাধ নয়? রাগ কি এতে মনিবের হয় না?

বিজয়া। কে মনিব, বিলাসবাবু? নিজেকে কর্ত্রী বলতে আমার লজ্জা করে দয়ালবাবু, কিন্তু ও দাবী যদি কারো থাকে সে আমারই। আর কারো নয়।

দয়াল। ও-কথা বলতে নেই মা, রাগ করেও না। আমাদের মনিব যেমন তুমি তেমনি বিলাসবাবু। এই তো আমরা সবাই জানি।

বিজয়া। সে জানা ভুল। আমি ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ মনিব নেই।

দয়াল। শান্ত হও মা, শান্ত হও। বিলাসবাবু একটু ক্রোধী, অল্পেই চঞ্চল হয়ে পড়েন এই তাঁর দোষ, কিন্তু মানুষ তো সর্ব্বগুণান্বিত হয় না, কোথাও একটু ত্রুটি থাকেই। এইখানেই নলিনীর সঙ্গে আমার মেলে না। সেদিন রোগে তুমি শয্যাগত, তোমার ঘরের মধ্যে নরেনকে অপমান করার কথা শুনে নলিনী রাগে জ্বলতে লাগল। বললে, এর আসল কারণ বিলাসবাবুর বিদ্বেষ। নিছক হিংসা আর বিদ্বেষ।

বিজয়া। বিদ্বেষ কিসের জন্যে দয়ালবাবু?

দয়াল। কি জানি, কেমন করে যেন নলিনীর মনে হয়েছে নরেনকে তুমি মনে মনে—করুণা—করো। এইটেই বিলাসবাবু কিছুতে সইতে পারছেন না।

বিজয়া। কিন্তু করুণা তো তাঁকে আমি করিনি। আমার একটা কাজেও তো তাঁর প্রতি করুণা প্রকাশ পায়নি দয়ালবাবু।

দয়াল। আমিও তো তাই বলি। বলি, তেমন করুণা তো বিজয়া সকলকেই করেন। আমাকেই কি তিনি কম দয়া করেছেন।

বিজয়া। দয়ার কথা ইচ্ছে হলে আপনারা বলতেও পারেন, কিন্তু নরেনবাবু পারেন না। বরঞ্চ, বার বার যা পেয়েছেন সে আমার নিষ্ঠুরতারই পরিচয়। সত্যি কিনা বলুন!

দয়াল। (সলজ্জে) না না, সত্যি নয়—সত্যি নয়—তবে নরেন নিজে কতকটা তাই ভাবে বটে। সেদিন কালীপদকে দিয়ে তুমি আমার ওখানে তার microscopeটা পাঠিয়ে দিলে, নরেন জিজ্ঞেস করলে, কত টাকা দিতে বলেছেন। কালীপদ বললে, টাকার কথা বলে দেননি—এমনি। এমনি কি রে? কালীপদ বললে, হ্যাঁ, এমনি নিয়ে যান, টাকা বোধহয় দিতে হবে না! সত্যিই তো আর এ বিশ্বাস করা যায় না—নিশ্চয় কালীপদর ভুল হয়েছে—এতেই নরেন রেগে উঠে বললে, তাঁকে বল্‌গে যা, আমাকে দান করার দরকার নেই, ঠাট্টা করারও দরকার নেই। যা, ফিরিয়ে নিয়ে যা।

বিজয়া। শুনেছি আমি কালীপদর মুখে।

দয়াল। কিন্তু নলিনী তাঁকে বারণ করেছিল। ওর ধারণা নরেনের হয়ত কাজ আটকাচ্ছে ভেবেই বিজয়া পাঠিয়ে দিয়েছেন, নইলে উপহার বলেও নয়, বিদ্রূপ করার জন্যেও নয়। ভেবেছেন হাতে-হাতে টাকা না নিয়ে যেদিন হোক পরে নিলেই হবে। আমারও তাই মনে হয়। বল ত মা, সত্যি নয় কি?

বিজয়া। জানিনে দয়ালবাবু। অসুখের মধ্যে পাঠিয়েছিলুম, ঠিক মনে করতে পারিনে তখন কি ভেবেছিলুম।

দয়াল। কিন্তু নলিনী বলে নিশ্চয়ই এই। বললে, নরেনের মত ভদ্র, আত্মভোলা, নিঃস্বার্থপর মানুষকে কেউ কখনো অপমান করতে পারে না এক বিলাসবাবু ছাড়া। কিন্তু নরেন নিজে কোনমতেই এ কথা বিশ্বাস করতে পারলে না, বললে, যে-লোক আমার চরম দুর্গতির দিনে ওটা দুশো টাকা দিয়ে কিনে দু'দিন পরেই নিজের মুখে চারশো টাকা চায় তার কিছুই অসম্ভব নয়। ওরা বড়লোক, ওদের অনেক ঐশ্বর্য্য—তাই আমাদের মত নিঃস্বদের উপহাস করতেই ওরা আনন্দ পায়। কিন্তু যাক গে এসব কথা মা! তোমাদের উভয়কেই ভালবাসি, ভাবলে আমার ক্লেশ বোধ হয়। (একটুখানি মৌন থাকিয়া) নরেন কিন্তু তোমার বিলাসকে অকপটে ক্ষমা করেছে। এমনি অন্যমনস্ক, নিঃসঙ্গ লোক ও যে, সবাই যখন শুনেছে তোমাদের বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, তখনো শোনেনি কেবল ওই! তোমার ঘর থেকে বা'র করে এনে রাসবিহারীবাবু যখন তাকে খবর দিলেন তখন শুনে যেন ও চমকে গেল। বিলাসবাবুর রাগের কারণটা বুঝতে পেরে তাঁকে তখনি ক্ষমা করলে। শুধু এইটুকুই সে আজো ভেবে পায় না যে, তার মত দরিদ্র গৃহহীন দুর্ভাগাকে বিলাসবাবু সন্দেহের চোখে দেখলেন কি ভেবে। এত বড় ভ্রম তাঁর হলো কি করে? আমিও ঠিক তাই ভাবি, শুধু নলিনীই ঘাড় নাড়ে—সমস্ত কথাই সে শুনেছে!

বিজয়া। শুনেছেন? শুনে কি বলেন নলিনী।

দয়াল। বলে না কিছুই, শুধু মুখ টিপে হাসে!

বিজয়া। তিনি কি চলে গেছেন?

দয়াল। না, আজ যাবে। বলেছিল যাবার পথে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে। কিন্তু তিনটে বাজল বোধ হয়, এল বলে। কিংবা হয়ত নরেনের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

বিজয়া। কলকাতা থেকে আজ বুঝি তাঁর আসার কথা আছে?

দয়াল। হাঁ, আমার স্ত্রীকে দেখতে আসবেন। কিন্তু আমারই হবে সবচেয়ে মুস্কিল মা, নরেন যদি কলকাতা থেকে চলে যায়।

বিজয়া। যাবার কথা আছে নাকি?

দয়াল। আছে বইকি। পরশুই তো বলছিল এখানে থাকার আর ইচ্ছে নেই, South Africa-র কোথায় নাকি কাজের সম্ভাবনা আছে—খবর পেলেই রওনা হবে।

বিজয়া। অত দূরে?

দয়াল। আমরাও তাই বলছিলাম। কিন্তু ও বলে, আমার দূরই বা কি, আর কাছেই বা কি! দেশই বা কি, আর বিদেশই বা কি! সবই ত সমান। শুনে

ভাবলাম, সত্যিই তো। কিই বা আছে এখানে যা ওকে টেনে রাখবে! কিন্তু ভাবলেও চোখে যেন জল এসে পড়ে। কিন্তু আর না মা, আমি উঠি, একটু কাজ সেরে নিই গে।

বিজয়া। কিন্তু বাড়ি যাবার আগে আর একবার দেখা করে যাবেন। এমনি চলে যাবেন না।

[কালীপদ প্রবেশ করিল]

কালীপদ। [দয়ালের প্রতি] ডাক্তারসাহেব একবার দেখা করতে-চান ?

দয়াল। কে ডাক্তার, আমাদের নরেন ? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় ? এখানে এসে ?

কালীপদ। নীচের ঘরে বসাব, না যেতে বলে দেব ?

বিজয়া। চলে যেতে বলবি ? কেন! যা আমার এই ঘরে তাঁকে ডেকে নিয়ে আয়।

[মাথা নাড়িয়া কালীপদ প্রস্থান করিল]

দয়াল। এখানে ডেকে আনা কি ভালো হবে মা ?

বিজয়া। আমার বাড়িতে ভালো-মন্দ বিচারের ভার আমার উপরেই থাক দয়ালবাবু।

দয়াল। না না, তা আমি বলিনি, বিলাসবাবু শুনতে পেলে কি—

বিজয়া। শুনতে পাওয়াই তাঁর দরকার মনে করি। নিজের যথাযোগ্য স্থানটার সম্বন্ধে ধারণা তাতে পাকা হয়।

[কালীপদ প্রবেশ করিল]

কালীপদ। ডাক্তারসাহেব এলেন না, চলে গেলেন।

দয়াল। চলে গেলেন ? কেন ?

কালীপদ। জিজ্ঞেসা করলেন, মিস্ দাস আছেন ? বললুম, না। বললেন, তাহলে আবশ্যক নেই, ও বাড়িতেই দেখা হবে। এই বলেই চলে গেলেন।

দয়াল। মা ডেকেছিলেন বলেছিলে তাঁকে ?

কালীপদ। বলেছিলুম বইকি। বললে, আজ সময় নেই, ছ'টার গাড়িতে ফিরে যেতে হবে। যদি সময় পান আর একদিন এসে দেখা করে যাবেন।

দয়াল। (সলজ্জে) কি জানি। এরকম তো তাঁর প্রকৃতি নয় মা। বোধ হয় সত্যিই খুব তাড়াতাড়ি।

বিজয়া। (কালীপদর প্রতি) আচ্ছা তুই যা এখান থেকে।

[যাওয়ার মুখে কালীপদ হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, কর্তাবাবু আসছেন এবং সসঙ্কোচে অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। মন্থরপদে রাসবিহারীবাবু প্রবেশ করিলেন।]

রাস। এই-যে মা বিজয়া। দয়ালবাবুও রয়েছেন দেখছি। ব'সো মা, ব'সো ব'সো।

[দয়াল সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন, বিজয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাসবিহারী আসন গ্রহণ করিলে বিজয়া পুনরায় উপবেশন করিল।]

রাস। এ ভালই হ'লো যে দু'জনের সঙ্গে একত্রেই দেখা হ'লো। আরও আগেই আসতে পারতাম, কিন্তু বিলাসের হঠাৎ সর্দ্দিগর্ম্মীর মত হয়ে—মাথায়-মুখে জল দিয়ে বাতাস করে সে একটু সুস্থ হলে তবে আসতে পারলাম—তার মুখে সবই শুনতে পেলাম দয়ালবাবু। (দয়াল কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই হাত নাড়িয়া তাহাকে বাধা দিয়া) না না না—তার দোষ-স্খালনের চেষ্টা করবেন না দয়ালবাবু। যে আপনার মত সাধু ভগবৎ-প্রাণ ব্যক্তিকেও অসম্মান করতে পারে তার স্বপক্ষে কিছুই বলবার নেই। আপনার কর্ম্মশৈথিল্য প্রকাশ পেয়েছে,—কিন্তু তাতে কি? সাহেবেরা বিলাসের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তার কর্ম্মময় জীবনের শত প্রশংসা করুক, কিন্তু আমরা তো সাহেব নয়, কর্ম্মই তো আমাদের জীবনের সবখানি অধিকার করে নেই! কিন্তু ও শাস্তি পেল কার কাছে? দেখছেন দয়ালবাবু করুণাময়ের করুণা—ও শাস্তি পেলে তারই কাছে যে তার ধর্ম্ম-সঙ্গিনী, আত্মা যাদের পৃথক নয়। দীর্ঘজীবী হও মা, এই তো চাই! এই তো তোমার কাছে আশা করি! (ক্ষণকাল পরে) কিন্তু এই কথাটা আমি কোনমতে ভেবে পাইনি বিজয়া, বিলাস আমার মত খোলাভোলা, সংসার-উদাসী লোকের ছেলে হয়ে এতবড় কর্ম্মপটু পাকা বিষয়ী হয়ে উঠল কি করে? কি যে তাঁর খেলা, কি যে সংসারের রহস্য কিছুই বোঝবার জো নেই মা!

দয়াল। তাঁর দোষ নেই রাসবিহারীবাবু, আমারই ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। এই তরুণ বয়সেই কি যে তাঁর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কি যে তাঁর চিত্তের দৃঢ়তা তা বলতে পারিনে। আমাকে তিনি উচিত কথাই বলেছেন।

রাস। উচিত কথা? এবার আমি সত্যিই দুঃখ পাব দয়ালবাবু। আপনি ভক্তিমান্, জ্ঞানবান্, কিন্তু বয়সে আমি বড়। এ আমি জানি, সংসারে অত্যন্ত বস্তুটা কিছুরই ভালো নয়। এ-ও জানি, বিলাসের কর্ম্ম-অন্ত প্রাণ, এখানে সে অন্ধ, কিন্তু তাই বলে কি মানীর মান রাখতেও হবে না? না না, আমি বুড়োমানুষ, সে তেজও নেই, জোরও নেই—এ আমি ভালো বলতে পারব না। নিজের ছেলে বলে তো এ-মুখ দিয়ে মিথ্যে বার হবে না দয়ালবাবু!

দয়াল। সাধু! সাধু!

রাস। এ ভালই হয়েছে মা। আমি অপার আনন্দ লাভ করেছি যে, বিলাস তার সর্ব্বোত্তম শিক্ষাটি আজ তোমার হাত থেকেই পাবার সুযোগ পেলে। কিন্তু কি ভ্রম দেখছেন দয়ালবাবু, আনন্দে এমনি আত্মহারা হয়েছি যে, আমার মাকেই

বোঝাতে যাচ্ছি। যেন আমার চেয়ে তিনি তার কম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। আজ এত আনন্দ তো শুধু এইজন্যেই যে, তোমার কাজ তুমি নিজের হাতে করেছ। তার সমস্ত শুভ যে শুধু তোমার হাতেই নির্ভর করছে। তার শক্তি, তোমার বুদ্ধি। সে ভার বহন করে চলবে, তুমি পথ দেখাবে। জগদীশ্বর! (চোখ তুলিয়া) ইস! চারটে বাজে যে! অনেক কাজ এখনো বাকী. আসি মা বিজয়া! আসি দয়ালবাবু। (প্রস্থানোদ্যত)

দয়াল। চলুন আমিও যাই।

রাস। কিন্তু আসল কথাটাই যে বলা হয়নি। (ফিরিয়া আসিয়া উপবেশন করিলেন) তোমার এই বুড়ো কাকাবাবুর একটি অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে। বলো রাখবে?

বিজয়া। বলুন কি?

রাস। লজ্জায়, ব্যথায়, অনুতাপে সে দগ্ধ হয়ে যাচ্চে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তোমাকে একটু কঠিন হতে হবে। সে এসে ক্ষমা চাইলেই যে ভুলে যাবে সে হবে না। শাস্তি তার পূর্ণ হওয়া চাই। অন্ততঃ একটা দিনও এই দুঃখ সে ভোগ করুক এই আমার অনুরোধ।

বিজয়া। বিলাসবাবু কি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন?

রাস। না, সে আমি বলব না—সে কিছু নয়—ও-কথা শুনে তোমার কাজ নেই।

বিজয়া। কালীপদ?

[কালীপদ প্রবেশ করিল]

কালীপদ। আজ্ঞে—

বিজয়া। বিলাসবাবু অফিস ঘরে আছেন, একবার তাঁকে ডেকে আনো।

কালীপদ। যে আজ্ঞে—

রাস। (সস্নেহ মৃদু ভর্ৎসনার সুরে) ছি মা! শুনে পারলে না থাকতে? এখুনি ডেকে পাঠালে? (হাসিয়া দয়ালের প্রতি) ঠিক এই ভয়টিই করেছিলুম দয়ালবাবু। সে ব্যথা পাচ্ছে শুনলে বিজয়া সইতে পারবে না—তাই বলতে চাইনি—কি করে যে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—কিন্তু আমি বাধা দেব কি করে? মা যে আমার করুণাময়ী! এ যে সংসারের সবাই জেনেছে। আসুন দয়ালবাবু—

দয়াল। চলুন যাই।

[কালীপদ প্রবেশ করিল]

কালীপদ। ছোটবাবু বাড়ি চলে গেছেন, তাঁকে ডেকে আনতে লোক গেল।

রাস। লোক গেল? আজ তাকে না ডাকলেই ভালো হ'তো মা। কিন্তু—ওঃ!

গোলমালে একটা মস্ত কাজ যে আমরা ভুলে যাচ্ছি। দয়ালবাবু, আজ যে বছরের প্রথম দিন! আমাদের যে অনেক দিনের কল্পনা আজকের শুভদিনে বিশেষ করে মাকে আমরা আশীর্ব্বাদ করব! তবে, ভালোই হয়েছে, আমরা না চাইতেই বিলাসকে ডেকে আনতে লোক গেছে। এও সেই করুণাময়ের নির্দ্দেশ। আসুন দয়ালবাবু, আর বিলম্ব করব না— সামান্য আয়োজন সম্পূর্ণ করে নিই—বিলাস এসে পড়লেই আমরা ফিরে এসে বিজয়াকে আমাদের সমস্ত কল্যাণ কামনা উজাড় করে ঢেলে দিয়ে যাব। আসুন।

[উভয়ের প্রস্থান। বিজয়া যাইবার পূর্ব্বে টেবিলের চিঠিপত্রগুলা গুছাইয়া রাখিতেছিল, কালীপদ মুখ বাড়াইয়া বলিল]

কালীপদ। মা, ডাক্তারসাহেব—

[বলিয়া অদৃশ্য হইল। নরেন প্রবেশ করিয়া hat ও ছড়িটা একপাশে রাখিতে রাখিতে]

নরেন। নমস্কার! পথ থেকে ফিরে এলুম, ভাবলুম, যে বদ্‌রাগী লোক আপনি, না এলে হয়ত ভয়ানক রাগ করবেন।

বিজয়া। ভয়ানক রেগে আপনার করতে পারি কি?

নরেন। কি করতে পারেন সেটা তো প্রশ্ন নয়, কি না করতে পারেন সেটাই আসল কথা। কিন্তু বাঃ! আমার ওষুধে দেখছি চমৎকার ফল হয়েছে।

বিজয়া। আপনার ওষুধে কি করে জানলেন? আমাকে দেখে, না কারো কাছে শুনে!

নরেন। শুনে। কেন, আপনি কি দয়ালবাবুর কাছে শোনেননি যে আমার ওষুধ খেতে পর্য্যন্ত হয় না, শুধু প্রেস্‌ক্রিপশনটার ওপর চোখ বুলিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলেও অর্দ্ধেক কাজ হয়! হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

বিজয়া। (হাসিয়া ফেলিয়া) তাই বুঝি বাকী অর্দ্ধেকটা সারাবার জন্যে পথ থেকে ফিরে এলেন? কিন্তু ওদিকে নলিনী বেচারা যে আপনার অপেক্ষা করে পথ চেয়ে রইল?

নরেন। তা বটে। দয়ালবাবুর স্ত্রীকে গিয়ে একবার দেখে আসতে হবে। কিন্তু আমাকে নিয়ে আচ্ছা কাণ্ড করলেন তো বিলাসবাবুর সঙ্গে! ছি ছি ছি ছি— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

বিজয়া। এর মধ্যে বললে কে আপনাকে?

নরেন। দয়ালবাবু। এইমাত্র নীচে তাঁর সঙ্গে দেখা—ছি ছি ছি—আপনার ভারী অন্যায়! ভারী অন্যায়! হাঃ হাঃ হাঃ—

বিজয়া। অন্যায় আমার, কিন্তু আপনি এত খুশী হয়ে উঠলেন কেন?

নরেন। (গম্ভীর হইয়া) খুশী হয়ে উঠলুম? একেবারে না। অবশ্য এ-কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারিনে যে, শুনেই প্রথমে একটু আমোদ বোধ করেছিলুম, কিন্তু তারপরে বাস্তবিক দুঃখিত হয়েছি। আপনার মত বিলাসবাবুর মেজাজটাও তেমন ভাল নয়—ভবিষ্যতে আপনারা যে দিনরাত লাঠালাঠি করবেন।

বিজয়া। আপনি তো তাই চান।

নরেন। (জিভ কাটিয়া সলজ্জে) না না না না—ছি ছি, ওকথা বলবেন না। সত্যিই আমি শুনে বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছি। তাঁর মেজাজ ভালো নয় বটে, কিন্তু আপনি নিজেও যে অসহিষ্ণু হয়ে কতকগুলো অপমানের কথা বলে ফেলবেন সে-ও ভারী অন্যায়। ভেবে দেখুন দিকি কথাটা প্রকাশ পেলে ভবিষ্যতে কি রকম লজ্জার কারণ হবে? বিশেষ করে আমার জন্য আপনাদের মধ্যে এরূপ একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায়—

বিজয়া। তাই আহ্লাদে হাসি চাপতে পাচ্ছেন না?

নরেন। (গম্ভীরমুখে) ছি ছি, কেন আপনি বার বার একরকম মনে করছেন? বিশ্বাস করুন, যথার্থ-ই আমি বড় দুঃখিত হয়েছি। কিন্তু তখন আমি আপনাদের সম্বন্ধে কিছুই জানতুম না। জ্বরের ঘোরে কি একটা সামান্য কথা আপনি বললেন তাতেই এত! প্রথমে আমি তো হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলুম বিলাসবাবুর উগ্রতা দেখে, তারপরে বাইরে এনে রাসবিহারীবাবু আমাকে যা বুঝিয়ে বললেন তারও সঙ্কেত ঐ ঈর্ষা, এবং মিস্ নলিনীও স্পষ্ট বললেন ঈর্ষা, আর দয়ালবাবুও তাতেই যেন সায় দিলেন। শুনে লজ্জায় মরে যাই, অথচ সত্যি বলছি আপনাকে, এত লোকের মধ্যে আমার মত একটা নগণ্য লোককে বিলাসবাবুর ঈর্ষা করার কি আছে আমি তো আজও ভেবে পেলুম না। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) আপনারা তো আবশ্যক হলে সকলের সঙ্গে কথা কন, এতে এমন কি দোষ তিনি দেখতে পেলেন? যাই হোক, আপনারা আমাকে মাপ করবেন—আর ঐ বাঙলায় কি যে বলে—অভি—অভিনন্দন—আমিও আপনাকে তাই জানিয়ে যাচ্ছি, আপনারা সুখী হোন।

বিজয়া। (মুখ ফিরাইয়া) অভিনন্দন আজ না জানিয়ে বরঞ্চ সেইদিনই আশীর্বাদ করবেন।

নরেন। সেদিন? কিন্তু ততদিন পারব থাকতে?

বিজয়া। না, সে হবে না। রাসবিহারীবাবুকে কথা দিয়েছিলেন, আপনাকে থাকতেই হবে।

নরেন। কথা দিইনি বটে, কিন্তু দিতেই ইচ্ছে করে। যদি থাকি আসবই। (বিজয়া অলক্ষ্যে চোখ মুছিয়া ফেলিল) ভাল কথা। আমার আর একটা ক্ষমা চাইবার আছে। সেদিন কালীপদকে দিয়ে হঠাৎ microscope-টা পাঠিয়েছিলেন কেন?

বিজয়া। আপনার জিনিস আপনি নিজেই তো ফিরে চেয়েছিলেন।

নরেন। তা বটে, কিন্তু দামের কথাটা তো বলে পাঠাননি? তা হলে তো—

বিজয়া। আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু সেই ভুলের শাস্তি আপনি তো আমাকে কম দেননি!

নরেন। কিন্তু কালীপদ যে বললে—

বিজয়া। যাই বলুক সে, আপনাকে উপহার দেবার স্পর্দ্ধা আমার থাকতে পারে এমন কথা কেমন করে বিশ্বাস করলেন? আর সত্যিই তাই যদি করে থাকি, কেন নিজের হাতে শাস্তি দিলেন না? কেন চাকরকে দিয়ে আমার অপমান করলেন? আপনার কি করেছিলুম আমি?

[শেষের দিকে তাহার গলা ভাঙিয়া আসিল, সে উঠিয়া গিয়া
জানালার বাহিরে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

নরেন। কাজটা আমার যে ভাল হয়নি তা তখনি টের পেয়েছিলুম। তারপরে অনেক ভেবে দেখেছি—আর ঐ দেখুন—ঐ ঈর্ষা জিনিসটা কত মন্দ তার সীমা নেই। ও যে শুধু নিজের ঝোঁকে বেড়ে চলে তাই নয়, সংক্রামক ব্যাধির মত অপরকে আক্রমণ করতেও ছাড়ে না। আজ তো নিশ্চয় জানি আমাকে ঈর্ষা করার মত ভুল বিলাসবাবুর আর নেই, কিন্তু সেদিন নলিনীর মুখের ঐ ঈর্ষা শব্দটা আমার কানের মধ্যে গিয়ে বিঁধে রইল, কিছুতেই যেন আর ভুলতে পারিনে।

বিজয়া। (মুখ না ফিরাইয়া) তারপরে? ভুললেন কি করে?

নরেন। (হাসিয়া) অনেক চেষ্টায়। অনেক দুঃখে। কেবলি মনে হতে লাগল —নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে, নইলে মিছেমিছি কেউ কারুকে হিংসে করে না। আপনাকে আজ আমি সত্যি বলছি, তারপরের ক'দিন চব্বিশ ঘণ্টাই শুধু আপনাকে ভাবতুম, আর মনে পড়ত আপনার জ্বরের ঘোরের সেই কথাগুলি। তাইতো বলছিলুম এ কি ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ! কাজকর্ম্ম চুলোয় গেল—দিবারাত্রি আপনার কথাই শুধু মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এর কি আবশ্যক ছিল বলুন তো! আর শুধু কি এই? আপনাকে দেখার জন্যেই কেবল দু-তিনদিন এই পথে হেঁটে গেছি। দিনকতক সে এক আচ্ছা পাগলা ভূত আমার কাঁধে চেপেছিল।

[এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। বিজয়া কোন কথা না বলিয়া
ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল]

নরেন। (সেদিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া) এ আবার কি হ'লো! রাগ করবার কথা কি বললুম!

[কালীপদ প্রবেশ করিল]

কালীপদ। আপনি চলে যাবেন না যেন। মা বলে দিলেন আপনি চা খেয়ে যাবেন।

নরেন। না না, তাকে বারণ করে দাও গে —আমি দয়ালবাবুর ওখানে চা খাব।

কালীপদ। কিন্তু মা দুঃখ করবেন যে!

নরেন। না, দুঃখ করবেন না। তাঁকে বলো গে আজ আমার সময় নেই।

কালীপদ। বলছি, কিন্তু তিনি কখ্‌খনো শুনবেন না।

[কালীপদ প্রস্থান করিল, অন্য দ্বার দিয়া বিজয়া প্রবেশ করিল।]

নরেন। অমন করে হঠাৎ চলে গেলেন যে বড়?

বিজয়া। কেমন করে চলে গেলুম শুনি?

নরেন। যেন রাগ করে।

বিজয়া। আপনার চোখের দৃষ্টিটা খুলেছে দেখছি তা হলে। আচ্ছা, সেই ভূতের কাহিনীটা শেষ করুন এবার।

নরেন। কোন্ ভূতের কাহিনী?

বিজয়া। সেই যে পাগলা ভূতটা দিনকতক আপনার কাঁধে চেপেছিল? সে নেবে গেছে তো?

নরেন। (সহাস্যে) ওঃ—তাই? হাঁ সে নেবে গেছে।

বিজয়া। যাক তা হলে বেঁচে গেছেন বলুন। নইলে আর কতদিন যে আপনাকে এই পথে ঘোড়দৌড় করিয়ে বেড়াত কে জানে।

কালীপদ। (নরেনকে দেখাইয়া) উনি চা খাবেন না।

বিজয়া। (কালীপদকে) কেন খাবেন না? যা তুই ঠিক করে আনতে বলে দি গে।

[কালীপদ প্রস্থান করিল]

নরেন। আমাকে মাপ করবেন, আজ আমি চা খেতে পারব না।

বিজয়া। কেন পারবেন না? —আপনাকে নিশ্চয় খেয়ে যেতে হবে।

নরেন। (মাথা নাড়িয়া) না না,—সে ঠিক হবে না। সেদিন তাঁদের কথা দিয়েছিলুম আজ এসে তাঁদের বাড়িতে খাব। না খেলে তাঁরা বড় দুঃখ করবেন।

বিজয়া। তাঁরা কে? দয়ালবাবুর স্ত্রী, না নলিনী?

নরেন। দু'জনেই দুঃখ পাবেন। হয়ত আমার জন্যে আয়োজন করে রেখেছেন।

বিজয়া। আয়োজনের কথা থাক, কিন্তু দুঃখ পেতে বুঝি শুধু তাঁরাই আছেন, আর কেউ নাই নাকি?

নরেন। আর কেউ কে, দয়ালবাবু? (হাসিয়া) না না, তিনি বড় শান্ত মানুষ—সাদাসিধে নিরীহ লোক। তা ছাড়া তাঁকে তো এ-বাড়িতেই দেখলুম। তাঁকে ভয় নেই, কিন্তু ওঁরা বড় রাগ করবেন।

বিজয়া। ওঁরা কারা নরেনবাবু? ওঁরা কেউ নেই- আছেন শুধু নলিনী। এখানে খেয়ে গেলে তিনিই রাগ করবেন। বলুন তাঁকেই আপনার ভয়, বলুন এই কথা সত্যি।

নরেন। রাগ করতে আপনারা কেউ কম নয়। আপনাকে কথা দিয়ে সেখানে খেয়ে এলে আপনিই কি রাগ কম করতেন নাকি?

বিজয়া। হাঁ, তাই যান। শীগ্‌গির যান, আপনার অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর আপনাকে আটকাব না।

নরেন। হাঁ, দেরি হয়ে গেছে বটে। ফিরে যাবার সাতটার ট্রেনটা হয়ত আর ধরতে পারব না।

বিজয়া। পারবেন না কেন? এখন থেকে সাতটা পর্য্যন্ত আপনাকে ধরে বসিয়ে নলিনী খাওয়াবেন নাকি? এখানে তো একটুখানি খেয়েই না না করতে থাকেন, শত উপরোধেও কথা রাখেন না, উপেক্ষা করে উঠে পড়েন।

নরেন। একেবারে উল্টো অভিযোগ? মানুষকে বেশী খাওয়ানোর রোগ আপনার চেয়ে সংসারে কারো আছে নাকি? উপেক্ষা করা? আপনাকে উপেক্ষা করে কারো নিস্তার আছে? ভয়েই তো সারা হয়ে যায়।

বিজয়া। কিন্তু আপনার তো ভয় নেই। এই তো স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছেন।

নরেন। উপেক্ষা করে নয়, তাঁদের কথা দিয়েছি বলে। আর খাওয়াই শুধু নয়, একটা বইয়ের কতকগুলো জিনিস নলিনীর বেধেছে সেইগুলো বুঝিয়ে দিতে হবে।

বিজয়া। কি বই?

নরেন। একটা ডাক্তারি বই। তাঁর ইচ্ছে বি. এ. পাশের পরে মেডিকেল কলেজে গিয়ে ভর্ত্তি হ'ন। তাই সামান্য যা জানি অল্পস্বল্প তাঁকে সাহায্য করি।

বিজয়া। আপনি কি তাঁর প্রাইভেট টিউটর? মাইনে কি পান?

নরেন। এ বলা আপনার অন্যায়। আপনার কথাবার্ত্তায় আমার প্রায় মনে হয় তাঁর প্রতি আপনি প্রসন্ন ন'ন। কিন্তু তিনি আপনাকে কত যে শ্রদ্ধা করেন জানেন না। এখানে এসে পর্য্যন্ত যত ভালো কাজ আপনি করেছেন সমস্ত তাঁর মুখে শুনতে পাই। আপনার কত কথা। এক কলেজে পড়তেন আপনারা—আপনি কলেজে আসতেন মস্ত একটা জুড়ি-গাড়ি করে, মেয়েরা সবাই চেয়ে থাকত। নলিনী বলছিলেন, যেমন রূপ তেমনি নম্র আচরণ—পরিচয় ছিল না, কিন্তু তখন থেকে আমরা সবাই বিজয়াকে মনে মনে ভালবাসতুম। এমনি কত গল্প হয়।

বিজয়া। কেবল গল্পই যদি হয় আপনি পড়ান কখন?

নরেন। পড়াই কখন? আমি কি তার মাস্টার, না পড়ানোর ভার আমার ওপর?

আপনার কথাগুলো সব এত বাঁকা যে মনে হয় সোজা কথা বলতে কখনো শেখেননি।

বিজয়া। শিখব কি করে, মাস্টার তো ছিল না।

নরেন। আবার সেই বাঁকা কথা।

বিজয়া। (হাসিয়া ফেলিল) কিন্তু আপনি যাবেন কখন? যাওয়া আজ না হয় নাই হ'লো, কিন্তু পড়ানো না হলে যে ভয়ানক ক্ষতি!

নরেন। আবার সেই! চললুম। (টুপিটা হাতে লইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, দ্বারের নিকটে সহসা থমকাইয়া দাঁড়াইয়া) একটা কথা বলবার ছিল, কিন্তু ভয় হয় পাছে রাগ করে বসেন!

বিজয়া। রাগই যদি করি তাতে আপনার ভাবনা কি? দেনা শোধ করুন বলে চোখ রাঙাব সে জো-ও নেই। ভয়টা আপনার কিসের?

নরেন। আবার তেমনি বাঁকা কথা! কিন্তু শুনুন। এখানে এসে পর্য্যন্ত আপনি বহু সৎকার্য্য করেছেন। কত দুঃখী প্রজার খাজনা মাপ করেছেন, কত দরিদ্রকে দান করেছেন, ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন—

বিজয়া। এসব শোনালে কে? নলিনী?

নরেন। হাঁ, তাঁর মুখেই শুনেছি। কত দরিদ্র কত কি পেলে আমি কি কিছু পাব না? আমাকে সেই মাইক্রসকোপটা আজ উপহার দিন, কাল-পরশু দামটা তার পাঠিয়ে দেব।

বিজয়া। দাম দিয়ে উপহার নেবার বুদ্ধি আপনাকে কে যোগালে? নলিনী?

নরেন। না না, তিনি নয়। তিনি শুধু বলছিলেন সেটা আপনার তো কোন কাজে লাগল না, কিন্তু তিনি পেলে অনেক কিছু শিখতে পারেন—সে শিক্ষা পরে তাঁর অনেক কাজে লাগবে।

বিজয়া। অর্থাৎ, সেটা গিয়ে পৌঁছবে তাঁর হাতে? আমি বেচলে আপনি নিয়ে গিয়ে তাঁকে উপহার দেবেন—এই তো প্রস্তাব?

নরেন। না না, তা নয়। কিন্তু সেটা আপনারও কোন কাজে এল না, অথচ সকলেরই চক্ষুশূল হয়ে রইল। তাই বলছিলুম—

বিজয়া। বলার কোন দরকার ছিল না নরেনবাবু। আপনার টাকার অভাব নেই, দোকানেও মাইক্রসকোপ কিনতে পাওয়া যায়। কিনেই যদি উপহার দিতে হয় তাঁকে বাজার থেকে কিনেই দেবেন। এটা আমার চক্ষুশূল হয়েই আমার কাছে থাক।

নরেন। কিন্তু—

বিজয়া। কিন্তুতে আর কাজ নেই। আপনি নিরর্থক নিজেরও সময় নষ্ট করছেন, আমারও করছেন। আরও তো কাজ আছে।

নরেন। (ক্ষণকাল হতবুদ্ধিভাবে চাহিয়া থাকিয়া) আপনার সুমুখে সব কথা আমি গুছিয়ে বলতে পারিনে, আপনিও রেগে ওঠেন। হয়ত আপনার মনে হয় নিজের অবস্থাকে ডিঙিয়ে আপনার সমকক্ষ হয়ে আমি বলতে চাই, কিন্তু তা কথনো সত্যি নয়। আপনার বাড়িতে আসতে কত যে সঙ্কুচিত হই সে আমিই জানি। এসে কি বলতে কি বলি, নিজের ওজন রাখতে পারিনে, আপনি উত্যক্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু সে আমার অন্যমনস্ক প্রকৃতির দোষে, আপনাকে অমর্য্যাদা করার জন্যে না। কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করতে আমি আসব না। নমস্কার!

[নরেন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল]

[ব্যগ্রপদে রাসবিহারীর প্রবেশ। তাঁহার পিছনে দয়াল, হাতে রৌপ্যপাত্রে ফুল, চন্দন ও একজোড়া মোটা সোনার বালা। তাঁহার পিছনে দুইজন ভৃত্যের হাতে ফুল মালা ইত্যাদি এবং তাহাদের পিছনে কর্ম্মচারীর দল। বিজয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।]

রাস। মা বিজয়া, আজ যে নব-বৎসরের প্রথম দিন সে কথা কি তোমার স্মরণ আছে?

বিজয়া। একটু পূর্ব্বেই আপনি বলে গেলেন, নইলে ছিল না।

রাস। (মৃদু হাসিয়া) তুমি ভুলতে পার, কিন্তু আমি ভুলি কি করে? এই যে আমার ধ্যান-জ্ঞান। বনমালী বেঁচে থাকলে আজকের দিনে তিনি কি করতেন মনে পড়ে মা?

বিজয়া। পড়ে বইকি। আজকের দিনে বিশেষ করে তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করতেন।

রাস। বনমালী নেই, কিন্তু আমি আজ আছি। ভেবেছিলাম এই কর্ত্তব্য প্রভাতেই নিষ্পন্ন করব, তোমাদের স্বাস্থ্য, আয়ু, নির্ব্বিঘ্ন জীবন ভগবানের শ্রীচরণে প্রসাদ ভিক্ষা করে নেব, কিন্তু নানা কারণে তাতে বাধা পড়ল। কিন্তু বাধা তো সত্যি নয়, সে মিথ্যে। তাকে স্বীকার করে নিতে পারি না তো মা! জানি আজ তোমার মন চঞ্চল, তবু দয়ালকে বললাম, ভাই, আজকের এই পুণ্য দিনটিকে আমি ব্যর্থ যেতে দিতে পারব না, তুমি আয়োজন কর। আয়োজন যত অকিঞ্চনই হোক,—কিন্তু নিজেই যে আমি বড় অকিঞ্চন মা! দয়াল বললেন, সময় কই? বেলা যে যায়। সজোরে বললুম, যায়নি বেলা—আছে সময়। কোন কিছুই আজ আমি মানব না। আয়োজনের স্বল্পতায় কি আসে-যায় দয়াল, আড়ম্বরে বাইরের লোককেই শুধু ভোলানো যায়, কিন্তু এ যে বিজয়া! মা যে বুঝবেই এ তার পিতৃ-কল্প কাকাবাবুর অন্তরের শুভ-কামনা। লোক ছুটল আমার বাড়িতে, বাগানে ছুটল মালী ফুল তুলতে—মাঙ্গলিক যাকিছু সংগৃহীত হতে বিলম্ব ঘটল না। মুকুট-মালা

নাই বা হ'লো—এ যে কাকাবাবুর আশীর্ব্বাদ! কিন্তু বিলাস এল না কেন? তখনি স্মরণ হ'লো সে আসবে কি করে? সে সাহস তার কই? ভাবলাম ভালই হয়েছে সে যে লজ্জায় লুকিয়ে আছে। এমনি হয় মা,—অপরাধের দণ্ড এমনি করেই আসে। জগদীশ্বর! (একমুহূর্ত্ত পরে) তখন কাছারি-ঘরে ডাক দিয়ে বললাম, তোমরা কে কে আছ এসো আমাদের সঙ্গে। আজকের দিনে তোমাদের কাছেও বিজয়ার চিরদিনের কল্যাণ-ভিক্ষা করে আমি নিতে চাই। এসো তো মা আমার কাছে।

[এই বলিয়া তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়া গেলেন। বিজয়া উদ্‌ভ্রান্ত-মুখে এতক্ষণ নীরবে চাহিয়াছিল, এইবার ঘাড় হেঁট করিল। রাসবিহারী তাহার কপালে চন্দনের ফোঁটা দিলেন, মাথায় ফুল ছড়াইয়া দিতে দিতে]

সংসারে আনন্দ লাভ কর, স্বাস্থ্য-আয়ু সম্পদ লাভ কর, ব্রহ্মপদে অবিচলিত শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস লাভ কর, আজকের পুণ্যদিনে এই তোমার কাকাবাবুর আশীর্ব্বাদ মা।

[বিজয়া দুই হাত জোড় করিয়া নিজের ললাট স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিল। অনেকের হাতেই ফুল ছিল তাহারা ছড়াইয়া দিল।]

রাস। দেখি মা তোমার হাত দুটি—

[এই বলিয়া বিজয়ার দুই হাত টানিয়া লইয়া একে একে সেই সোনার বালা দুটি পরাইয়া দিলেন।]

টাকার মূল্যে এ-বালার দাম নয় মা, এ তোমার (দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া) এ আমার বিলাসের জননীর হাতের ভূষণ। চেয়ে দেখ মা, কত ক্ষয়ে গেছে। মৃত্যুকালে তিনি বলেছিলেন এ যেন না কখনো নষ্ট করি, এ যেন শুধু আজকের দিনের জন্যেই—

[রাসবিহারীর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর এইবার একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।]

দয়াল। (আশীর্ব্বাদ করিতে কাছে আসিয়া ব্যস্তভাবে) মা, মুখখানি যে বড় পাণ্ডুর দেখাচ্ছে, অসুখ করেনি তো?

বিজয়া। (মাথা নাড়িয়া) না।

দয়াল। সুখী হও, আয়ুষ্মতী হও, জগদীশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি।

[বিজয়া জানু পাতিয়া তাঁহার পায়ের কাছে প্রণাম করিল]

দয়াল। (ব্যস্ত হইয়া) থাক মা, থাক—আনন্দময় তোমাকে আনন্দে রাখুন। কিন্তু মুখ দেখে তোমাকে বড় শ্রান্ত মনে হচ্ছে। বিশ্রাম করার প্রয়োজন।

রাস। প্রয়োজন বইকি দয়াল, একান্ত প্রয়োজন। আজ বনমালীর উল্লেখ করে হয়তো তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়েছি, কিন্তু না করেও যে উপায় ছিল না। আজকের শুভদিনে তাঁকে স্মরণ করা যে আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু আর কথা কয়ে তোমাকে ক্লান্ত করব না মা, যাও বিশ্রাম কর গে। দয়াল, চল ভাই, আমরা

যাই। (কর্ম্মচারীদের লক্ষ্য করিয়া) তোমরা সকলেই বয়োজ্যেষ্ঠ, তোমাদের মঙ্গল কামনা কখনো নিষ্ফল হবে না। শুধু দয়াল নয়, তোমাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু চল সকলে যাই, মাকে বিশ্রাম করার একটু অবসর দিই।

[সকলের একে একে প্রস্থান]

[বিজয়া বালা-জোড়া হাত হইতে খুলিয়া ফেলিল এবং নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া উপবেশন করিল। ক্ষণেক পরে পরেশ প্রবেশ করিয়া ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া রহিল—]

পরেশ। মা গো!

বিজয়া। (মুখ তুলিয়া) কি রে পরেশ?

পরেশ। তোমার যে বিয়ে হবে গো!

বিজয়া। বিয়ে হবে? কে তোকে বললে?

পরেশ। সবাই বলছে। এই যে আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল আমরা সবাই দেখনু।

বিজয়া। কোথা দিয়ে দেখলি?

পরেশ। ওই দোরের ফাঁক দিয়ে। আমি, মা, সতুর পিসী—সব্বাই। দু-গোণ্ডা পয়সা দাও না মা, একটা ভালো নাটাই কিনব—(জানলার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া) উই গো! ডাক্তারবাবু যায় মা। হনহন করে চলচে ইস্টিশানে—

বিজয়া। (দ্রুতপদে জানালার কাছে আসিয়া বাহিরে চাহিয়া) পরেশ, ধরে আনতে পারবি ওঁকে? তোকে খুব ভাল নাটাই কিনে দেব।

পরেশ। দেবে তো মা?

[পরেশ দৌড় মারিল। পরেশের মা মৃদুপদে প্রবেশ করিল।]

পরেশের মা। আজকে কিছু খাবে না দিদিমণি? একফোঁটা চা পর্য্যন্ত যে খাওনি! (টেবিলের কাছে আসিয়া বালা-দুটা হাতে তুলিয়া লইয়া) একি কাণ্ড! আজকের দিনে কি হাত থেকে সরাতে আছে দিদিমণি! তোমার যে ভুলো মন, হয়ত এইখানে ফেলে চলে যাবে, যার চোখে পড়বে সে কি আর দেবে!— তোমার পরেশকে কিন্তু একটা আঙটি গড়িয়ে দিতে হবে দিদিমণি, তার কতদিনের সখ।

বিজয়া। আর তোমাকে একটা হার—না?

পরেশের মা। তামাসা করছ বটে, কিন্তু না নিয়েই কি ছাড়ব ভেবেছ?

বিজয়া। না, ছাড়বে কেন, এই তো তোমাদের পাবার দিন।

পরেশের মা। সত্যি কথাই তো! এসব কাজকর্ম্মে পাব না তো কবে পাব বল তো? এক বাটি চা আর কিছু খাবার নিয়ে আসব? না হয় তোমার শোবার ঘরে চল, আমি সেখানেই দিয়ে আসি গে।

বিজয়া। তাই যাও পরেশের মা, আমার শোবার ঘরেই দাও গে।

পরেশের মা। যাই দিদিমণি, বামুন-ঠাকুরকে দিয়ে খানকতক গরম লুচি ভাজিয়ে নিই গে।

[পরেশের মা চলিয়া গেল। প্রবেশ করিল পরেশ এবং তার পিছনে নরেন]

বিজয়া। এই নে পরেশ একটা টাকা। খুব ভালো লাটাই কিনিস্, ঠকিস্‌নে যেন।

পরেশ। নাঃ— [পরেশ নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল]

নরেন। ওঃ—তাই ওর এত গরজ! আমাকে নিশ্বাস নেবার সময় দিতে চায় না। লাটাই কেনার টাকা ঘুষ দেওয়া হ'লো! কিন্তু কেন? হঠাৎ যে আবার ডাক পড়ল?

বিজয়া। (ক্ষণকাল নরেনের মুখের প্রতি চাহিয়া) মুখ তো শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। কি খেলেন সেখানে?

নরেন। খাইনি। দোরগোড়া পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে এলুম, ঢুকতে ইচ্ছেই হ'লো না।

বিজয়া। কেন?

নরেন। কি জানি কেন! মনে হলো কোথাও কারো কাছে আর যাব না,—এদিকেই আর আসব না।

বিজয়া। আমি মন্দ লোক, মিছামিছি রাগ করি, আর আপনি ভয়ানক ভালো লোক—না?

নরেন। কে বলেছে আপনাকে মন্দ লোক?

বিজয়া। আপনি বলেছেন। আমাকেই অপমান করলেন, আর আমাকেই শাস্তি দিতে না খেয়ে কলকাতা চলে যাচ্ছেন—কি করেছি আপনার আমি?

[বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাহাই গোপন করিতে সে জানালার বাহিরে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।]

নরেন। কি আশ্চর্য্য! বাসায় ফিরে যাচ্ছি তাতেও আমার দোষ!

[কালীপদ প্রবেশ করিল]

কালীপদ। মা, আপনার শোবার ঘরে খাবার দেওয়া হয়েছে।

বিজয়া। (নরেনের প্রতি) চলুন আপনার খাবার দিয়েছে।

নরেন। আমার কি রকম? আমি যে আসব নিজেই তো জানতুম না।

বিজয়া। আমি জানতুম, চলুন।

নরেন। আমার খাবার ব্যবস্থা আপনার শোবার ঘরে? এ কখনো হয়? হাঁ কালীপদ, কার খাবার দেওয়া হয়েছে সত্যি করে বল তো?

কালীপদ। আজ্ঞে মা'র। আজ সারাদিন উনি প্রায় কিছুই খাননি।

নরেন। তাই সেগুলো এখন আমাকে গিলতে হবে? দেখুন, অন্যায় হচ্ছে—এতটা জুলুম আমার 'পরে চালাবেন না।

বিজয়া। কালীপদ, তুই নিজের কাজে যা। যা জানিস্‌নে তাতে কেন কথা বলিস্ বল্ তো? (নরেনের প্রতি) চলুন, ওপরের ঘরে।

নরেন। চলুন, কিন্তু ভারী অন্যায় আপনার।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিজয়ার শয়ন-কক্ষ

[বিজয়া ও নরেন প্রবেশ করিল। একটা টেবিলের উপর বহুবিধ
ভোজ্যবস্তু বিজয়া হাত দিয়া দেখাইয়া—]

বিজয়া। খেতে বসুন।

নরেন। (বসিতে বসিতে) এইখানে আপনারও কেন খাবার এনে দিক না। সারাদিন তো খাননি?

বিজয়া। খাইনি বলে এইখানে এনে দেবে? আপনি কে যে আপনার সুমুখে এই টেবিলে বসে আমি খাব! বেশ প্রস্তাব!

নরেন। আমার সব কথাতেই দোষ ধরা আপনার স্বভাব। তা ছাড়া এমনি রূঢ়ভাষী যে আপনার কথাগুলো গায়ে ফোটে। এত শক্ত কথা বলেন কেন?

বিজয়া। শক্ত কথা বুঝি আর কেউ আপনাকে বলে না?

নরেন। না, কেউ না। শুধু আপনি। ভেবে পাইনে কেন এত রাগ?

বিজয়া। সেই ভাঙা মাইক্রস্‌কোপটা আমাকে ঠকিয়ে বিক্রী করা পর্য্যন্ত আমার রাগ আর যায় না—আপনাকে দেখলেই মনে পড়ে।

নরেন। মিছে কথা, সম্পূর্ণ মিছে কথা। বেশ জানেন আপনি জিতেছেন।

বিজয়া। বেশ জানি জিতিনি, সম্পূর্ণ ঠকেছি। সে হোক গে—কিন্তু আপনি খেতে বসুন তো। সাতটার ট্রেন তো গেলই, ন'টার গাড়িটাও কি ফেল করবেন?

নরেন। না না, ফেল করব না, ঠিক ধরব।

[নরেন আহারে মন দিল। কালীপদ উঁকি মারিল—]

কালীপদ। মা, আপনার খাবার যায়গা কি—

বিজয়া। না, এখন না।

[কালীপদ সরিয়া গেল।]

নরেন। আপনার বাড়িতে চাকরদের মুখের এই 'মা' সম্বোধনটি আমার ভারী ভালো লাগে।

বিজয়া। তাদের মুখের আর কোন সম্বোধন আছে নাকি?

নরেন। আছে বইকি। মেমসাহেব বলা—

বিজয়া। আপনি ভারী নিন্দুক। কেবল পরচর্চ্চা।

নরেন। যা দেখতে পাই তা বলব না?

বিজয়া। না। আপনার কাজ শুধু মুখ বুজে খাওয়া। কিচ্ছুটি যেন পড়ে থাকতে না পায়।

নরেন। তা হলে মারা যাব। এর মধ্যেই আমার পেট ভরে এসেছে।

বিজয়া। না আসেনি। বরঞ্চ এক কাজ করুন, পরের নিন্দে করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে খান। সমস্ত না খেলে কোনমতে ছুটি পাবেন না।

নরেন। আপনি এতেই বলছেন খাওয়া হ'লো না,—কিন্তু কলকাতায় আমার রোজকার খাওয়া যদি দেখেন তো অবাক হয়ে যাবেন। দেখছেন না এই ক'মাসের মধ্যেই কি রকম রোগা হয়ে গেছি। আমার বাসায় বামুন-ব্যাটা হয়েছে যেমন পাজি, তেমনি বদমাইস জুটেছে চাকরটা। সাত-সকালে রেঁধে কোথায় যায় তার ঠিকানা নেই। আমার কোনদিন ফিরতে হয় দুটো, কোনদিন বা চারটে বেজে যায়। সেই ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত— দুধ কোনদিন বা বেড়ালে খেয়ে যায়, কোনদিন বা জানালা দিয়ে কাক ঢুকে সমস্ত ছড়াছড়ি করে রাখে,—সে দেখলেই ঘৃণা হয়। অর্দ্ধেক দিন তো একেবারেই খাওয়া হয় না।

বিজয়া। এমন সব চাকর-বাকরদের দূর করে দিতে পারেন না? নিজের বাসায় এত টাকা খরচ করেও যদি এত কষ্ট, তবে চাকরি করাই বা কেন?

নরেন। একটা হিসাবে আপনার কথা সত্যি। একদিন বাক্স থেকে কে দুশো টাকা চুরি করে নিলে, একদিন নিজেই কোথায় একশো টাকা হারিয়ে ফেললুম, অন্যমনস্ক লোকের পদে-পদেই বিপদ কিনা। (একটু থামিয়া) তবে নাকি দুঃখকষ্ট আমার অনেকদিন থেকেই সয়ে গেছে, তাই তেমন গায়ে লাগে না। শুধু অত্যন্ত ক্ষিদের ওপর খাওয়ার কষ্টটা এক একদিন অসহ্য বোধ হয়।

[বিজয়া আনতমুখে নীরবে শুনিতেছিল]

নরেন। বাস্তবিক, চাকরি আমার ভালো লাগে না, পারিওনে। অভাব আমার খুবই সামান্য—আপনার মত কোনো বড়লোক দু'বেলা দুটি খেতে দিত, আর নিজের কাজ নিয়ে থাকতে পারতুম তো আর আমি কিছুই চাইতুম না।

কিন্তু সেরকম বড়লোক কি আর আছে! (হঠাৎ হাসিয়া) তারা ভারী সেয়ানা, এক পয়সা বাজে খরচ করতে চায় না।

[এই বলিয়া পুনরায় সে হাসিয়া উঠিল। বিজয়া তেমনি নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।]

নরেন। কিন্তু আপনার বাবা বেঁচে থাকলে হয়ত এ-সময়ে আমার অনেক উপকার হতে পারত—তিনি নিশ্চয় এই উঞ্ছবৃত্তি থেকে আমাকে রক্ষা করতেন।

বিজয়া। কি করে জানলেন? তাঁকে তো আপনি চিনতেন না।

নরেন। না, আমিও তাঁকে কখনো দেখিনি, তিনিও বোধ হয় কখনো দেখেননি। কিন্তু তবুও আমাকে খুব ভালবাসতেন। কে আমাকে টাকা দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিলেন জানেন? তিনিই। আচ্ছা আমাদের ঋণের সম্বন্ধে আপনাকে কি কখনো কিছু তিনি বলে যাননি?

বিজয়া। বলাই তো সম্ভব, কিন্তু আপনি কি ইঙ্গিত করছেন তা না বুঝলে তো জবাব দিতে পারিনে।

নরেন। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) থাক গে। এখন এ আলোচনা একেবারে নিষ্প্রয়োজন।

বিজয়া। (ব্যাগ্র হইয়া) না, বলুন—বলতেই হবে।—আমি শুনবোই।

নরেন। কিন্তু যা চুকেবুকে শেষ হয়ে গেছে তা আর শুনে কি হবে বলুন?

বিজয়া। না সে হবে না, আপনাকে বলতেই হবে।

নরেন। (হাসিয়া) বলা যে শুধু নিরর্থক তাই নয়—বলতে আমার নিজেরও লজ্জা করে। হয়ত আপনার মনে হবে আমি কৌশলে আপনার সেন্টিমেণ্টে ঘা দিয়ে—

বিজয়া। (অধীরভাবে) আমি আর খোশামোদ করতে পারিনে আপনাকে—আপনার পায়ে পড়ি বলুন।

নরেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে।

বিজয়া। না এখুনি।

নরেন। আচ্ছা, বলছি বলছি। কিন্তু তার পূর্বে একটা কথা জিজ্ঞেসা করি, আমার বাড়িটার ব্যাপারে সত্যিই কি তিনি কোনদিন কোন কথা আপনাকে বলেননি? (বিজয়া অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।) আচ্ছা, রাগ করে কাজ নেই, আমি বলছি। যখন বিলেত যাই তখন বাবার মুখে শুনেছিলাম আপনার বাবাই আমাকে পাঠাচ্ছেন। আজ দিনচারেক আগে দয়ালবাবু আমাকে একতাড়া চিঠি দেন। নীচের যে-ঘরটায় ভাঙাচোরা কতকগুলো আসবাব পড়ে আছে তারই একটা ভাঙা দেরাজের মধ্যে চিঠিগুলো ছিল—বাবার জিনিস বলে দয়ালবাবু আমার হাতেই দেন। পড়ে দেখলুম খানদুই চিঠি আপনার বাবার লেখা। শুনেছেন বোধ

হয় শেষ বয়সে বাবা দেনার জ্বালায় জুয়া খেলতে শুরু করেন। বোধ করি সেই ইঙ্গিত একটা চিঠির গোড়ায় ছিল। তারপরে নীচের দিকে এক জায়গায় তিনি উপদেশের ছলে সান্ত্বনা দিয়ে বাবাকে লিখেছেন, বাড়িটার জন্যে ভাবনা নেই—নরেন আমারও তো ছেলে, বাড়িটা তাকেই যৌতুক দিলুম।

বিজয়া। (মুখ তুলিয়া) তারপরে ?

নরেন। তারপরে সব অন্যান্য কথা। তবে, এ পত্র বহুদিন পূর্ব্বের লেখা। খুব সম্ভব, তাঁর এ অভিপ্রায় পরে বদলে গিয়েছিল বলেই কোন কথা আপনাকে বলে যাওয়া আবশ্যক মনে করেননি।

বিজয়া। (কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া) তাহলে বাড়িটা দাবী করবেন বলুন ? (হাসিল)

নরেন। (হাসিয়া) করলে আপনাকেই সাক্ষী মানব। আশা করি সত্য কথাই বলবেন।

বিজয়া। (ঘাড় নাড়িয়া) নিশ্চয়। কিন্তু সাক্ষী মানবেন কেন ?

নরেন। নইলে প্রমাণ হবে কিসে ? বাড়িটা যে সত্যই আমার সে-কথা তো আদালতে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।

বিজয়া। অন্য আদালতের দরকার নেই,—বাবার আদেশ আমার আদালত। ও-বাড়ি আপনাকে আমি ফিরিয়ে দেব।

নরেন। (পরিহাসের ভঙ্গিতে) চিঠিটা চোখে না দেখেই বোধ হয় ফিরিয়ে দেবেন ?

বিজয়া। না, চিঠি আমি দেখতে চাই। কিন্তু এই এ-কথাই যদি থাকে—বাবার হুকুম আমি কোনমতেই অমান্য করব না।

নরেন। তাঁর অভিপ্রায় যে শেষ পর্য্যন্ত এই ছিল তারই বা প্রমাণ কোথায় ?

বিজয়া। ছিল না তারও তো প্রমাণ চাই।

নরেন। কিন্তু আমি যদি না নিই ? দাবী না করি ?

বিজয়া। সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে আপনার পিসীর ছেলেরা আছেন। আমার বিশ্বাস অনুরোধ করলে তারা দাবী করতে অসম্মত হবেন না।

নরেন। (সহাস্যে) তাঁদের ওপর এ বিশ্বাস আমার আছে। এমন কি হলফ নিয়ে বলতেও রাজী আছি। (বিজয়া এ হাসিতে যোগ দিল না। চুপ করিয়া রহিল।) অর্থাৎ আমি নিই না নিই, আপনি দেবেনই।

বিজয়া। অর্থাৎ, বাবার দান করা জিনিস আমি আত্মসাৎ করব না এই আমার পণ।

নরেন। (শান্তস্বরে) ও-বাড়ি যখন সৎকাজে দান করেছেন তখন আমি না

নিলেও আপনার আত্মসাৎ করায় অধর্ম্ম হবে না। তা ছাড়া ফিরিয়ে নিয়ে কি করব বলুন? আপনার জন কেউ নেই যে তারা বাস করবে। বাইরে কোথাও-না-কোথাও কাজ না করলে আমার চলবে না, তার চেয়ে যে ব্যবস্থা হয়েছে সেই তো সবচেয়ে ভালো। আরও এক কথা এই যে, বিলাসবাবুকে কিছুতেই রাজী করাতে পারবেন না।

বিজয়া। নিজের জিনিসে অপরকে রাজী করানোর চেষ্টা করার মত অপর্য্যাপ্ত সময় আমার নেই। কিন্তু আপনি তো আর এক কাজ করতে পারেন। বাড়ি যখন আপনার দরকার নেই, তখন তার উচিত মূল্য আমার কাছে নিন। তা হলে চাকরিও করতে হবে না, এবং নিজের কাজও স্বচ্ছন্দে করতে পারবেন। আপনি সম্মত হোন নরেনবাবু।

[এই মিনতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর নরেনকে মুগ্ধ করিল।]

নরেন। আপনার কথা শুনলে রাজী হতেই ইচ্ছে করে, কিন্তু সে হয় না। কি জানি কেন আমার বহুবার মনে হয়েছে, বাবার ঋণের দায়ে বাড়িটা নিয়ে মনের মধ্যে আপনি সুখী হতে পারেননি, তাই কোন একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করে ফিরিয়ে দিতে চান। এ দয়া আমি চিরদিন মনে রাখব, কিন্তু যা আমার প্রাপ্য নয় গরীব বলেই তা ভিক্ষের মত নেব কি করে?

বিজয়া। এ-কথায় আমি কষ্ট পাই জানেন?

নরেন। মানুষের কথায় মানুষে কষ্ট পায় এ কি কখনো হতে পারে? কেউ বিশ্বাস করবে?

বিজয়া। দেখুন, আপনি খোঁচা দেবার চেষ্টা করবেন না। আপনি কষ্ট পান এমনধারা কথা আমি কোনদিন বলিনি।

নরেন। কিন্তু এই যে বলছিলেন ঠকিয়ে মাইক্রস্কোপ বেচে গেছি! অতি শ্রুতিমধুর বাক্য না?

বিজয়া। (হাসিয়া) কিন্তু সেটা যে সত্যি।

নরেন। হাঁ, সত্যি বইকি!

বিজয়া। আপনি গরীব হ'ন, বড়লোক হ'ন, আমার কি? আমি কেবল বাবার আদেশ পালন করবার জন্যই বাড়িটা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছি।

নরেন। এর মধ্যেও একটু মিথ্যে রয়ে গেল—তা থাক। খুব বড় বড় পণ তো করলেন, কিন্তু বাবার হুকুম মত দিতে হলে কত জিনিস দিতে হয় তা জানেন? শুধু ওই বাড়িটাই নয়।

বিজয়া। বেশ, নিন আপনার সম্পত্তি ফিরে।

নরেন। (হাসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে) খুব বড় গলায় দাবী করতে

আমাকে বলছেন, আমি না করলে আমার পিসীমার ছেলেদের দাবী করতে বলবেন ভয় দেখাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর আদেশমত দাবী আমার কোথায় পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে জানেন? শুধু কেবল ওই বাড়িটা আর কয়েক বিঘে জমি নয়—তার ঢের ঢের বেশী।

বিজয়া। বাবা আর কি আপনাকে দিয়েছেন?

নরেন। তাঁর সে চিঠিও আমার কাছে আছে। তাতে যৌতুক শুধু ঐটুকু দিয়েই আমাকে তিনি বিদায় করেননি। যেখানে যা-কিছু দেখছেন সমস্তই তার মধ্যে। আমি দাবী শুধু ওই বাড়িটা করতে পারি তাই নয়। এ বাড়ি, এই ঘর, ওই সমস্ত টেবিল-চেয়ার-আয়না-দেয়ালগিরি, খাট, পালঙ্ক, বাড়ির দাসদাসী-আমলা-কর্ম্মচারী, মায় তাদের মনিবটিকে পর্য্যন্ত দাবী করতে পারি তা জানেন কি? বাবার হুকুম, বাবার হুকুম,—দেবেন এইসব? (বিজয়া পাথরের মূর্ত্তির মত নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।) কেমন, দিতে পারবেন বলে মনে হয়? বরঞ্চ একবার না হয় বিলাস-বাবুর সঙ্গে নিরিবিলি পরামর্শ করবেন! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—(বিজয়া মুখ তুলিতেই তাহার পাংশু মুখের প্রতি চাহিয়া নরেনের বিকট হাস্য থামিল।) (সভয়ে) আপনি পাগল হলেন নাকি? আমি কি সত্যই এইসব দাবী করতে যাচ্ছি, না, করলেই পাব? বরঞ্চ, আমাকেই তো ধরে নিয়ে পাগলা-গারদে পুরে দেবে।

বিজয়া। (গম্ভীরমুখে) কই, দেখি বাবার চিঠি?

নরেন। কি হবে দেখে?

বিজয়া। না দিন, আমি দেখব।

নরেন। চিঠির তাড়াটা সেদিন থেকে এই কোটের পকেটেই রয়ে গেছে। এই নিন। আত্মসাৎ করবেন না যেন। পড়ে ফেরত দেবেন।

[পকেট হইতে এক বাণ্ডিল চিঠি সে বিজয়ার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। বিজয়া দ্রুতহস্তে বাঁধন খুলিয়া একটার পর একটা উল্টাইতে উল্টাইতে দু'খানা চিঠি বাছিয়া লইল—]

বিজয়া। এই তো বাবার হাতের লেখা। বাবা! বাবা!

[চিঠি দুটা সে মাথায় রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। নরেন অন্য চিঠিগুলি তুলিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।]

তৃতীয় দৃশ্য

বিজয়ার অট্টালিকা-সংলগ্ন উদ্যানের একাংশ

[গৃহের কিছু-কিছু গাছের ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যায়। পরেশ কোঁচড়ে মুড়ি-মুড়কি লইয়া আপন মনে চিবাইতে চিবাইতে চলিয়াছিল, পিছনে দ্রুতবেগে রাসবিহারী প্রবেশ করিলেন।]

রাস। এই হারামজাদা ব্যাটা! দাঁড়া,— দাঁড়া বলছি।

পরেশ। (থমকিয়া দাঁড়াইয়া চাহিল) এজ্ঞে ?

রাস। এজ্ঞে! হারামজাদা শূয়ার! কেন এই নরেনটাকে তুই বাড়িতে ডেকে এনেছিলি ?

পরেশ। মা-ঠাকরুণ বললে যে।

রাস। মা-ঠাকরুণ বললে যে! কত রাত্তিরে সে ব্যাটা বাড়ি থেকে গেল বল্।

পরেশ। আমি ত জানিনে বড়বাবু।

রাস। জানিসনে হারামজাদা! বল তোর মা-ঠাকরুণ নরেনকে কি কি কথা বললে ?

পরেশ। আমি ছিনু না বড়বাবু! মা-ঠান বললে, এই নে পরেশ একটা টাকা, ভাল দেখে ঘুড়ি-নাটাই কিন্ গে। আমি ছুটে চলে গেনু।

রাস। এখনো সত্যি কথা বল্, নইলে পেয়াদা দিয়ে চাবকে তোর পিঠের চামড়া তুলে দেব।

পরেশ। (কাঁদ কাঁদ হইয়া) সত্যি বলছি জানিনে বড়বাবু। নতুন দরোয়ান তোমাকে মিছে কথা বলেছে! তুমি বরঞ্চ আমার মাকে জিজ্ঞেসা করো গে।

রাস্। তোর মা ? সে বেটী যত নষ্টের গোড়া। তোকেও দূর করব, তাকেও দূর করব, পেয়াদা দিয়ে গলায় ধাক্কা দিতে দিতে। আর ঐ বেটা কালীপদ, তাকেও তাড়িয়ে তবে আমার কাজ।

পরেশ। আমি কিছু জানিনে বড়বাবু।

রাস। খবরদার। এসব কথা কাউকে বলবিনে। যদি শুনি তোর মা-ঠাকরুণকে একটা কথা বলেছিস তো পিছমোড়া করে বেঁধে দরোয়ানকে দিয়ে জলবিছুটি লাগাব। খবরদার বলছি একটা কথা কাউকে বলবিনে। যা—

[রাসবিহারী ও দরোয়ান প্রস্থান করিল। আর একদিকে বিজয়া প্রবেশ করিয়া পরেশকে ইঙ্গিতে কাছে আহ্বান করিল।]

বিজয়া। হাঁ রে পরেশ, বড়বাবু তোরে লাঠি দেখাচ্ছিল কেন রে? কি করেছিস তুই?

পরেশ। বলতে মানা করে দেছে যে। বলে, খবরদার বলছি হারামজাদা শূয়ার, একটা কথা তোর মা-ঠানকে বলবি তো তোরে সেপাই দিয়ে বেঁধে জলবিছুটি লাগাব।

[বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিজয়া সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল—]

বিজয়া। তোর কিছু ভয় নেই পরেশ, তুই আমার কাছে কাছে থাকবি। কার সাধ্যি তোকে মারে।

পরেশ। (চোখ মুছিয়া) বড়বাবু বলে হারামজাদা শূয়ার, নরেনকে কেন ডেকে এনেছিলি বল্‌। সে ব্যাটা কত রাত্তিরে বাড়ি থেকে গেল বল্‌। তোর মা-ঠাকরুণ তাকে কি-কি কথা বললে বল্‌। তুমি ডাক্তারবাবুকে কি-কি বললে আমি কি জানি মা-ঠান? তুমি টাকা দিলে আমি ছুটে ঘুড়ি-নাটাই কিনতে গেনু না।

বিজয়া। তাই তো গেলি।

পরেশ। তবে? নতুন দরোয়ানজী কেন বলে আমি সব জানি। বড়বাবু বলে, তোকে আর তোর মাকে গলাধাক্কা দিয়ে দূর করে দেব। আর ঐ কালীপদটাকে, —তাকেও তাড়াব।

বিজয়া। তুই যা পরেশ তোর ভয় নেই। বড়বাবু ডেকে পাঠালে তুই যাস্‌নে।

পরেশ। আচ্ছা মা-ঠান, আমি কখ্‌খনো যাব না। দরোয়ান ডাকতে এলে ছুটে পালাবো—না?

বিজয়া। হাঁ, তুই ছুটে আমার কাছে পালিয়ে আসিস্‌।

[পরেশ প্রস্থান করিল।]

[রাসবিহারীর প্রবেশ]

রাস। তুমি মা এখানে। সকালেই বেরিয়েছ? আমি বাড়িতে ঘরে-ঘরে খুঁজে দেখি কোথাও বিজয়া নেই।

বিজয়া। আপনি আজ এত সকালেই যে?

রাস। মাথার উপরে যে নানা ভার মা। একটা দুশ্চিন্তায় কাল ভালো করে ঘুমুতে পারিনি। কিন্তু তোমারও চোখ দুটি যে রাঙা দেখাচ্ছে। ভাল ঘুম হয়নি বুঝি?

বিজয়া। ঘুম ভালোই হয়েছে।

রাস। তবে? তবে ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়?

বিজয়া। না, ভালোই আছি।

রাস। সে বললে শুনব কেন মা? একটা কিছু নিশ্চয় হয়েছে। সাবধান হওয়া ভালো, আজ আর স্নান ক'রো না যেন। একবার উপরে যেতে হবে যে। তোমার শোবার ঘরের লোহার সিন্দুকে যে দলিলগুলো আছে একবার ভালো করে পড়ে দেখতে হবে। শুনছি নাকি চৌধুরীরা ঘোষপাড়ার সীমানা নিয়ে একটা মামলা রুজু করবে।

বিজয়া। তাঁরা মামলা করবেন কে বললে?

রাস। (অল্প হাস্য করিয়া) কেউ বলেনি মা, আমি বাতাসে খবর পাই। তা না হলে কি এত বড় জমিদারীটা এতদিন চালাতে পারতাম।

বিজয়া। তাঁরা কতটা জমি দাবী করেছেন?

রাস। তা, হবে বইকি—খুব কম হলেও সেটা বিঘে-দুই হবে।

বিজয়া। এই? তা হলে তাঁরাই নিন। এ নিয়ে মামলা-মকদ্দমার দরকার নেই।

রাস। (ক্ষোভের সহিত) এরকম কথা তোমার মত মেয়ের মুখে আমি আশা করিনি মা। আজ বিনা বাধায় যদি দু-বিঘে ছেড়ে দিই, কাল যে আবার দুশো বিঘে ছেড়ে দিতে হবে না তাই বা কে বললে!

বিজয়া। সত্যিই তো তা আর হচ্ছে না; আমি বলি সামান্য কারণে মামলা-মকদ্দমার দরকার নেই।

রাস। (বারংবার মাথা নাড়িয়া) না না, কিছুতেই সে হতে পারে না। তোমার বাবা যখন আমার উপর সমস্ত নির্ভর করে গেছেন এবং যতক্ষণ বেঁচে আছি বিনা আপত্তিতে দু-বিঘে কেন দু-আঙুল জায়গা ছেড়ে দিলেও ঘোর অধর্ম্ম হবে। তা ছাড়া আরও অনেক কারণ আছে, সেজন্য পুরনো দলিলগুলো ভাল করে একবার দেখা দরকার। একটু কষ্ট করে ওপরে চল মা,—দেরি হলে ক্ষতি হবে।

বিজয়া। কি ক্ষতি হবে?

রাস। সে অনেক। মুখে-মুখে তার কি কৈফিয়ত দেবো বলো তো।

[সরকার মহাশয়ের প্রবেশ]

সরকার। বাইরের ঘর থেকে খাতাগুলো কি নিয়ে যাব মা?

বিজয়া। (লজ্জিত হইয়া) একটুও দেখতে পারিনি সরকারমশাই। আজকের দিনটা থাক, কাল সকালেই আমি নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব।

সরকার। যে আজ্ঞে।

[সরকার চলিয়া যাইতেছিল, বিজয়া ফিরিয়া ডাকিল]

বিজয়া। শুনুন সরকারমশাই! কাছারির ঐ নতুন দরোয়ান কতদিন বহাল হয়েছে?

সরকার। মাস তিনেক হবে বোধ হয়।

বিজয়া। ওকে আর দরকার নেই। এক মাসের মাইনে বেশী দিয়ে আজই ওকে জবাব দেবেন। (একটু থামিয়া) না না, দোষের জন্যে নয়, লোকটাকে আমার ভালো লাগে না—তাই।

রাস। বিনাদোষে কারো অন্ন মারাটা কি ভালো মা?

সরকার। তা হলে তাকে কি—

বিজয়া। আমার আদেশ তো শুনলেন সরকারমশাই। আজই বিদায় দেবেন।

রাস। (নিজেকে সামলাইয়া লইয়া) এবার কষ্ট করে একটু চল। পুরনো দলিলগুলো বেশ করে একবার পড়া চাই ই।

বিজয়া। কেন?

রাস। বললাম কারণ আছে। তবুও বার বার এক কথা বলবার তো আমার সময় নেই বিজয়া!

বিজয়া। কারণ আছে বলছেন, কিন্তু কারণ তো একটাও দেখাননি!

রাস। না দেখালে তুমি যাবে না? (একটু থামিয়া) তার মানে আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না!

[বিজয়া নিরুত্তর]

রাস। (লাঠিটা মাটিতে ঠুকিয়া) কিসের জন্যে আমাকে তুমি এত বড় অপমান করতে সাহস করো? কিসের জন্যে আমাকে তুমি অবিশ্বাস করো শুনি?

বিজয়া। (শান্তস্বরে) আমাকেও তো আপনি বিশ্বাস করেন না। আমারি টাকায় আমারি উপর গোয়েন্দা নিযুক্ত করলে মনের ভাব কি হয় আপনি বুঝতে পারেন না? এবং তারপরে আমার সম্পত্তির মূল দলিলপত্র হস্তগত করার তাৎপর্য্য যদি আমি আর কিছু বলে সন্দেহ করি সে কি অস্বাভাবিক? না, সে আপনাকে অপমান করা?

[রাসবিহারী নির্ব্বাক্ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার এত বড় পাকা চাল একটা বালিকার কাছে ধরা পড়িবে এ সংশয় তাঁহার পাকা মাথায় স্থান পায় নাই। এবং ইহাই সে অসঙ্কোচে মুখের উপর নালিশ করিবে সে তো স্বপ্নের অগোচর। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত স্তব্ধ থাকিয়া এই প্রকৃতির লোকের যাহা চরম অস্ত্র তাহাই তূণীর হইতে বাহির করিয়া প্রয়োগ করিলেন।]

রাস। বনমালীর মুখ রাখবার জন্যেই এ কাজ করতে হয়েছে। বন্ধুর কর্ত্তব্য বলেই করতে হয়েছে। একটা অজানা-অচেনা হতভাগাকে পথ থেকে শোবার ঘরে ডেকে এনে রাত-দুপুর পর্য্যন্ত হাসি-তামাসায় কাটালে এর অর্থ কি বুঝতে পারিনে? এতে তোমার লজ্জা হয় না বটে, কিন্তু আমাদের যে ঘরে-বাইরে মুখ পুড়ে গেল।

সমাজে কারো সামনে মাথা তোলবার জো রইল না! (রাসবিহারী আড়চোখে চাহিয়া তাঁহার মহামন্ত্রের মহিমা নিরীক্ষণ করিলেন।) বলি এগুলো ভালো, না, নিবারণ করার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়? (বিজয়া নিরুত্তর) (লাঠি ঠুকিয়া) না, চুপ করে থাকলে চলবে না, এসব গুরুতর ব্যাপার। তোমাকে জবাব দিতে হবে।

বিজয়া। ব্যাপার যত গুরুতর হোক, মিথ্যে কথার আমি কি উত্তর দিতে পারি!

রাস। মিথ্যে কথা বলে একে উড়োতে চাও নাকি?

বিজয়া। আমি উড়োতে কিছু চাইনে কাকাবাবু। শুধু এ যে মিথ্যে তাই আপনাকে বলতে চাই। এবং মিথ্যে বলে একে আপনি নিজেই সকলের চেয়ে বেশী জানেন তাও আপনাকে জানাতে চাই।

রাস। মিথ্যে বলে আমি নিজেই জানি?

বিজয়া। হাঁ জানেন। কিন্তু আপনি গুরুজন,—এ নিয়ে তর্কবিতর্ক করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। দলিলপত্র দেখা এখন থাক, মামলা-মকদ্দমার আবশ্যক বুঝলে আপনাকে ডেকে পাঠাব।

[বিজয়া চলিয়া গেল। রাসবিহারী অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিজয়ার বাটী-সংলগ্ন উদ্যানের অপর প্রান্ত

[অদূরে সরস্বতী নদীর কিছু কিছু দেখা যাইতেছে, বিজয়া ও কানাই সিং।
দয়াল প্রবেশ করিলেন]

দয়াল। তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি মা। শুনলাম এইদিকেই এসেছো, ভাবলাম বাড়ি যাবার আগে এদিকটা দেখে যাই যদি দেখা মেলে।

বিজয়া। কেন দয়ালবাবু।

দয়াল। আজ তৃতীয়া, পূর্ণিমা হ'লো সতেরোই। আর ক'টা দিন বাকী বলো তো মা? বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন এই ক'দিনেই সম্পূর্ণ করে নিতে হবে। অথচ রাসবিহারীবাবু সমস্ত দায়িত্ব আমার উপর ফেলে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

বিজয়া। দায়িত্ব নিলেন কেন?

দয়াল। এ যে আনন্দের দায়িত্ব মা,—নেবো না?

বিজয়া। তবে অভিযোগ করছেন কেন?

দয়াল। অভিযোগ করিনি বিজয়া; কিন্তু মুখে বলছি বটে আনন্দের দায়িত্ব, তবু কেন জানিনে, কাজে উৎসাহ পাইনে, মন কেবল এর থেকে দূরে সরে থাকতে চায়।

বিজয়া। কেন দয়ালবাবু?

দয়াল। তাও ঠিক বুঝিনে। জানি এ বিবাহে তুমি সম্মতি দিয়েছ, নিজের হাতে নামসই করেছ,—আগামী পূর্ণিমায় বিবাহও হবে, তবু এর মধ্যে যেন রস পাইনে মা। সেদিন আমার অসম্মানে বিরক্ত হয়ে তুমি বিলাসবাবুকে যে তিরস্কার করলে সে সত্যিই কঠোর; তবু, কেন জানিনে মনে হয় এর মধ্যে কেবল আমার অপমানই নেই, আরও কিছু গোপন আছে যা তোমাকে অহরহ বিঁধছে। (কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া) তোমার কাছে সর্ব্বদা আসিনে বটে, কিন্তু চোখ আছে মা। তোমার মুখে আসন্ন-মিলনের স্বর্গীয় দীপ্তি কই,—কই সে সূর্য্যোদয়ের অরুণ আভা? তুমি জানো না মা, কতদিন নিরালায় তোমার ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখখানি আমার চোখে পড়েছে। বুকের ভেতর কান্নার ঢেউ উথলে উঠেছে—

বিজয়া। না দয়ালবাবু, ওসব কিছুই নয়।

দয়াল। আমার মনের ভুল, না মা?

বিজয়া। (ম্লান হাসিয়া) ভুল আছে বইকি।

দয়াল। তাই হোক মা, আমার ভুলই যেন হয়। এ-সময়ে বাবার জন্যে বোধ করি মন কেমন করে—না বিজয়া? (বিজয়া নীরবে মাথা নাড়িয়া সায় দিল।) (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) এমন দিনে তিনি যদি বেঁচে থাকতেন!

বিজয়া। আমাকে কি জন্যে খুঁজছিলেন বললেন না তো দয়ালবাবু?

দয়াল। ওঃ—একেবারেই ভুলেছি। বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র ছাপাতে হবে, তোমার বন্ধুদের সমাদরে আহ্বান করতে হবে, তাঁদের আনবার ব্যবস্থা করতে হবে—তাই তাঁদের সকলের নামধাম জানতে পারলে—

বিজয়া। নিমন্ত্রণপত্র বোধকরি আমার নামেই ছাপানো হবে?

দয়াল। না মা, তোমার নামে হবে কেন? রাসবিহারীবাবু বর-কন্যা উভয়েরই যখন অভিভাবক তখন তাঁর নামেই নিমন্ত্রণ করা হবে স্থির হয়েছে।

বিজয়া। স্থির কি তিনি করেছেন?

দয়াল। হাঁ, তিনিই বইকি।

বিজয়া। এও তিনিই স্থির করুন। আমার বন্ধু কেউ নেই।

দয়াল। (সবিস্ময়ে) এ কেমন ধারা জবাব হলো মা! এ বললে আমরা কাজের জোর পাব কোথা থেকে?

বিজয়া। হাঁ দয়ালবাবু, সেদিন নরেনবাবুকে কি আপনি এক তাড়া চিঠি দিয়েছিলেন?

দয়াল। দিয়েছি মা। সেদিন হঠাৎ দেখি একটা ভাঙা দেরাজের মধ্যে এক বাণ্ডিল পুরনো চিঠি। তাঁর বাবার নাম দেখে তাঁর হাতেই দিলাম। কোন দোষ হয়েছে কি মা?

বিজয়া। না দয়ালবাবু, দোষ হবে কেন? তাঁর বাবার চিঠি তাঁকে দিয়েছেন এ তো ভালই করেছেন। চিঠিগুলো কি আপনি পড়েছেন!

দয়াল। (সবিস্ময়ে) আমি? না না, পরের চিঠি কি কখনো পড়তে পারি?

বিজয়া। চিঠির সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলেননি?

দয়াল। একটি কথাও না। কিন্তু কিছু জানবার থাকলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে আমি কালই তোমাকে বলতে পারি।

বিজয়া। কালই বলবেন কি করে? তিনি তো আর এদিকে আসেন না।

দয়াল। আসেন বইকি। আমাদের বাড়িতে রোজ আসেন।

বিজয়া। রোজ? আপনার স্ত্রীর অসুখ কি আবার বাড়লো? কই সে-কথা তো আপনিও একদিন বলেননি?

দয়াল। (হাসিয়া) না মা, এখন তিনি বেশ ভালোই আছেন। তাই বলিনি। নরেনের চিকিৎসা এবং ভগবানের দয়া।

[হাতজোড় করিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিলেন।]

বিজয়া। ভালো আছেন, তবু কেন তাঁকে আসতে হয়?

দয়াল। আবশ্যক না থাকলেও জন্মভূমির মায়া কি সহজে কাটে? তা ছাড়া, আজকাল ওঁর কাজকর্ম নেই, সেখানে বন্ধুবান্ধব বিশেষ কেউ নেই—তাই সন্ধ্যেবেলাটা এখানে কাটিয়ে যান। আমার স্ত্রী তো তাঁকে ছেলের মত ভালবাসেন। ভালবাসার ছেলেও বটে। এমন নির্ম্মল, এমন স্বভাবতঃ ভদ্রমানুষ আমি কম দেখেছি মা। নলিনীর ইচ্ছে সে বি. এ. পাশ করে ডাক্তারি পড়ে। এ-বিষয়ে তাকে কত উৎসাহ কত সাহায্য করেন তার সীমা নেই। ওঁর সাহায্যে এরই মধ্যে নলিনী অনেকগুলি বই শেষ করেছে। লেখাপড়ায় দু'জনে বড় অনুরাগ।

বিজয়া। তা হোক, কিন্তু আপনি কি আর কিছু সন্দেহ করেন না?

দয়াল। কিসের সন্দেহ মা?

বিজয়া। আমার মনে হয় কি জানেন দয়ালবাবু?

দয়াল। কি মনে হয় মা!

বিজয়া। আমার মনে হয় নলিনী সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করে প্রকাশ করা উচিত।

দয়াল। ও—এই বলছ। সে আমারও মনে হয়েছে মা, কিন্তু তার তো এখনো

সময় যায়নি। বরঞ্চ দু'জনের পরিচয় আরো একটু ঘনিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত সহসা কিছু না বলাই উচিত।

বিজয়া। কিন্তু নলিনীর পক্ষে তো ক্ষতিকর হতে পারে। তাঁর মনস্থির করতে হয়ত সময় লাগবে, কিন্তু ইতিমধ্যে নলিনীর—

দয়াল। সত্যি কথা। কিন্তু আমার স্ত্রীর কাছে যতদূর শুনেছি তাতে,—না না, নরেনকে আমরা খুব বিশ্বাস করি। তাঁর দ্বারা যে কোন ক্ষতি হতে পারে, তিনি ভুলেও যে কারো প্রতি অন্যায় করতে পারেন এ আমি ভাবতেই পারিনে। কিন্তু একি, কথায় কথায় যে তুমি অনেক দূরে এগিয়ে এসেছ। এতখানি যদি এলে, চল না মা, তোমার এবাড়িটা একবার দেখে আসবে! নলিনীর -মামী কত যে খুশী হবে তার সীমা নেই।

বিজয়া। চলুন, কিন্তু ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে যে।

দয়াল। হ'লোই বা। আমি তার ব্যবস্থা করব। তা ছাড়া সঙ্গে কানাই সিং তো আছেই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

দয়ালবাবুর বাটীর নিচের বারান্দা

[নলিনী ও নরেন। টেবিলের দুইদিকে দুইজনে বসিয়া, সম্মুখে খোলা বই দোয়াত কলম ইত্যাদি রক্ষিত।]

নলিনী। সত্যই মিস্ রায়ের বিবাহে আপনি উপস্থিত থাকবেন না? এই ত মাত্র কটা দিন পরে, আর রাসবিহারীবাবু কি অনুরোধই না আপনাকে করেছেন।

নরেন। তিনি করেছেন বটে, কিন্তু যাঁর বিবাহ তিনি নিজে তো একটি মুখের কথাও বলেননি।

নলিনী। বললে থাকতেন?

নরেন। না। থাকবার জো নেই আমার। যত শীঘ্র সম্ভব নতুন চাকরিতে গিয়ে যোগ দিতে হবে।

নলিনী। কিন্তু আমার বেলায়? সেও থাকবেন না?

নরেন। থাকব। নিমন্ত্রণপত্র পাঠাবেন, যদি অসম্ভব না হয় আপনার বিবাহে আমি উপস্থিত হবোই।

নলিনী। কথা দিলেন?

নরেন। হঁ্যা, দিলুম কথা। হয়ত এমনি কথা বিজয়াকেও দিতুম যদি তিনি নিজে অনুরোধ করতেন। কাজের ক্ষতি হলেও।

নলিনী। দেখুন ডক্টর মুখার্জ্জি, এ বিবাহে বিজয়ার সুখ নেই, আনন্দ নেই, এই আমার ঘোরতর সন্দেহ। সেই জন্যেই আপনাকে অনুরোধ করেননি।

নরেন। কিন্তু তিনি নিজেই তো সম্মতি দিয়েছেন।

নলিনী। দিয়েছেন মুখের সম্মতি—হয়ত বাধ্য হয়ে। কিন্তু অন্তরের সম্মতি কখনো দেননি। আমার মামার মত নিরীহ সরল মানুষ, যিনি সামনে ছাড়া এতটুকু আশেপাশে দেখতে পান না, তাঁরও কেমন যেন সংশয় জেগেছে, বিজয়া যাকে চায় সে লোক ওই বিলাসবাবু নয়। কালই বলছিলেন আমাকে, বিবাহ আয়োজনের সব ভারটাই এসে পড়েছে আমার 'পরে, কিন্তু মনে উৎসাহ পাইনে মা, কেবল ভয় হতে থাকে যেন কি একটা গর্হিত কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি। যতই দেখি ওকে ততই মনে হয় দিন দিন শুকিয়ে যেন বিজয়া কালি হয়ে যাচ্ছে। কেনই বা এখানে এসেছিলুম, শেষ বয়সে যদি পাপ অর্জ্জন করেই যাই, মরণের পরে তাঁর কাছে গিয়ে কি জবাব দেব মা!

নরেন। দেখুন মিস্ দাস, ওসব কিছু না। বিজয়া সেই দিন অসুখ থেকে উঠলেন, এখনো সেরে উঠতে পারেননি।

নলিনী। তাই প্রতিদিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। ডক্টর মুখার্জ্জি, আমার মামা তবু সামনাসামনি দেখতে পান, কিন্তু আপনি তাও পান না। আপনি তাঁর চেয়েও অন্ধ। সেদিনের কথা মনে করে দেখুন, ভালোবাসলে কোন মেয়ে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধের কথা বিলাসবাবুকে কিছুতেই বলতে পারতেন না,—তা যত রাগই হোক।

নরেন। বড়-লোক টাকার অহঙ্কারে সব পারে মিস্ দাস। ওদের মুখে কিছু আটকায় না।

নলিনী। এ বলা আপনার ভারী অন্যায় ডক্টর মুখার্জ্জি। আপনার আগে আমি ওঁকে দেখেছি—আমর এক কলেজে পড়তুম। ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব কোন-দিন কেউ অনুভব করিনি। ওঁর কত দয়া, কত দান, কত পুণ্য অনুষ্ঠান—মনে নেই আপনার? অপরিচিত আপনি, তবু আপনার কথাতেই পূর্ণবাবুর বাড়ির পূজোর অনুমতি তখ্‌নি দিয়ে দিলেন। বিলাসবাবু, রাসবিহারীবাবু শত চেষ্টাতেও তা বন্ধ করতে পারলে না। ভদ্রতা, সহানুভূতি, ন্যায়-অন্যায়বোধ কতটা জাগ্রত থাকলে এরকম হতে পারে একবার ভেবে দেখুন দিকি। আমার মামা তো গরীব, কিন্তু কি শ্রদ্ধাই না তাঁকে করেন? এ কি ধনীর দর্পের প্রকাশ ডক্টর মুখার্জ্জি?

নরেন। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) সে সত্যি। কেউ অভুক্ত জানলে না খাইয়ে

কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না, যেমন করে হোক খাওয়াবেনই। আর সে কি যত্ন!

নলিনী। তবে? এসব কি আসে সম্পদের দম্ভ থেকে?

নরেন। আর কি অদ্ভুত অপরিসীম পিতৃভক্তি এই মেয়েটির। এই বাড়িটা নিয়ে পর্য্যন্ত তাঁর মনে শান্তি ছিল না, নিতে হয়েছিল কেবল বিলাসবাবুর জবরদস্তিতে—

নলিনী। এ-কথা আমরা সবই জানি ডক্টর মুখার্জ্জি।

নরেন। হ্যাঁ, অনেকেই জানে। সেদিন ওঁকে একটু বিপদগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যেই বনমালীবাবুর সেই চিঠির উল্লেখ করে বলেছিলুম, আমার বাবা যত ঋণই করে থাকুন আপনার বাবা কিন্তু এ-বাড়ী আমাকেই যৌতুক দিয়েছিলেন। তবু আপনি কেড়ে নিলেন। শুনে বিজয়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, বললেন, সত্যি হলে এ বাড়ি আপনাকে আমি ফিরিয়ে দেব। বললুম, সত্যি বটে, কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে আমি করব কি? পেটের দায়ে চাকরি করতে নিজে থাকব বাইরে,—বাড়ি হবে বন-জঙ্গল, শিয়াল-কুকুরের বাসা—তার চেয়ে যা হয়েছে সেই ভালো। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, না, সে হবে না,—নিতেই হবে আপনাকে। বাবার আদেশ আমি প্রাণ গেলেও উপেক্ষা করতে পারব না। অন্ততঃ বাড়ির ন্যায্য যা দাম—তাই নিন। বললুম, ভিক্ষে নিতে আমি পারব না। তিনি বললেন, তা হলে বিলিয়ে দেব আপনার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়দের। বাবা যা দিয়ে গেছেন আমি তা অপহরণ করব না—কোনমতেই না—এই আমার পণ। শুনে, দুষ্টবুদ্ধি মাথায় চেপে গেল, বললুম, ও পণ রাখতে গেলে কি কি দিতে হয় জানেন? শুধু ওই বাড়িটাই নয়, এই বাড়ি, এই জমিদারী, দাস-দাসী, আমলা-কর্ম্মচারী, খাট-পালঙ্ক-টেবিল-চেয়ার, মায় তাদের মনিবটিকে পর্য্যন্ত আমার হাতে তুলে দিতে হবে। দেবেন এইসব? পারবেন দিতে?

নলিনী। (সবিস্ময়ে) বনমালীবাবুর আছে নাকি এইসব চিঠি? কই আমাদের তো কাউকে বলেননি!

নরেন। (হাসিয়া) এ তামাসা বলব কাকে? আমি কি পাগল? কিন্তু চিঠির কথা বলেন তো সত্যিই আছে বনমালীবাবুর চিঠি। সত্যি আছে এইসব লেখা। (আঙুল দিয়া দেখাইয়া) ঐ ঘরটায় ছিল এক তাড়া চিঠি একটা ভাঙা দেরাজের মধ্যে—বাবার চিঠি বলে দয়ালবাবু দিলেন আমার হাতে, পড়ে দেখি তাতে এই মজার ব্যাপার। জানেন তো, আমার বাবার বনমালীবাবু ছিলেন অকৃত্রিম বন্ধু। লেখাপড়ার জন্য আমাকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন তিনিই।

নলিনী। তারপরে?

নরেন। বিজয়া বললেন, কই দেখি বাবার চিঠি। পকেটেই ছিল, ফেলে দিলুম সুমুখে। বাণ্ডিল খুলে ফেলে খুঁজতে লাগল বুভুক্ষু কাঙালের মত—হঠাৎ চেঁচিয়ে

উঠল—এই যে আমার বাবার হাতের লেখা। তারপর চিঠি দুটো নিজের মাথায় চেপে ধরে চক্ষের নিমেষে যেন পাথর হয়ে গেল।

নলিনী। তারপরে?

নরেন। মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়ে গেলুম। একেবারে নিঃশব্দ নিশ্চল! হঠাৎ দেখি চাপা কান্নায় তার বুকের পাঁজরগুলো ফুলে ফুলে উঠছে—আর বসে থাকতে সাহস হ'লো না, নিঃশব্দে বেরিয়ে এলুম।

নলিনী। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন? আর যাননি তাঁর কাছে।

নরেন। না, সেদিকেই না।

নলিনী। তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করে না আপনার?

নরেন। (হাসিয়া) এ-কথা জেনে লাভ কি?

নলিনী। না, সে হবে না, আপনাকে বলতেই হবে।

নরেন। বলতে আপনাকেই শুধু পারি। কিন্তু কথা দিন কখনো কাউকে বলবেন না?

নলিনী। কথা আমি দেব না। তবু বলতেই হবে তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করে কিনা।

নরেন। করে। রাত্রি-দিনই করে।

নলিনী। (বাহিরের দিকে চাহিয়া মহা-উল্লাসে) এই যে! আসুন, আসুন। নমস্কার! ভালো আছেন?

[বিজয়া ও দয়ালের প্রবেশ]

বিজয়া। (নরেনের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া নলিনীকে) নমস্কার! ভালো আছি কিনা খোঁজ নিতে একদিনও তো গেলেন না?

নলিনী। রোজই ভাবি যাই, কিন্তু সংসারের কাজে—

বিজয়া। সংসারের কাজ বুঝি আমাদের নেই?

নলিনী। আছে সত্যি, কিন্তু মামীমার অসুখে—

বিজয়া। একেবারে সময় পান না। না?

নরেন। (সম্মুখে আসিয়া হাসিমুখে বলিল) আর আমি যে রয়েছি, আমাকে বুঝি চিনতেই পারলেন না?

বিজয়া। চিনতে পারলেই চেনা যায় নাকি? (নলিনীর প্রতি) চলুন মিস্ দাস, ওপরে গিয়ে মামীমার সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি। চলুন!

[নরেনের প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া নলিনীকে একপ্রকার ঠেলিয়া লইয়া চলিল।]

নলিনী। (চলিতে চলিতে) ডক্টর মুখার্জ্জি, চা না খেয়ে আপনি যেন পালাবেন না। আমাদের ফিরতে দেরি হবে না বলে যাচ্ছি।

[নলিনী ও বিজয়া চলিয়া গেল]

দয়াল। তুমিও চল না বাবা ওপরে। সেইখানেই খাবে।

নরেন। ওপরে গেলেই দেরি হবে দয়ালবাবু, ছ'টার গাড়ি ধরতে পারব না।

দয়াল। তুমি ত সেই আটটার ট্রেনে যাও, আজ এত তাড়াতাড়ি কেন? চা না হয় এইখানেই আনতে বলে দি'। কি বল?

নরেন। না দয়ালবাবু, আজ চা খাওয়া থাক। (ঘড়ি দেখিয়া) এই দেখুন পাঁচটা বেজে গেছে—আর আমার সময় নেই। আমি চললুম। মামীমা যেন দুঃখ না করেন।

দয়াল। দুঃখ সে করবেই নরেন।

নরেন। না করবেন না। আর একদিন আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলব।

[প্রস্থান]

[ভিতরে নলিনী ও বিজয়ার হাসির শব্দ শোনা গেল, এবং পরক্ষণে তাহারা দয়ালের স্ত্রীকে লইয়া প্রবেশ করিল।]

দয়ালের স্ত্রী। (স্বামীর প্রতি) নরেন কোথা গেল, তাকে দেখছিনে তো?

দয়াল। সে এইমাত্র চলে গেল। কাজ আছে, ছ'টার ট্রেনে আজ তার না ফিরে গেলেই নয়।

দয়ালের স্ত্রী। সে কি কথা! চা খেলে না, খাবার খেলে না,—এমনধারা সে তো কখনো করে না!

[সকলেই নীরব। বিজয়া আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া রহিল।]

দয়ালের স্ত্রী। (স্বামীর প্রতি) তুমি যেতে দিলে কেন? বললে না কেন আমি ভারী দুঃখ পাব?

দয়াল। বলেছিলুম, কিন্তু থাকতে পারলে না।

দয়ালের স্ত্রী। তবে নিশ্চয় কোন জরুরি কাজ আছে। মিছে কথা সে কখনো বলে না! কি ভদ্র ছেলে মা! যেমন বিদ্বান্ তেমনি বুদ্ধিমান। আমাকে তো মরা বাঁচালে। রোজ বিকালে নলিনী আর ও বসে বসে পড়াশুনো করে, আমি আড়াল থেকে দেখি। দেখে কি যে ভালো লাগে তা আর বলতে পারিনে। ভগবান ওর মঙ্গল করুন।

বিজয়া। সন্ধ্যা হয়ে গেল, আমি এবার যাই মামীমা।

দয়ালের স্ত্রী। তোমার বিয়েতে আমি উপস্থিত থাকবই। তা যত অসুখই করুক। নরেন বলে, বেশী নড়া-চড়া করা উচিত নয়। তা সে বলুকগে—ওদের

সব কথা শুনতে গেলে আর বেঁচে থাকা চলে না। আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও, দীর্ঘজীবী হও,—বিলাসবাবুকে চোখে দেখিনি, কিন্তু কর্ত্তার মুখে শুনি খাসা ছেলে। (সহাস্যে) বর পছন্দ হয়েছে তো মা, নিজে বেছে নিয়েছ—

বিজয়া। বেছে নেবার কি আছে মামীমা। মেয়েদের সম্বন্ধে সব পুরুষই সমান। মুখের ভদ্রতায় কেউ বা একটু হুঁসিয়ার, কেউ বা তা নয়। প্রয়োজন হলে দুটো মিষ্ট কথা বলে, প্রয়োজন ফুরালে উগ্রমূর্ত্তি ধরে। ওর ভালোমন্দ নেই মামীমা, আমাদের দুঃখের জীবন শেষ পর্য্যন্ত দুঃখেই কাটে।

নলিনী। এ-কথা বলা আপনার উচিত নয় মিস্ রায়।

বিজয়া। এখন তর্ক করব না, কিন্তু নিজের বিবাহ হলে একদিন স্মরণ করবেন, বিজয়া সত্যি কথাই বলেছিল। কিন্তু আর দেরি নয়, আমি আসি। কানাই সিং—

[নেপথ্যে]—মাইজি—

দয়াল। (ব্যস্তভাবে) অন্ধকার রাত, একটা আলো এনে দিই মা।

বিজয়া। (হাসিয়া) অন্ধকার কোথায় দয়ালবাবু, বাইরে জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে। আমরা বেশ যেতে পারব, আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। নমস্কার।

[বিজয়া বাহির হইয়া গেল]

দয়ালের স্ত্রী। (স্বামীর প্রতি) মেয়েটি কি বললে—শুনলে?

দয়াল। কি?

দয়ালের স্ত্রী। তোমাদের কি কান নেই? এসে পর্য্যন্ত ওর কথায় যেন একটা কান্নার সুর। হাসছিল তখনও। বিজয়াকে আগে কখনও দেখিনি, কিন্তু ওর মুখ দেখে আজ মনে হ'লো যেন ওকে কেউ বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলুম, বর পছন্দ হয়েছে তো মা? বললে, পছন্দ হবার কি আছে মামীমা, মেয়েদের দুঃখের জীবন শেষ পর্য্যন্ত দুঃখেই কাটে। এ কি আহ্লাদের বিয়ে? দেখো, কোথায় কি একটা গোলমাল বেঁধেছে। ওর মা নেই, বাপ নেই—মুখ দেখলে বড্ড মায়া হয়। না বুঝে-সুঝে একটা কাজ করে ব'সো না।

দয়াল। আমি কি করতে পারি বল? রাসবিহারীবাবু কর্ত্তা।

দয়ালের স্ত্রী। তাঁর ওপরেও আর একজন কর্ত্তা আছে মনে রেখো। তুমি ওর মন্দিরের আচার্য্য, ওর টাকায়, ওর বাড়িতে তোমরা খেয়ে-পরে সুখে আছ,—ওর ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ দেখা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়? সমস্ত না ভেবেই কি একটা করে বসবে।

দয়াল। তবে কি করব বল?

দয়ালের স্ত্রী। এ বিয়েতে আচার্য্যগিরি তুমি ক'রো না। আমি বলছি, তোমাকে একদিন মনস্তাপ পেতে হবে।

দয়াল। (চিন্তান্বিত-মুখে) কিন্তু বিজয়া যে নিজে সম্মতি দিয়েছেন! রাস-বিহারীবাবুর সুমুখে নিজের হাতে কাগজ সই করে দিয়েছে!

নলিনী। দিক। ওর হাত সই করেছে কিন্তু হৃদয় সই করেনি, ওর জিভ সম্মতি দিয়েছে কিন্তু অন্তর সম্মতি দেয়নি। সেই মুখ আর হাতই বড় হবে মামাবাবু, তাঁর অন্তরের সত্যিকার অসম্মতি যাবে ভেসে?

দয়াল। তুমি এ-কথা জানলে কি করে নলিনী?

নলিনী। আমি জানি। আজ যাবার সময় নরেনবাবুর মুখ দেখেও কি তুমি বুঝতে পারনি?

দয়াল ও দয়ালের স্ত্রী। (সমস্বরে) নরেন? আমাদের নরেন?

নলিনী। হাঁ তিনিই।

দয়াল। অসম্ভব! একেবারে অসম্ভব।

নলিনী। (হাসিয়া) অসম্ভব নয় মামাবাবু, সত্যি।

দয়াল। (সজোরে) কিন্তু বিজয়া যে আমাকে নিজে বললেন—

নলিনী। কি বললে?

দয়াল। বললেন, তোমার আর নরেনের পানে একটু চোখ রাখতে। বললেন, নরেনের উচিত তোমার সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করে জানাতে—

নলিনী। (সলজ্জে) ছি ছি, নরেনবাবু যে আমার বড় ভায়ের মত মামাবাবু?

দয়ালের স্ত্রী। কি আশ্চর্য্য কথা! তুমি আমাদের জ্যোতিষকে ভুলে গেলে? তার বিলেত থেকে ফিরতে তো আর দেরি নেই।

দয়াল। জ্যোতিষ? আমাদের সেই জ্যোতিষ?

দয়ালের স্ত্রী। হাঁ হাঁ, আমাদের সেই জ্যোতিষ। (হাসিয়া) এই অন্ধ মানুষটিকে নিয়ে আমার সারাজীবন কাটল।

দয়াল। আমি এখ্‌খুনি যাব নরেনের বাসায়।

দয়ালের স্ত্রী। এত রাত্রে? কেন?

দয়াল। কেন? জিজ্ঞাসা করছ, কেন? আমার কর্ত্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি —সে থেকে কেউ আর আমাকে টলাতে পারবে না।

নলিনী। তুমি শান্ত মানুষ মামাবাবু, কিন্তু কর্ত্তব্য থেকে তোমাকে কে কবে টলাতে পেরেছে? কিন্তু আজ রাতে নয়—তুমি কাল সকালে যেও।

দয়াল। তাই হবে মা, আমি ভোরের গাড়িতেই বেরিয়ে পড়ব।

নলিনী। আমি তোমার চা তৈরি করে রাখব মামাবাবু। কিন্তু ওপরে চল, তোমার খাবার সময় হয়েছে।

দয়াল। চল। [সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

লাইব্রেরী

[বিজয়া চিঠি লিখিতেছিল, পরেশের মা প্রবেশ করিল।]

পরেশের মা। রাত্তিরে কিছু খাওনি, আজ একটু সকাল সকাল খেয়ে নাও না দিদিমণি।

[বিজয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া পুনরায় লেখায় মনঃসংযোগ করিল।]

পরেশের মা। খেয়ে নিয়ে তারপরে লিখো। ওঠো—ওমা, ডাক্তারবাবু আসছেন যে!

[বলিয়াই সরিয়া গেল। পরেশ নরেনকে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। নরেন ঘরে ঢুকিয়াই অদূরে একখানা চৌকি টানিয়া বসিল। তাহার মুখ শুষ্ক, চুল এলো-মেলো, উদ্বেগ ও অশান্তির চিহ্ন তাহার চোখেমুখে বিদ্যমান।]

নরেন। কাল আমাকে চিনতে চাননি কেন বলুন তো! এখন থেকে চিরদিনের মত অপরিচিত হয়ে গেলুম এই বুঝি ইঙ্গিত।

বিজয়া। আপনার চোখ-মুখ এমন ধারা দেখাচ্ছে কেন, অসুখ-বিসুখ করেনি তো? এত সকালে এলেন কি করে? কিছু খাওয়া হয়নি বোধ করি?

নরেন। স্টেশনে চা খেয়েছি। ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়েছিলুম। কাল খেতে পারিনি, ঘুমোতে পারিনি, সারা রাত কেবল এক কথাই মনে হয়েছে, দোর বোধ হয় বন্ধ হলো,—দেখা আর হবে না।

বিজয়া। ও-বাড়ি থেকে কাল না খেয়ে পালিয়ে গেলেন, বাসায় ফিরে গিয়ে খেলেন না শুলেন না, আবার সকলে উঠে স্নান নেই খাওয়া নেই, এতটা পথ হাঁটা, —শরীরটা যাতে ভেঙে পড়ে সেই চেষ্টাই হচ্ছে বুঝি? আমাকে কি আপনি এতটুকু শান্তি দেবেন না?

নরেন। আপনি অদ্ভুত মানুষ! পরের বাড়িতে চিনতে চান না, আবার নিজের বাড়িতে এত বেশী চেনেন যে সেও আশ্চর্য্য ব্যাপার। কালকের কাণ্ড দেখে ভাবলুম খবর দিলে দেখা করবেন না, তাই বিনা সংবাদে পরেশের সঙ্গে এসে আপনাকে ধরেছি। একটু ক্লান্ত হয়েছি মানি, কিন্তু এসে ঠকিনি। (বিজয়া নীরবে চাহিয়া রহিল!) কাল ফিরে গিয়ে দেখি সাউথ আফ্রিকা থেকে কেব্‌ল এসেছে, আমি চাকরি পেয়েছি! চারদিন পরে করাচী থেকে জাহাজ ছাড়বে—আজ আসতে না পারলে হয়ত আর কখনো দেখাই হতো না। আপনার বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রও পেলুম। দেখে যাবার সৌভাগ্য হবে না, কিন্তু আমার আশীর্ব্বাদ, আমার অকৃত্রিম শুভকামনা,

আপনাদের পূর্ব্বাহ্ণেই জানিয়ে যাই। আমার কথা অবিশ্বাস করবেন না এই প্রার্থনা।

বিজয়া। এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে সাউথ আফ্রিকায় চলে যাবেন? কিন্তু কেন?

নরেন। (হাসিয়া) বেশি মাইনে বলে। আমার কলকাতাও যা সাউথ আফ্রিকাও তো তাই।

বিজয়া। তাই বই কি! কিন্তু নলিনী কি রাজী হয়েছেন? হলেও বা এত শীঘ্র কি করে যাবেন আমি তো ভেবে পাইনে। তাঁকে সমস্ত খুলে বলেছেন কি? আর এত দূরে যেতেই বা তিনি মত দিলেন কি করে?

নরেন। দাঁড়ান, দাঁড়ান। এখনো কাউকে সমস্ত কথা খুলে বলা হয়নি বটে, কিন্তু—

বিজয়া। কিন্তু কি? না সে কোনমতেই হতে পারবে না। আপনারা কি আমাদের বাক্স-বিছানার সমান মনে করেন যে, ইচ্ছে থাক না থাক দড়ি দিয়ে বেঁধে গাড়িতে তুলে দিলেই সঙ্গে যেতে হবে? সে কিছুতেই হবে না। তাঁর অমতে কোনমতেই অত দূরে যেতে পারবেন না।

নরেন। (কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের ন্যায় স্তব্ধভাবে থাকিয়া) ব্যাপারটা কি আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো? পরশু না করে, এই নূতন চাকরির কথাটা দয়ালবাবুকে বলতে তিনিও চমকে উঠে এই ধরনের কি একটা আপত্তি তুললেন আমি বুঝতেই পারলুম না। এত লোকের মধ্যে নলিনীর মতামতের ওপরেই বা আমার যাওয়া না-যাওয়া কেন নির্ভর করে, আর তিনিই বা কিসের জন্যে বাধা দেবেন,—এসব যে ক্রমেই হেঁয়ালি হয়ে উঠছে। কথাটা কি আমাকে খুলে বলুন তো!

বিজয়া। (ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে) তাঁর সঙ্গে একটা বিবাহের প্রস্তাব কি আপনি করেননি?

নরেন। আমি? না কোনদিন নয়।

বিজয়া। না করে থাকলেও কি করা উচিত ছিল না? আপনার মনোভাব তো কারও কাছে গোপন নেই।

নরেন। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) এ অনিষ্ট কার দ্বারা ঘটেছে আমি তাই শুধু ভাবছি। তার নিজের দ্বারা কদাচ ঘটেনি। দু'জনেই জানি এ অসম্ভব।

বিজয়া। অসম্ভব কেন?

নরেন। সে থাক। একটা কারণ এই যে আমি হিন্দু এবং আমাদের জাতও এক নয়।

বিজয়া। জাত আপনি মানেন?

নরেন। মানি।

বিজয়া। আপনি শিক্ষিত হয়ে একে ভালো বলে মানেন কি করে?

নরেন। ভালোমন্দর কথা বলিনি, জাত মানি তাই বলছি।

বিজয়া। আচ্ছা অন্য জাতের কথা থাক, কিন্তু জাত যেখানে এক সেখানেও কি শুধু আলাদা ধর্ম্মমতের জন্যই বিবাহ অসম্ভব বলতে চান? আপনি কিসের হিন্দু? আপনি তো একঘরে। আপনার কাছেও কি কোন অন্য সমাজের কুমারী বিবাহ-যোগ্য নয় মনে করেন? এত অহঙ্কার আপনার কিসের জন্য? আর এই যদি সত্যিকারের মত, তবে সে কথা গোড়াতেই বলে দেননি কেন?

[বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং ইহাই গোপন
করিতে সে মুখ ফিরাইয়া লইল।]

নরেন। (ক্ষণকাল একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া) আপনি রাগ করে যা বলছেন এ তো আমার মত নয়।

বিজয়া। নিশ্চয় এই আপনার সত্যিকার মত।

নরেন। আমাকে পরীক্ষা করলে টের পেতেন এ আমার সত্যিকার মিথ্যেকার কোন মতই নয়। এ-ছাড়া নলিনীর কথা নিয়ে কেন আপনি বৃথা কষ্ট পাচ্ছেন? আমি জানি তার মন কোথায় বাধা এবং তিনিও নিশ্চয় বুঝবেন কেন আমি পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে পালাচ্ছি। আমার যাওয়া নিয়ে আপনি নিরর্থক উদ্বিগ্ন হবেন না।

বিজয়া। নিরর্থক? তাঁর অমত না হলেই আপনি যেখানে খুশি যেতে পারেন মনে করেন?

নরেন। না তা পারিনে। আপনার অমতেও আমার কোথাও যাওয়া চলে না। কিন্তু আপনি তো আমার সব কথাই জানেন। আমার জীবনের সাধও আপনার অজানা নয়, বিদেশে কোনদিন হয়ত সে সাধ পূর্ণ হতেও পারে, কিন্তু এ-দেশে এত বড় নিষ্কর্ম্মা দীন-দরিদ্রের থাকা না-থাকা সমান। আমাকে যেতে বাধা দেবেন না।

বিজয়া। আপনি দীন-দরিদ্র তো ন'ন। আপনার সবই আছে, ইচ্ছে করলেই ফিরে নিতে পারেন।

নরেন। ইচ্ছে করলেই পারিনে বটে, কিন্তু আপনি যে দিতে চেয়েছেন সে আমার মনে আছে এবং চিরদিন থাকবে। কিন্তু দেখুন, নেবারও একটা অধিকার থাকা চাই—সে অধিকার আমার নেই।

বিজয়া। (উচ্ছ্বসিত রোদন সংবরণ করিতে করিতে উত্তেজিত-স্বরে) আছে বই কি। বিষয় আমার নয়, বাবার। সে আপনি জানেন। নইলে পরিহাসচ্ছলেও তাঁর যথাসর্ব্বস্ব দাবী করার কথা মুখে আনতে পারতেন না। আমি হলে কিন্তু

ঐখানেই থামতুম না। তিনি যা দিয়ে গেছেন সমস্ত জোর করে দখল করতুম, তার একতিলও ছেড়ে দিতুম না। (টেবিলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল)

নরেন। নলিনী ঠিকই বুঝেছিল বিজয়া, আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি। ভাবতেই পারিনি আমার মত একটা অকেজো অক্ষম লোককে কারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সত্যই যদি এই অসঙ্গত খেয়াল তোমার মাথায় ঢুকেছিল শুধু একবার হুকুম করোনি কেন? আমার পক্ষে এর স্বপ্ন দেখাও যে পাগলামি বিজয়া!

[বিজয়া মুখের উপর আঁচল চাপিয়া উচ্ছ্বসিত রোদন সংবরণ করিতে লাগিল। নরেন পিছনে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল দয়াল দাঁড়াইয়া দ্বারের কাছে। তিনি ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া বিজয়ার আসনের একান্তে বসিয়া তাহার মাথায় হাত দিলেন, বলিলেন—]

দয়াল। মা!

[বিজয়া একবার মুখ তুলিয়া দেখিয়া পুনরায় উপুড় হইয়া পড়িয়া মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। দয়ালের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—]

দয়াল। শুধু আমার দোষেই এই ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেল মা, শুধু আমি এই দুর্ঘটনা ঘটালুম। তোমরা চলে গেলে নলিনীর সঙ্গে আমার এই কথাই হচ্ছিল, সে সমস্তই জানত। কিন্তু কে ভেবেছে নরেন মনে মনে কেবল তোমাকেই,—কিন্তু নির্ব্বোধ আমি, সমস্ত ভুল বুঝে তোমাকে উল্টো খবর দিয়ে এই দুঃখ ঘরে ডেকে আনলুম। এখন বুঝি আর কোন প্রতিকার নাই? (তেমনি মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে) এর কি আর কোন উপায় হতে পারে না বিজয়া?

বিজয়া। (তেমনি মুখ লুকাইয়া ভগ্নকণ্ঠে) না দয়ালবাবু, মরণ ছাড়া আর আমার নিষ্কৃতির পথ নেই।

দয়াল। ছি মা, এমন কথা বলতে নেই।

বিজয়া। আমি কথা দিয়েছি দয়ালবাবু। তাঁরা সেই কথায় নির্ভর করে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে এনেছেন। এ যদি ভাঙি সংসারে আমি মুখ দেখাব কেমন করে? শুধু বাকী আছে মরণ—

[বলিতে বলিতে পুনরায় তাহার কণ্ঠরোধ হইল। দয়ালের চোখ দিয়াও আবার জল গড়াইয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া বলিলেন—]

দয়াল। নলিনী বললে, বিজয়া কথা দিয়েছে, সই করে দিয়েছে—এ ঠিক। কিন্তু কোনটায় তার অন্তর সায় দেয়নি। তার সেই মুখের কথাটাই বড় হবে মামাবাবু, আর হৃদয় যাবে মিথ্যে হয়ে? তার মামী বললে, ওর মা নেই, বাপ নেই,—একলা মেয়ে, আচার্য্য হয়ে তুমি এত বড় পাপ ক'রো না। যে দেবতা হৃদয়ে বাস

করেন এ অধর্ম তিনি সইবেন না। সারা রাত চোখে ঘুম এল না, কেবলই মনে হয় নলিনীর কথা—মুখের বাক্যটাই বড় হবে, হৃদয় যাবে ভেসে? ভোর হতেই ছুটলুম কলকাতায়—নরেনের কাছে—

নরেন। আপনি আমার কাছে গিয়েছিলেন?

দয়াল। গিয়ে দেখি তুমি বাসায় নেই, খোঁজ নিয়ে গেলুম তোমার অফিসে, তারাও বললে তুমি আসনি। ফিরে এলুম বিফল হয়ে, কিন্তু আশা ছাড়লুম না। মনে মনে বললুম, যাব বিজয়ার কাছে, বলব তাকে গিয়ে সব কথা—

[পরেশ গলা বাড়াইয়া দেখা দিল]

পরেশ। মা-ঠান, একটা-দুটো বেজে গেল—তুমি না খেলে যে আমরা কেউ খেতে পাচ্ছিনে।

[শুনিয়া বিজয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল।]

বিজয়া। (ব্যস্তভাবে) দয়ালবাবু, এখানেই আপনাকে স্নানাহার করতে হবে।

দয়াল। না মা, আজ তোমার আদেশ পালন করতে পারব না। তারা সব পথ চেয়ে আছে। নরেন তোমাকেও যেতে হবে। কাল না খেয়ে চলে এসেছ, সে দুঃখ ওদের যায়নি। এস আমার সঙ্গে।

[নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজয়া ইঙ্গিতে তাহাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া দয়ালের অগোচরে মৃদুকণ্ঠে বলিল—]

বিজয়া। আমাকে না জানিয়ে কোথাও চলে যাবেন না তো?

নরেন। না। যাবার আগে তোমাকে বলে যাব।

বিজয়া। ভুলে যাবেন না?

নরেন। (হাসিয়া) ভুলে যাব? চলুন দয়ালবাবু, আমরা যাই।

দয়াল। চল। আসি মা এখন।

[একদিক দিয়া দয়াল ও নরেন, অন্যদিক দিয়া বিজয়া প্রস্থান করিল।]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিজয়ার বসিবার ঘর

[পরেশ প্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে চওড়া পাড়ের শাড়ি, গায়ে ছিটের জামা, গলায় কোঁচানো চাদর, কিন্তু খ লি পা।]

পরেশ। মা-ঠান্, তিনটে-চারটে বেজে গেল পালকি এলো না তো? আমার মা কি বলছে জানো মা-ঠান? বলছে, বুড়ো দয়ালের ভীমরতি হয়েছে, নেমন্তন্ন করে ভুলে গেছে।

বিজয়া। তোর বুঝি বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে পরেশ?

পরেশ। হিঁ—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

বিজয়া। কিছু খাস্‌নি এতক্ষণ?

পরেশ। না। কেবল সকালে দুটি মুড়ি-মুড়কি খেয়েছিনু আর মা বললে, পরেশ, নেমতন্ন-বাড়িতে বড় বেলা হয়, দুটো ভাত খেয়ে নে। তাই—দেখো মা-ঠান, এই এত্ত ক'টি খেয়েছি।

[এই বলিয়া সে হাত দিয়া পরিমাণ দেখাইয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিল—]

পরেশ। তোমার ক্ষিদে পায়নি মা-ঠান?

বিজয়া। (মৃদু হাসিয়া) আমারও ভারী ক্ষিদে পেয়েছে রে।

[পরেশের মা প্রবেশ করিল।]

পরেশের মা। পাবে না দিদিমণি, বেলা কি আর আছে! বুড়ো করলে কি বল তো,—ভুলে গেল না তো? লোক পাঠিয়ে খবর নেব?

বিজয়া। ছি, ছি, সে করে কাজ নেই পরেশের মা। যদি সত্যই ভুলে গিয়ে থাকেন ভারী লজ্জা পাবেন।

পরেশের মা। কিন্তু নেমন্তন্ন-বাড়ির আশায় তোমার পরেশ যে পথ চেয়ে চেয়ে সারা হ'লো। বোধ হয় হাজারবার নদীর ধারে গিয়ে দেখে এসেছে পালকি আসছে কি না। যা পরেশ, আর একবার দেখ্‌গে। (পরেশ প্রস্থান করলে পরেশের মা পুনশ্চ কহিল) কিন্তু সত্যি আশ্চয্যি হচ্ছি তাঁর বিবেচনা দেখে। কাল অত বেলায় তো ডাক্তারবাবুকে নিয়ে বাড়ি গেলেন, আবার ঘণ্টাকয়েক পরেই দেখি বুড়ো লণ্ঠন নিয়ে নিজে এসে হাজির। পরেশের মা, তোমার দিদিমণি কোথায়? বললুম, ওপরে নিজের ঘরেই আছেন। কিন্তু এত রাত্তিরে কেন আচায্যিমশাই? বললেন,

পরেশের মা, কাল দুপুরে আমারে ওখানে তোমরা খাবে। তুমি, পরেশ, কালীপদ আর আমার মা বিজয়া। তাই নেমন্তন্ন করতে এসেছি। জিজ্ঞাসা করলুম, নেমতন্ন কিসের আচায্যিমশায়। বলেন, উৎসব আছে? কিসের উৎসব দিদিমণি?

বিজয়া। জানিনে পরেশের মা। আমাকে গিয়ে বললেন, কাল দ্বিপ্রহরে আমার ওখানে যেতে হবে মা। পালকি-বেহারা পাঠিয়ে দেব, হেঁটে যেতে পারবে না। কিন্তু ততক্ষণে কিছু খেয়ো না যেন। জিজ্ঞাসা করলুম, কেন দয়ালবাবু? বললেন, আমার ব্রত আছে। তুমি গিয়ে পা দিলে তবেই সে ব্রত সফল হবে। ভাবলাম মন্দির তো? হয়ত কিছু-একটা করছেন। কিন্তু এমন কাণ্ড হবে জানলে স্বীকার করতুম না পরেশের মা।

[রাসবিহারী প্রবেশ করিলেন]

রাস। একি কাণ্ড! এখনো যাওনি—চারটে বাজল যে!

পরেশের মা। পালকি পাঠাবার কথা, এখনো আসেনি।

রাস। এমনই তার কাজ। পালকি যদি সে না পেয়েছিল একটা খবর পাঠালে না কেন? আমি যোগাড় করে দিতুম। মধ্যাহ্ন ভোজন যে সায়াহ্ন করে দিলে, ভারী ঢিলে লোক, এইজন্যই বিলাস রাগ করে। আবার আমাকেও পীড়াপীড়ি—সন্ধ্যার পরে যেতেই হবে। [ছুটিয়া পরেশের প্রবেশ]

পরেশ। পালকি এসতেছে মা-ঠান।

[রাসবিহারীকে দেখিয়াই সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।]

রাস। বলিস্ কি রে? এস্তেছে? তোরই মোচ্ছব রে! দেখিস্ পরেশ, নেমন্তন্ন খেয়ে তোকে না ডুলিতে করে আনতে হয়। (বিজয়ার প্রতি) যাও মা, আর দেরি ক'রো না—বেলা আর নেই। গিয়ে পালকিটা পাঠিয়ে দিও—আমি আবার যাব। না গেলে তো রক্ষে নেই, মান-অভিমানের সীমা থাকবে না, সে এ বোঝে না যে দু'দিন বাদে আমার বাড়িতেও উৎসব,—কাজের চাপে নিশ্বাস নেবার অবকাশ নেই আমার। কিন্তু কে সে কথা শোনে? রাসবিহারীবাবু, পায়ের ধুলো একবার দিতেই হবে! কাজেই না গিয়ে উপায় নেই। রাত হলে কিন্তু যেতে পারব না বলে দিও। যাও তোমরা মা,—আমি ততক্ষণ মিস্ত্রীর কাজের হিসাবটা দেখে রাখি গে। প্রায় ষাট-সত্তর জন উদয়াস্ত খাটছে—প্রাসাদতুল্য বাড়ি, কাজের কি শেষ আছে। অতিথিরা যাঁরা আসবেন, বলতে না পারেন আয়োজনের কোথাও ত্রুটি আছে।

[এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, অন্যান্য সকলেও বাহির হইয়া গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

দয়ালের বহির্ব্বাটী

[মাঙ্গলিক সজ্জায় নানাভাবে সাজানো। নানা লোকের যাতায়াত, কলরব ইত্যাদির মাঝখানে পালকি-বাহকদের শব্দ শোনা গেল এবং ক্ষণেক পরে বিজয়া প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে পরেশ, কালীপদ ও পরেশের মা। দয়াল কোথা হইতে ছুটিয়া আসিলেন]

দয়াল। (মহা-উল্লাসে) এই যে মা আমার এসেছেন।

বিজয়া। (হাসিমুখে) বেশ আপনার ব্যবস্থা! পালকি পাঠাতে এত দেরি করলেন, আমরা সবাই ক্ষিধেয় মরি। এই বুঝি মধ্যাহ্ন-নেমন্তন্ন?

দয়াল। আজ তো তোমার খেতে নেই মা, কষ্ট একটু হবে বই কি। ভট্‌চাযি্যমশায়ের শাসন আজ না মানলেই নয়। নরেন তো না খেতে পেয়ে একেবারে নির্জ্জীব হয়ে পড়ে আছে! কিরে পরেশ, তুই কি বলিস?

[একজন লোক ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল, তাহার হাতে চেলির জোড় প্রভৃতি মোড়কে বাঁধা]

লোক। (দয়ালের প্রতি) দানসামগ্রী এসে পৌঁছেছে, আমি সাজাতে বলে দিলুম। বর-কন্যার চেলীর জোড় এই এল—নাপিতকে কোঁচাতে দিই।

দয়াল। হাঁ দাও গে। ক'টা বাজল, সন্ধ্যার পরেই তো লগ্ন—আর বেশী দেরি নেই বোধ করি। (বিজয়ার প্রতি) ভাগ্যক্রমে দিনক্ষণ সমস্ত পাওয়া গেছে,—না পেলেও আজই বিবাহ দিতে হ'তো, কিছুতে অন্যথা করা যেত না—তা যাক, সমস্তই ঠিকঠাক মিলে গেছে, তাইতো ভট্‌চাযি্যমশাই হেসে বলেছিলেন, এ যেন বিজয়ার জন্যেই পাঁজিতে আজকের দিনটি সৃষ্টি হয়েছিল। তোমার যে আজ বিবাহ মা।

বিজয়া। আজ আমার বিবাহ?

দয়াল। তাইতো আজ আমাদের আনন্দ-আয়োজন, মহোৎসবের ঘটা।

বিজয়া (করুণকণ্ঠে) আপনি কি আমার হিন্দুবিবাহ দেবেন?

দয়াল। হিন্দুবিবাহ কি বিবাহ নয় মা? কিন্তু সাম্প্রদায়িক মতবাদ মানুষকে এমনি বোকা করে আনে যে, কাল সমস্ত বিকেলটা ভেবে ভেবেও এই তুচ্ছ কথাটার কুল-কিনারা খুঁজে পাইনি। কিন্তু নলিনী আমাকে এক মুহূর্ত্তে বুঝিয়ে দিলে। বললে, তাঁর বাবা তাঁকে যাঁর হাতে দিয়ে গেছেন তোমরা তাঁর হাতেই তাঁকে

দাও। নইলে ছল করে যদি অপাত্রে দান করো, তোমাদের অধর্ম্মের সীমা থাকবে না। আর মনের মিলনই তো সত্যিকার বিবাহ, নইলে বিয়ের মন্ত্র বাঙলা হবে কি সংস্কৃত হবে, ভট্‌চায্যিমশাই পড়াবেন কি আচার্য্যিশাই পড়াবেন তাতে কি আসে-যায় মামা? এত বড় জটিল সমস্যাটা যেন একেবারে জল হয়ে গেল বিজয়া, মনে মনে বললুম, ভগবান্! তোমার তো কিছু অগোচর নেই, এদের বিবাহ আমি যে-কোন মতে দিই না তোমার কাছে অপরাধী হব না আমি নিশ্চয় জানি।

জনৈক ভদ্রলোক। নিশ্চয় নিশ্চয়। অতি সত্য কথা।

[ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া]

দয়াল। তুমি জানো না মা, নরেন তোমাকে কত ভালোবাসে। তবু সে এমন ছেলে যে তোমার মাথায় অসত্যের বোঝা তুলে দিয়ে তোমাকে ও গ্রহণ করতে রাজী হ'তো না। একবার আগাগোড়া তার কাজগুলো মনে করে দেখ দিকি বিজয়া।

[বিজয়া নিঃশব্দে নতমুখে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। নলিনী ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল।]

নলিনী। বাঃ আমি এতক্ষণ খবর পাইনি! কাজের ভিড়ে কিছু জানতেই পারিনি। ওপরে চল ভাই, তোমাকে সাজাবার ভার পড়েছে আমার উপর। চল শীগ্‌গির।

[এই বলিয়া সে বিজয়াকে টানিয়া লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। সঙ্গে গেল পরেশ, পরেশের মা ও কালীপদ। নেপথ্যে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, ভট্টাচার্য্য-মহাশয় প্রবেশ করিলেন।]

ভট্টাচার্য্য। লগ্ন সমুপস্থিত। আপনারা অনুমতি করুন শুভকার্য্যে ব্রতী হই।

সকলে। (সমস্বরে) আমরা সর্ব্বান্তকরণে সম্মতি দিই ভট্‌চায্যিমশাই, শুভকর্ম্ম অবিলম্বে আরম্ভ করুন।

[যে আজ্ঞে; বলিয়া ভট্‌চায্যিমশায় প্রস্থান করিলেন। গ্রামের চাষা-ভূষা নানা লোক নানা কাজে আসা-যাওয়া করিতেছে এবং ভিতর হইতে কলরব শুনা যাইতেছে।]

দয়াল। আমারও সংশয় এসেছিল। একটা বড় কথা আছে যে, বিজয়া তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নলিনী বললে, বড় কথা নয় মামাবাবু। বিজয়ার অন্তর্য্যামী সায় দেয়নি। তবু তার হৃদয়ের সত্যকে লঙ্ঘন করে তার মুখের বলাটাকেই বড় করে তুলবে? শুনে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম। ও বলতে লাগল, কেবল মুখ দিয়ে বার হয়েছে বলেই কোন জিনিস কখনো সত্য হয়ে ওঠে না। তবু তাকেই জোর করে

যারা সকলের উর্দ্ধে স্থাপন করে তারা সত্যকে ভালবাসে বলেই করে না, তারা সত্য-ভাষণের দম্ভটাকেই ভালবাসে বলে করে। আপনারা সকলে হয়ত জানেন না যে, এই ভট্চায্যিমশায়ের পিতা-পিতামহ ছিলেন রায়বংশের কুলপুরোহিত! আবার বহুদিন পরে সেই বংশেরই একজনকে যে এ-বিবাহে পৌরোহিত্যে বরণ করতে পেলুম এ আমার বড় সান্ত্বনা। সকলের আশীর্ব্বাদে এ বিবাহ কল্যাণময় হোক, নির্ব্বিঘ্নে হোক এই আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা।

সকলে। আমরা আশীর্ব্বাদ করি বর-কন্যার মঙ্গল হোক।

দয়াল। কন্যা সম্প্রদান করতে বসছেন তাঁর দূর সম্পর্কের এক পিসী —

জনৈক ভদ্রলোক। কে—কে? ঈশ্বরকালী ঘোষালের বিধবা!

দয়াল। হাঁ তিনিই। ক্লেশের সঙ্গে মনে হয় আজ বনমালীবাবু যদি জীবিত থাকতেন! তাঁর একমাত্র কন্যা বিজয়াকে নরেন্দ্রনাথের হাতে সমর্পণ করবেন বলেই নরেনকে তিনি মানুষ করে তুলেছিলেন। দয়াময়ের আশীর্ব্বাদে সে মানুষ হয়ে উঠেছে। তাঁর সেই মানুষ করা ধনের হাতেই তাঁর কন্যাকে আমরা অর্পণ করলাম। বনমালীর অভিলাষ আজ পূর্ণ হ'লো।

সকলে। আমরা আবার আশীর্ব্বাদ করি তারা সুখী হোক।

[অন্তঃপুর হইতে শঙ্খধ্বনি ও আনন্দ-কলরোল শুনা গেল।]

দয়াল। (চোখ বুজিয়া) আমিও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের শুভ-ইচ্ছা সফল হয় যেন!

জনৈক বৃদ্ধ। আমরা আপনাকেও আশীর্ব্বাদ করি দয়ালবাবু। শুনেছিলুম রাস-বিহারীর ছেলে বিলাসের সঙ্গে হবে বিজয়ার বিবাহ; আমরা প্রজারা শুনে, ভয়ে মরে যাই। সে যে কিরূপ পাষণ্ড—

দয়াল। (সলজ্জে হাত তুলিয়া) না না না—অমন কথা বলবেন না মজুমদার-মশাই। প্রার্থনা করি তাঁরও মঙ্গল হোক।

বৃদ্ধ। মঙ্গল হবে? ছাই হবে। গোল্লায় যাবে। আমার পুকুরটার—

দয়াল। না না না না—ও-কথা বলতে নেই—বলতে নেই- কারো সম্বন্ধে না। করুণাময় যেন সকলেরই মঙ্গল করেন।

বৃদ্ধ। কিন্তু ঐ যে বুড়ো দেড়ে —

[ধীরে গম্ভীরপদে রাসবিহারী প্রবেশ করিতেই সকলে চক্ষের পলকে উঠিয়া দাঁড়াইল—]

সকলে। আসুন, আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক রাসবিহারীবাবু। আমরা সকলেই আপনার শুভাগমনের প্রতীক্ষা করছিলুম।

রাস। (কটাক্ষে চাহিয়া, দয়ালের প্রতি) আজ ব্যাপারটা কি বল তো দয়াল?

দোরগোড়ায় কলাগাছ পুঁতেছ, ঘট বসিয়েছ, বাড়ির ভেতরে শাঁখের আওয়াজ শুনতে পেলুম—আয়োজন মন্দ করোনি—কিন্তু কিসের শুনি ?

দয়াল। (সভয়ে ও সবিনয়ে) আজ যে বিজয়ার বিবাহ ভাই।

রাস। মতলবটা কে দিল শুনি ?

দয়াল। কেউ নয় ভাই, করুণাময়ের—

রাস। হুঁ—করুণাময়ের ! পাত্রটি কে ? জগদীশের ছেলে সেই নরেন ?

দয়াল। তুমি তো—আপনি তো জানেন বনমালীবাবুর চিরদিনের ইচ্ছে ছিল—

রাস। হুঁ, জানি বইকি। বনমালীর মেয়ের বিয়ে কি শেষকালে হিন্দুমতেই দিলে নাকি ?

দয়াল। আপনি তো জানেন, আসলে সব বিবাহ-অনুষ্ঠানই এক।

রাস। ওর বাপকে যে হিন্দুরা দেশ থেকে তাড়িয়েছিল মেয়েটা তাও ভুললো নাকি !

[এমনি সময়ে অন্তঃপুরে নানাবিধ কলরব শঙ্খধ্বনি কানে আসিতে লাগিল]

দয়াল। শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে। আজ মনের মধ্যে কোন গ্লানি না রেখে তাদের আশীর্ব্বাদ কর ভাই, তারা যেন সুখী হয়, ধর্ম্মশীল হয়, দীর্ঘায়ু হয়।

রাস। হুঁ। আমাকে বললেই পারতে দয়াল, তা হলে আর এই চাতুরী করতে হ'তো না। ওতেই আমার সবচেয়ে ঘৃণা।

[এই বলিয়া তিনি গমনোদ্যত হইলেন। নলিনী কোথায় ছিল ছুটিয়া আসিয়া পড়িল]

নলিনী। (আবদারের সুরে বলিল) বাঃ—আপনি বুঝি বিয়েবাড়ি থেকে শুধু শুধু চলে যাবেন ? সে হবে না, আপনাকে খেয়ে যেতে হবে রাসবিহারীমামা। আমি কত কষ্ট করে আপনাকে নেমতন্ন করে আনিয়েছি।

রাস। দয়াল, মেয়েটি কে ?

দয়াল। আমার ভাগনী নলিনী।

রাস। বড় জ্যাঠা মেয়ে।

[প্রস্থান]

দয়াল। (সেই দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া) অন্তরে বড় ব্যথা পেয়েছেন। ভগবান ওর ক্ষোভ দূর করুন। গাঙ্গুলীমশাই, চলুন, আমরা অভ্যাগতদের খাবার ব্যবস্থাটা একবার দেখি গে। আজকের দিনে কোথাও না অপরাধ স্পর্শ করে।

পূর্ণ। প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে কোথাও ত্রুটি নেই দয়ালবাবু—সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক আছে।

[প্রস্থান]

দয়াল। (ইঙ্গিতে বর-বধূকে দেখাইয়া) নলিনী, এদেরও যা হোক দুটো খেতে দিতে হবে যে মা! যাও তোমার মামীমাকে বলগে।

নলিনী। যাই মামাবাবু—

দয়াল। আমিও যাচ্ছি চল—

[প্রস্থান]

[ক্ষণকালের জন্য রঙ্গমঞ্চে বর-বধূ ভিন্ন আর কেহ রহিল না]

নরেন। গম্ভীর হয়ে কি ভাবছ বল তো?

বিজয়া। (সহাস্যে) ভাবছি তোমার দুর্গতির কথা। সেই যে ঠকিয়ে microscope বেচেছিলে তার ফল হ'লো এই। অবশেষে আমাকেই বিয়ে করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'লো।

নরেন। (গলার মালা দেখাইয়া) তার এই ফল! এই শাস্তি!

বিজয়া। হাঁ তাইতো। শাস্তি কি তোমার কম হ'লো নাকি!

নরেন। তা হোক, কিন্তু বাইরে এ-কথা আর প্রকাশ ক'রো না,—তা হলে রাজ্যিশুদ্ধ লোক তোমাকে microscope বেচেতে ছুটে আসবে। (উভয়ের হাস্য)

নলিনী। (প্রবেশ করিয়া) এসো ভাই, আসুন Dr. Mukherjee, মামীমা আপনাদের খাবার দিয়ে বসে আছেন,—কিন্তু অমন অট্টহাস্য হচ্ছিল কেন!

বিজয়া। (হাসিয়া) সে আর তোমার শুনে কাজ নেই—

অপ্রকাশিত রচনাবলী

আত্মকথা

"My childhood and youth were passed in great proverty. I received allmost no education for want of means. From my father I inherited nothing except, as I believe, his restless spirit and his keen interest in literature. The first made me a tramp and sent me out tramping the whole of India quite early, and the second made me a dreamer all my life. Father was a great scholar, and he had tried his hand at stories and novels, dramas and poems, in short every branch of literature, but never could finish anything. I have not his work now—somehow it got lost : but I remember poring over those incomplete mss. Over again in my childhood, and many a night I kept awake regretting their incompleteness, and thinking what might have been their conclusion if finished, Probably this led to my writing short stories when I was barely seventeen. But I soon gave up the habit as useless, and almost, forgot in long years that followed that I could even write a sentence in my boyhood. A mere accident made me start again after the lapse about eighteen years. Some of my old acquaintances started a little magazine, but no one of note would condescend to contribute to it, as it was so small and insignificant. When allmost hopeless, some of them suddenly remembered me, and after much persuasion they succeeded in extracting from me a promise to write for it. This was in the year 1913. I promised most unwillingly—perhaps only to put them off till I had returned to Rangoon and could forget all about it. But sheer volume and force of their letters and telegrams compelled me at last to think seriously about writing again. I sent them a short story for their magazine Jamuna. This became at once extremely popular, and made me famous in one day. Since then I have been writing

regularly. In Bengal. Perhaps., I am the cnly fortunate writer who has not had to struggle."*

"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। পরে পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেননি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই —কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে, সে-কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কতবার অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যাননি, এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে, ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প-রচনা অকেজোর কাজ মনে করে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তারপর অনেক বৎসর চলে গেল। আমি যে কোন কালে একটি লাইনও লিখেছি সে-কথা ভুলে গেলাম।

আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিক-পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজী হয়েছিলাম। কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, কোন রকমে একবার রেঙ্গুনে পৌছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য সত্যই আবার কলম ধরতে

* ১৯২২ সনে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস হইতে প্রথম পর্ব্ব 'শ্রীকান্ত'র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন K. C. Sen ও Theodesia Thompson, ইহার ভূমিকায় E. J. Thompson শরৎচন্দ্রের ইংরাজী বিবৃতিটি উদ্ধৃত করেন।

প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত 'যমুনা'র জন্য একটি ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাঙলার পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম। তারপর আমি অদ্যাবধি নিয়মিত ভাবে লিখে আসছি। বাঙলাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান্ লেখক যাকে কোনদিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়নি।"*

বাল্য-স্মৃতি

পুরাতন কথার আলোচনা-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আমার সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে, কিন্তু আছে বলিয়াই যে সে-আলোচনায় আমিও যোগ দিই এ আমার স্বভাব নয়। তাহার প্রধান কারণ আমি অত্যন্ত অলস লোক—সহজে লেখালিখির মধ্যে ঘেঁষি না; দ্বিতীয় কারণ, আমার বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উদাসীন। জানি, এই লইয়া বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা ও নানাবিধ জনশ্রুতি সাধারণ্যে প্রচারিত আছে, কিন্তু আমার নির্বিকার আলস্যকে তাহা বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতেও পারে না। শুভার্থীরা মাঝে মাঝে উত্তেজিত হইয়া আসিয়া বলেন, এইসব মিথ্যের আপনি প্রতিকার করবেন না? আমি বলি, মিথ্যে যদি থাকে ত সে প্রচার আমি করিনি, সুতরাং প্রতিকার করার দায় আমার নয়—তাদের। তাঁদের করতে বলো গে। তাঁরা রাগিয়া জবাব দেন—লোকে যে আপনাকে অদ্ভুত ভাবে তার কি? আমি বলি, সে দায়ও তাঁদের, কিন্তু এই সাতান্ন বছরেও যদি ক্ষতি না হয়ে থাকে ত আর কয়েকটা বছর ধৈর্য্য ধরে থাকো—আপনিই এর সমাপ্তি হবে। কোন চিন্তা নেই।

আজ··· এই লেখাটা পড়িতে পড়িতে ভাবিতেছিলাম আমাদের ছেলেবেলার সেই অতি ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সভায়···নেপথ্যে যোগদান করার—'নেপথ্য' শব্দটি কে-একজন দিতে ভুলিয়াছেন বলিয়া···কি অস্থিরতা! একবারও ভাবিয়া দেখি নাই কতটুকু ইহার মূল্য এবং জগৎ-সংসারে কেই বা সে-কথা মনে রাখিবে। অবশ্য ইহার জবাবও আছে।

সে যাই হোক, নিজের কথাটাই বলি। বলার একটু হেতু আছে,—কিন্তু সে আমার নিজের জন্য নয়—এ লেখার শেষ পর্য্যন্ত পড়িলে তাহা বুঝা যাইবে।

'বাতায়ন,' শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৪৪।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমার আত্মীয় ও আবাল্যবন্ধু। 'কল্লোল' এবং 'কালি কলমে' তিনি আমার বাল্যজীবনের প্রসঙ্গে কি কি লিখিয়াছেন আমি পড়ি নাই এবং…কোন্ কথা বলিয়াছেন তাহাও দেখি নাই। এও আমার স্বভাব। কিন্তু আমি জানি আমার প্রতি সুরেনের কি অপরিসীম স্নেহ, সুতরাং তাহার লেখায় অতিশয়োক্তি যে আছেই তাহা না পড়িয়াও হলফ করিতে পারি। কিন্তু না পড়িয়া হলফ করা এক কথা,—এবং না পড়িয়া প্রতিবাদ করা অন্য কথা। অতএব ইহা কাহারও লেখার প্রতিবাদ নয়, শুধু যতটুকু আমার মনে পড়ে তাহাই বলা।

ভাগলপুরে আমাদের সাহিত্য-সভা যখন স্থাপিত হয় তখন আমাদের সঙ্গে শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ ভট্ট বা তাঁর দাদাদের কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না। বোধ হয় একটা কারণ এই যে, তাঁরা ছিলেন বিদেশী এবং বড়লোক। স্বর্গীয় নফর ভট্ট ছিলেন সেখানকার সাবজজ। তারপর কি করিয়া এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের ক্রমশঃ জানাশুনা এবং ঘনিষ্ঠতা হয় সে-সব কথা আমার ভালো মনে নাই। বোধ হয় এই জন্য যে, ধনী হইলেও ইঁহাদের ধনের উগ্রতা বা দাম্ভিকতা কিছু মাত্র ছিল না। এবং আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম বোধ হয় এই জন্য বেশী যে, ইঁহাদের গৃহে দাবা-খেলার অতি পরিপাটি আয়োজন ছিল। দাবা-খেলার পরিপাটি আয়োজন অর্থে বুঝিতে হইবে—খেলোয়াড়, চা, পান ও মুহুর্মুহু তামাক।

সম্ভবতঃ সেই সময়েই শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ আমাদের সাহিত্য-সভার সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হন। আমি ছিলাম সভাপতি, কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সভার গুরুগিরি করিবার অবসর অথবা প্রয়োজন আমার কোনকালেই ঘটে নাই। সপ্তাহে একদিন করিয়া সভা বসিত এবং অভিভাবক গুরুজনদের চোখ এড়াইয়া কোন একটা নির্জ্জন মাঠের মধ্যে বসিত। জানা আবশ্যক যে, সে সময়ে সে-দেশে সাহিত্যচর্চ্চা একটা গুরু-তর অপরাধের মধ্যেই গণ্য ছিল। এই সভায় মাঝে মাঝে কবিতা পাঠ করা হইত। গিরীন পড়িতে পারিত সবচেয়ে ভালো, সুতরাং এ ভার তাহার উপরেই ছিল, আমার 'পরে নয়। কবিতার দোষগুণ বিচার হইত এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সাহিত্য-সভার মাসিক-পত্র 'ছায়া'য় প্রকাশিত হইত। গিরীন ছিলেন একাধারে সাহিত্য-সভার সম্পাদক, 'ছায়া'র সম্পাদক ও 'অঙ্গুলি-যন্ত্রে' অধিকাংশ লেখার মুদ্রাকর। এ-সম্বন্ধে এই আমার মোটামুটি মনে পড়ে।

সাহিত্য-সভার সভ্যগণের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন…বিভূতি। যেমন ছিল তাঁর পড়াশুনা বেশী, তেমনি ছিলেন তিনি ভদ্র এবং বন্ধুবৎসল। সমঝদার সমালোচকও তেমনি।…

কিন্তু না বলিয়া জানা এবং বলিয়া প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করাও ঠিক এক বস্তু

নয়। তখন সঙ্কোচে বাধা দেয়, বয়োজ্যেষ্ঠ কাহাকেও অকারণে ক্ষুণ্ণ করার ক্ষোভে মন অশান্তি বোধ করে। অথচ সত্য প্রতিষ্ঠা যখন করিতেই হয় তখন অপ্রিয় কর্ত্তব্যের এই পুনঃপুনঃ দ্বিধা নিজের বক্তব্যকে পদে পদে অস্বচ্ছ করিয়া তোলে। পুরাতন কথার আলোচনায়···বিপদ হইয়াছে এইখানে। অথচ প্রয়োজন ছিল না। এই সুদীর্ঘবর্ষ পরে আমি হইলে বলিতাম কত ভুলই ত সংসারে আছে, থাকিলই বা আর একটা। কি এমন ক্ষতি! কিন্তু আমার ও অপরের ক্ষতিবোধের হিসাব ত এক নয়।

······এখানে একটা গল্প মনে পড়িয়াছে। গল্পটা এই—

"কয়েক বৎসরের কথা, একবার হাবড়ায় 'শরৎচন্দ্র' সম্বন্ধীয় একটি সভার একজন বক্তা বোধ হয় সুরেন্দ্রনাথের ঐ লেখাটি পড়িয়াই ('কল্লোল,' মাঘ ১৩৩২) বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, টিলাকুঠির মাঠে (ভাগলপুর) এই সভা বসিত এবং সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র··· বিভূতিভূষণ তাঁহার পদতলে বসিয়া সাহিত্য সাধনা করিত। এই সভার একজন শ্রোতা (তাঁর নাম ৺বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শারীরিক বলের জন্য আদমপুর ক্লাবে এই বিনয়বাবুকে সকলেই জানিত। তিনি গৃহশিক্ষকরূপে ভাগলপুরে বহুদিন বাস করায় সবই জানিতেন) উত্তেজিত হইয়া আমাদের এ-খবর দেন এবং প্রতিবাদ করিতে বলেন। বিভূতিবাবু তাঁহাকে বহু কষ্টে প্রকৃতিস্থ করিয়া বুঝান যে···অপরের মুখের শোনা কথা লেখায় প্রতিবাদ চলে না। আপনি মুখে যাহা বলিয়াছেন সেই পর্য্যন্তই ভাল।"

বিভূতিবাবু তাঁহার ভূতপূর্ব্ব গৃহশিক্ষক বিনয়কুমারকে যদি সত্যই 'প্রকৃতিস্থ' করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন ত একটা বিস্ময়কর ব্যাপার করিয়াছিলেন তাহা মানিবই। কারণ, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক ঘণ্টাও তাঁহাকে 'প্রকৃতিস্থ' করা সহজ বস্তু ছিল না। "পদতলে বসিয়া সাহিত্য-সাধনা করিত," সভায় এই গ্লানিকর উক্তি শুনিয়া ভূতপূর্ব্ব গৃহশিক্ষক বিনয়কুমার নিজে উত্তেজিত হইয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং অপরকে উত্তেজিত হইতে প্ররোচিত করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনাটা আমার কাছে একেবারে নূতন। ১৩৩২ সনে আমি হাবড়াতেই ছিলাম অথচ আমার সম্বন্ধে এরূপ একটা সভা হওয়ার কথা আমি আদৌ বিদিত নাই। সত্য সত্যই হইয়া থাকিলে এবং নিজে উপস্থিত থাকিলে এমন একটা কথা আমার নিজের পক্ষে যত বড় গৌরবের সামগ্রীই হোক, অসত্য বলিয়া নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করিতাম এবং বিনয়ের উত্তেজিত হইয়া উঠার প্রয়োজন হইত না তা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

······মানুষ স্বভাবতঃ অনেকটা যে কল্পনাপ্রবণ তাহা সত্য এবং কল্পনারও যে উপযোগিতা আছে তাহাও সত্য, কিন্তু যথাস্থানে। ভূতপূর্ব্ব গৃহশিক্ষক বিনয়কুমার

পরবর্ত্তী কালে ছিলেন Statesman কাগজের Reporter. বার বার ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকিয়াও খরতর কল্পনার সাহায্যে report দাখিল করার জন্য তাঁহার চাকরি গিয়াছিল এবং কাগজের সম্পাদককে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

আজ বিনয় পরলোকগত। মৃত ব্যক্তিকে লইয়া এইসকল কথা লিখিতে আমার ক্লেশবোধ হয়।……

কিন্তু ইহা বাহ্য। আসলে উত্যক্ত করিয়াছে কতকগুলি অতি কৌতূহলী লোকের অশিষ্ট ও অমার্জ্জনীয় জিজ্ঞাসাবাদ। উহারা প্রশ্ন করিয়াছে, আমার কাছে···সাহিত্য-ব্যাপারে কে কতটা ঋণী। লোকেরা এ-প্রশ্ন আমাকেও যে না করিয়াছে তাহা নয় কিন্তু যে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছে তাহাকেই অকপটে এই সত্য কথাটাই চিরদিন বলিয়াছি যে আমার কাছে লেশমাত্র কেহ ঋণী নয়। এই-স্থানে এক সময়ে ছেলে-বয়সে সাহিত্যচর্চ্চা করিতে থাকিলে লোক পরস্পরকে উৎসাহ দিয়াই থাকে, ভালো লাগিলে ভালো বলিয়া বন্ধুজনেরা অভিনন্দিত করিয়াই থাকে, তাহাকে ঋণ বলিয়া অভিহিত করিতে গেলে মানুষের ঋণের কোথাও আর সীমা থাকে না। যেমন সুরেন, গিরীন, উপেন, তেমনি বিভূতি···প্রভৃতি। লেখা পড়িয়া ভালো লাগিলে ভালো বলিয়াছি—কোথাও তেমন ভালো না লাগিলে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিতে অনুরোধ করিয়াছি। কোনদিন সংশোধন করি নাই। এতকাল পরে এই সকল কথা ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য আমার শুধু এই যে, এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যেন লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে।

এইবার আমার নিজের সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলিয়া এ আলোচনা শেষ করিতে চাই। ছেলেবেলার লেখা কয়েকটা বই আমার নানা কারণে হারাইয়া গেছে। সবগুলার নাম আমার মনে নেই। শুধু দু'খানা বইয়ের নষ্ট হওয়ার বিবরণ জানি। একখানা, অভিমান, মস্ত মোটা খাতায় স্পষ্ট করিয়া লেখা,—অনেক বন্ধুবান্ধবের হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিয়া পড়িল বাল্যকালের সহপাঠী কেদার সিংহের হাতে। কেদার অনেকদিন ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু ফিরিয়া পাওয়া আর গেল না। এখন তিনি এক ঘোর তান্ত্রিক সাধুবাবা। বইখানা কি করলেন তিনিই জানেন —কিন্তু চাহিতে ভরসা হয় না – তাঁর সিঁদুর মাখানো মস্ত ত্রিশূলটার ভয় করি। এখন তিনি নাগালের বাইরে—মহাপুরুষ—ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা।

দ্বিতীয় বই 'শুভদা'। প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই, অর্থাৎ 'বড়দিদি,' 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস' প্রভৃতির পরে।*

---

* 'ছোটদের মাধুকরী,' আশ্বিন, ১৩৪৫

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

১

বাংলার হিন্দু জনগনের আজকের এই সম্মিলনী যাঁরা আহ্বান করেছেন, আমি তাঁদের একজন। এই বিশাল সভা কেবলমাত্র এই নগরের নাগরিকগণের নয়। আজ যাঁরা সমবেত হয়েছেন, তাঁরা বাংলার বিভিন্ন জেলার অধিবাসী। সকলের বর্ণ হয়ত এক নয়, কিন্তু ভাষা এক, সাহিত্য এক, ধর্ম্ম এক, জীবনযাত্রার গোড়ার কথাটা এক,—যে বিশ্বাস যে নিষ্ঠা আমাদের ইহলোক পরলোক নিয়ন্ত্রিত করে, সেখানেও আমরা কেউ কারও পর নয়। পর করে দেবার নানা উপায় নানা কৌশল সত্ত্বেও বলব, আমরা আজ এক। যুগ-যুগান্ত থেকে যে বন্ধন আমাদের এক করে রেখেছে, সত্যই আজও তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি।

বাংলার সেই সমগ্র হিন্দুজাতির পক্ষ থেকে, যাঁরা এই সভায় উদ্যোক্তা, তাঁদের পক্ষ থেকে আমি সবিনয়ে সসম্মানে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করি—এই বিপুল আয়তন সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে।

একটা প্রথা আছে সভাপতির পরিচয় দেওয়া ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই বিরাট নামের সম্মুখে পিছনে পরিচয়ের কোন বিশেষণ যোগ করা যায়! বিশ্বকবি, কবিসার্ব্বভৌম ইত্যাদি অনেক কিছু মানুষে পূর্ব্বেই আরোপ করে রেখেছে। কিন্তু আমরা—যাঁরা তাঁর শিষ্য-সেবক—নিজেদের মধ্যে শুধু 'কবি' বলেই তাঁর উল্লেখ করি। বাইরে বলি রবীন্দ্রনাথ। সভ্য-জগতের এক-প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত এই ব্যক্তিটিকে বোঝাবার পক্ষে কারও অসুবিধা ঘটবে না। কবির মন ক্লান্ত, দেহ দুর্ব্বল, অবসন্ন। এই বিপুল জনতার মাঝখানে তাঁকে আহ্বান করে আনা বিপজ্জনক। তবু তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম। মনে মনে ইচ্ছে ছিল, দুনিয়ার কারও না অবিদিত থাকে এই সভার নেতৃত্বের ভার বহন করলেন কে? কবি স্বীকার করলেন, বললেন, ভাল, তাঁর বক্তব্য তাঁর নিজের মুখ দিয়েই তবে ব্যক্ত হোক।

তাঁকে আমাদের সকৃতজ্ঞ চিত্তের নমস্কার নিবেদন করি।

ভারত-রাজ্যশাসনের নূতন যন্ত্র বিলাতের মন্ত্রিগণ বহুদিনে বহুযত্নে প্রস্তুত করেছেন। জাহাজে বোঝাই দেওয়া হয়েছে,—এলো বলে। তার ছোট-বড় কত চাকা, কত দণ্ড, কত কলকব্জা, কোনটা কোনদিকে ঘোরে কোনদিকে ফেরে কোন্ মুখে এগোয় আমরা কেউ ঠিক জানিনে। এবং মূল্য তার শেষ পর্য্যন্ত যে কি দিতে

হবে, সে ধারণা কারো নেই। যন্ত্র-নির্ম্মাণের সময় মাঝে মাঝে শুধু খবর পাওয়া যেতো, এদেশ থেকে ওদের বহু বুদ্ধিমান চালান দেওয়া হয়েছে বুদ্ধি দেবার জন্যে। কি বুদ্ধি তাঁরা দিলেন, সে সূক্ষ্ম তত্ত্ব আমরা সাধারণ মানুষে বুঝিনে, কেবল এইটুকু বোঝা গিয়েছিল, এক পক্ষ তারস্বরে অনেক চীৎকার করেছিলেন ও নূতন যন্ত্রে তাঁদের কাজ নেই এবং অপরপক্ষ ধমক দিয়ে বলেছিলেন, আলবাত কাজ আছে,—চেঁচিও না। অতএব কাজ আছে শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করতেই হ'লো। অনেকের ধারণা সেটা নাকি মস্ত বড় আখমাড়া কলের মত। তার একদিকে জমা হবে ছিবড়ে, অন্য দিকে রস। শেষেরটা পাত্রে সঞ্চিত হয়ে কোন্‌দিকে চালান যাবে, সে প্রশ্ন শুধু বাহুল্য নয়, হয়ত বা অবৈধ। ভয় আছে। তথাপি প্রশ্ন করা চলে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্ম্মবিশ্বাসই কি হয়ে দাঁড়াল সকলের বড়? আর মানুষ হ'লো ছোট? যে ব্যবস্থা জগতের কোথাও নেই, কোথাও কল্যাণ হয়নি, এই দুর্ভাগ্য দেশে তাই কি হ'লো special and peculiar circumstances? আর সে কেউ বোঝে না—নাবালকের trusteeরা ছাড়া?

কিন্তু এ হ'লো Politics, এ-আলোচনা করবার ভার নেই আমার উপর। এ বিষয়ে যাঁরা ওয়াকিবহাল, তাঁহারাই এ তত্ত্ব বুঝিয়ে দেখার যোগ্য পাত্র। আমি নয়।

তবুও পরিশেষে একটি কথা বলে রাখি। কারও কারও ধারণা—আমরা বিলেতে memorial পাঠিয়েছি সুবিচারের আশায়। সে বিশ্বাস আমাদের কারও নেই, আমরা পাঠিয়েছি অন্যায়ের প্রতিবাদ। নূতন শাসনব্যবস্থার আগাগোড়াই মন্দ। সেই অপরিসীম মন্দের মধ্যেও বাংলায় হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লো সবচেয়ে বেশী। আইনের পেরেক ঠুকে তাঁদের ছোট করা হ'লো চিরদিনের মত! তথাপি এ-কথা সত্য যে, দেশের মুসলমান ভাইয়েরা দশ-পনেরোটা স্থান বেশী পেয়েছে বলে তাঁদের বলতে চাই,—অন্যায়, অবিচার—একজনের প্রতি হলেও সে অকল্যাণময়। তাতে শেষ পর্য্যন্ত না মুসলমানের না হিন্দুর, না জন্মভূমির—কাহারও মঙ্গল হয় না।*

২

নূতন শাসনতন্ত্রে সমগ্র ভারতের হিন্দুদিগের বিশেষতঃ বাঙলাদেশের হিন্দুদিগের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে—এত বড় অবিচার আর কিছুতে হতে পারে না। অনেকে হয়ত এই মনে করবেন যে, এই অবিচারের প্রতিকার করবার ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই এবং এই মনে করেই তাঁরা নিশ্চেষ্ট থাকবেন, প্রতিবাদ করবেন না। কিন্তু তা সত্য নয়; যদি এই অন্যায়কে রোধ করবার ক্ষমতা কারও থাকে, সে আমাদেরই আছে।

---

* ১৫ জুলাই ১৯৩৬ তারিখে কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ সভায় উদ্বোধন বক্তৃতা। 'বাতায়ন,' ১লা শ্রাবণ, ১৩৪৩।

নিজের শক্তিমত আমি আজন্মকাল সাহিত্যসেবা করে এসেছি,—যদি দেশের সাহিত্য বড় হয় এই আশায় ;—এবং এই আশাতেই সাহিত্যের কাজে, দেশের কাজে, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করেছি। কিন্তু এখন অবস্থা এমন হতে চলেছে যে, আমার ভয় হয়—হয়ত দশ বৎসরের মধ্যে সাহিত্যের আর এক যুগ এসে পড়বে,—হয়ত রবীন্দ্রনাথ সেদিন থাকবেন না, আমিও হয়ত ততদিন আর থাকব না। তাই এখন হতে সেই অবস্থার কথা ভেবে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়েছি।

বাঙলা-সাহিত্যকে বিকৃত করবার একটি হীন প্রচেষ্টা চলেছে। কেউ বলেছেন, সংখ্যার অনুপাতে ভাষার মধ্যে এতগুলি 'আরবী' কথা ব্যবহার কর ; কেউ বলেছেন, এতগুলি 'পারসী' কথা ব্যবহার কর ; আবার কেউ বা বলছেন, এতগুলি 'উর্দ্দু' কথা ব্যবহার কর। এটা একেবারে অকারণ,—যেমন ছোট ছেলে হাতে ছুরি পেলে বাড়ির সমস্ত জিনিস কেটে বেড়ায়, এও সেইরূপ।

তারপর এতবড় অবিচার যে আমাদের—হিন্দুদের উপর হ'লো, এ তাঁরা জেনেও নীরব হয়ে রইলেন—এইটাই সকলের চেয়ে দুঃখের কথা। এটা কি তাঁরা বোঝেন না যে, এই যে বিষ, এই যে ক্ষোভ হিন্দুদের মনের মধ্যে জমা হয়ে রইল—একদিন না একদিন তা রূপ পাবেই ; তার যে একটি প্রতিক্রিয়া আছে এও কি তাঁরা ভাবেন না ? এরকম করে ত আর একটা দেশ চলতে পারে না, একটা জাতি বাঁচতে পারে না—এটাও তাঁদের জন্মভূমি। দেখুন, কেবল দিলেই হয় না, গ্রহণ করার শক্তিও একটা শক্তি। আজ যদি তাঁরা মনে করেন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ঢেলে দিলেন বলেই তাঁদের পাওয়া হ'লো—একদিন টের পাবেন, এত বড় ভুল আর নেই।

আমি আবার মুসলমান ভাইদের বলছি, তোমার সংস্কৃতির উপর নজর রেখো, সাহিত্যের উপর নজর রেখো ; আর ছোট ছেলেদের মত ধারালো ছুরি হাতে পেয়েছ বলে সব কেটে ফেলো না।

আমার মতে অন্যায় স্বীকার করতে নেই, যথাসাধ্য প্রতিকার করতে হয় ; তাই দিয়েই মানুষ মানুষ হয়ে উঠে। এই যে অন্যায়টা আমাদের উপর হয়েছে, তার প্রতিকার করতেই হবে ; যদি না পারি, তা হলে দশ বৎসর পরে—বাঙালি আজ যা নিয়ে গৌরব করছে—তার আর কিছুই থাকবে না। তাই আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতখানি পারি এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করব ; কারণ অন্যায় যদি চলতে দেওয়া হয়, তবে দেশে না হিন্দুর, না মুসলমানের, কারো কখন মঙ্গল হবে।*

---

* এলবার্ট-হলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নির্দ্ধারণের প্রতিবাদকল্পে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির বক্তৃতা। 'বাতায়ন', ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৩।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

কংগ্রেস ভুল করেছে—এমনি একটা চীৎকার কিছুদিন ধরে শুনছি। এই কোলাহলের মধ্যে সত্য বস্তু আছে কতটুকু, তার বিচার কিন্তু হয়নি।

নিজে আমি কোনদিনই হঠাৎ কোন বিষয়ে ধারণা গ'ড়ে নিতে পারিনে। যারা জোর গলায় প্রচার করে যে, তাদের দাবীই প্রবল, সহজে তাদের কথাও আমি স্বীকরে করে নিইনে। তাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই যুক্তিহীন নিন্দা-প্রচার আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন।

যিনি এই নব-আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছেন, তাঁকে আমি একনিষ্ঠ প্রবীণ কর্ম্মী হিসেবে শ্রদ্ধা করি; দেশের রাজনৈতিক সাধনার ইতিহাসে দান তাঁর কম বলেও মনে করিনে। কিন্তু দেশের প্রতি দুঃখবোধ তাঁর কংগ্রেসের চেয়েও বেশী, এ-কথা প্রমাণের জন্য নূতন কোনো দল গঠনের প্রয়োজন বোধ করি ছিল না। কংগ্রেস দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস চিরকাল লড়াই করে এ:সছে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির বিরুদ্ধে। আজ তাকে ছোট প্রমাণ করার চেষ্টায় ব্যক্তিগত গৌরব কারও কিছুমাত্র বেড়েছে কিনা জানিনে, কিন্তু দেশের গৌরব বুঝি এতটুকুও বাড়েনি।

দেশসেবা জিনিসটা যতদিন ধর্ম্ম হয়ে না দাঁড়ায়, ততদিন তার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি থেকে যায়। এ-কথা আমি প্রতিদিন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। আবার ধর্ম্ম যখন দেশের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে, তখনও ঘটে বিপদ। মহাত্মা জানেন এবং ওয়ার্কিং কমিটিও জানেন যে, ভুল তাঁরা করেননি। মালব্যজী এবং অ্যানের বিরুদ্ধাচরণও মহাত্মাকে বিচলিত করেনি। সুতরাং তিনি যদি কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগই করেন, তার সঙ্গে এ গোলযোগের কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। তার আসল ভয় সোশিয়েলিজম্‌কে। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এইখানে মহাত্মার দুর্ব্বলতা অস্বীকার করা চলে না।

একটা কথা আমি জানি যে, বাঙলাদেশের মুসলমানরাও 'জয়েন্ট ইলেক্‌টোরেট' চাইতে শুরু করেছেন। তা না হলে, গলদ কোথায়, তা তাঁরা ভাল করেই জানেন। এ-কথা ভুললে চলবে না যে, অধিকাংশ ধনী মুসলমানই নায়েব, গোমস্তা, উকিল, ডাক্তার হিসাবে স্বজাতির চেয়ে হিন্দুদের বিশ্বাস করেন বেশী। সঙ্গে সঙ্গে এও আমি বলব যে, প্রত্যেক হিন্দুই মনে-প্রাণে ন্যাশন্যালিস্ট। ধর্ম্মবিশ্বাসেও তারা কারও হতে ছোট নয়। তাদের বেদ, তাদের উপনিষৎ, বহু মানুষের বহু তপস্যার ফল। তপস্যার মানেই হলো চিন্তা। বহুজনের বহুতর চিন্তার ফলে যে ধর্ম্ম গড়ে উঠেছে, আইনসভার গুটিকতক আসন কম হবার আশঙ্কায়, তাকে সর্ব্বনাশের ভয় দেখাবার প্রয়োজন বোধ করি ছিল না।*

* 'নাগরিক', শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪১।

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীকান্ত (চতুর্থ পর্ব্ব)

প্রথম প্রকাশ—১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা এবং ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে মাঘ সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—৩ই মার্চ্চ, ১৯৩৩।

বামুনের মেয়ে

প্রথম প্রকাশ—শিশির পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত 'উপন্যাস-সিরিজ'-এর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম উপন্যাস (ক্রমিক নং—১৩) হিসাবে প্রথম প্রকাশিত। প্রকাশকাল—আশ্বিন, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ। পরে 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স' এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

নিষ্কৃতি

প্রথম প্রকাশ—১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'যমুনা'য় ইহার প্রথম অংশ 'ঘর-ভাঙা' নামে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ইহার সমগ্র অংশ ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র, কার্ত্তিক ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ'-এ প্রকাশিত হয়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—১লা জুলাই, ১৯১৭।

বিজয়া (নাটক)

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ৬ই পৌষ, শনিবার, ১৩৪১ বঙ্গাব্দে 'স্টার রঙ্গমঞ্চে' নবনাট্য-মন্দির কর্তৃক সর্ব্বপ্রথম অভিনীত। ইহা 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ। ১৩২৪ বঙ্গাব্দের পৌষ হইতে চৈত্র ও ১৩২৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষ'-এ 'দত্তা' প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে 'দত্তা'র প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ (২রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৮)।

চতুর্থ সম্ভার
সমাপ্ত